সমরেশ বসু

গোগোল অমনিবাস



পরিবেশক : নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশিকা : সুমিতা নাথ
১বি, প্রিয়নাথ ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

অলংকরণ : ধীরেন শাসমল

মুদ্রক : কমলা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬



ছোট্ট বন্ধুরা

তোমাদের মধ্যে অনেকেই গত কয়েক বছর ধরে গোগোলের নানা ধরনের কাণ্ড-কারখানার খবর শুনেছ গোগোলের স্রষ্টা সমরেশ বসুর বিভিন্ন লেখায়। তোমরা জেনেছ গোগোলের অনেক শ্বাসরোধকারী এ্যাডভেঞ্চারের কথা যার ফলে এই খুদে গোয়েন্দাটি তোমাদের একান্ত আপন হয়ে উঠেছে, তোমরা নিজেদের অজান্তে কখন যে ওকে দারুণ ভালোবেসে ফেলেছ, তা নিজেরা জানো না। ওর একটা কাহিনী পড়ার পর মাসের পর মাস রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করেছ পরবর্তী কাহিনী জানার আশায়। এমনি-ভাবেই গোগোল এবং তোমরা শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিয়েছ, তোমাদের স্বপ্নবর্ণিল দিনগুলোতে গোগোল তোমাদের সাথী।

গোগোলের স্রষ্টা সমরেশ বসু ওর নাম গোগোল রাখলেন কেন? অন্য নামও তো রাখতে পারতেন। সমরেশ বসু গোগোল নামটি পেয়েছিলেন ওঁরই অভিন্নসত্তা কালকূটের কাছে, যখন কালকূট কুম্ভমেলায় গিয়ে প্রথমে এলাহাবাদে যাঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন সেই ডঃ অরুণকুমার মিত্রের ছেলের নাম গোগোল বলে জানতে পারেন। কিন্তু গোগোলের বাবা সমীরেশ চ্যাটার্জী তা জানতেন না। তিনি রাশিয়ার বিখ্যাত গোগোল-এর ভক্ত। অতএব ছেলের নাম রাখলেন গোগোল।

কিন্তু গোগোল যার নাম, তার নামে যে 'গোল' কথাটা আছে। যার নামের পিছনে গোল আছে, তার কাজে তো গোলমাল থাকবেই। সে জানে না, এমন বিষয় নেই। তার হাব-ভাব, হাঁটা-চলা, কথা বলার কায়দা সব কিছুর মধ্যেই একটু অভিনবত্ব আছে। তাই তো সে তোমাদের এত প্রিয়, তোমাদের নায়ক।

তোমরা তো ওর অনেক ঘটনা জানো, এই অমনিবাসটা পড়লে ওর আরো অনেক নতুন কথা জানতে পারবে। কিন্তু সব জানার পরেও একটা ব্যাপারে কিন্তু তোমাদের একমত হতেই হবে— গোগোল মোটেই দস্যি ছেলে নয়। আমাদের আশেপাশে সবসময় যা ঘটছে সেইসব ব্যাপারে ওর অসীম কৌতূহল, কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে বিন্দুমাত্র দুষ্টুমি ওর ধাতে পোষায় না।

তবে দেখবে ও বাড়িতে ভীষণ নিঃসঙ্গ। মা সুনীতি রান্নাবান্না আর

সংসার সামলানোয় ব্যস্ত। বাড়িতে কাজের লোক আছে। কিন্তু হারাধন বা বঙ্কিমদা গোগোলকে মোটেই সময় দেয় না। তোমরা দেখবে স্কুলে যাওয়া ছাড়া বাড়িতে সময় কাটানো ওর কী রকম সমস্যা! হয়তো মা কখনও একটু গল্প পড়ে শোনালেন কিংবা ও কখনও নিজের খাতায় একটা গল্প লিখল। কিন্তু তোমরা বলো তো, এভাবে তোমাদের মতো বয়েসের একটা ছেলের সময় কাটে? ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবারও কেউ নেই। বাবা তো সারাক্ষণ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে বাড়ির বাইরেই কাটান। তাই, ও কাউকে পেলে আর ছাড়তে চায় না, তাকে গল্প শোনায়, নিজের নানা রকমের কেরামতির পরিচয় দেয়।

ও কিন্তু তোমাদের মতো দুষ্টু না, দুরন্তপনা ওর ধাতে নেই। তোমরা কি গোগোলের মতো মায়ের বাধ্য ছেলে? ও সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়। ও প্লাস্টার দিয়ে নানারকম মূর্তি তৈরি করে। বাড়ির যাবতীয় ফেলে-দেওয়া ইলেকট্রিকের তার, খারাপ সুইচ ইত্যাদি দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করে। জিজ্ঞেস করলে বলে, মাইক তৈরি করা হচ্ছে। আলো জ্বলছে না, সুইচ ঠিক করা হচ্ছে। সে মাকে বাঘ সেজে ভয় দেখায়, বাবার ডাক্তার হয়ে যায়, ফ্রিজ সারানোর ইঞ্জিনিয়ার হয়। চাকরের কাছে গল্প বলে ও নিজেও শোনে। বন্ধুদের নানা বিষয়ে জ্ঞান দেয়। কখনও নিজের মনেই বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দীতে কথা বলে।

তবে তোমরা তো গোগোলকে বেশ কয়েক বছর ধরেই দেখছ। ওর বয়সটা তো আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা একটু বাড়ছে বই কি। সুমিত, টুকাই, গোগে, পারভেজ ও জর্জের মতো বন্ধুরাও ওর জীবনে এসেছে। ও ক্যারাটের ভক্ত। আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর কৌতূহলটা বেড়ে যাওয়ার দরুন ও মাঝে-মাঝে বিপদের মুখে ঝুঁকি নেয়।

হঠাৎ কোনো লোকের মুখ দেখেই ওর মনে হয়, লোকটা মোটেই ভালো নয়। আবার চোখের সামনে কোনো ঘটনা ঘটতে দেখলেই সেটা ভালো কি মন্দ ও যেন মনে-মনে বুঝতে পারে। ঘটনাটা যদি খারাপ হয় তাহলেই গোগোলের কৌতূহল এমন বেড়ে যায় যে সেই ঘটনার শেষ না দেখা পর্যন্ত ও শান্তি পায় না। কিন্তু তোমরা কি কোনো ঘটনা দেখলেই প্রাণপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ো? বাবা-মায়ের আপত্তি থাকলে তোমরা কি কোথাও এগিয়ে যাও? কিন্তু গোগোলের মতো বাধ্য ছেলে কি করে ভয়ঙ্কর সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে? ওর ভাগ্যটাই এমন, ওর কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন নেই,

আপনা থেকেই ও বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।

আসলে, তোমাদের মতো গোগোল সব কিছুকে সাধারণ চোখে দেখতে পারে না। তোমাদের জহুরী-চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে, বড় হবার পর বাবাকে নকল করে পাকামি করার চেয়ে ওর অন্য অনেক বিষয়ে কতটা কৌতূহল বেড়েছে—মানুষের চাঁদে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা, মঙ্গলগ্রহেব রঙ এবং সেখানে পাহাড় নদ-নদী, গাছপালা এবং কোনো জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা—সেসব ও জানতে চায়।

গোগোলের সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই অনেক বিষয়ে অমিল রয়েছে। ওর জীবনে দারিদ্র্য নেই, বাবা সচ্ছল ও পদমর্যাদাসম্পন্ন। তাই, ও ইচ্ছেমতো গল্পের বই কিনতে পারে, ছবি আঁকার সরঞ্জাম যোগাড় করতে পারে। কিন্তু দেখবে ও স্বভাবের দিক থেকে কত ভালো। মাত্র একবারই ও পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারেনি। ও মায়ের কড়া শাসন মুখ বুজে সহ্য করে, সচরাচর মায়ের বিনা অনুমতিতে কোথাও পা বাড়ায় না। কিন্তু ওকে নিয়ে ওর বাবা-মায়ের মনে যে শান্তি নেই তাতে ও কি করতে পারে বলো ?

তোমরা তো কত গোয়েন্দা-গল্প পড়ো কিন্তু বলো তো ওর চালচলন কি গোয়েন্দা-গল্পের নায়কদের মতো সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ? ও ইচ্ছে করে আসামীদের ধরতে বা মোকাবিলা করতে চায় না। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আরামে একটি নিটোল সচ্ছল মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারে বাবা-মায়ের স্নেহের উত্তাপে ওর জীবনটা মসৃণ পথেই চলার কথা।

কিন্তু ও বাড়িতেই থাকুক আর বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতেই যাক, ওর কৌতূহল আর সব কিছু জানার আগ্রহ ওকে বিভ্রাটে ফেলে দেয়, ওর বাবা-মায়ের ঘুম কেড়ে নেয়। ও কি করবে বলো!

সব কিছু জানার অদম্য কৌতূহল মাঝে-মাঝে ওকে প্রায় মৃত্যুর দরজায় নিয়ে গেছে। 'দুর্গের গড়খাইয়ের দুর্ঘটনা'র আততায়ী ওকে প্রায় হত্যা করে ফেলে, রায়রাজাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ও গুণ্ডাদের তাড়া খেয়ে পালালেও ওকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাত্রে বাড়িতে ডাকাত পড়ে, কাইরং মঠের ঘটনায় ওকে শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়, সারেণ্ডার জঙ্গলে রাক্ষসের বদলে পাইথন আবিষ্কার করার ঝুঁকি নেওয়ার দুঃসাহসের জন্য মায়ের কাছে থাপ্পড় খেতে হয়, রাণাঘাটে গিয়ে শয়তানদের কাছে তাড়া খেয়ে তীব্রবেগে ধাবমান ট্রেনের চাকার তলায় পিষ্ট হতে হতে বেঁচে যায়। তোমরা দেখবে মহিষাসুরমর্দিনী-মূর্তির অপহরণকারীরা কীভাবে ওকে ধরে নিয়ে

একটা কাঁচা মাটির ঘরে শুইয়ে রেখে হুমকি দেয় যে ঘোর দুপুরে এসে ওকে দীঘির জলে ডুবিয়ে শেষ করে দেবে। এমন কি, 'সোনালীপাড়ের রহস্য' আবিষ্কার করতে গিয়ে পুরীতে ও গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে পারত, ব্যাঙ্ক-ডাকাতেরা একবার ওকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞানও করে ফেলে। সেখান থেকে ও এসে পড়ে এমন একটা লোকের হাতে যে ওকে হত্যা করে ঘরের মেঝেতে পুঁতে ফেলার জন্য একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। এমন কি, ওকে বাড়ি থেকেও দু'বার শয়তানেরা ধরে নিয়ে যায়।

কিন্তু দেখছ তো তোমরা, গোগোলের কী অসাধারণ ক্ষমতা! ওর শরীর থেকে কখনও রক্ত ঝরেনি। সে বরাবরই মায়ের কোলে ফিরে আসে। আর একটা মজা নিশ্চয়ই তোমাদের নজর এড়াবে না। বন্দী অবস্থায় ওর খাওয়া-শোয়ার কোনো অসুবিধে হয় না। টেলিফোনে আড়ি পাতার শাস্তি দিতে যে-দস্যুরা ওকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে এবং হত্যার হুমকি দেয়, সেই নৃশংস লোকগুলো ওর শোবার ব্যবস্থা করে 'ফোমের গদির ওপর বিছানায়,' খেতে দেয় 'পরোটা, মুর্গীর মাংস আর মিষ্টি।' ওদের সহৃদয়তায় গোগোল সকালে প্রাতরাশ হিসেবে খেতে পায় মাখন-মাখানো টোস্ট, ওমলেট আর সন্দেশ। অনুরোধ আসে চা অথবা কফি পান করার, দুপুরের খাদ্য হিসেবে পায় ভাত, মুর্গীর ঝোল ও মিষ্টি আর বিকেলে 'হ্যাপি ক্রিসমাস'-লেখা বড়দিনের কেক। সত্যিই তো, যেখানে মা নেই, হারাধন বা বঙ্কিমদা নেই, সেখানে যে-কোনো উপায়ে এইসব মুখরোচক খাবার-দাবারের ব্যবস্থা না থাকলে খালি পেটে কি ওইসব ঝুট-ঝামেলা পোষায়?

আর একটা ব্যাপাব তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। বিভিন্ন এ্যাডভেঞ্চারে গোগোল এমন কিছু সঙ্গী পেয়ে যায় যারা পরোক্ষভাবে ওকে রহস্য উদ্ধারে সাহায্য করে। তবে লিম্বু, মেদা, ইলা, তিনুদা, আলেগে, বিজিত, ডাবুদা এবং নৈহাটির বিখ্যাত গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর ওকে যতই সাহায্য করুক না কেন, মূল কৃতিত্বটা কিন্তু ওরই। বাংলা সাহিত্যের আসরে এই খুদে গোয়েন্দা নিশ্চয়ই অমরত্বের দাবি করতে পারে। কি, তাই না? কি বলো তোমরা? অমনিবাসটা পড়ে জানিও।

নিতাই বসু

ইঁদুরের খুট খুট



অনেককাল ধরে বড়োদের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে, আমি নিজেও যেন কেমন হাঁপিয়ে পড়েছি। অথচ যাদের সঙ্গে গল্প করতে পেলে আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে, তাদের একটা গল্প নিজে থেকে শোনাতে পারি না। শোনাবার খুব সাধ। কিন্তু সাধ থাকলেই তো আর সাধ্যে কুলায় না। বড়োদের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে মনটা কেমন যেন মরচে ধরে গিয়েছে। মনের সেই তাজা টাটকা ভাবটা যেন হারিয়েই ফেলেছি, যা না থাকলে, তোমাদের আসরে এসে বসবার কোনো মানেই হয় না।

এসব কথা বলতে হলো, কারণ, আজ ঠিক করেছি, তোমাদের আমি একটি গল্প শোনাবো। সম্প্রতি আমি এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর লেখা পড়ছিলাম। তিনি একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন। তিনি মানুষের মন নিয়ে অনেক গবেষণা করে, আবিষ্কার করেছেন, মাত্র ছ'বছর বয়সের মধ্যে, শিশুদের মনে যে-সব ভাবনা-চিন্তা কল্পনা এবং জ্ঞান বুদ্ধির প্রসার ঘটে, পরবর্তীকালে—অর্থাৎ ভবিষ্যতে মানুষ যতো বুড়ো হয়, সেই ছ'বছরের ভাবনা-চিন্তা কল্পনা জ্ঞান বুদ্ধিই নানা রূপে, নানা ভাবে বিকাশলাভ করে। তার মানে হলো, সেই বিজ্ঞানী এ কথাই বলতে চেয়েছেন, ছ'বছর বয়স পর্যন্তই, মানুষের যা কিছু অনুভূতির পূর্ণতা ঘটে, পরে তা নানা রূপে বিকাশ লাভ করে। তা তিনি বিজ্ঞানী হোন, কবি বা সাহিত্যিক হোন, রাজনৈতিক নেতা বা ডাক্তার হোন।

আমি অবিশ্যি তোমাদের সেই বিজ্ঞানীর কথা শোনাতে বসি নি। তাঁর গবেষণায় যথেষ্ট যুক্তি আছে বটে, অনেক তর্কও আছে। সে-সব নিয়ে আমাদের আপাততঃ মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমি যার বিষয় নিয়ে, তোমাদের একটি আশ্চর্য অথচ ভয়ঙ্কর গল্প শোনাতে যাচ্ছি, তার বয়স মাত্র ছ'। নাম গোগোল। গোগোল নামটা ওর বাবা রেখেছিলেন। রাশিয়ার এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম ছিল গোগোল, আর আমাদের গোগোলের বাবা সেই রাশিয়ার সাহিত্যিক গোগোলের ভারি ভক্ত। সেই জন্যই ছেলেব নাম রেখেছেন গোগোল।

গোগোলের কথা শুনলেই তোমাদের মনে হবে, সে জানে না, এমন বিষয় নেই। আসলে সে হয়তো অনেক কিছুই এখনো জানে না, জানা সম্ভবও না। কিন্তু তার ভাব ভঙ্গি, স্পষ্ট উচ্চারণের কথাবার্তা শুনলে, একটু যেন থমকেই যেতে হয়। এই যেমন ধরো, গোগোলের বাবাকে কোনো ভদ্রলোক ডাকতে এলেন, বাড়ির চাকর এগিয়ে যাবার আগেই, গোগোল তার ঝকঝকে কালো চোখে, ভদ্রলোকের আপাদমস্তক একবার দেখবে। কপালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুলের নীচেই ওর সরু টানা ভুরু কুঁচকে উঠবে। জিজ্ঞেস করবে, 'জানতে পারি, আপনি কাকে চান?'

স্বভাবতঃই অচেনা ভদ্রলোক হলে একটু হকচকিয়ে যাবেন, অবাক চোখে গোগোলের ফরসা মুখ আর টুকটুকে লাল ঠোঁটেব দিকে, ওর রঙচঙে জামা আর প্যাণ্টের দিকে দেখবেন, এবং গোগোলের বাবার নামটা বলবেন। তখন গোগোল গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

ওর জিজ্ঞেস করবার ভঙ্গিটাই এমন, ভদ্রলোককে তাঁর নামটি বলতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে গোগোলের পরের জিজ্ঞাসা, 'কোথা থেকে আসছেন, কী দরকার?'

ভদ্রলোকের তখন মনে হতে পারে, গোগোল একটি ডেঁপো ছেলে। তখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে হয়তো বাড়ির ভৃত্য সে-সব কথা শুনছে আর মিটিমিটি হাসছে। সেও একই কথা, অন্যরকম ভাবে জিজ্ঞেস করবে, 'বাবু আপনি কোথা থেকে আসছেন, বাবুকে কী বলব?'

গোগোল তখন ভৃত্যকে ধমক দিয়ে বলবে, 'আহ্, তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে, দেখছো আমি কথা বলছি।'

বলে সেই ভদ্রলোককেই গোগোল বলবে, 'দেখছেন তো কী রকম দুষ্টু ছেলে, কিছু মনে করবেন না। আপনি আসুন, বাইরের ঘরে বসুন, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোককে বাইরের ঘরে বসিয়ে, সে কিন্তু বাবাকে ডাকতে যাবে না। জানে, বাবার কাছে খবর চলে গিয়েছে। বরং ও নিজে বাইরের ঘরে চেয়ারে লাফ দিয়ে উঠে বসবে। জিজ্ঞেস করবে, 'আপনি সিগারেট খাচ্ছেন না কেন?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলবেন, 'আমি তো সিগারেট খাই না?'

গোগোল বলবে; 'আমার বাবা খায়। বাবাকে ডাক্তারবাবু সিগারেট কম খেতে বলেছেন। আমিও খুব কম খাই।'

ভদ্রলোক চমকে উঠে জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি সিগারেট খাও নাকি?'

গোগোল গম্ভীর মুখে বলবে, 'হ্যাঁ, যখন আমি কাজ করি। পড়ার সময় না। আর আমার সিগারেটগুলো আমি নিজেই বানিয়ে নিই। মায়ের চিঠি লেখার কাগজ দিয়ে বানাই। আচ্ছা ও কথা যাক, আপনি কি সেই বাঘের গল্পটা জানেন, যে ছাগলছানার গা চেটে দিয়েছিল?'

ভদ্রলোক বলবেন, 'না তো।'

গোগোল চোখ বড়ো বড়ো করে বলবে, 'সে কি, আপনি জিম্ করবেটের নাম শোনেন নি? তিনিই তো লিখেছেন। আচ্ছা, আপনাকে আমিই গল্পটা বলছি। একদিন বিকালবেলা জিম্ করবেট একটা গাছে মাচা—মাচা মানে জানেন তো? মাচা হলো, গাছের ডালে বসবার জায়গা, সেখান থেকে বাঘকে গুলি করে মারা হয়। তা একদিন বিকেলে জিম্ করবেট একটা গাছের ওপরে মাচায় বসে আছেন, তখন কিন্তু আকাশটা লাল ছিল। উনি দেখলেন, কাছেই যে গ্রাম আছে না, সেই গ্রামের একটা ছাগলছানা বাড়ির পথ ভুলে, জঙ্গলের কাছে এসে পড়েছে। উনি ভাবলেন, ছাগলছানাটা বাঘের পেটে যাবে। ঠিক সেই সময়েই দেখা গেল, প্রকাণ্ড বড় একটা বাঘ একটা উঁচু ঢিবিতে এসে দাঁড়ালো। সেই বাঘটা অনেকগুলো মানুষ খেয়ে ফেলেছে, ওকে মারবার জন্যই উনি মাচায় বন্দুক নিয়ে বসেছিলেন। উনি বন্দুক তোলবার আগেই দেখলেন, ছাগলছানাটা ম্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ করতে করতে একেবারে বাঘটার মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক হয় তো সত্যি জানেন না, তাই বললেন, 'জানি না তো?'

গোগোল হাত নেড়ে নিজেই খুব অবাক হয়ে বলবে, ছাগলছানাটা তো কোনোদিন বাঘ দেখে নি। ও তো শিশু, তাই বাঘ যে কী ভীষণ জানোয়ার, ও তার কিছুই জানে না। ভেবেছিল, ওটাই বুঝি ওর মা, তাই বাঘের মুখের কাছ থেকে, একেবারে তার পেটের নীচে চলে গেল। জিম্ করবেট তখন ভাবলেন, বাঘটা এবার ছাগলছানাটাকে এক গরাসে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু

বাঘটা কী করলো বলুন তো ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'জানি না তো ?'

গোগোল বলবে, 'বাঘটা ওকে খেল না। একটু যেন বিরক্ত হলো, একবার ছাগলছানাটাকে শুঁকে, আস্তে আস্তে ঠ্যাং তুলে ছাগলছানাটাকে সরিয়ে দিল, তারপরে টিবির নীচে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ব্যাপার দেখে, জিম্ করবেট বাঘটাকে মারবার কথাই ভুলে গেলেন। তাঁর মনে হলো, জীবনে এমন ঘটনা মানুষ আর কখনো হয়তো দেখবে না। এটা নিশ্চয় ভগবানের কোনো লীলা। কিন্তু বাঘটা কেন ছাগলছানাটাকে খেলো না, বলুন তো ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'জানি না তো ?'

গোগোল ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বললে, 'আসলে বাঘেরা খিদে না পেলে, কারোকে মারে না। আমাদের যেমন দুষ্টু খিদে আছে না, খিদে না পেলেও খাবার জন্য বায়না করি, ওরা সেরকম না।'

ভদ্রলোক তখন জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার বুঝি দুষ্টু খিদে পায় ?'

গোগোলের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠবে। বলবে, 'একটু একটু! আচ্ছা আপনি কি সেই বাহাদুরের কথা জানেন ?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, 'কোন্ বাহাদুর ?'

গোগোলও ভদ্রলোকের এত কম জানা আছে দেখে, খুব অবাক হয়ে বলবে, 'যুথপতি বাহাদুর ?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, 'যুথপতিটা কী ?'

গোগোল এবার ঠোঁট আর জিভ্ দিয়ে একটা শব্দ করবে, যেন ও ভদ্রলোককে করুণা করছে। বলবে, 'যুথপতি জানেন না ? জঙ্গলে হাতীদের যে দল থাকে, তার যে সর্দার থাকে, তাকে বলে যুথপতি।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলবেন, 'ও, তাই নাকি ? তা সে-সব বই কি তুমি পড়েছ নাকি ?'

গোগোল বলবে, 'আমি এখনো এতোটা ভালো করে পড়তে শিখিনি। মা আমাকে পড়ে শোনায়, আমার সব মনে থাকে। অবিশ্যি আমারও একটা গল্প লেখার খাতা আছে, তাতে অনেক গল্পই লিখি। তবে বানান একটু ভুল হয়, মা ঠিক করে দেয়। তারপরে শুনুন, বাহাদুর নামে একজন যুথপতি ছিল, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে—।'

এ সময়েই হয়তো গোগোলের বাবা এসে পড়বেন, এবং ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা আরম্ভ করবেন, 'ওহো, আপনি এসেছেন ? আমার একটু দেরি

হয়ে গেল।'

গোগোল তাড়াতাড়ি বলবে, 'বাবা, আমি আগে বাহাত্তরের গল্পটা বলে নিই।'

গোগোলের বাবা বললেন, 'না গোগোল, লক্ষ্মী বাবা, এঁর সঙ্গে আমার অনেক জরুরী দরকারী কথা আছে। তুমি এখন ভেতরে যাও।'

গোগোল চেয়ার থেকে লাফিয়ে নামবে, হতাশ মুখখানি ভারী করে বলবে, 'তোমাদের খালি দরকারী আর জরুরী কথা। বাহাত্তরের গল্পটা বুঝি কিছু না?'

ভদ্রলোক তখন বলবেন, 'দরকারী কথা সেরেই, আমি তোমার বাহাত্তরের গল্প না শুনে যাচ্ছি না।'

গোগোল একটু চোখ পাকাবার ভঙ্গি করে বলবে, 'ঠিক তো? মিথ্যা কথা বলবেন না, পাপ লাগবে।'

গোগোলের বাবা বলবেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ তোমাকে মিথ্যা কথা বলছেন না। তুমি এখন ভেতরে যাও তো।'

গোগোল তখন চলে যাবে।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি, বাড়িতে গোগোল ভারী নিঃসঙ্গ। মা রান্নাবান্না আরো দশ রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। চাকরও তা-ই। ও ইস্কুলে যায় বটে। তারপর যে ওর আর সময় কাটতে চায় না। সেই দুপুরে মা কখন একটু গল্প পড়ে শোনাবেন। তারপরেও বিকেল আছে, সন্ধ্যে আছে। রোজ রোজ ওকে বেড়াতে নিয়েও যাওয়া যায় না। বাবা থাকেন বাড়ির বাইরে কাজে। সে জন্যই ও কারোকে পেলে ছাড়তে চায় না। আর সত্যি সত্যি ও চমৎকার গল্প বলতে পারে। লেখেও। লেখাগুলো অবিশ্যি মায়ের কাছে শোনা গল্পগুলোরই মতো প্রায়, একটু এদিক ওদিক থাকে। সেটা ওর নিজের বানানো।

তাছাড়া গোগোল প্লাস্টার দিয়ে নানারকম মূর্তি তৈরি করে। বাড়ির যাবতীয় ফেলে দেওয়া ইলেকট্রিকের তার, নষ্ট হয়ে যাওয়া সুইচ্, সেসব দিয়েও সে অনেক কিছু তৈরি করে, জিজ্ঞেস করলে বলে, 'মাইক তৈরি করা হচ্ছে। আলো জ্বলছে না, সুইচ ঠিক করা হচ্ছে।'

মোটের ওপর, গোগোল একদিকে যেমন নিঃসঙ্গ, অন্যদিকে আবার তেমনিই ব্যস্ত। তখন ওকে দশবার ডেকেও চান করানো খাওয়ানো যাবে না।

যাই হোক, যে অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর গল্পটা বলতে যাচ্ছি, এবার সেটাই বলি।

জুন মাসে গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে কাশ্মীরে বেড়াতে গেল। মনে মনে তার যতো আনন্দ, ততো উত্তেজনা। ও ওর বাবার কাছে আগেই শুনে নিয়েছে, হিমালয়ের অভ্যন্তরে, চল্লিশ মাইল চওড়া, আশি মাইল লম্বা এক অপূর্ব সুন্দর উপত্যকা আছে। সেই উপত্যকা ভূমিই হল কাশ্মীর।

গোগোলেরা সকালবেলা যখন পাঠানকোটে এসে পৌঁছুলো, দেখা গেল, সেখানে বেশ একটা উত্তেজনা আর পুলিশ মিলিটারী টহল দিচ্ছে। লোক-জনকে ডেকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করছে, সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে। সন্দেহবশতঃ অনেকের ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ খুলেও দেখছে। এমন কি গোগোলের বাবাকেও একজন পুলিশ অফিসার ইংরেজীতে কী সব কথাবার্তা জিজ্ঞেস করলেন। বাবা পকেট থেকে রেলের টিকেট, তাঁর অফিসের কার্ড, সবই দেখালেন। মাকে আর গোগোলকেও দেখিয়ে পরিচয় দিলেন।

পাঠানকোট স্টেশনের ক্যাটারিং-এর খাবার ঘরে, সকালের খাবার খেতে খেতে গোগোল বাবার মুখে সব ঘটনাটা শুনলো। গতকাল পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে একটা সাংঘাতিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ডাকাতেরা তিন জন লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এক ধরনের লোহার কেস্ আছে, যার মধ্যে কোটি কোটি টাকা থাকে। এই কেস্গুলো যে-সে খুলতে পারে না। প্রত্যেকটা কেসের আলাদা আলাদা ধরনের চাবি আছে, আর চাবিগুলো, বাঁ দিকে বা ডান দিকে কতোবার কীভাবে পাক দিতে হবে, তা জানা আছে শুধু একজনের। তিনি হলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। চাবিও তাঁর কাছেই থাকে।

যেখানে নোট ছাপানো হয়, তাকে বলে মিন্ট্। মিন্ট্ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে টাকা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে, সেই রকম কয়েকটি কেস্ ভরতি টাকা নিয়ে যখন একটা গাড়ি চণ্ডীগড় স্টেট ব্যাঙ্কের দিকে যাচ্ছিল, তখনই একটা নির্জন জায়গায়, ডাকাতরা সেই গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাড়িতে ড্রাইভার নিয়ে সব শুদ্ধ চারজন লোক ছিল। তিন জনের কাছে বন্দুক ছিল। কিন্তু ডাকাতরা এমনই দুর্ধর্ষ, তারা তিনজনকে মেরে ফেলেছে, একজন এখন হাসপাতালে আছে, বাঁচবে কি না সন্দেহ। তার মানে, ডাকাতরা প্রায় পনর কুড়ি কোটি টাকার কেস্ নিয়ে পালিয়েছে। চার দিকেই সেই ডাকাত দলের সন্ধান চলেছে। কেউ কেউ অনুমান করছে, ডাকাতদল হয়তো কাশ্মীরে

ঢুকে, ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে, পাকিস্তান পালিয়ে যাবে।

সেই জন্য সমস্ত লরি ট্রাক প্রাইভেট গাড়ি বাস পুলিস আর মিলিটারি খুঁজে খুঁজে দেখছে। সব থেকে মুশকিল হয়েছে, ডাকাতদলকে কেউ চেনে না। বা তারা কী গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে, তাও কেউ বলতে পারে না। যারা পারতো, তাদের তিনজন তো মারাই গিয়েছে। একজন এখন অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে।

গোগোল আবার খেতে খেতে, বাবার মুখে সমস্ত ঘটনাটা শোনার পর, মনে মনে কেবলই কল্পনা করার চেষ্টা করতে লাগলো, ডাকাতগুলোর চেহারা কী রকম হতে পারে। খাবাব খেয়ে, বাইরে বেরিয়ে, ও প্রত্যেকটা লোকের মুখের দিকে ভালো করে দেখতে লাগলো। লম্বাচওড়া চেহারা আর বড় গোঁফ দেখলেই, ওর মনটা যেন ছাঁৎ ছাঁৎ করে উঠতে লাগলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাদের হাসি আর কথাবার্তা শুনে, অন্যরকম মনে হলো। এদিকে ওর মা তাড়া দিলেন, পাঠানকোট থেকেই চান করে নিতে হবে। তা-ই নিতে হলো। তারপরে বেশ একটা ঝকমকে সুন্দর বাসে উঠে, ওরা কাশ্মীর যাত্রা করলো।

পাহাড়ের উপর দিয়ে, এঁকে বেঁকে যেতে যেতে, নানারকম দৃশ্য দেখে ডাকাতির কথাটা গোগোল প্রায় ভুলেই গেল। খাতা আর পেন্সিল নিয়ে, হঠাৎ হঠাৎ একটা করে কথা লিখতে লাগলো। গাড়ির মধ্যে ভারতের নানা প্রদেশের মহিলা পুরুষেরা রয়েছেন। তাঁদের ভাষা গোগোলের জানা না থাকলেও, সকলের সঙ্গেই তার বেশ ভাব হয়ে গেল। সকলেই তাকে গাল টিপে, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদরও করলো। এক দাড়িগোঁফওয়ালা তলোয়ারধারী শিখ ওকে চুমো খেতেই ওর ভীষণ সুড়সুড়ি লেগে গেল।

রাত্রিবেলাটা ওদের কাটাতে হলো কুঁদ বলে একটা জায়গায়। পরদিন ভোরবেলা আবার যাত্রা শুরু হলো।

গোগোল আর বাইরে থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। দুপুরের দিকে ওরা যখন কাশ্মীরে পৌঁছুলো, সমতলের মতো সেই উপত্যকায়, গোগোল একেবারে মুগ্ধ। হিমালয়ের বুকে যে এরকম সুন্দর হ্রদ আছে, ভাসমান বাগান আছে, ও ভাবতেই পারে নি। ঝিলম নদীর দিকে তাকিয়ে ওর চোখ চকচক করে উঠলো। বাবা ওকে চিনিয়ে দিলেন, চিনার গাছ। যেমন বিশাল গাছ, তেমনি ওর পাতা। সব থেকে ওর আনন্দ হলো, যখন বাবা একটা বোট ভাড়া করলেন। কোনো হোটেলে ওরা থাকলো না। হাউস-বোটটাই একটা বাড়ি। তার মধ্যে বসবার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর,

বাথরুম, সব আছে। এমন কি ইলেকট্রিকের আলোও আছে।

কয়েকদিন হাউসবোটে থেকে, গোগোলরা বেড়াতে গেল পহেলগাঁও বলে একটা জায়গায়। কাশ্মীর শহর থেকে, ষাট পঁয়ষট্টি মাইল দূরে পহেলগাঁও। জায়গাটা লিডর নদীর ধারে। পাহাড়ী নদী, পাথরে ধাক্কা খেয়ে, গর্জন করে বহে চলেছে। নদীর ওপারে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে পাইন বন, আর বনের মাথায়, পাহাড়ের চূড়া বরফে সাদা ধবধব করছে। গোগোল এসব ছবিতেই দেখেছে। চোখে এই প্রথম দেখলো। এখানেও ছোট ছোট হোটেল আছে। কিন্তু হ্রদে যেমন হাউস বোট থাকে, পহেলগাঁওয়ে তাঁবু আছে। গোগোলের বাবা তাঁবুতে থাকাই ঠিক করলেন। সবুজ ঘাসওয়ালা উঁচু নীচু এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবু খাটানো হয়েছে। গোগোলের বাবা তাঁবুওয়ালাদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁবুওয়ালা একটা বেশ বড় খাটানো তাঁবু দেখালো, যার ভিতরে তিনটে ভাগ আছে। সামনের ভাগে কয়েকটা চেয়ার আর একটা টেবিল। টেবিলে আবার কয়েকটা ইংরেজী ম্যাগাজিনও আছে। তার পরের ভাগটা বেশ বড়। সেখানে দুটো বড় বড় খাটিয়া আছে। গোগোল বুঝে গেল, এটাই তাঁবুর ভেতরে শোবার ঘর। তার পিছনে বাথরুম। সেখানেও কাঠের পাটাতন পাতা আছে। বালতি ঘটি আর গোগোল জানে, বাকী দুটো জিনিসকে বলে কমোড। হাউস বোটেই বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এ সব জায়গায় তো পায়খানা নেই, তাই কমোডের ব্যবস্থা। তাঁবুওয়ালাই জানিয়ে দিল, তারা খাবারও দেবে, যা গোগোলদের খেতে ইচ্ছা হয়।

সত্যি, কী মজা! বেড়াবার জন্য যে এত ব্যবস্থা আছে, আগে গোগোল জানতো না। ওর সঙ্গে তাঁবুওয়ালার খুব ভাব হয়ে গেল। সে আবার ভাব করিয়ে দিল টাট্টু ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে। গোগোলের বাবা টাট্টুওয়ালাকে গোগোলকে ঘোড়ায় চাপিয়ে বেড়িয়ে আনতে বললেন। টাট্টুওয়ালা গোগোলকে টাট্টুতে চাপিয়ে মাঠ আর পাইন বনের দিকে বেড়াতে নিয়ে গেল। পাইন বন আর ফাঁকে ফাঁকে মাঠেও তাঁবু পড়েছে অনেক। আশে-পাশে অনেক গাড়ি দাঁড় করানো। যাদের গাড়ি আছে, তারা অনেকে গাড়ি নিয়েও বেড়াতে এসেছে। কয়েকটা গাড়ির পিছনে আবার আলাদা করে ভ্যান জুড়ে দেওয়া রয়েছে। ঠিক যেন গাড়ির পিছনে একটা মালগাড়ির ওয়াগন। গোগোল টাট্টুওয়ালাকে ওগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওগুলো কী?'

টাট্টুওয়ালা বাঙলা কথা না বুঝলেও, গোগোলের প্রশ্নটা বুঝে নিল।

জবাব দিল, 'উসমে সাব লোগকো শামান হ্যায়।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'শামান কী?'

টাট্টুওয়ালা হেসে বললো, 'শামান নহি জানতা খোকাবাবু? মাল মাল, বাক্সা বিস্তারা।'

গোগোল বুঝে নিল, বললো, 'বাকশো আর বিছানা! তার জন্য এত বড় মালগাড়ি?'

টাট্টুওয়ালা হাসলো, কোনো জবাব দিল না। গোগোল বেশ খানিকক্ষণ টাট্টুতে চেপে বেড়ালো। জায়গাটা ওদের তাঁবুর কাছেই।

দুপুরবেলা খেয়েই, গোগোল ওর খাতা আর পেন্সিল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বাবা বললেন, 'বেশি দূরে কোথাও যেও না, কাছে পিঠেই থেকো।'

গোগোল মাঠ আর পাইনবন দেখিয়ে বললো, 'আমি ওদিকটায় থাকবো।'

গোগোল মাঠ আর পাইন বনের দিকে গিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরলো। ওর মনে হলো, ওর বয়সী ছেলেরা সকলেই বোধহয় পাঞ্জাবী। কয়েকজনের সঙ্গে অল্প দু' চারটি ইংরেজিতে কথা হলো। কিন্তু তেমন জমলো না। তখন গোগোল খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে গেল। বড় বড় করে লিখলো, 'পাইন বন অতি সুন্দর। লোকেরাও সুন্দর।'

গোগোল ওর বাবার কাছে, দুপুরবেলা জেনে নিয়েছে, গাড়ির পিছনে জোড়া ওগুলোকে নাকি অটোভ্যান বলে। ও ঘুরে ঘুরে, হঠাৎ একটা অটোভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লো। অটোভ্যানের সামনে কোনো গাড়ি নেই, শুধু ভ্যানটা রয়েছে। গোগোলের মনে হলো, ভ্যানটার মধ্যে যেন ঠুং ঠুং করে একটা শব্দ হচ্ছে। ও খুব অবাক হলো। ভ্যানটার পিছনে গিয়ে দেখলো, তার দরজায় মস্ত বড় বড় দুটো তালা ঝুলছে। অথচ শব্দটা কিসের? ভ্যানটা যেখানে রয়েছে, সেখানে পাইন বন একটু ঘন, সামনে কোনো তাঁবু নেই, নিরিবিলি মতো।

শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। গোগোল ভ্যানটার চারপাশে ঘুরলো। উঁচুতে এক জায়গায় একটা বড়ো ফুটো রয়েছে। সেখানে উঠে দেখবার উপায় নেই।

গোগোলের মনে হলো, ও বোধহয় ভুল শুনেছে। আসলে ভিতরে বোধহয় ইঁদুর রয়েছে, ইঁদুর ঠুক ঠুক করছে। ও সেখান থেকে আবার অন্যদিকে সরে গেল। যেদিকে লোকজন আছে, সেদিকে বেড়াতে বেড়াতে, বাবা মাকে পেয়ে গেল। তাঁদের সঙ্গে লিডর নদীর ধারে গেল। কিন্তু

বেশিক্ষণ থাকা গেল না। আকাশে মেঘ করে এল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। গোগোল বললো, 'বাবা, আমাদের তাঁবু ভিজে গেলে, থাকবো কেমন করে?'

বাবা হেসে বললেন, 'দূর বোকা, তাঁবুর ভিতরে আবার জল পড়ে নাকি? ওয়াটার প্রুফ দেখোনি, যেমন কী না রেনকোট বা ছাতা, তার নীচে কি জল পড়ে? তাঁবুর কাপড়ও সেইরকম। ভেতরে জল পড়ে না।'

গোগোল খুব গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালো। সত্যি, ব্যাপারটা ও ভাবে নি। ওরা তাঁবুতে ফিরতে না ফিরতেই বৃষ্টি নামলো, আর দারুণ শীত করতে লাগলো। বাবা তাঁবুর মুখ ভালো করে বেঁধে দিলেন।

পরের দিন সকালবেলা ঝকঝকে রোদ উঠলো। সব যেন নতুন হয়ে উঠেছে। গোগোল সেই মাঠ আর পাইন বনের দিকে গেল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে, ও সেই ভ্যানটার কাছে গেল। ভ্যানটার সঙ্গে এখন গাড়িটাও রয়েছে। এক ভদ্রলোক গাড়িতে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছেন, বাবারই বয়সী হবে। তিনি গোগোলকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু ভ্যানের ভিতরে সেই ঠুং ঠুং শব্দ হচ্ছে। গোগোল ভ্যানটার চারপাশে ঘুরে, গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে। সেই সময়েই ভদ্রলোক ওর দিকে তাকালেন। সামনে থেকে মনে হলো, ভদ্রলোক বাবার থেকে যেন বয়সে ছোট। লম্বা জুলফি, সরু গোঁফ, গালে অল্প দাড়ি গজিয়েছে। গোগোলকে দেখেই, লোকটি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে; গাড়িব হর্ন বাজিয়ে দিল। অমনি ঠুং ঠুং শব্দটাও থেমে গেল।

লোকটি গোগোলকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেয়া মাংতা বাচ্চো?'

গোগোল বললো, 'কিছু না: ইঁদুর—মানে র‍্যাট-র‍্যাট ঠুক ঠুক করছে।' বলে ভ্যানের দিকে দেখিয়ে দিল। লোকটা হেসে বললো, 'হাঁ হাঁ, উস্‌কো অন্দর মে ইন্দুর হ্যায়, মার দেগা।'

গোগোলও হেসে সরে গেল। চলে যাবার সময়, হঠাৎ ভ্যানের উঁচু গায়ে, ফুটোর দিকে ওর চোখ পড়লো। পড়তেই দেখলো, একটা চোখ ওকে দেখছে। যেই চোখাচোখি হলো অমনি চোখটা সরে গেল। ওটা যে ইঁদুরের চোখ না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে হলো মানুষের চোখ। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হবে? ভ্যানের মধ্যে মানুষ থাকবে কেমন করে? গোগোল কি গাড়ির লোকটাকে কিছু বলবে? না, না বলাই ভালো। ও চলে যেতে যেতে ভাবলো, লোকটা তখন হঠাৎ হর্ন বাজালো কেন? আর

তখনই ঠুং ঠুং শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেল। এর মধ্যে কী ব্যাপার থাকতে পারে?

গোগোল তাঁবুতে ফিরে বাবাকে ঘটনাটা বললো। বাবা বললেন, 'তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ, ওটা কখনো মানুষের চোখ হতে পারে না। ভ্যানের কোনো জানলা দরজা থাকে না, ওর মধ্যে মানুষ থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।'

গোগোলের মনে হলো, কথাটা ঠিক। কিন্তু ও কি এতোই ভুল দেখেছে? ও অন্যদিকে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলো। দেখলো, এখানেও পুলিস আর মিলিটারি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় সেই ব্যাঙ্ক



ডাকাতির, ডাকাতদের ধরবার জন্য। তাঁবুওয়ালা ওর বাঙলা কথা বুঝতে পারে। সেও বেশ ভাঙা ভাঙা বাঙলা বলতে পারে? ও গিয়ে তাঁবুওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে এত পুলিস আর মিলিটারি টহল দিচ্ছে কেন? সেই ডাকাতদের ধরবার জন্য?

তাঁবুওয়ালা বললো, 'হাঁ খোঁকাবাবু, ডাকাতলোগ্ ইধারেও আসতে পারে। পুলিস বাতলাচ্ছে কি, ডাকাতলোগ্ নাকি ইধারে কোথায় এসেছে।'

'পুলিস খবর পেয়েছে?'

তাঁবুওয়ালা বললো, 'তা জানি না। তবে উ লোগ ডাকাত খুঁজছে।'

গোগোল বললো, 'কিন্তু এখানে তো সবাই বেড়াতে আসে। ডাকাতরা কি এখানে আসবে?'

তাঁবুওয়ালা বললো, 'আসতে ভি পারে, উলোগ হর্ জায়গা যেতে পারে।'

গোগোল চিন্তিত হয়ে তাঁবুতে ফিরে গেল।

গোগোল দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে, বাবার পাশে একটু শুয়ে রইলো। তারপরে বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়লো, খাতা পেন্সিল নিয়ে। এক জায়গায় বসে লিখলো, 'ভ্যানের মধ্যে ইঁদুরের ঠুক ঠুক।' তারপরে পাইন বনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, ভ্যানটা রয়েছে, গাড়িটা নেই। গোগোল ভ্যানটার কাছে গেল। কোনো শব্দ হচ্ছে না। ও সেই ফুটোটার দিকে তাকালো। না, কোনো চোখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ভিতরে যেন খুট করে একটা শব্দ হলো, একবারই। গোগোল ভ্যানটার গায়ে কান ঠেকিয়ে শোনবার চেষ্টা করলো, কোনো শব্দ হচ্ছে কি না। ও চমকে উঠলো। খুব অস্পষ্ট হলেও, গোগোল মানুষের কথা বলার শব্দ পেল। কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক মানুষের গলা।

গোগোল সরে এসে পিছনে গিয়ে দেখলো, তালা দুটো ঠিক ঝুলছে। ও তাঁবুতে ফিরে গিয়ে, বাবাকে ঘটনাটা বললো। বাবা বললেন, 'তুমি তো অনেক কিছুই শুনতে পাও। কী শুনতে কী শুনেছ, তার ঠিক নেই। ও ভ্যানটা তোমাকে পেয়ে বসেছে।'

বাবা তেমন আমল দিলেন না। গোগোল তখন তাঁবুওয়ালার কাছে গেল, তাকে সব কথা বললো। তাঁবুওয়ালার চোখে মুখে একটু চিন্তা দেখা দিল। সে গোগোলকে নিয়ে, পাকা রাস্তার ধারে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বন্দুক পিস্তল নিয়ে অনেক পুলিসের লোকেরা ছিলেন। তাঁবুওয়ালা

তাঁদের হিন্দীতে গোগোলের বলা ঘটনাটা বললো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন। একজন লম্বা চওড়া অফিসার, কোমরে পিস্তল গোঁজা, গোগোলের হাত ধরে বললেন, 'চলো বাচ্চো, মুঝে ও ওয়াগন দেখা দো।'

তাঁবুওয়ালা বললো, 'খোঁখাবাবু, ভ্যানটা ই সাবলোগকো দেখিয়ে দাও।'

গোগোল বললো, 'চলুন।'

গোগোলের সঙ্গে সেই অফিসার, এবং আরো কয়েকজন বন্দুক নিয়ে চললেন। কাছে গিয়ে দেখা গেল, ভ্যানের গাড়িটা তখন ফিরে এসেছে, আর সেই লোকটিই গাড়িতে বসে আছে। অফিসার এগিয়ে গিয়ে, সেই লোকটিকে কী বললেন। লোকটিও কী সব বললো। তারপরে একটা চাবির গোছা নিয়ে, লোকটি গাড়ি থেকে নেমে এল। নেমে এসে, ভ্যানের পিছন দিকে না গিয়ে, লোকটা হঠাৎ অন্যদিকে দৌড়তে লাগলো। অফিসার তৎক্ষণাৎ কোমর থেকে পিস্তল বের করে, লোকটার দিকে ছুঁড়লেন। কিন্তু লোকটা যেন সাপের মত এঁকেবেঁকে, পাইন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে ভিড় জমতে লাগলো। অফিসার হুকুম দিলেন, 'ভ্যানকো তালামে গোলি চালাও।'

দুজন বন্দুকধারী গুলি করে, তালা ভেঙে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানের ভিতর থেকেও গুলি ছুটে এল। তাঁবুওয়ালা গোগোলকে কোলে তুলে নিয়ে সরে গেল। একজন পুলিসের লোক গুলি খেয়ে পড়ে গেল। তখন বন্দুকধারী মিলিটারিও এসে গিয়েছে। ভ্যানের চার পাশ ঘিরে গুলি ছোঁড়া শুরু হলো। যেন একটা যুদ্ধ চলছে। ভ্যানের ভিতর থেকে খানিকক্ষণ গুলি ছুটে এল, তারপরে বন্ধ হয়ে গেল। ভিতরে যেন কেউ আর্তনাদ করছে।

সেই পুলিস অফিসার চেঁচিয়ে বললেন, 'জিন্দা রহনে মাংতাতো জল্‌দি নিকালো।'

একটু পরে, ভ্যান থেকে একটি লোক দু হাত তুলে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে একজন ধরে ফেললো। আর একজনকে নামানো হলো, তার ঘাড়ের কাছে রক্ত। তারপর কয়েকজন ভ্যানের ভিতর ঢুকলো। ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এল, ব্যাঙ্কের সেই ভাঙা লোহার কেস্‌, আর বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকার নোট।

তাঁবুওয়ালার চোখ ছানাবড়া। সে গোগোলকে বললো, 'খোঁখাবাবু, তুমি বহোত বরিয়া লেড়কা আছো, তোমার জন্যই ডাকাতলোগ ধরা পড়েছে, তামাম রুপেয়া ভি মিলে গেছে।'

সেই লম্বা চওড়া ফরসা পুলিস অফিসার এসে, তাঁবুওয়ালার কোল থেকে, গোগোলকে নিজের কোলে তুলে নিলেন, আদর করে চুমু খেয়ে অনেক কথা বলতে লাগলেন। গোগোল তা বুঝতে পারলো না। শত শত লোক, পুলিস, মিলিটারি, পুরুষ মহিলা সবাই তখন গোগোলকে দেখছে, আর হাসছে, কেউ কেউ হাততালিও দিচ্ছে।

এ সময়েই গোগোলেব বাবা মা ছুটে এলেন। বাবা ইংরেজিতে অফিসারকে ভয়ে ভয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করলেন, আর বললেন। অফিসার অমনি বাবাকেও এক হাতে জড়িয়ে ধবে ইংরেজিতে কী যেন বললেন। গোগোল দেখলো, বাবা মা হাসছেন, কিন্তু তাঁদের চোখে যেন জলও এসে পড়েছে। মা হাত বাড়াতেই, গোগোল মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মা ওকে চুমো খেয়ে বললেন, 'আমার সোনা মাণিক।'

গোগোল বললো, 'কাঁদছো কেন মা?'

মা বললেন, 'আনন্দে, তুমি যে আমাদের মুখোজ্জ্বল কবেছ।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে মায়েব কাঁধে মুখ লুকালো।

এবার এখানেই ইতি। পবে আবার তোমাদেব গোগোলেব নতুন গল্প শোনাবো।

রত্নরহস্য ও গোগোল



গোগোলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। প্রমোশন পেয়েছে নতুন ক্লাসে। কিন্তু অঙ্কে গোগোল বেশ কম নম্বর পেয়েছে। লাল দাগ থেকে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। একশোতে সাঁইত্রিশ পাওয়া, মায়েব কাছে শুধু কম নয়, স্রেফ ফাঁকিবাজী। মা মনে করেন, গোগোল অঙ্কতে অমনযোগী বলেই কম নম্বর পায়।

যাই হোক। ডিসেম্বরের শেষে পরীক্ষার ফল বেরিয়ে যাবাব পবে, কোথাও বেড়াতে যাবার কথা প্রথমে কিছুই ওঠে নি। হঠাৎ বাবা একদিন অফিস থেকে ফিরে মা'কে বললেন, অফিসেব কাজে তাঁকে বম্বে যেতে হবে। যেতে হবে দু'দিন পরেই। এত কম সময়েব মধ্যে, ট্রেনের রিজারভেশন পাওয়া মুশকিল। অবশ্য চেষ্টা করলে হয় তো হয়ে যায়। ট্রাভেল এজেন্সী-গুলো খুব কম সময়ের নোটিসেই ব্যবস্থা কবে দিতে পারে। তবে বাবা ট্রেনে যাবেন না। প্লেনে যাবেন। প্লেনেব টিকেটও ট্রাভেল এজেন্সীর কাছ থেকেই কেনা হবে।

বাবার কথা শুনে, মা জিজ্ঞেস কবলেন, 'কত দিনেব জন্য যাবে? সেই মত তোমার জামা কাপড় সুটকেশে গুছিয়ে দেব।'

বাবা বললেন, 'কথাটা সেজন্য তোমাকে বলি নি। ভাবছিলাম বছরের শেষ, আমার তো অনেক দিন ছুটি পাওনা রয়েছে। বোম্বেতে আমার সেরকম বেশি কাজও নেই। দু'দিন দুটো জরুরী মিটিং আছে। মিটিংয়ের খবর টেলেকস্ করে কলকাতার অফিসে পাঠিয়ে দিয়েই আমার কাজ শেষ।

তারপর কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে ধীরে সুস্থে ফিরে আসব। তাই বলছিলাম, ছুটিই যদি কাটাব, তাহলে তুমি আর গোগোলও চল। বম্বেতে গিয়ে উঠব তো অফিসের গেস্ট হাউসে। আমি অফিসের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই এসেছি। উনি বললেন, 'বেশ তো, ফ্যামিলি নিয়ে যান। আপনার ফ্যামিলিও কোম্পানীর গেস্ট। আমি গেস্ট হাউসের কীপারকে জানিয়ে দিচ্ছি। সে তো আপনাকে ভালই চেনে। কাটিয়ে আসুন কিছুদিন।'

গোগোল বসবার ঘর থেকে বাবার কথাগুলো শুনছিল। বাবা বসেছিলেন খাবার টেবিলে। মা বাবাকে, অফিস থেকে ফিরে আসার পরে জল খাবার দিচ্ছিলেন। বাবার কথা শুনেই, গোগোলের মন চনমন করে উঠেছিল। সেই সঙ্গে একটা উত্তেজনা। ভয় কেবল মাকেই। মা রাজী হবেন কিনা, তার ওপরেই সব নির্ভর করছে। কেননা, মাকে কিছু বিশ্বাস নেই। হয় তো বলে বসবেন, গোগোল অঙ্কে এত কম নম্বর পেয়েছে, ওকে নিয়ে এখন কোথাও যাওয়া চলবে না। এখন থেকেই ওকে অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে, যাতে পরের বছর আরও ভাল করতে পারে। সেই জন্য গোগোল মায়ের কথা শোনবার জন্য দম বন্ধ করে, কান পেতেছিল।

মা বললেন, 'তা হলে আমার আর গোগোলের জন্যও তো প্লেনের টিকিট কাটতে হবে। সে তো অনেক খরচা।'

বাবা হেসে বললেন, 'আহা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, বছরে দুবার আমি বেড়াতে যাবার ছুটি আর এ্যালাউয়েন্স পাই। তোমার আর গোগোলের জন্য দেড়খানা টিকেটে এমন কিছু বেশি খরচা লাগবে না। এখন তুমি যদি বল, আমি জেনারেল ম্যানেজারের সেক্রেটারির বাড়িতে এখুনি একটা টেলিফোন করে বলে দেব, তিনি যেন আমাদের আড়াইখানা প্লেনের টিকেট কাটবার ব্যবস্থা করেন।'

মা বললেন, 'হ্যাঁ আমার তো এই একটাই সময়। এখন ঘুরে এলে, গোটা বছরটা পাওয়া যাবে। গোগোলটা যা আরম্ভ করেছে। দেখি, এবার ফার্স্ট টারমে, অঙ্কে কেমন করে। তাহলে কবে যাওয়া হবে?'

বাবা বললেন, 'সবাই গেলে, আমার মনে হয়, আগামী পরশুদিন সকালের প্লেনেই বেরিয়ে যাই। সকাল মানে ভোর সাড়ে ছটার প্লেন। রিপোর্টিং সাড়ে পাঁচটায়। বাড়ি থেকে পাঁচটায় বেরিয়ে গেলেই হবে। তুমি সেই মত সব ব্যবস্থা কর।'

গোগোল যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে বাবা মাকে দেখা যাচ্ছিল না।

ওর ইচ্ছে হল, লাফিয়ে উঠে, হাততালি দেয়। সাহস পেল না, তাহলে মা রেগে যেতে পারেন। ও পড়ার ঘরে গিয়ে আনন্দে, নাচতে আরম্ভ করল।

গোগোলের বাবা নিজে গাড়ি চালান। কোন ড্রাইভার ছিল না। কিন্তু দমদম এয়ারপোর্ট যাবার জন্য, বাবাকে অফিসের একজন ড্রাইভারকে আসতে বলতে হয়েছিল। ড্রাইভার এসে গোগোলদের ঠিক সাড়ে পাঁচটায় দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল। বাবা ড্রাইভারকে কয়েকটি টাকা দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার গ্যারেজে গাড়ি রেখে, ফ্ল্যাটে বঙ্কিমের কাছে, গাড়ির চাবি রেখে যেও। আমি বম্বে থেকে ফিরে আসার আগেই, অফিসে খবর পাঠিয়ে দেব, কবে ফিরে আসছি। তুমি অফিস থেকেই খবর পেয়ে যাবে। সেই মত গাড়ি নিয়ে চলে আসবে।'

ড্রাইভার, 'আজ্ঞে আচ্ছা' বলে সেলাম ঠুকে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। পোর্টার এসে গোগোলদের তুটো সুটকেশ তুলে নিল। বাবার হাতে এ্যাটাচি। লাউঞ্জে ঢুকে, বাবা মাকে বললেন, 'তুমি গোগোলকে নিয়ে কোথাও বস; অথবা বুকস্টলে যেতে পার। আমি সুটকেশ তুটো চালান করে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে আসছি।'

গোগোল এই প্রথম প্লেনে চাপতে যাচ্ছে না। এর আগে প্লেনে গৌহাটি গিয়ে, সেখান থেকে মোটরে শিলং গিয়েছিল। সেটা ছিল বোয়িং। বাবা বলেছেন, বম্বে যাবে এয়ারবাস। অনেক বড় প্লেন। যাত্রীও অনেক। বম্বে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র তু'ঘণ্টা। অবশ্য দমদম থেকে গৌহাটি যেতে, বোয়িংয়ের সময় লেগেছিল মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। সেবারে চেরাপুঞ্জিতে গিয়ে একটা দারুণ ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এখন গোগোল সেই ঘটনার কথা ভাবতে চায় না।

লাউঞ্জে বেশ ভিড়। ভোরবেলা অনেকগুলো প্লেন ছাড়ে। মাইকে অনবরতই মহিলার গলার স্বরে নানা রকম ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল। ঘোষণায় ফ্লাইট নাম্বার আর জায়গার কথা বলা হচ্ছিল। দিল্লী, গৌহাটির নামই বেশী শোনা যাচ্ছিল। ঘোষণা ইংরেজি আর হিন্দীতে হচ্ছিল।

লাউঞ্জে কত রকমের মহিলা পুরুষ, দেখতে বেশ ভাল লাগে। আর চারদিক বেশ গম্‌গম্ করছে। ভিতরে শীতও কম। গোগোলের মনে হচ্ছিল, দমদমের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এটা না হলেও, সারা পৃথিবীর লোকই যেন রয়েছে। বিচিত্র আর নানা রঙের বেশভূষা। দেখতেও তাই। ভারতের বাইরের, ইউরোপ আর আমেরিকার লোকদের দেখলে চেনা যায়।

ভারতীয়দের মধ্যে, বাঙালী, অবাঙালীদেরও চেনা যায়। কেবল চিনতে অসুবিধা হয়, ভারতেব উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অধিবাসী আর চীনা ও জাপানীদের। বিশেষ করে যারা স্যুট বুট টাই পরা, তাদেব মোটেই চেনা যায় না। আবার, মাথায় যাদের টুপি, মুখে অদ্ভুত লম্বা পাইপ আর জাতীয়



পোষাক দেখলেই, নাগা বা মিজোদের চিনতে অসুবিধে হয় না।

একে তো ডিসেম্বর মাস। তার ওপরে শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। মা গোগোলকে আপাদ মস্তক গরম জামা কাপড়ে মুড়ে দিয়েছেন। বাবা অবশ্য বলেছেন, বম্বেতে নাকি মোটেই শীত নেই। সমুদ্রের ধারে আবহাওয়া অন্যরকম। তবু ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে, মা গোগোলকে পশমী ট্রাউজার আর গলাবন্ধ কোট পরিয়ে দিয়েছেন। পায়ে জুতো মোজা তো আছেই তা ছাড়া, মায়ের নিজের হাতে বোনা পশমের টুপিও মাথা চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ মা নিজে মাত্র একটা কাশ্মীরি ভালো শাল জড়িয়েছেন, পায়ে স্যাণ্ডেল। মোজাও নেই। বাবা ট্রাউজার আর শার্টের ওপরে একটা হাতকাটা লাল সোয়েটার।

গোগোল নানারকম লোক দেখতে দেখতে এদিকে ওদিকে চলে যাচ্ছিল। মা ডেকে বলেছিলেন, 'দূরে কোথাও চলে যেও না।'

মা একটা চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর নজর ছিল বাবার ওপর। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত মা উঠবেন না। গোগোল ঘুরতে ঘুরতে লোকজন দেখছিল। কেউ কেউ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। গোগোল হাসবে কি না বুঝে উঠতে পারছিল না। তার মধ্যে, এক মহিলা ওর গাল টিপে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবে?'

মহিলা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন। গোগোলও ইংরেজিতে বলল, 'আমি বম্বে যাচ্ছি।'

তারপর মহিলা একজন পুরুষকে বললেন, 'ছেলেটিকে ফানি দেখাচ্ছে। সুন্দর।'

ফানি কেন? গোগোল ভাবল। গোগোল যেমন অনেককে দেখছিল, ওকেও অনেকে দেখছিল। তা দেখুক। কিন্তু অচেনা কেউ আদর করলে গোগোলের ভাল লাগে না। অস্বস্তি হয়। ও দূর থেকে দেখল, বাবা তখনও রিপোর্টিংয়ের কাউন্টারের লাইনে। ঘড়িতে ছ'টাও বাজেনি। মা ওর দিকে নজর রেখেছিলেন।

গোগোল মায়ের কাছে ফিরে এসে বলল, 'মা আমি বুকস্টলে যাব?'

মা যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে বুকস্টল দেখা যায় না। বললেন, 'যাও। কিন্তু ওখানেই থেকো। আমি আর তোমার বাবা সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও যেও না। আর এটা নাও।' বলে মা ব্যাগ থেকে চকোলেট বের করে দিলেন।

গোগোল তখনই চকোলেটের মোড়ক খুলল না। কোটের পকেটে

ঢুকিয়ে দিয়ে, বুক স্টলেব দিকে এগিয়ে গেল। ঐ দিকেই সিকিউরিটি চেকে যাবাব কাঁচের দরজা। অনেক মহিলা পুরুষ আর ছোটরাও সিকিউরিটি চেকে যাবার জন্য লাইন দিয়েছে। কাছেই বুকস্টলটাও কাঁচের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা। গোগোল স্টলের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে বেশ ভিড়। আর সবাই বড় মহিলা পুরুষ। গোগোলের বয়সী কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। তা হলে কি গোগোল ঢুকবে না ?

এই সময়েই এক ভদ্রলোক পিছন থেকে গোগোলের কাঁধে হাত রাখলেন। গম্ভীর অথচ নরম মিষ্টি গলায় ইংরেজিতে বললেন, 'বাইরে কেন মিষ্টি ছেলেটি ? ভেতরে যাও। অনেক কমিকস্ আর এ্যাডভেঞ্চারের বই পাবে। চকোলেট, টফি, সব আছে ভেতরে।'

গোগোল ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ফরসা মুখে মিষ্টি হাসি। ভদ্রলোকেব গোঁফজোড়াটি প্রায় ঠোঁটেব দু'পাশে ঝুলে পড়েছে। চোখা নাক। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমার কাঁচ হালকা নীলচে। মাথায় তাঁর কালো গবম পোশাকের মতোই, কালো রঙেরই ফেলট্ হ্যাট। তবে হ্যাটটা বোধ হয় কালো সিল্কে মোড়া। ভদ্রলোক নিজেই গোগোলকে একরকম, কাঁচের দরজা খুলে, স্টলেব মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে গেলেন। ইংবেজিতে বললেন, 'ঐখানে দেখ তোমাব মনেব মত অনেক বই আছে। কোথায় যাবে তুমি ?'

গোগোল বলল, 'বম্বে।' তাবপরে ও দেখল, সত্যি ছোটদেরও অনেক বই রয়েছে। কেবল কমিকস্ নয়। অরণ্যদেব আর গোয়েন্দা রিপের সিরিজ। ক্রস্ওয়ার্ড আর ধাঁধাব বই। ছোটদের জন্য ইংরেজি রামায়ণ মহাভারতও আছে। সব ছবিবই বই। শেষ পর্যন্ত মডার্ন রবিনহুড বইটাব দিকেই গোগোলের ঝোঁক পড়ল। কিন্তু ওব কাছে টাকা নেই। মা বাবা না এলে কিনতে পাববে না।

মাথায় ফেলট্ হ্যাট, চোখে হালকা নীল চশমা, কালো স্যুট পরা সেই ভদ্রলোক আবার গোগোলেব পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁব হাতে একটি চকোলেটের প্যাকেট। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, কোন মনের মত বই এখন খুঁজে পেলে না ? আচ্ছা, আমি দেখছি। ততক্ষণে তুমি এই চকোলেটের সদ্গতি কর।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, চকোলেট দেবেন না। আমার পকেটেই চকোলেট আছে।' গোগোল পকেট থেকে চকোলেটের প্যাকেট বের করে দেখাল।

ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু আমি তোমাব কথা ভেবেই কিনেছি। ঠিক

আছে, রেখে দাও। পরে খেও।' তিনি গোগোলের ঢলঢলে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, তাড়াতাড়ি বের করে, বললেন, 'না থাক, তোমার কোটের পকেটেই রেখে দাও।' বলে, গোগোলের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চকোলেটের প্যাকেটটা রেখে দিলেন। তারপরে, সেটা যেন কোন একটা ঘটনাই নয়, এমনি ভাবে বইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বইগুলির দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'কোন্ বইটা তোমার পছন্দ বল। আমি তোমাকে উপহার দেব।'

গোগোল সত্যি খুব লজ্জা পাচ্ছে, আব অস্বস্তিও লাগছে। ভদ্রলোককে ও চেনে না, কিছু না। অথচ উনি ওকে চকোলেট কিনে দিয়েছেন। এখন আবার বই উপহার দিতে চাইছেন। ও বাধ্য হয়ে বলল, 'আমার কোন বই-ই পছন্দ হয় নি। আমি বই চাই নে।'

ভদ্রলোক হয় তো আরও কিছু বলতেন। এমন সময়ে বাবা এসে পড়লেন গোগোলেব কাছে। বললেন, 'তোমাকে তো আমি বাইরে থেকে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। বড়দের আড়ালে পড়ে গেছ। কী, তোমার কোন বই কেনবার ইচ্ছে আছে নাকি?'

গোগোল এবাব আবও লজ্জা পেয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন, 'ক্ষমা করবেন। মনে হচ্ছে, এ মিষ্টিটা আপনার ছেলে?'

বাবা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক মাথার হ্যাটসহ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কিছু নয়, এমনি। স্টলের দরজার কাছে এসে, ওকে আমার বেশ ভাল লেগে গেল। ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে পাবছিল না। আমি ওকে ঢুকিয়ে নিয়ে এলাম। ইচ্ছে করলো, তাই এক প্যাকেট চকোলেটও কিনে দিলাম। কিন্তু ওর আত্মসম্মান খুবই ভারি। নিতে চাইছিল না। ওর কাছেও চকোলেট আছে, সেটা আমাকে দেখিয়ে দিল। তবু আমি ওটা ওর কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তাবপরে ওকে আমি একটা বই উপহার দিতে চাইলাম। কিন্তু ও আমাকে বলল, কোন বই ওর পছন্দ নয়। কথাটা কি সত্যি তাই?'

ভদ্রলোক গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল লজ্জা পেয়ে হেসে বাবার দিকে তাকাল। বাবা ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি একজন সহৃদয় ভদ্রলোক। চকোলেট দিয়েছেন, ঠিক আছে, কিন্তু বই আপনাকে দিতে হবে না। ওর কোন বই পছন্দ হয়ে থাকলে আমিই কিনে দেব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'না না ধন্যবাদ আবার কিসের? ছোটদের আমি এমনিতেই ভালবাসি। আসলে আমি একজন চালচুলোহীন একলা মানুষ। অবশ্য যদিও আমার স্ত্রী পুত্র ছিল। কিন্তু কেউ আর বেঁচে নেই। আমার নাম জিতেন্দ্র যোশী।' ভদ্রলোক বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বাবাও ভদ্রলোকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করলেন, আর নিজের নাম বললেন।

জিতেন্দ্র যোশী বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা শুনলাম বম্বে যাচ্ছেন। বম্বেতেই থাকেন, না কি কোন—?'

বাবা বাধা দিয়ে বললেন, 'না না, আমি আমার অফিসের কাজে যাচ্ছি। ছুটিও পাওনা আছে। তাই আমাব ছেলে আব স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি কি—।'

জিতেন্দ্র যোশী বললেন, 'আমি বম্বেতেই থাকি। ব্যবসায়ী মানুষ। পালি হিল্‌সে আমাব বাড়ি। আপনি নিশ্চয়ই কোন হোটেলে উঠবেন?'

বাবা বললেন, 'না। মেরী মাউন্ট রোডে আমাদের অফিসেব গেস্ট হাউসে উঠব।'

এমন সময় মহিলার স্বরে, বম্বের ফ্লাইটেব নাম্‌বাব বলে, ঘোষণা শোনা গেল, 'আপনারা সিকিউরিটি চেকে যান।'

বাবা ব্যস্ত হয়ে তাঁর হাতের ঘড়ি দেখলেন। ছ'টা বেজে পাঁচ। জিতেন্দ্র যোশী বললেন, 'এখনও অনেক সময় আছে। আপনাকে বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করবেন।'

বাবা ব্যস্ত হয়ে হেসে বললেন, 'না না, এতে বিবক্ত হবার কী আছে?'

জিতেন্দ্র যোশী গোগোলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'তা হলে তুমি বাবার কাছ থেকেই উপহারটা নাও। আমি চলি। কিন্তু তোমার নামটা জানা হল না।'

গোগোলের ভাল নামটা কিছুতেই মুখে আসে না। বলল, 'গোগোল।'

'বাঃ গ্রেট নেম।' জিতেন্দ্র যোশী গোগোলের কাঁধে চাপ দিয়ে, বেরিয়ে যাবার আগে, বাবার দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝাঁকালেন, বললেন, 'আশা করি, সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে আবার একবার দেখা হবে।' তিনি স্টল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গোগোল ছবিওয়ালা রবিনহুডের বইটা তুলে নিল। বাবা বললেন, এটা তোমার পছন্দ? চল, তাড়াতাড়ি ক্যাশ কাউন্টারে দামটা দিয়ে যাই। তোমার মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

ক্যাশ কাউন্টারে বইয়ের দাম দিয়ে গোগোল বাবার সঙ্গে বেরিয়ে এল। মা স্টলের বাইরে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার? তোমরা এত দেরী করছিলে কেন?'

বাবা ঘটনাটা বললেন। মায়ের হাতে দুটো বোর্ডিং কার্ড দিয়ে বললেন, 'তুমি গোগোলকে নিয়ে লেডিস সিকিউরিটি চেকে যাও। তোমার হাত ব্যাগটা দেখবে।'

এই সময়েই কাস্টমস-এর একজন অফিসার ডেটোনেটার যন্ত্র নিয়ে গোগোলদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। খানিকটা গিয়েই থম্‌কে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দুটো কুঁচকে উঠল। আশেপাশে সকলের দিকেই সন্দেহের চোখে তাকালেন। তখন আর একজন সাধারণ পোষাকের ভদ্রলোক তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। দুজনের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে দু'একটা কথা হল। তারপর দুজনেই সিকিউরিটি চেকের ভিতরে ঢুকলেন। যাঁর হাতে ডেটোনেটার যন্ত্রটা রয়েছে, তিনি পুরুষদের চেকিং বোর্ড থেকে, মহিলাদের দিকে চলে এলেন। সঙ্গে সেই সাধারণ পোষাকের ভদ্রলোক। দুজনের চোখেই সন্দেহ। আর তাঁদের দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠেছে। যে-মহিলা চেক করেছিলেন তাঁকে সাধারণ পোষাক পরা ভদ্রলোক চাপা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এখন আর কারোকে ঢুকতে দেবেন না। এ ভদ্রমহিলা আর ছেলেটিকে একটু ভাল করে দেখতে হবে।'

গোগোল অবাক হয়ে দেখল, ওর আর মায়ের সম্পর্কেই ভদ্রলোক ঐ কথা বলছেন! মা যেমন অবাক, তেমনি ভয়ও পেয়েছেন। মহিলা সিকিউরিটি অফিসার মায়ের হাত ব্যাগ আর শরীর নানা ভাবে দেখতে লাগলেন। ডেটোনেটার যন্ত্রে তখন অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। সাধারণ পোষাক পরা ভদ্রলোক গোগোলের কোটের আর ট্রাউজারের পকেট ভাল করে দেখলেন। তারপরে, ট্রাউজারের একটা পকেট থেকে টেনে বের করলেন, পাতলা কাগজের একটি মোড়ক। গোগোল অবাক হয়ে ভাবল, ওটা আবার কী? ওটা তো তার নয়? ভদ্রলোক সাদা পাতলা কাগজের মোড়কের নীচে, আর একটা বেগুনি কাগজ পেলেন। সেটা খুলতেই চোখ ঝলসানো একটা পাথর বেরিয়ে পড়ল। মা অবাক চোখে তাকিয়ে, ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একি গোগোল, এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে?'

গোগোল বলল, 'আমি কিছু জানিনে মা। এটা তো আমার পকেটে ছিল না?'

সাধারণ পোষাক পরা ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঠিক

জানেন তো, এটা আপনাদের জিনিস নয়? এটা একটা কয়েক লক্ষ টাকা দামের হীরে!'

মা বললেন, 'এত দামী হীরে আমি কোনদিন চোখেও দেখি নি। নিজের হওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু এ হীরে গোগোলের পকেটে এল কেমন করে?'

গোগোলের চোখে তখন জিতেন্দ্র যোশীর মুখ ভেসে উঠল। ও বুক স্টলের ঘটনাটা বলল। সাধারণ পোষাকের ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ হীরেটা মুড়ে, আবার গোগোলের পকেটেই ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। লোকটার চেহারার যা বিবরণ দিলে, সেটা তার আসল চেহারা না-ও হতে পারে। কিন্তু সেটা নিয়ে এখন আমরা আর আলোচনা করব না। বাইরে অনেক মহিলার ভিড় জমে গেছে সিকিউরিটি চেকের জন্য। তোমার নাম তো গোগোল চ্যাটার্জি? ও, কে! তুমি তোমার মা বাবার সঙ্গেই বসবে। আমরা তোমার ওপর খেয়াল রাখব। লোকটা বম্বে পৌঁছে, তোমার কাছে হীরেটা নিতে আসবেই।' বলে ভদ্রলোক মায়ের কাছে জোড় হাত করে ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'এ কষ্ট দেবার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনার ছেলের জন্যই আমরা একজন আন্তর্জাতিক হীরে চোরাই চালানদারকে ধরতে পারব। আপনি বেরিয়ে যান। কেবল আপনার স্বামী এখন কিছু জিজ্ঞেস করলে, জবাবটা দয়া করে এড়িয়ে যাবেন। প্লেনে উঠে চুপি চুপি বলে দেবেন।'

মা গোগোলকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দুজনেরই মুখ তখন লাল আর উত্তেজিত। বাবা বেশ ভয় পেয়ে, এগিয়ে এসে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? তোমাদের চেক হতে এত দেরী হচ্ছিল কেন?'

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'জানি নে। ওঁরা যে এতক্ষণ ধরে আমাদের কাছে কী খুঁজলেন, কিছুই বুঝলাম না। বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিল।'

বাবা বেশ রেগেই বললেন, 'অফিসারগুলো সব অকর্মার ঢেঁকি। হয়তো কিছু একটা খবর পেয়েছে, অমনি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে, তাদের কষ্ট দিচ্ছে।'

মা চারদিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, "যাকগে ছেড়ে দাও। ওঁরা আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আমরা কি এগোব?"

বাবা বললেন, 'না, এখনও কিছু বলেনি। অথচ ছ'টা পঁচিশ হয়ে গেল। চল, বসি গিয়ে।'

গোগোলের পকেটে তখন কয়েক লক্ষ টাকার হীরে! ও চারদিকে

তাকিয়ে, জিতেন্দ্র যোশীকে খুঁজছে। কিন্তু সেরকম চেহারার কোন লোকই ওর চোখে পড়ছে না। ওদের খুব কাছে, দেখতে সুন্দর এক মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তিনি একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন পড়তেই ব্যস্ত। তাঁর আগে অন্য দিকে মুখ ফেরানো এক ভদ্রলোক। ফরসা, মাথায় বেশ বড় টাক। চোস্ত্ আর সিল্কের পাঞ্জাবীর ওপরে লাল রঙের কাশ্মীরী শাল ভাঁজ করে জড়ানো। পায়ে কোলাপুরি স্যাণ্ডেল।

গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে, টারমিনালের দরজার কাছাকাছি এগিয়ে গেল। বসবার আগেই ঘোষণা শোনা গেল। গোগোলদের ফ্লাইট নাম্বার বলে, এয়ারক্রাফটে যাবার জন্য, বাসের দিকে এগোতে বলা হচ্ছে। মা গোগোলের হাত ধরে, বাবার সঙ্গে এগোলেন। মায়ের হাতে দুটো বোর্ডিং কার্ড। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে গিয়ে বাসে উঠল। বসবার আগেই বাস ছেড়ে দিল। মা বাবাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন। মা তাড়াতাড়ি মাথার ওপর হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলেন। গোগোলের কোন দরকার ছিল না। মা গোগোলকে এমন আগলে রাখলেন, ওর কাছে কেউ ঘেঁষলেই, তিনি গোগোলকে কোলের কাছে টেনে রাখলেন। গোগোল নিজেও সাবধান ছিল। ও মায়ের গায়ে হেলান দিয়ে, দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে।

বাস দাঁড়াল বিরাট এয়ারবাসের একটু দূরে। সিঁড়ি লাগান ছিল। গোগোল মায়ের সঙ্গে এগোল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই, এয়ার হোস্টেস হেসে 'গুডমর্নিং' বলে বোর্ডিং কার্ড দেখতে চাইলেন। সীট নাম্বার দেখে, বসতে গিয়ে দেখা গেল, গোগোল আর মায়ের সীট পড়েছে জানালার পাশাপাশি। বাবার মাঝখানের ধারে। মা গোগোলকে ঠেলে দিলেন জানালার ধারে। গোগোলও তাই চাইছিল। যে-বোয়িংয়ে ও গৌহাটি গিয়েছিল, এয়ারবাস তার থেকে অনেক বড়। রাস্তা দিয়ে যে-বাস চলে, সে-বাসও এত বড় হয় না। আর আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে, সেই এয়ারবাস রাস্তায় চলা বাসের থেকে অনেক বড়। লোক উঠছে তো উঠছেই। ভিতরে তখন খুব আস্তে আস্তে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা বাজনা বাজছে :

গোগোল দেখল, মা কেবলই বাবার দিকে তাকাচ্ছেন। মাঝখানে চলাচলের ফাঁক থাকায়, বাবাকে কিছুই বলতে পারছেন না। আর বাবা তখন সামনের সীটের পিছন থেকে খবরের কাগজ টেনে নিয়ে, পাতা উল্টে দেখতে আরম্ভ করেছেন। প্রায় দশ মিনিট পরে মহিলার স্বর শোনা গেল, সবাই কোমরের বেল্ট পরে নিন। ধূমপান করবেন না। কোন্ পাইলট প্লেন চালাচ্ছেন, তাঁর নাম বললেন। আর জানিয়ে দিলেন, দু'ঘণ্টার মধ্যে আমরা

বম্বে ল্যাণ্ড করব। কথাগুলো তিনি হিন্দীতেও বললেন। সেই ফাঁকে একজন এয়ার হোস্টেস বিলি করে গেলেন টফি, কানের তুলো আর মৌরি। গোগোল দুটো টফি তুলে নিল।

পাঁচ মিনিট পরেই প্লেন আকাশে উড়ল। গোগোলও সব ভুলে গিয়ে, জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। মা হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'খুব সাবধান গোগোল। সেই দামী জিনিসটা কিন্তু তোমার পকেটেই রয়ে গেছে। তুমি যদি টয়লেটে যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব। একলা সীট ছেড়ে নড়বে না।'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'বম্বে না আসা পর্যন্ত আমি সীট থেকে উঠব না। কিন্তু মা, মাথার টুপিটা আমার খুলতে ইচ্ছে করছে।'

মা হাত বাড়িয়ে নিজেই গোগোলের মাথা থেকে পশমের হাতে বোনা টুপিটা খুলে নিলেন। বললেন, 'ওঁরা কেন যে তোমার পকেটেই ওটা রেখে দিলেন, বুঝতে পারছিনে। নিজেদেব কাছে রেখে দিলেই তো পারতেন। তারপর তোমাকে চোখে চোখে রাখলেই, সেই লোকটাকে ধরতে পারতেন। আর কী অদ্ভুত ব্যাপার, তুমি থাকলেই একটা না একটা গোলমাল হবেই!'

গোগোল হেসে বলল, 'সেটা বুঝি আমাব দোষ?'

মা বললেন, 'না এটা অবশ্য তোমার দোষ নয়। কিন্তু কী যে ঘটবে, কে জানে। তোমার বাবাকে এখনও কথাটা বলতে পারছিনে। উনি বেশ ফাঁকে বসে আছেন।'

গোগোল হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সামনে পেছনে, অনেকগুলো মুখের দিকে দেখল। কিন্তু এত লোক, সকলের মুখ দেখা সম্ভবই নয়। মা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল? উঠে দাঁড়ালে কেন?'

বাবাও গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল বসে পড়ে, বলল, 'সেই লোকটাকে খুঁজছি: কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনে।'

মা ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমাকে আর দেখতে হবে না। চুপ করে বস।'

এয়ার হোস্টেস ট্রলিতে করে, স্ন্যাকস্ নিয়ে এগিয়ে এলেন।

এয়ার হোস্টেস এক সময়ে ঘোষণা করলেন, 'আমরা এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি।' তারপরে প্রায় একঘণ্টা বাদে ঘোষণা করলেন 'আপনারা কোমরে বেল্ট বাঁধুন। ধূমপান করবেন না। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা বিমান বন্দরে অবতরণ করব।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মা হাত তুলে ঘড়ি দেখলেন। সময় সাড়ে আটটা। দশ মিনিট লেটে

ছেড়েছিল। ঠিক দু'ঘণ্টা সময়ই লাগল। গোগোল ওর ঢলঢলে ট্রাউজারের দু'পকেটে দু'হাত ঢোকাল। এক পকেটে মায়ের দেওয়া চকোলেটের প্যাকেট। আর এক পকেটে সেই কাগজের ছোট মোড়ক। ও হাত দিয়ে মোড়কটা টিপল। শক্ত ঠেকল। মনে মনে অবাক হল, ঐ সামান্য জিনিসটার দাম কয়েক লক্ষ টাকা! কতো আশ্চর্য জিনিস যে পৃথিবীতে আছে। কিন্তু সত্যি কি সেই মাথায় ফেলট হ্যাট পরা সুন্দর ভদ্রলোকটিই ওর পকেটে ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন? বুক স্টলের ভিড়ে অন্য কেউও হয় তো ঢুকিয়ে দিতে পারে। জিতেন্দ্র যোশী তো তাঁর নাম ঠিকানা সবই বাবাকে বলেছেন। উনি কি মিথ্যে কথা বলেছেন?

মা গোগোলের দু'হাত পকেট থেকে টেনে বের করলেন। কোমরে বেল্ট আটকে দিলেন। গোগোলের মনে হল, মায়ের হাত কাঁপছে। তাকিয়ে দেখল, মায়ের চোখে মুখে গভীর উদ্বেগ। বাবা খবরের কাগজ গুটিয়ে রেখে, হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'এসে গেলাম। এয়ারপোর্টে অফিসের গাড়ি আসবার কথা আছে। গাড়ির নম্বরও নিয়ে এসেছি। সুটকেশের গায়ে লাগানো কাউণ্টার পার্ট কার্ড আমার কাছে আছে। পেতে একটু দেরী হবে। মালপত্র যেখানে আসবে, তোমরা সেখানে দাঁড়িও। আমি সেই ফাঁকে গাড়িটা কোথায় আছে, দেখে আসব।'

মা বাবার মুখের দিকে তাকালেন। অথচ একটা কথাও বলতে পারছেন না। তাঁর মুখ সাদা হয়ে উঠছে। গোগোল তখন দাঁতে দাঁত চেপে, প্লেন ল্যাণ্ড করার অপেক্ষা করছে। বেশ বুঝতে পারছে, প্লেন সামনের দিকে যেন একটু ঝুঁকে আছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিতেই, গোগোল মায়ের গায়ে ধাক্কা খেল। জানালা দিয়ে বাইরে দেখল, প্লেন মাটিতে নেমেছে। যে-কোন দ্রুতগামী মোটর গাড়ির থেকেও জোরে চলেছে।

বাবা এ্যাটাচিটা হাতে তুলে নিলেন। প্লেনের গতি কমে এল। বাঁক নিয়ে আস্তে আস্তে চলল। একেবারে নেমে যাবার পরেই, মা উঠে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ মায়ের পিছনে এসে এক ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। বাবাও উঠে দাঁড়ালেন। মা ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। গোগোল, দেখল, সেই ভদ্রলোক। চোস্ত আর সিল্কের পাঞ্জাবীর ওপর লাল কাশ্মীরি শাল জড়ানো। দাড়ি গোঁফ কামানো ফরসা মুখ। মাথায় চকচকে বড় টাক। বাবা ডাকলেন, 'গোগোল এস!'

মা সেই ভদ্রলোককে যাবার জন্য সরে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'যান!'

'আপনি যান দয়া করে।' ভদ্রলোক যেন ঠোঁট টিপে বললেন।

মা গোগোলেব হাত চেপে ধবে নিজেব সামনে টেনে নিলেন। মুহূর্তেই পিছন থেকে একটা ধাক্কা এল। শাল গায়ে টাক মাথা ভদ্রলোক অনেকখানি দূবে ছিটকে গেলেন। মুখ ফিবিয়ে বেগে বলে উঠলেন, 'এটা কী হচ্ছে?'

পিছনেব লম্বা চওড়া ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দুঃখিত। আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মাবা হয়েছে।' বলেই গোগোলেব বাবাব দিকে ফিবে বললেন, 'চলুন।'

বাবা পা বাড়াতেই, ভদ্রলোক মা'কে বললেন, 'দযা কবে চলুন।'

মাযেব মুখে ঘাম ফুটে উঠেছে। তিনি শক্ত কবে গোগোলকে ধবে, সামনে টেনে নিলেন। গোগোলেব সামনে বাবা। পিছনে মা। মাযেব পিছনে সেই লম্বা চওড়া ভদ্রলোক। চৌকো শক্ত মুখ। সাদা ট্রাউজাবেব ওপব সাদা সার্ট। গায়ে গবম জামা কিছুই নেই। মোটা ভুরু, চোখা নাক। আব চোখ দুটো যেন শিক্‌বে ঈগল পাখীব মত ঝকঝকে। গোগোল কি ভদ্রলোককে কোন ইংবেজি ছবিতে দেখেছে? চেহাবাটা যেন সেই বকমই। প্লেন থেকে নামবাব জন্য তখন ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। গোগোল বাবাব পিছনে পিছনে সামনেব দিকে এগিযে গেল। পিছন থেকে মা ওকে দু'হাতে জড়িযে ধবে বেখেছেন। গোগোলবা ছিল প্লেনেব সামনে দিকে। ককপিটেব দিক থেকেও যাত্রীবা দবজাব দিকে এগিযে আসছিলেন। এযাব হোস্টেস দু'হাত জোড় কবে, হাসি মুখে দাঁড়িযেছিলেন। সবাইকেই বলছিলেন, 'নমস্তে।'

গোগোল সিঁড়ি বেযে নীচে নেমে এল। মা ওকে যেমন ধবেছিলেন, তেমনি ধবেই আছেন। বাবা বললেন, 'গোগোলকে এখন ছেড়ে দাও না

মা বললেন, 'না। তুমি দূবে যেও না। আমাব আব গোগোলেব গাযে গাযে থাক।'

বাবা অবাক চোখে মায়েব দিকে তাকালেন। এই প্রথম তিনি মাযেব মুখেব দিকে ভাল কবে দেখলেন, জিজ্ঞেস কবলেন, 'কী হয়েছে নীতি?'

কয়েকজন মহিলা পুরুষ গোগোলদেব খুব কাছেই। বাস নেই। টারমিনালেব দিকে হেঁটে যেতে হচ্ছে। মা চাবদিকে দেখে ফিসফিস কবে বললেন, 'ভীষণ বিপদ! গোগোলেব প্যান্টেব পকেটে কেউ একটা কয়েক

লক্ষ টাকা দামের হীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

এমন সময় সেই লম্বা চওড়া ভদ্রলোক একেবারে বাবার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লেন। হেসে বললেন, 'দুঃখিত।'

বাবা রেগে গেলেন না। অবাক হেসে বললেন, 'খোলা জায়গায় ঘাড়ে পড়ছেন?'

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই, একজন সিনেমা এ্যাকট্রেসের মত মহিলা গোগোল আর মায়ের সামনে এসে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ সেই ভদ্রলোক মহিলার গায়ের কাছে এসে পড়লেন। মহিলা ভদ্রলোকের দিকে একবার বিরক্ত চোখে তাকিয়ে, সোজা হেঁটে চলে গেলেন। বাবা মায়ের আরও কাছে চলে এলেন। বললেন, 'কী ধরনের লোক সব, বোঝা যায় না।'

গোগোল তখন সেই ফেল্ট হ্যাট পরা লোকটাকে খুঁজছে। আশ্চর্য, এত লোক হেঁটে চলেছে। জিতেন্দ্র যোশী একেবারে বেপাত্তা? তাঁকে দেখাই যাচ্ছে না। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে লাউঞ্জে পৌঁছে গেল। ওদের ঘিরে একটা ভিড় কিছুতেই সরছে না। মা বাবাকে বললেন, 'তুমি এখন গাড়ি খুঁজতে যেও না। সুটকেশ দুটো এলে, একেবারে এক সঙ্গে যাব। আমার ভয় করছে ভীষণ।'

বাবা বললেন, 'সেটা তো আমারও করছে। কিন্তু পুলিশ বা কাস্টমস্-এর কেউ আমাদের কাছে আসছেন না কেন? হীরে পাচারকারীটা যদি গোগোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?'

বাবা মা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিলেন। সেই লম্বা চওড়া ভদ্রলোক হঠাৎ পাশ থেকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠলেন, 'তার জন্যে ভাববেন না। মাল পেলেই, পোর্টারের হাতে দিয়ে, সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসবেন। নিজের জায়গায় চলে যাবেন।'

বাবা অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ভদ্রলোক ডান দিকে ফিরে হন্ হন্ করে চলে গেলেন। মা গোগোলকে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'কে লোকটা?'

বাবা বললেন, 'কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। যাকগে, কনভেয়ার বেল্টে মাল আসতে আরম্ভ করবে এখুনি। চল আমরা সেদিকে যাই।'

গোগোল দেখল, ওদের চারপাশে এখন কেউ ঘিরে নেই। কী যে ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন সব লোক গিয়ে ভিড় করেছে কনভেয়ার বেল্টের কাছে। কনভেয়ার বেল্ট ঘুরতে আরম্ভ করল। ওদের ফ্লাইট নাম্বারটাও একটা বোর্ডে লাল আলোয় জ্বলে উঠল। বাবা বললেন,

'নীতি, কী ঘটতে চলেছে, কিছুই জানি নে। তবে আমার মনে হচ্ছে, হীরে পাচারকারী আমাদের কাছে পিঠে থাকতে পারে। গোগোলকে নিয়েই চিন্তা। ওকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে কেউ পালিয়ে না গেলেই হল। মনে হয়, পুলিশ বা কাস্টমস্ দূর থেকে আমাদের ওপর নজর রেখেছে। হীরে চোরাই চালানদারও জানতে পেরেছে, ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু আমি একটা কথাই বুঝতে পারছিনে। দমদমে ওরা গোগোলের কাছ থেকে হীরেটা নিয়ে নিলেই তো আমাদের ঝামেলা চুকে যেত।'

মা বললেন, 'জানিনে বাপু। কী কুক্ষণে যে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। আর আমার এ ছেলেটাও হয়েছে সে রকম। যেখানে যাবে, সেইখানেই একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে।'

বাবা অতি দুঃখেও হেসে বললেন, 'গোগোলের কী দোষ বল? তবে আমার মনে হচ্ছে, ঐ জিতেন্দ্র যোশীই আসলে হীরে চালানদার। ভেবেছিল, ছোট ছেলেকে সিকিউরিটি চেক করা হবে না। মূর্খ। ডেটোনেটারে তো সবই ধরা পড়বে।'

গোগোল বলল, 'কিন্তু বাবা, সেই জিতেন্দ্র যোশীকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে?'

বাবা বললেন, 'সে হয়তো দমদম থেকে প্লেনে ওঠেই নি। আমাদের ধাপ্পা দিয়েছে। অন্য কেউ আমাদের পেছনে লেগে আছে। যাই হোক, চল, কনভেয়ার বেল্টের দিকে যাই। মালপত্র আসতে আরম্ভ করেছে।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি করব?'

বাবা বললেন, 'তুমি এখানেই দাঁড়াও। ভিড়ের মধ্যে বরং না যাওয়াই ভাল।'

মা গোগোলকে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর চারপাশে দেখতে লাগলেন। তাঁর দু'চোখে আতঙ্ক আর ভয়। আশপাশ দিয়ে মহিলা পুরুষ কেউ না কেউ যাতায়াত করছেন। গোগোল কেবল সেই ফেল্ট হ্যাট পরা লোকটিকেই খুঁজছে। এই সময়ে একজন সুন্দরী বিদেশী মহিলা গোগোল আর মায়ের পাশে দাঁড়াল। মা সটকে উঠে মহিলার দিকে তাকালেন। মহিলা একটি দু'টাকার নোট মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি আমাকে পঞ্চাশ পয়সার একটা কয়েন দিতে পারেন? টেলিফোনের জন্য দরকার। কারোর কাছ থেকে চেয়ে পাচ্ছিনে। অথচ একটা কয়েন না হলে, আমি একটা জরুরী টেলিফোন করতে পাচ্ছিনে।'

মা মহিলাকে জিজ্ঞেস করবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। মহিলা হাঁরে

চোরাচালানদারদের কেউ কী না কে বলতে পারে? তবু মা তাঁর হাতের ব্যাগ খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন। আর সেই ফাঁকেই গোগোল কনভেয়ার বেল্টের দিকে এগিয়ে গেল। মা একটি পঞ্চাশ পয়সার কয়েন বিদেশী মহিলাকে দিলেন। মহিলা ছ'টাকার নোটটি মাকে দিয়ে দৌড় দিলেন। মা অবাক হয়ে বলতে গেলেন, 'আপনার নোটটা নিয়ে যান?' মহিলা ততক্ষণে অদৃশ্য। কিন্তু গোগোল? গোগোল কোথায় গেল? আশেপাশে তাকিয়ে কোথাও গোগোলকে দেখতে পেলেন না। একি ভোজবাজী! ছেলে কোথায় গেল? তিনি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কনভেয়ার বেল্টের দিকেই ছুটে গেলেন। সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। গোগোলের বাবাই বা কোথায়?

- বাবা তখন একজন পোর্টারের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন। পোর্টারের হাতে ছুটো স্যুটকেশ। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'গোগোল কোথায়?'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি! ও তো তোমার কাছেই ছিল!'

'ছিল তো।' মা প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, 'এক মেমসাহেব আমার কাছে আট আনার কয়েন চাইতে এসেছিলেন, ব্যাগ খুলে সেটা দেবার ফাঁকেই, গোগোলকে আর দেখতে পাচ্ছি নে।'

বাবার চোখ ছানাবড়া। ঘামতে শুরু করলেন। রেগে গিয়ে বললেন, 'মহিলাকে পয়সা দিতে গিয়ে খেয়ালই করলে না, গোগোল কোথায় কার সঙ্গে গেল?'

মা জবাব দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। পোর্টার স্যুটকেশ ছুটো হাতে নিয়ে ছুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। বোঝা গেল, সে বাংলা বোঝে না। এমন সময় গোগোল ছুটে এল। বলল, 'বাবা, আমি তোমাকে খুঁজতে গেছলাম।'

'কেন গেছলে?' বাবা রেগে উঠলেন আরও। বললেন, 'জান না, তোমাকে নিয়ে কী বিপদের মধ্যে আমরা পড়েছি? এখন চল, তাড়াতাড়ি গাড়ি খুঁজে মেরী মাউন্ট রোডের গেস্ট হাউসে চলে যাই।'

বাবা এবার নিজে গোগোলের হাত চেপে ধরলেন। মা রইলেন পাশে। বাবা গেটের কাছে, ব্যাগেজের কাউন্টার পার্ট দিয়ে দিলেন। যে লোকটি ব্যাগেজ চেক করছিল, সে দেখে ছেড়ে দিল। বাবা পকেট থেকে গাড়ির নাম্বারের কাগজ বের করলেন। লাইন দিয়ে সারি সারি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেই নাম্বারের গাড়ি আর পাওয়া যায় না। হঠাৎ একটি রোগা লম্বা, উসকো খুসকো চেহারার লোক বাবার সামনে এসে

হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম কি মিঃ এস. চ্যাটার্জি ? কলকাতার অমুক কোম্পানীর পাবলিসিটি অফিসার ?'

বাবা বললেন, 'কেন ? আপনি কি আমাদের কোম্পানীর ড্রাইভার। গাড়ি নিয়ে এসেছেন ?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। গাড়ির নাম্বার এম. আর. পি. থ্রি, ওয়ান।'

বাবা খুশি হয়ে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। গাড়িটা কোথায় ?'

লোকটি গাড়ির ভিড়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'ওদিকে আছে। আসুন। এটি বুঝি আপনাব ছেলে স্যার ?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ।'

লোকটি হাসতে হাসতে গোগোলের হাত ধরে বলল, 'আসুন বাবা, আমার সঙ্গে আসুন।'

লোকটা বলতে গেলে, বাবার হাত ছাড়িয়েই গোগোলকে নিয়ে চলল। মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'একি, এই তো আমাদের সামনেই এম. আর. পি. থ্রি, ওয়ান দাঁড়িয়ে। লোকটা গোগোলকে নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে ?'

বাবা গাড়িটা দেখেই, লোকটার দিকে ছুটলেন। চিৎকার করে ডাকলেন, 'গোগোল, যেও না। ও লোকটা তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

গোগোল তখন প্রায় কুড়ি হাত দূরে। ও ফিরে তাকাতেই লোকটা ওর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। গোগোল ছিটকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে, লোকটার হাতে ওর কোটটা রয়ে গেল। লোকটা গোগোলের কোট নিয়ে ছুট্ দিল। বাবা ততক্ষণে গোগোলের কাছে এসে গেছেন। লোকটা যে গাড়ির ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল, দেখতেই পাওয়া গেল না। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই জিনিসটা কোথায় আছে ?'

গোগোল বলল, 'হীরেটা ? ওটা তো আমার প্যান্টের পকেটে। বলে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, রয়েছে। বের করব ?'

বাবা বললেন, 'না, এখানে আর বের করতে হবে না। গাড়িতে উঠে দেখলেই হবে। তোমার নতুন কোটটা গেল।'

মাও এসে পড়েছিলেন। গোগোলকে নিয়ে ফিরে তুজনেই গাড়ির কাছে গেলেন। চেনা ড্রাইভার বাবাকে কপালে হাত ঠুকে সেলাম জানিয়ে বলল, 'আসুন স্যার।'

বাবা অবাক হয়ে গেলেন, 'ও তুমি ! গোমেজ না ?'

'হ্যাঁ স্যার।' ড্রাইভার বলল, 'ও লোকটার পেছনে ছুটছিলেন কেন ?

বাবা বললেন, 'সে অনেক ব্যাপার, গোমেজ তুমি সুটকেশ দুটো পেছনে তুলে নাও। তারপরে চল।'

বাবা পোর্টারকে টাকা মিটিয়ে দিলেন। মা আগেই গোগোলকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসেছেন। বাবা গাড়িতে উঠতেই, গোমেজ গাড়ি চালিয়ে দিল। কিন্তু মনে শান্তি নেই। বাবা মা দেখছেন, কোন গাড়ি তাঁদের ফলো করছে কি না। এত গাড়ি, দেখে বোঝবার উপায় নেই, কোন গাড়ি তাঁদের ফলো করছে কি না। মাঝে মাঝে এক একটা গাড়ি এমন গা ঘেঁষে ওভারটেক করছিল, যেন গোগোলদের গাড়ি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে।

বাবা এক একটা রাস্তার নাম বলছেন। এক সময়ে গাড়ি উঁচুতে উঠতে আরম্ভ করল। বাবা বললেন, 'এটা মেরী মাউন্ট রোড, আমাদের গেস্ট হাউস থেকে সমুদ্র দেখা যায়।'

এই সময়ে গোগোল পিছন থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বাবা, একটা গাড়ি আমাদের পেছনে পেছনে আসছে।'

বাবা মা দুজনেই পেছন ফিরে দেখলেন। সত্যি একটা জাপানী টয়োটা তাঁদের গাড়ির একেবারে কয়েক হাত পিছনে। কিন্তু ভেতরে কারা বসে আছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ি তখন উঁচুতে উঠে, সমতল দিয়ে চলেছে। ডান দিকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র দেখার আনন্দ কোথায় ? মা বললেন, 'ওরা যদি আমাদের পেছু নিয়ে থাকে, কী হবে ? গেস্ট হাউসে আমাদের কে বাঁচাবে ?'

বাবা বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছিনে। তবে সেই চোরাচালানীরা হলে, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা তো আর তাদের সঙ্গে পারব না। জিনিসটি দিয়ে দেব।'

গোমেজ বাঁ দিকের একটা বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ণ দিল। হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা একটি সতের আঠার বছরের ছেলে ছুটে এসে গেট খুলে দিল। গোগোলের লক্ষ্য তখন পেছন দিকে। ওদের গাড়িটা গেটের ভেতরে ঢুকতেই, পেছনের গাড়িটাও ঢুকে পড়ল। গোগোল হঠাৎ কী ভেবে, প্যান্টের পকেট থেকে সেই কাগজের মোড়কটা বের করে, পায়ের নীচে ফেলে দিল। মা ভয় পেয়ে বাবাকে বললেন, 'গাড়িটা যে গেস্ট হাউসের মধ্যেই ঢুকে পড়ল ?'

বাবা কিছু না বলে, গাড়িতেই বসে রইলেন। গোমেজ নেমে, দরজা খোলবার আগেই, সেই টয়োটা থেকে দুজন ভদ্রলোক নামলেন। একজন

সেই সাদা শার্ট প্যান্ট পরা লম্বা চওড়া লোক। যিনি ফিস্‌ফিস্‌ করে বাবাকে এয়ারপোর্টে কিছু বলেছিলেন। আর একজন দমদমের সেই কাস্টমস-এব সাদা পোষাকের ভদ্রলোক। দুজনেই হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। দমদমের অফিসার বললেন, 'ভয় নেই, আপনারা নেমে আসুন। আমবা দমদম থেকেই আপনাদের চোখে চোখে রেখেছি। গোগোলের কোট নিয়ে যে লোকটা চম্পট দিয়েছিল, সে ধরা পড়ে গেছে এয়ারপোর্টের সাদা পোষাকের পুলিশের হাতেই। আমাদেব আরও লোক এখুনি এসে পড়বে।'

বাবা মা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। গোগোল আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ল। ওপব থেকে, একটু দূরেই সমুদ্র দেখে, খুশির চোটে সব ভুলে গেল। বাবা গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'একটু যদি আমাদের জানিয়ে দিতেন, আপনারা পেছনে আছেন, তা হলে আব গোটা পথটা এত ভয়ে কাটত না। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি। তারপরে সব শুনব। গোগোল, ভেতরে এস।'

গোগোল সকলের সঙ্গে ভেতরে গেল। সামনেই ফুলের টব সাজানো বারান্দার ধারে। বড় সড় সাজানো বসবার ঘর। সত্যি, বম্বেতে শীত মোটেই নেই। গেস্ট হাউসের কীপার, কুক, মালী, সবাই এসে বাবাকে সেলাম জানাল। বাবা তাদের কুশল জিজ্ঞেস করে, আগে সবাইকে চা দিতে বললেন। গোগোল বলল, 'আমি ছোট বাথরুমে যাব।'

গেস্ট হাউসের কীপার বাঁ দিকে একটি ভেজানো দরজা দেখিয়ে বলল, 'ঐ ঘরে যান বাবা। লাগোয়া বাথরুম আছে।'

গোগোল দরজা ঠেলে সেই ঘরে ঢুকল। প্রথমেই বাঁ দিকে তাকাল বাথ-রুমের খোঁজে! আর তৎক্ষণাৎ ডান দিক থেকে একজন দরজাটা ভেতব থেকে বন্ধ করে দিল। গোগোল দেখল, সেই চোস্ত পরা, সিল্‌কের পাঞ্জাবীর ওপর লাল কাশ্মীবি শাল জড়ানো, টেকো মাথা লোকটা! এ লোকটা এখানে এল কী করে? লোকটা সে সব ভাববার সময় না দিয়ে, গোগোলের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। আর গোগোল হঠাৎ আবিষ্কার করল, এই সেই জিতেন্দ্র ঘোশী। আসলে প্যান্ট কোটের সঙ্গে, লোকটা মাথায় ফেল্ট হ্যাট চাপিয়ে টাকটা চাপা দিয়েছিল। একটা নকল গোঁফ আর চশমা লাগিয়েছিল। তারপরে কোন্‌ ফাঁকে পোষাক বদলে নিয়েছিল।

লোকটা গোগোলের পকেটে হীরে না পেয়ে হতাশায় আর রাগে ক্ষেপে গিয়ে, গোগোলকে জোর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, চাপা স্বরে ইংরেজিতে বলল, 'সেই জিনিসটা কোথায়?'

গোগোল হঠাৎ কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, 'আমার মায়ের কাছে।'

লোকটা পেছনের একটা দরজার দিকে গোগোলকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তা হলে তোমাকেই আমি নিয়ে চলে যাচ্ছি। সেটা ফিরে পেলে, বাবা মা তোমাকে ফিরে পাবেন। না পেলে, তোমাকেও পাবেন না।'

গোগোল হঠাৎ চিৎকাব করে উঠল, "বাবা! মা! আমাকে সেই লোকটা—।"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই, জিতেন্দ্র যোশী ওর মুখ চেপে ধরল। পাঞ্জাবীটা তুলে, কোমরের কাছ থেকে বের করল একটা চকচকে রিভলভার। বলল, 'চুপ! চল, আমার সঙ্গে বেরিয়ে চল।'

জিতেন্দ্র যোশী পিছনের দরজা খুলে, গোগোলকে নিয়ে বাইরে বেরোল। কিন্তু ওর চিৎকার শুনে, সবাই তখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে আর একটা গাড়িতে কয়েকজন এসে নেমেছেন। সকলেই বাড়ির পেছন দিকে ছুটে গেলেন। জিতেন্দ্র যোশী রিভলভার তুলে বলল, 'কেউ এগোলেই তাকে আমি শেষ করে দেব। নইলে গোগোলকেই মেরে ফেলব।'

রিভলভার দেখে সবাই থমকে গেলেন। লোকটা পেছনের ঢালু দিকে পেছন হটতে লাগল। তার সামনে গোগোল। সবাই একেবারে হতভম্ব। গোগোল দেখল, আবাব একটা বাজে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। ও ছদ্মবেশী জিতেন্দ্র যোশীকে বলল, 'ঐ জিনিসটা আমার মাকে দিইনি। ওটা আমার জুতোর ভেতরে, মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি'

'সত্যি!' লোকটা তৎক্ষণাৎ নীচু হয়ে গোগোলের জুতোর ফিতে খুলতে আরম্ভ করল।

গোগোল দেখল, পেছন দিকটা অনেক ঢালু। ও চোখ কান বুজে, লোকটাব কাঁধে মারল এক লাথি। জিতেন্দ্র এরকমটা ভাবতেই পারে নি। এক হাতে সে ঢালুতে ছিটকে পড়ল। গোগোলও সামনের দিকে বোঁ বোঁ দৌড় দিল। চারজন অফিসার তখন, চারদিক থেকে, রিভলভার হাতে, ঢালুর দিকে, ছুটে গেলেন। নকল জিতেন্দ্র যোশী নীচের থেকে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে লাগল। নীচের দিকেই, দূরের রাস্তায় একটা গাড়িও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু চারজন অফিসার নীচের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে, ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। জিতেন্দ্র সব দিক সামলাতে না পেরে, পিছু ফিরে দৌড় দিতেই, একটি গুলি তার পায়ে লাগল। সে পড়ে গেল। অফিসাররা সবাই গিয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ছদ্মবেশী জিতেন্দ্র যোশীকে তো পাকড়াও করা গেল। কিন্তু সেই হীরে

কোথায়? সবাই তখন গোগোলের প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছেন, আর জিজ্ঞেস করছেন, 'সেই কাগজেব মোড়কটা কোথায়?'

গোগোল ব্যাপার স্যাপার দেখে, সব ভুলেই গেছল। অঙ্কের প্রশ্নপত্র দেখলেই, যেমন ও সব ভুলে যেতে থাকে। তারপরে হঠাৎ দৌড়ে গেল গাড়ির দিকে। দরজা খুলে, নীচু হয়ে, তুলে নিল সেই মোড়ক। ফিরে এসে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাদের পেছনে আসতে দেখে, এটা আমি গাড়ির পায়ের নীচে ফেলে দিয়েছিলাম।'

দমদমের অফিসার গোগোলের হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে খুললেন। মস্ত বড় হীরের টুকরোটা জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল। অফিসার গোগোলের কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, 'সাবাস গোগোল। তোমার প্যান্টের পকেটে ওটা থাকলে, এ নিয়ে সরে পড়ত। বুদ্ধিটা ভালই করেছিলে। তোমার পুরস্কাব পাওয়া উচিত। এই হীরেটার দাম দশ লক্ষ টাকা। উদয়পুর থেকে, ভায়া কলকাতা, আমেবিকায় চালান যাচ্ছিল।'

গোগোল বলল, 'কিন্তু আমাকে যে ছোট বাথরুম করতে যেতে হবে?'

সবাই হেসে উঠলেন। বললেন, 'এবাব যাও'

মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও, আমি তোমাব সঙ্গে যাব।'

গেস্ট হাউসের কর্মীবা তখনও ব্যাপারটা কিছু বুঝে উঠতে পারে নি। কেবল ছদ্মবেশী জিতেন্দ্র যোশী গুলির চোট খাওয়া খোঁড়া পা নিয়ে বসে, হীবেটার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রইল। বেচাবি ভাবতে পাবে নি, সে কী ভুলই না করেছে।

গোগোলের কেরামতি



গোগোল সেবার অল্প কয়েক দিনের জন্য মধুপুরে বেড়াতে গিয়েছিল। পুজোর ছুটির সময় মা কোথাও বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করেন না। না করার দুটো কারণ। এক ঃ দুর্গাপূজার সময় বাঙলা দেশের বাইরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। প্রবাসী বাঙালীদের পূজা ভালই হয়। তবু বাঙলাদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজার চেহারাই আলাদা। দুই ঃ পুজোর ছুটির পরে স্কুল খুলেই, এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যায় গোগোলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সেজন্য পুজোর ছুটিতে পড়াশোনার চাপ থাকে।

গোগোল সেবারে মধুপুর গিয়েছিল লক্ষ্মী পুজোর পরে। মাত্র পাঁচ দিনের জন্য। মা প্রথমে যেতে রাজি হন নি। রাজি না হওয়ার কারণ, গোগোলের পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি হবে। কিন্তু যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের কথা বাবা মা কেউ ঠেলতে পারেননি। যাঁরা বলতে, বিশেষ করে তারকনাথ দত্ত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁদের বাড়ি। মস্ত বড়লোক। তাঁর বিরাট পৈতৃক ব্যবসা আছে। কী ব্যবসা, কিসের ব্যবসা, গোগোল তা জানে না। তবে, বাবা মা'র সঙ্গে তারকনাথ দত্তর বাড়ি দু'একবার বেড়াতে গিয়েছে। যেমন বিশাল বাড়ি, তেমনি সবই বিশাল। বিশেষ করে খাওয়া। তারকনাথ দত্ত সবাইকে খাওয়াতে ভালবাসেন। আর নানারকমের খাবার

রান্নার তদারকি তিনি নিজে করেন। তাঁর বাড়িতে রোজই অতিথি অভ্যাগতের ভিড়।

গোগোল বুঝে নিয়েছে, তারকবাবু আসলে ঐ বিশাল বাড়িতে খুবই একা। তাঁর একমাত্র মেয়ে গোগোলের মায়ের বয়সী হবেন। তিনি থাকেন এলাহাবাদে শ্বশুর বাড়িতে। আর তাঁর একমাত্র ছেলে থাকেন আমেরিকায়। বাড়িতে আছে এক গাদা কাজের মানুষ। দূর সম্পর্কের কয়েকজন মহিলা আত্মীয়া। সেই জন্যই, তিনি মনের মতো মানুষ খুঁজে, বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান, তাদের সঙ্গে গল্প গুজব করে, খাইয়ে দাইয়ে, সময় তাঁর ভালই কাটে।

তারকনাথ দত্ত গোগোলের বাবার থেকে অনেক বড়। বাবা মা তারকবাবুকে কাকা বলে ডাকেন। তিনি বাবা মা'কে নাম ধরে ডাকেন। নিজের ছেলে মেয়ের মতোই ভালবাসেন। আর গোগোলকে ডাকেন, 'ডিটেকটিভ দাদু' বলে।

গোগোল অনেক বার শুনেছে, মধুপুরে তারকনাথ দত্তের বিরাট বাড়ি আর বাগান আছে। সে-বাগানের গোলাপের নাকি তুলনা নেই। মধুপুর থেকে প্রচুর গোলাপ কলকাতায়ও আসে। তারকনাথ বাবা মা'কে অনেকবার বলেছেন, তোমরা আমার মধুপুরের বাড়ি বেড়িয়ে এস। সেখানে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। দেখাশোনা আর রান্না করার লোকজন আছে। খাবে দাবে বেড়াবে ঘুমোবে। আমি খুব খুশি হব।

সেই নিমন্ত্রণে কিছুতেই যাওয়া হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারকনাথ নিজেই মধুপুরে যাবেন বলে স্থির করলেন, আর বাবা মা'কে বললেন, 'এবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার ডিটেকটিভ দাদুও যাবে। আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। যেতে এক রাত্রি, আসতে এক রাত্রি। বেশী দিন নয়, পাঁচ দিন ওখানে থাকব। পাঁচদিনে, আমার ডিটেকটিভ দাদুর পড়া না হলেও, ও ঠিক পাস করবে।'

বাবা মা সেবার আর তাঁর কথা ঠেলতে পারেন নি।

তারকনাথ দত্তর মধুপুরের বাহান্ন বিঘা এলাকায়, বাড়িটা কেবল বড় না। বাড়ি আর বাগান, সব মিলিয়ে, যেন একটা নন্দনপুরী। বিরাট বাগানে বোধহয় হাজার খানেক গোলাপ গাছ আছে। নানা রকমের গোলাপ। তাছাড়া ছিল, ঝাউ পাইন আর ইউক্যালিপটাস গাছ। মাধবী বিতান, যুঁইয়ের কেয়ারি। দোতলা বাড়িতে যে কতগুলো ঘর আছে, গোগোল গুনে

উঠতে পারেনি। সামনের দিকে ফুলের বাগান। পিছনে ফলের গাছ। আম জাম পেয়ারা আর আতা। তাছাড়া আছে মস্ত একটা গোয়াল। অনেকগুলো দুধের গাভী। রোজ প্রচুর দুধ হয়। খাবার লোক নেই, বিক্রি করে দেওয়া হয়।

বাড়ির ভিতরে চৌহদ্দির মধ্যে আছে বিরাট একটা ইঁদারা। তার সঙ্গে পাইপ দিয়ে পাম্প সেটে জল তোলা হয় ওপরের ট্যাঙ্কে। ভারি মিষ্টি জল। খেতে ভাল, আর খেলেই হজম হয়ে যায়। সব শোবার ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। আব খাওয়া? রোজই যেন যজ্ঞি বাড়ির রান্না। মাছ, মুরগী, বাগেড়ি পাখি, ছানা পায়েস, রসমালাই যত খুশি খাও।

গোগোলেব এত খাওয়া পছন্দ নয়। প্রথম দিন সকালে পৌঁছে, ওর একটুও ঘুম পেল না। বাড়ি, বাগান, ছাদ, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াল। দুপুরেব খাবার পবে, গোগোল ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টার জন্য। উঠে দেখল, বাবা মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

গোগোল উঠে পড়ল। তারকনাথ নীচের একটা ঘরে ছিলেন। ও নীচে নেমে এসে, তাঁর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, তিনি গড়গড়ায় তামাক টানছেন ইজি চেয়াবে বসে। আর খবরের কাগজ পড়ছেন মনোযোগ দিয়ে। কাজের লোকদের কোন সাড়া শব্দ নেই। বোধহয় তারাও এখন ঘুমোচ্ছে। গোগোল বাগানে বেরিয়ে এল। বাগান থেকে বাইরে যাবার বড় গেটটা বন্ধ। একটা ছোট দরজা আছে, লোহার ঘোরানো দরজা। গরু বাছুর ঢুকতে পারে না। গোগোল সেই দরজা দিয়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল।

বাহান্ন বিঘার লাল কাঁকর মাটিব শক্ত রাস্তা, দুপুরে খা খা করছে। গাছে গাছে পাখিরা ডাকছে। কাঠ বেড়ালীরা হুটোপাটি খেলছে। কখনও উঠে যাচ্ছে বড় বড় গাছের মগডালে। আবার কখনও নেমে আসছে নীচে। ওরা যে কী খুটে খুটে খাচ্ছে, গোগোল বুঝতে পারছে না। গোটা রাস্তায় লোক নেই। কেবল একটু দূরে, গাছের নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল একটা টাঙা। ঘোড়াটা মাথা নীচু করে, কাঠের পাত্র থেকে মুখ নামিয়ে খাবার খাচ্ছিল। টাঙাওয়ালা শুয়েছিল টাঙার ওপরেই।

গোগোল ডাইনে বাঁয়ে তাকাল। দেখল, বাঁ দিকের একটা রাস্তা থেকে, একটি মোষেব গাড়ি বেরিয়ে, বড় রাস্তা পেরিয়ে, অন্য রাস্তায় ঢুকে গেল। বোঝা গেল, গাড়িটা যে দিকে গেল, সেদিকে কোন গ্রাম আছে। গোগোল পায়ে পায়ে সেদিকে গেল। দু'পাশেই বাড়ি। আর সব বাড়ির সামনেই বাগান। গোগোল মোড় অবধি গিয়ে দাঁড়াল। দেখল মোষের গাড়িটা

যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। খোলা জমিতে গরু মোষ চরছে।

গোগোল হটাৎ দেখল, একজন যেন মাটি ফুঁড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। মাথায় বড় বড় কালো চুল। মুখটা কালো গোঁফ দাড়িতে ভরা। চোখে চশমা। পাজামা আর পাঞ্জাবী ময়লা মত। পায়ে কোলাপুরী চপ্পল। বয়স ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেখে শুনে ভদ্রলোকই মনে হয়। বাঙালী কি অবাঙালী, তা বোঝবার উপায় নেই। ভদ্রলোক চুরোট টানছেন। গোগোল অবাক চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তারকনাথ দত্তের বাড়িটা কোথায় বলতে পার খোকা?'

গোগোল অবাক হয়ে, বাড়িটার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'ঐ তো, ঐ বিরাট বাগানওলা বড় দোতলা বাড়িটা। আপনি তারকবাবুকে খুঁজছেন?' 'না।' ভদ্রলোক গোঁফ দাড়ির ফাঁকে হাসলেন 'আমি একটি ছেলেকে খুঁজছি। সেই ছেলেটি একবার রাজধানী এক্সপ্রেসে একটা হত্যার ব্যাপারে আমার বন্ধুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। খুব ডাকসাঁইটে ছেলে, নাম গোগোল। শুনেছি, সে ঐ বাড়িতে উঠেছে। তাকে আমি কিডন্যাপ করব।'

গোগোল প্রথমে খুব চমকে উঠেছিল। ভয়ও পেয়েছিল। এখন গোঁফ দাড়ি আর চশমা পরা লোকটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে, চোখ বড় করে হেসে উঠল। ' বলল, 'আপনি! মানে—।' 'চুপ চুপ!' ভদ্রলোক বললেন, 'একদম আমার নাম নিও না। জানবে এখানে গাছ-পালারও কান আছে। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ, আমি তোমার বন্ধু!'

গোগোল মনে মনে বলল, 'অশোক ঠাকুর। বিখ্যাত গোয়েন্দা!' রাজধানী এক্সপ্রেসের হত্যা, আর গোগোলের নাম বলাতেই, ও গলার স্বরটা চিনে ফেলেছিল। ও কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই অশোক ঠাকুর নীচু স্বরে বললেন, 'তারকনাথ দত্তর বাড়িতে আজ সকালেই তোমরা এসেছ, এ খবর আমি জানি। মধুপুরে কে কখন করে আসছে, সব খবরই আমার জানা। তবে আমি যাকে খুঁজছি, তাকে এখনও পাই নি। কিন্তু সে কাছে পিঠেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারছে না। অথচ আমি ধরতে পারছি না। তোমাকে বলে রাখি, একটু চোখ কান খোলা রেখে চলো। লোকটার বয়স হবে আমারই মত, তবে বেশ লম্বা আর শক্ত ফরসা চেহারা। এক জোড়া গোঁফ আছে। মাথার চুল ছোট করে

ছাঁটা। সঙ্গে ওর বউও আছে। লোকটার নাম অবতার সিং। নাম করা হীরে চোর। গোটা তিনেক খুনও করেছে। ভারতের সব রকম ভাষা বলতে পারে। বাঙলা বললে, তুমি একদম ধরতে পারবে না, যে ও বাঙালী নয়। আসলে ও পাঞ্জাবী। আজ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি টাকার হীরে চুরি করেছে। খবরটা দিয়ে রাখলাম। এবার সরে পড়। বিকেল হয়ে আসছে, বাবা মা তোমাকে খুঁজবেন। কথাটা কিন্তু এখন কারোকে বোলো না।'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সত্যি সত্যি বাবা মা তখন উঠে পড়েছেন। নীচে তারকনাথ দাদুর ঘরে বসে, তিন জনেই চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। গোগোলকে দেখে তারকনাথ বললেন, 'কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ ডিটেকটিভ দাদু? এখানে কোন চোর ডাকাতের সন্ধান পেলে নাকি?'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি বাগানের বাইরে রাস্তাটা দেখছিলাম।'

'শুধু রাস্তাই দেখছিলে?' তারকনাথ হেসে বললেন, 'একটা গোঁফ দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলে না?'

গোগোল চমকে উঠল। তারকনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন। বাবা মাও অবাক চোখে গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল বলল, 'হ্যাঁ, অবাঙালী এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে যেচে কথা বলছিলেন। আমার নাম, কোথায় কার বাড়িতে উঠেছি, এই সব জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'হ্যাঁ, এখানে যত লোক বেড়াতে আসে, সবাই যেচে আলাপ করে!' তারকনাথ বললেন, 'ঐ গোঁফ দাড়িওলা লোকটা বোধ হয় একলা বেড়াতে এসেছে। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে নিল। এখানে ওরকম হয়। তোমার নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে, আমি কেমন করে ব্যাপারটা জানলাম?'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি যখন নীচে এসে আমার ঘরে উঁকি দিয়ে চলে গেলে, তখনই আমি তোমাকে দেখেছি।' তারকনাথ হেসে বললেন, 'আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম, কিন্তু চশমার ফাঁক দিয়ে তোমাকে ঠিক দেখে নিয়েছিলাম। তারপরেই আমি একজনকে ডেকে বললাম, খোকাবাবু কোথায় যাচ্ছে, একটু নজর রেখো। সে-ই এসে আমাকে খবর দিয়েছে।'

গোগোল হাসল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, গোগোল যে অশোক ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছিল, সেটা কেউ বুঝতে পারেন নি। একটি কাজের লোক, দেখতে বেশ পালোয়ান মত, ঘরে ঢুকল। প্লেটের ওপর বসানো বড়

এক গ্লাস দুধ ভরতি তার হাতে। অন্য হাতের প্লেটে মিষ্টি। তারকনাথ বললেন, 'বস গোয়েন্দা দাদু, দুধ মিষ্টি খেয়ে মা বাবার সঙ্গে মাছুয়া টাঁড়ে বেড়িয়ে এস। এখানে তো দেখবার কিছু নেই। মাছুয়া টাঁড়ে যাবার সময় ছোট্ট একটা নদী পায়ে হেঁটেই পার হয়ে যেতে পারবে। গ্রাম তেমন ভাল লাগবে না। আগামীকাল আমরা পাথ্‌রোলের কালী বাড়ি যাব।'

মা চা খাওয়া শেষ করে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি জামা কাপড় বদলাবে তো?'

বাবা নিজের গায়ের পাজামা পাঞ্জাবী দেখে, তারকনাথের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'দরকার কী? এখানে আমার জামাকাপড় কে দেখবে? তুমি বরং বদলে এস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরুষদের বেশী সাজগোজ দরকার হয় না।' তারকনাথ বললেন, 'আর যাবে তো মাঠে ঘাটে বেড়াতে। তবে একটা টর্চ লাইট নিয়ে বেরিও। আসতে আসতে যদি অন্ধকার হয়ে যায়, অচেনা রাস্তাঘাটে অসুবিধে হবে।' তারপরেই তিনি গোগোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হল গোয়েন্দা দাদু, দুধ মিষ্টি খেয়ে নাও?'

গোগোল সেই ভয়টাই পাচ্ছিল। ঐ বড় এক গেলাস দুধ আর মস্ত দুটো সন্দেশ খাবার মত পেটে জায়গা ছিল না। বলল, 'আমার এখনও পেট ভরা। এত খেতে পারব না।'

'যা পার, তাই খাও।' তারকনাথ গড়গড়ার নল তুলে নিলেন।

গোগোল বাবার দিকে তাকাল। বাবা তখন খবরের কাগজ টেনে নিয়েছেন। মা চলে গিয়েছেন জামা কাপড় বদলাতে। গোগোলের কানে তখন অশোক ঠাকুরের কথাগুলোই বাজছে। অবতার সিং, হীরে চোর। তিনটে খুন করেছে। অশোক ঠাকুরের মত বয়স। লম্বা শক্ত ফরসা শরীর। গোঁফ আছে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ভাবতে ভাবতে গোগোল দুটো মিষ্টিই খেয়ে ফেলল। এমন কি বড় এক গেলাস দুধও। তারকনাথ গড়গড়া টানা থামিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি বল তো ভাই গোয়েন্দা দাদু? খাবে না খাবে না করে, সবই খেয়ে ফেললে, কিন্তু দেখে মনে হল, যেন তুমি খেলে না। আর কেউ খেল। এত কী ভাবছ?'

গোগোল আবার চমকে উঠল। বেশী মিথ্যে কথা বলতে লজ্জাও করে। বলল, 'আমি সেই দাড়িওলা ভদ্রলোকের কথা ভাবছি। ভদ্রলোক যেন কেমন।'

'কোন অপরাধের গন্ধ-টন্ধ পেলে নাকি?' তারকনাথ ভুরু কুঁচকে

জিজ্ঞেস করলেন।

গোগোল লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, 'না, তা ভাবিনি, ওঁকে আমার বেশ মজার লোক বলে মনে হচ্ছিল।'

'ওরকম অনেক মজার লোক তুমি মধুপুরে ভ্রমণকারীদের মধ্যে পাবে।' তারকনাথ হেসে বললেন, 'এখন বেড়াতে বেরোলে দেখবে, সব ভাঙা শরীর সারাবার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তবে শরীর সারবে কেমন করে? সব বাতিকগ্রস্ত লোক।'

এই সময়ে মা জামাকাপড় বদলে, নীচের ঘরে এলেন। হাতে একটা টর্চ লাইট। বাবা খবরের কাগজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন, তারকনাথকে বললেন, 'তা হলে আমরা একটু ঘুরে আসি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এস।' তারকনাথ গড়গড়ার নল রেখে বললেন, 'আমিও একটু বাগানে পায়চারি করব।'

গোগোল বাবা মা'র সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

তারকনাথ ভুল বলেননি। দেখা গেল, রাস্তায় বেশ কিছু মহিলা পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বয়স্ক ভদ্রলোকেরা ছড়ি হাতে, কেউ হন্ হন্ করে হাঁটছেন। কেউ আস্তে ধীরে। সব রকম বয়সের মহিলা পুরুষকেই দেখা গেল, সেজে-গুজে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছেন। গোগোলের মত ছোট ছেলে মেয়েরা দৌড় ঝাঁপ করছে। কয়েকটা টাঙাও এদিকে-ওদিকে দৌড়ুচ্ছে। গোগোল দেখল, ডান দিকের বাড়ির গেট থেকে বেরোচ্ছেন এক বুড়ো ভদ্রলোক। মাথায় সাদা চুল, সাদা গোঁফ দাড়ি। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। পায়ে সাদা মোজা, কালো চটি। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, মোটা ছড়ি মাটিতে ঠুকে ঠুকে হাঁটছেন। তারকনাথের পাশের বাড়িটাও বেশ বড়। বাগানও ছোট নয়। কিন্তু বাড়িটা দেখতে পুরনো। বাগানেও তেমন ফুল গাছ নেই। এগিয়ে এসে বাবার দিকে তাকিয়ে হেসে, দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন। বাবা অবাক হয়ে দু'হাত কপালে ঠেকালেন। ভদ্রলোক ভাঙা-ভাঙা, হাঁফ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনলাম তারকবাবু এসেছেন। আপনি বুঝি তারকবাবুর ছেলে?'

'আজ্ঞে না।' বাবা বললেন, 'আমরা ওঁর সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, আমাদের খুব স্নেহ করেন।'

ভদ্রলোক যেন কেমন অসাব্যস্ত ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'শুনেছি, ওঁর মনটা খুব উঁচু, স্নেহপ্রবণ মানুষ। কত বড়লোক, অথচ বোঝা যায় না।'

'আপনি চেনেন বুঝি ওঁকে ?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

ভদ্রলোক তেমনি ভাঙা ভাঙা হাঁফ ধরা গলায় বললেন, 'ওঁকে কে না চেনে বলুন ? আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় নেই, তবে বাড়িটা যে ওঁর, তা জানি। আমি প্রত্যেক বছরই একবার মধুপুরে বেড়াতে আসি। এই পাশের বাড়িতেই উঠি, আমার বন্ধুর বাড়ি। তারকবাবুর বাড়ির দরজায় দেখে ভাবলাম, বোধহয় আপনি ওঁর ছেলে হবেন। আর—।' ভদ্রলোক মা আর গোগোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি বোধহয় বউমা আর নাতি হবে। তা একরকম তো তাই-ই। বেড়াতে বেরোচ্ছেন ?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নদী পেরিয়ে মাছুয়াটাঁড় গাঁয়ের দিকে যাব।'

'বাঃ, খুব ভাল কথা।' ভদ্রলোক বললেন, 'বেড়িয়ে আসুন। আমারও যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শরীরে কুলোয় না। একে খোঁড়া মানুষ, এদিকে হাঁফ, দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে, তবু এখানে এলে একটু ভাল থাকি। আচ্ছা আবার পরে দেখা হবে।'

ভদ্রলোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, হেঁটে চললেন। দাঁড়ালেন গিয়ে আর একজন বৃদ্ধ মানুষের সামনে। বাবা বললেন, 'এই সব বুড়ো মানুষদের দেখলে কষ্ট হয়। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক নেই, একলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যাঁকে পাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই একটু কথা বলছেন। সত্যি অসহায়। কিন্তু কথা হচ্ছে আমি তো মাছুয়াটাঁড়ে যাবার রাস্তা চিনিনে।'

'আমি রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' পিছন থেকে একজন বলে উঠল, 'বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।'

দেখা গেল, তারকনাথ দাদুর বাড়িরই একজন কাজের লোক। গোগোলরা সেই লোকটির সঙ্গে হাঁটতে লাগল। কিন্তু ওর নজর রাস্তার সব লোকের দিকে। ও অবতার সিং হীরে চোরকে খুঁজছে। কালো চুল দাড়ি গোঁফওয়ালা অশোক ঠাকুরকে চোখে পড়ছে না।

নদীটা সত্যি ছোট, প্রায় চওড়া একটা নালার মত। গরু মোষের গাড়ি আর মানুষ পায়ে হেঁটে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে। দলে দলে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষরা চলেছে। বাবা বললেন, 'বিহারের মধ্যে হলেও, এ দেশটা আসলে সাঁওতাল পরগণা।'

বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে, শুয়ে গোগোলের প্রথমেই মনে হল, অশোক ঠাকুর কোথায় কোন্ বাড়িতে উঠেছেন, সে জানা হয়নি। ও ইচ্ছে করলেও, তাঁর দেখা পাবে না। গোগোল অবতার সিংয়ের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। মা ওর শিয়রের কাছে একটা পাতলা হাত কাটা উলের সোয়েটার রেখে দিয়েছিলেন। এ সময়ে এখানে সাবধানে না থাকলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। গোগোল গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে, আগে টুথ ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিল। মা জেগেই ছিলেন। বাবা অন্য খাটে তখনও ঘুমোচ্ছেন। গোগোল বলল, 'মা, আমি একটু নীচে বেড়াতে যাছ।'

'যাও।' মা বললেন, 'বেশী দূরে কোথাও যেও না।'

গোগোল নীচে নেমে দেখল, তারকনাথ বাগানে পায়চারি করছেন। তাঁব গায়ে মাথায় চাদব জড়ানো।

গোগোলকে দেখে বললেন, 'গুডমর্নিং গোয়েন্দা দাছ।'

'গুডমর্নিং।' গোগোল বলল। তারকনাথের কাছে এগিয়ে গেল। তিনি বললেন, 'দেখ, গোলাপ ফুলগুলোর গায়ে কী সুন্দর শিশির জমেছে। এসব দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।'

গোগোলেরও ভাল লাগল। একজন মালী কাঁচি দিয়ে গোলাপফুল তুলছিল। তারকনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাদের পেছনেব বাগান আর গোয়াল দেখেছ?'

'না।'

'তাহলে চল যাই। দেখবে কেমন দুধ দোয়া হচ্ছে।'

গোগোল তারকনাথের সঙ্গে বাড়ির পিছনে ফলের বাগানে গেল। ওটা পুব দিক পিছনের পাঁচিল ঘেষে বড় আর পরিচ্ছন্ন গোয়াল ঘর। বড় বড় ভাগলপুরী সুরাটি গাভী। দুজন লোক দুধ দুইছিল। আরও দুজন লোক গোয়াল পরিষ্কার করছিল। বাছুরগুলো গাছের সঙ্গে বাঁধা। গোগোল দেখল, মস্ত বড় একটা টিনের পাত্রে দুধ ঢেলে রাখা হচ্ছে। তারকনাথ বাছুরগুলোর গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। গোগোলও বাছুরগুলোকে আদর করল। বাগান ঘিরে রাখা পাঁচিল খুব উঁচু নয়। ও দেখল, উত্তর দিকের বাড়ির পিছনেও ফলের বাগান, আর কয়েকটা গরু বাঁধা রয়েছে। গোগোল সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা বলল। তারকনাথ সেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কে জানে, কে এসেছে? বাড়ির মালিকের নাম আশুতোষ চক্রবর্তী। শুনেছিলাম, ভদ্রলোক নাকি বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চান। হবে হয় তো আশুবাবুর কোন বন্ধু বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু কেয়ার টেকার হিসেবে যে লোকটাকে রেখেছেন, সেটা একটা আস্ত শয়তান, নাম বেচনলাল। ও একবার আমার দুটো ভালো গাই চুরি করে বেশ

কিছুদিন লুকিয়ে রেখেছিল। মতলব ছিল, দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে বেশী দামে বিক্রি করে দেবে। তার আগেই ধরা পড়ে গেছল। ব্যাটাকে পুলিশে দিতাম। কিন্তু হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। তারপরেও অনেকবার বাগানের গোলাপ চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে। ধরা পড়ে আমার লোকদের হাতে বেশ উত্তম মধ্যম খেয়েছে। ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। আশুবাবু তাঁর বাড়িটা তেমন দেখাশোনা করতে পারেন না। শুনি, বেচনলাল নাকি লুকিয়ে বাড়ি ভাড়া দেয়।'

'তা ওকে এখানকার লোকে কিছু বলে না?' গোগোল জিজ্ঞেস করল।

তারকনাথ বললেন, 'এখানে সেরকম লোক কে আর আছে? বেশীর ভাগ বাড়ির মালিক তো বাইরে থাকে। ছুটি ছাটায় বেড়াতে আসে। এমনি যারা থাকে, তারা বেচনকে ভয় পায়।'

গোগোল হাঁটতে হাঁটতে উত্তরের পাঁচিলের কাছে গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে ও পাঁচিলের ওপাশে কিছু দেখতে পেল না। ছোট হলেও পাঁচিলটা ওর মাথা একটু ছাড়িয়ে উঠেছে। শুধু শুনতে পেল, কারা কথাবার্তা বলছে হিন্দীতে। তারকনাথ ডাকলেন, 'এস গোয়েন্দাদাদু, ওসব ছিঁচকে চোরদের দেখে কোন লাভ নেই। তোমার মুখ ধোয়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে একটু পরেই এক গেলাস দুধ খেয়ে নাও।'

তারকনাথ বললেন, 'তারপরে জলখাবার হলে, খেয়ে আমরা পাথ্‌রোলে বেরিয়ে পড়ব। একটা বড় ভাল টাঙ্গা আনতে বলে দিয়েছি।'

গোগোল তারকনাথের সঙ্গে, পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। তারকনাথ ভিতরে ঢুকে, নিজের ঘরের দিকে গেলেন। বললেন, 'আমি মুখ ধুয়ে দাড়িটা কামিয়ে নিই। দেখ তোমার বাবা মা কী করছেন।'

গোগোল দোতলায় উঠে, ঘরের দিকে যেতে গিয়ে থম্‌কে দাড়াল। ওপরের সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে, ছাদটা দেখতে ইচ্ছে হল। ও সিঁড়ি ভেঙে উঠে দেখল, ছাদের দরজায় দুটো বড় বড় শাল কাঠের হুড়কো আঁটা রয়েছে। খুলতে বেশ বেগ পেতে হল। বিরাট ছাদ, বল খেলা যায়। গোগোল বাড়ির সামনের দিকে গেল। বাগানে মালী কাজ করছে। রাস্তায় কয়েকজন লোক চলাফেরা করছে। ও উত্তর দিকে সরে গেল। সবে মাত্র রোদ উঠতে আরম্ভ করেছে। গোগোল আলসের ধারে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির ভিতরের উঠোন দেখতে পেল। ভিতরের উঠোনের এক কোণে ইঁদারা। মাঝখানে খাটিয়ার ওপর বসে আছে একটি লোক আর একজন

স্ত্রীলোক। দুজনে কথা বলছে। দুজনের কেউ গোগোলকে দেখতে পাচ্ছে না। লোকটি ফরসা লম্বা, শক্ত চেহারা। খালি গায়ে কাঁধের ওপর একটা তোয়ালে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গোঁফ নেই। স্ত্রীলোকটির মাথায় ঘোমটা নেই। বয়সও খুব বেশী নয়। রঙীন শাড়ি আর জামা গায়ে। দু পাশে দুটো বেণী দুলছে। দুজনেই হাসতে হাসতে কথা বলছিল।

গোগোল আরও একটু পুবে সরে গেল। আলসের মাঝে গোল গোল ফাঁক ছিল। বসে পড়ে সেই ফাঁক দিয়ে লোকটার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। আশ্চর্য, লোকটাকে কেমন চেনা চেনা লাগছে। অথচ কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। চোখ নাক কপাল দেখে মনে হচ্ছে, আগে কোথাও লোকটাকে দেখেছে। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

গোগোল দরজার হুড়কো লাগিয়ে নেমে এল। মা বললেন, 'গোগোল তোমার দুধ এসে গেছে। খেয়ে নিয়ে, একেবারে চান করে নাও। পাথ্‌রোল থেকে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। রোদ থেকে ফিরে তখন আর চান করতে হবে না। আমরাও চান করে নেব।'

গোগোল তাই করল।

বৈকালে গোগোল দেখল, বাবা মা'র কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই। ওবেলা পাথ্‌রোলের কালীবাড়ি ওর তেমন ভাল লাগে নি। সেরকম সুন্দর মন্দির নয়। একটা পুরনো বাড়ি, উঠোন, থামগুলো খুব সাধারণ। কালী মূর্তি আছে একটা ঘরের মধ্যে। তারকনাথ পূজা দিয়েছেন। ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে, ঘুম। গোগোল বলল, 'আমি বাইরের রাস্তায় বেড়িয়ে আসি।'

'বেশী দূরে কোথাও যেওনা' মা বললেন, 'আমরা টাঙা নিয়ে শহরের দিকে যেতে পারি। তোমাকে যেন খুঁজতে না হয়।'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে নেমে গেল। তারকনাথ তখনো ঘরের মধ্যে গড়গড়া টানছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন। গোগোল বাগানের ছোট দরজা দিয়ে বাইরে এল। লোকজন সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। গোগোল কোন দিকে যাবে ভাবছে। এমন সময় গতকালের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, হাতের মোটা ছড়ি ঠুকে ঠুকে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। মাথায় সাদা চুল, সাদা গোঁফ দাড়ি। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। পায়ে সাদা মোজা, কালো চটি। গোগোলকে একবার দেখে, ডাইনে বাঁয়ে দেখলেন। তারপর দক্ষিণ

দিকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন।

গোগোলের মনটা চমকে উঠল। এই লোকটার মুখই কি ও সকালে ছাদ থেকে দেখেছিল? ঠিক সেই টিয়ে পাখির মত নাক, কালো ছোট চোখ, চওড়া কপাল। কিন্তু সে-লোক তো জোয়ান। মাথায় তার কালো চুল ছিল। এ তো সাদা চুল গোঁফ দাড়ি খোঁড়া বুড়ো মানুষ। কিন্তু চোখ নাক কপাল একরকম! তা ছাড়া বুড়ো মানুষের কপালে তেমন ভাঁজ নেই।

গোগোল মনে মনে উত্তেজিত হল। অশোক ঠাকুরকে লোকটার কথা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তাঁকেই বা গোগোল কোথায় খুঁজে পাবে? উনি তো বলেন নি, কোথায় কোন্ বাড়িতে থাকেন? গোগোল সেই বৃদ্ধের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। খানিকটা গিয়েই, বুড়ো ভদ্রলোক, আর একজন বুড়ো ভদ্রলোককে দেখে, তাঁর দিকে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। হিন্দিতে বললেন, 'নমস্তে ব্যানার্জি বাবু, তবিয়ত ক্যায়সা বাতাইয়ে।'

আজ ভদ্রলোক হিন্দীতে কথা বলছেন। গোগোল থামল না। হাঁটতে লাগল। মাছুয়াটাঁড়ের রাস্তায় যাবার মোড়ে এসে থামল। নানা দিক থেকে গরু মোষ ধুলা উড়িয়ে, ছোট নদীর রাস্তায় চলেছে। হঠাৎ কোন্ দিক থেকে, কালো দাড়ি গোঁফ লম্বা চুলওয়ালা অশোক ঠাকুর হাজির। বললেন, 'কী খবর গোগোল, আজ পাথ্রোলে কেমন বেড়িয়ে এলে?'

'ভাল লাগেনি।' গোগোল উত্তেজিত স্বরে বলল, 'আমি আপনাকেই খুঁজছি। আমাদের বাড়ির উত্তর দিকের বাড়িতে একজনকে আজ সকালে দেখলাম। সে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। এবেলা সেই বাড়ি থেকে একজন বুড়ো ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মনে হল, সাদা চুল গোঁফ দাড়ির মধ্যে, সেই লোকটার মুখ। কালও বুড়ো লোকটিকে দেখেছিলাম। খুঁড়িয়ে হাঁটেন, হাঁফ ধরা গলায় কথা বলেন।'

কালো গোঁফ দাড়ি চশমার মধ্যে অশোক ঠাকুরও উত্তেজিত হলেন। কিন্তু সাবধানে নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই বুড়ো কোন্ দিকে গেছে?'

গোগোল পিছন ফিরে দেখে বলল, 'ঐ যে দেখছেন, দুজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন, তার মধ্যে সাদা চুল দাড়িগোঁফ চশমপরা লোকটিকে আমার সন্দেহ হয়েছে।'

'হুঁ, ঠিক আছে গোগোল, তুমি বাড়ির দিকে ফিরে যাও।' অশোক ঠাকুর নীচু স্বরে বললেন, 'আমি অন্যদিকে যাচ্ছি, কিন্তু ওর ওপরে নজর রাখছি।'

গোগোল আবার পিছন ফিরে বাড়ির দিকে চলল।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই গোগোল বাইরে গোলমাল শুনতে পেল। মা বাবা কেউ ঘরে নেই। গোগোল শিয়রের কাছ থেকে সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়ে নীচে নেমে এল। তারকনাথও ঘরে নেই। দেখা গেল সবাই বাগানে। ও বাগানে গিয়ে দেখল, উত্তর দিকের পাশের বাড়িটা চারদিক থেকে পুলিস ঘিরে ধরেছে। তিন চারটে পুলিসের ভ্যান রাস্তায়। বাড়ির ভিতরে বাগানেও, রিভলবার আর বন্দুক হাতে পুলিস ঢুকে পড়েছে। একজন অফিসার চিৎকার করে বলছেন, 'অবতার সিং বেরিয়ে এস, ধরা দাও। আমরা তোমার হদিস পেয়েছি। গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।'



ভিতর থেকে কোন জবাব এল না। কিন্তু দুম্ করে একটা গুলির শব্দ হল। অফিসার মাটিতে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি রাইফেল গর্জে উঠল। বাড়ির বন্ধ দরজা জানলা লক্ষ্য করে পুলিস গুলি ছুঁড়ল। আরও কয়েকজন পুলিস বন্দুক হাতে এবার বাগান পেরিয়ে, বাড়িটাকে ঘিরে ধরে গুলি চালাতে লাগল।

তারকনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই বেচনলালটা কোন ডাকাতি করেছে।'

'না, হীরে চোর অবতার সিং ও বাড়িতে লুকিয়ে আছে।' গোগোল উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলল।

সবাই গোগোলের দিকে অবাক চোখে তাকালেন। তারকনাথ জিজ্ঞেস করলেন 'গোয়েন্দা দাদু, তুমি এ খবর কোথা থেকে পেলে ?'

গোগোল বিব্রত হয়ে চুপ করে রইল। এ সময়েই, উত্তর দিকের বাড়ির সামনের দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, খালি গা ফরসা জোয়ান, মাথায় কালো চুল একজন বেরিয়ে আসছে। তার পিছনে অশোক ঠাকুর রিভলভার হাতে। লোকটার পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে রেখেছে। এখন তাঁর মুখে কালো গোঁফ দাড়ি নেই। গোগোল বলে উঠল, 'ঐ তো, অশোক ঠাকুর অবতার সিংকে রিভলভার ঠেকিয়ে বের করে নিয়ে আসছেন !'

তারকনাথ বাবা মা, কেউ একটা কথাও বলতে পারছেন না। তাঁরা সব ঘটনা দেখছেন। পুলিস অফিসার ছুটে গিয়ে অবতার সিংয়ের দু হাতে হ্যাণ্ডকাপ্ পরিয়ে দিলেন। আর একজন কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে ফেলল। চারপাশে বন্দুক তাগ্ করা সেপাই।

বাইরের রাস্তায় বিস্তর লোকজন জমে গিয়েছে। অবতার সিংকে একটা ভ্যানে তোলা হল। সেই সঙ্গে বেচনলাল আর সেই মেয়েটিকেও গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলা হল। তারপরে সবাইকে অবাক করে দিয়ে, অশোক ঠাকুর আর পুলিস অফিসার তারকনাথের বাড়িতে ঢুকলেন। অশোক ঠাকুর প্রথমেই গোগোলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'গোগোল তুমি ঠিকই দেখেছিলে। অথচ লোকটাকে আমি ক'দিন ধরে দেখছি। কিছু ধরতে পারিনি। তুমি না বললে, হীরে চোর অবতার সিং ধরা পড়তো না।' বলে পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'মিঃ চোপরা, এই সেই গোগোল, যে আমাকে গতকাল বিকালে অবতার সিংয়ের হদিস দিয়েছিল।'

মিঃ চোপরা গোগোলের সঙ্গে করমর্দন করে, ওর গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'সত্যি গোগোল, তোমার নজর ঈগল পাখির থেকেও চোখা।'

তারকনাথ এতক্ষণে মুখ খুললেন, 'ব্যাপারটা কী, কিছুই বুঝতে

পারছিনে ? দয়া করে আপনারা আমার বাড়ির ভেতরে আসুন। গোয়েন্দা-দাত্নর কেরামতিটা শুনি। এ যে একেবারে ভোজবাজীর মত লাগছে !'

'তা একরকম ভোজবাজীই বলতে পারেন।' অশোক ঠাকুর বললেন, 'চলুন, আপনার বাড়ির টাটকা তুধ খেতে খেতে সব ঘটনা বলি।'

তারকনাথের ঘরে বসে, অশোক ঠাকুর তুধ আর মিষ্টি খেতে খেতে সব ঘটনা বললেন। বাকিরা সব হতবাক হয়ে শুনলেন। তারকনাথ গোগোলকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'সাবাস গোয়েন্দা দাত্ন ! তুমি সত্যিই ভোজবাজী দেখিয়ে ছেড়েছ। গোঁফ দাড়িওয়ালা একটা খোঁড়া বুড়োর ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এলে হীরে চোর অবতার সিংকে ? তোমার তুলনা নেই।'

বাবা মাও হাসছিলেন। কারণ ওঁরা দেখলেন, গোগোল নিজে কোন বিপদে পড়েনি।

অশোক ঠাকুর বললেন, 'গোগোল তোমার একটা পুরস্কার বাকি রইল। আজ চলি, পরে দেখা হবে।'

অফিসার গোগোলকে আবার আদর করে বেরিয়ে গেলেন। তারকনাথ গোগোলকে তু হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এবার তোমার মুখ থেকে আলাদা করে ঘটনাটা শুনব। আমিও তোমাকে পুরস্কার দেব, কারণ তুমি ঐ ছিঁচকে বেচনলালটাকেও ধরিয়ে দিতে পেরেছ।'

গোগোল বলল, 'তবে দাত্ন, আপনি যদি বেচনলালের কথা না বলতেন, আমি অবতার সিংকে সন্দেহ করতাম না। আপনি যে বললেন, লোকটা আস্ত শয়তান। ভাবলাম, আস্ত শয়তানের কাছেই আর এক শয়তান থাকতে পারে।'

তারকনাথ গোগোলের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তা হলে আমি তোমাকে একটা ক্লু দিয়েছি ?'

বাবা মা হেসে উঠলেন।

চোরা হাতী শিকারী



বছরের সব ছুটিতেই যে গোগোলের বেড়াতে যাওয়া হয় এমন নয়। তবে, বছরে অন্ততঃ, একবার কি দু'বার বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সুযোগ মিলেই যায়। অবশ্য ছুটিতে বেড়াতে যাওয়াটা, সব থেকে বেশী নির্ভর করে বাবার ওপরে। তাঁর অফিসের ছুটি না পেলে, কোথাও যাবার উপায় থাকে না। কিন্তু একটাই কি মজা, গোগোলের ইস্কুলের ছুটির সঙ্গে, বাবা অফিস থেকে ঠিক ছুটি করিয়ে নেন। নেহাত খুব জরুরী কাজের চাপ থাকলে আলাদা কথা। তবে, ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা তো কেবল গোগোলের একলার নয়। বাবাও চান, সারা বছর চাকরি করে, কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে, বিশ্রাম করে আসতে। মাও চান। কিন্তু মা মুখ ফুটে তেমন করে বলেন না।

এ বছরের কথা একটু গোলমেলে ব্যাপার। গোলমালটা ঘটিয়েছে গোগোলই। এবার ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠতে, গোগোলের রেজাল্ট তেমন ভালো হয়নি। ফেল করেনি বটে, কিন্তু যেমনটা আশা করা গিয়েছিল, সেরকম ভালো করতে পারেনি। ফলে, মায়ের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আবার বাবার মনের হদিস গোগোল তেমন পায় না। তাঁর

মনটা কতো খারাপ হয়েছে, মুখ দেখে ঠিক বোঝা যায় না। তবে প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখে বাবা শুধু বলেছেন, 'মনোযোগের অভাবটাই চোখে পড়ছে বেশী। প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই দেখছি কুড়ি থেকে দশ পার্সেণ্ট নম্বর কম পেয়েছ। আর এবারে ক্লাস সিকসে উঠলে, তার মানে, হাই ইস্কুলের পড়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। এবারে তোমাকে খাটতে হবে বেশী। এটা তুমি নিজেই বুঝতে পারছ, তাই না?'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মা এত সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। অ্যানুয়াল পরীক্ষার আগে থেকেই কথাবার্তা চলছিল, পরীক্ষার পরে, এই শীতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে। পরীক্ষার ফলাফল দেখে, মা প্রথমেই বেড়াতে যাওয়াটা নাকচ করে দিলেন। মায়ের কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে, বেড়াতে যাওয়া মানেই, গোগোল সেখানে একটা গোলমাল পাকিয়ে বসবে। আর সে-সব গোলমালের মূলেই যতো অমনোযোগ আর পরীক্ষার খারাপ ফলাফলের কারণ।

অবশ্য একথা সত্যি, গোগোল কোথাও গেলেই, কেমন করে যেন একটা না একটা ঘটনা ঘটে যায়। তার জন্য গোগোলের কতোটা দোষ, ও নিজেই বুঝতে পারে না। ওর সব বিষয়েই কৌতূহলটা একটু বেশী। আর সেটাই ওকে বিপদের পথে টেনে নিয়ে যায়। হঠাৎ কোনো লোকের মুখ দেখেই ওর মনে হয়, লোকটা মোটেই ভালো নয়। আবার চোখের সামনে কোনো ঘটনা ঘটতে দেখলেই, সেটা ভাল কি মন্দ, ও যেন মনে মনে বুঝতে পারে। ঘটনাটা যদি খারাপ মনে হয়, তাহলেই ওর কৌতূহল এমন বেড়ে যায়, তার শেষ না দেখা পর্যন্ত ওর শান্তি হয় না। অথচ কোনো মানুষ, বা ঘটনা, যে ওর মনকে কৌতূহলী করে তোলে, তার মধ্যে ওর কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই। আপনা থেকেই ওর মন টেনে নিয়ে যায়। তারপরে দেখা যায়, ও একটা বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। আসলে, আর দশটা ছেলের মত গোগোল সব কিছুকে সাধারণ চোখে দেখতে পারে না। এক একটা ঘটনা যেন ওকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যায়।

যেমন এর আগের বছর, কলকাতাতেই ওদের আটতলার ফ্ল্যাটের ডাবুদাকে ডাকাতরা চুরি করেছিল। কিংবা দিল্লী থেকে ফেরার পথে রাজধানী এক্সপ্রেসে ওর চোখের সামনেই, ফার্স্ট ক্লাসের করিডরে, একজন আর একজনকে রিভলভার দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। এসব ঘটনার সঙ্গে ও এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, ওর জীবন নিয়েই টানাটানি। নতুন করে সে সব কথা এখানে আর বলার দরকার নেই। খবরের কাগজেই সব

ছেপে বেরিয়ে গিয়েছে, আর গোগোলের নামটাও এখন সকলের জানা হয়ে গিয়েছে।

গোগোল কি অন্যায় করেছে? মায়েব ধাবণা, গোগোল ইচ্ছে করেই এসব ঘটনাব মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। সেইজন্য মা খুবই বিরক্ত, রেগেও যান। এমন কি কান্নাকাটিও করেন। মাকে কাঁদতে দেখলেই গোগোল মনে মনে অস্থির হয়ে পড়ে। ভাবে, চোখের সামনে যেমন লোকই আসুক, আর যে-ঘটনাই ঘটুক, ও আর ফিবেও তাকাবে না।

বাবা আবার অন্যবকম কথা বলেন। তাঁব সব কিছু বলার ধবনটাই আলাদা। তিনি বলেন, 'দেখ, কোনো বাবা মা-ই চান না, তাঁদেব ছেলে কোনো অজানা বিপদেব মধ্যে গিয়ে পড়ে। তোমাকে আমি পুরোপুরি দোষ দিচ্ছিনে। চোখেব সামনে একটা ঘটনা ঘটতে দেখলে, তুমি কী কবেই বা চোখ বুজে সেখান থেকে চলে আসবে। তাছাড়া, কাপুরুষতা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। কিন্তু মাকে তোমাব বোঝা উচিত। তিনি যে বাগ কবেন, বিরক্ত হন, সে-সব আসলে সবই তোমাব জীবনেব ভালব জন্য। সে-ভযটা আমাবও আছে। তোমাব উচিত, কিছু ঘটতে দেখলেই আমাদেব বা বড়োদেব কাবোকে আগে জানিয়ে দেওয়া।'

গোগোল বলে, 'আমি তো তাই চাই বাবা। কিন্তু এমন কবে সব ঘটে যায়, কারোকে কিছু জানাবাব আগেই সব গোলমাল হয়ে যায়।'

বাবা হেসে বললেন, 'না গোগোল, এটা ঠিক কথা নয়। সব ব্যাপারেই তোমাব এমন কৌতূহল, তোমার তখন আব কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু তুমি এখনও ছেলেমানুষ। কোন্ দিন কোথা থেকে কী ঘটে যাবে, কিছুই বলা যায় না। তোমাকে সব সময় সাবধান থাকতে হবে।'

গোগোল জানে, বাবাব প্রত্যেকটা কথাই ঠিক। অথচ, বাবার একটি কথাই বিশেষ করে ওর মনে গেঁথে থাকে, 'কাপুরুষতা, আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'···আবার এটাও ঠিক, গোগোল নিজেব লেখাপড়া, খেলাধুলো নিয়েই থাকতে ভালবাসে। ও নিজে থেকে কোনো কিছুতেই জড়িয়ে পড়তে চায় না। অথচ রাজ্যের যতো ভয়াল ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাব মধ্যে ও যে কখন কী ভাবে জড়িয়ে পড়ে, নিজেই জানে না। তবে অনেক এ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ে, ওর মনেও অনেক কল্পনা জেগে ওঠে। সে তো আলাদা কথা। এ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়লে কার না এ্যাডভেঞ্চারে মেতে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যে-কোনো ব্যাপাবেই, ওর বিশেষ কৌতূহলই যতো গোলমালের মূলে। তখন ও আর এ্যাডভেঞ্চারে মেতে যাবে বলে মেতে যায় না। ববং নিজের

অজান্তেই বিপদের মুখে গিয়ে পড়ে।

যাই হোক, পরীক্ষার পরে, গোগোলের মনটা এবার খুবই খারাপ। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, প্রমোশন পেয়ে, ছুটি হবার পরে নিশ্চয়ই কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে। বাবার তো খুবই ইচ্ছে ছিল। মায়েরও বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু পরীক্ষার ফলটা তেমন ভালো না হওয়ায়, মা বেড়াতে যাবার কথা একদম তুললেন না।

অবশ্য কলকাতায় সাঁতার শেখা, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো আর আশপাশে বেড়াতে যেতে যে ভালো লাগে না, এমন নয়। গোগোলের চেহারারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যেই ও বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। দেখলেই বোঝা যায়, ভবিষ্যতে ও বেশ লম্বা হবে। পাড়ার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধু জর্জ বলে, বেঁটে লোকেরাই নাকি বেশী সাহসী আর সার্থক হয়। যেমন ছিলেন নেপোলিয়ন। গোগোল ও-সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিশ্বাসও করে না। লম্বা লোকেরাও যে বেশ সাহসী আর কৃতী পুরুষ হন, তা ও জানে।

কোথাও বেড়াতে না যাবার জন্য যখন মন খারাপের অবস্থা চলছে, তখনই ম্যাজিকের মত একটা ঘটনা ঘটে গেল। ছোটমামার বদলির চাকরি। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ে। হঠাৎ তাঁর চিঠি এলো শিলিগুড়ি থেকে। চিঠি এলো মায়ের নামে। ছোটমামা মায়ের ছোট ভাই। নাম অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। মা ডাকেন 'পুলু' বলে। ডাক নাম যে কার কেমন হয়, কেউ বলতে পারে না। যেমন গোগোলের নাম। এটা অবশ্য ওর ডাক নাম, রেখেছিলেন বাবা। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত লেখকের নাম ছিল নাকি গোগোল। বাবা সেই লেখকের খুব ভক্ত, তাই গোগোল নামটাই রেখে দিয়েছেন। আর তার ফলে এমন হয়েছে, গোগোলের আসল নামটাই সবাই ভুলে গিয়েছে। এমনকি ইস্কুলেও ওর ভালো নামের বদলে, আন্টিরাও গোগোল বলেই ডাকে।

যাই হোক, ছোটমামা লিখেছেন, 'দিদি, তোমাদের খবর দিতে পারি নি। কয়েক মাস হলো, আমি লক্ষ্ণৌ থেকে শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে এসেছি। শিলিগুড়ি মানে, গোটা উত্তরবঙ্গই আমাকে চষে বেড়াতে হয়। এর নাম প্রমোশন। ভেবেছিলাম, অনেকদিন পরে বদলি হয়ে কলকাতায় যেতে পারবো। তা আর ভাগ্যে হয়ে উঠলো না। তবে শিলিগুড়ি মানে কলকাতার কাছেই, আর এটাই আমার হেড কোয়ার্টার। বলতে পারো ইণ্ডিয়ান অয়েলের পয়লা নম্বরের জোনাল ম্যানেজার হয়ে আমি এখানে

এসেছি। কিন্তু যতো বড় চাকরি, তার দায়িত্বও বেশী। হুট্ বলতে যে কলকাতায় চলে যাবো, তা পারিনে।

'এখানে মোটামুটি একটা ভালো বাড়ি পেয়েছি। মমতা (ছোট মামীমা) আর হু'বছরের মুম্‌নি (ছোটমামার মেয়ে) ভালোই আছে। কিন্তু নতুন জায়গায় এসে ওদের বিশেষ ভালো লাগছে না। গোগোলের তো ছুটি হয়ে গিয়েছে। পত্রপাঠ তুমি আব সমীরেশদা গোগোলকে নিয়ে চলে এসো। এখানে এখন এলে শীতেব সময় দার্জিলিংয়ে হয় তো যাওয়া হবে না। এই সময়ে প্রচণ্ড শীতেব দাপটে, দার্জিলিং কার্শিয়াংয়েব গবিব পাহাড়ি মানুষবাই সমতলে নেমে আসে। কিন্তু বেড়াবার জায়গা অনেক আছে। ডুয়াবস আর তরাইয়েব জঙ্গলে, নদীব ধারে, ছোটখাটো পাহাড়ের ওপব আব চা বাগানে বেড়াতে বেশ ভালোই লাগবে। গাড়ির কোনো অভাব হবে না। মমতার তেমন বন্ধু না জুটলেও আমাব অনেক বন্ধু জুটে গিয়েছে। তবে কাজের চাপে আমি হয় তো সব সময়ে তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পাববো না, তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

'ভেবে দেখ, পাঁচ বছব তোমাদের সঙ্গে দেখা নেই। সেই বিয়েব সময় কলকাতায় শেষ দেখা। ইতিমধ্যে গোগোলের কিছু কাণ্ডকাবখানা হিন্দী আব ইংরেজী কাগজেও পড়েছি। ভাগ্‌নেটি দেখছি আমাব একটি ছোটখাটো জেমস বণ্ড হয়ে উঠেছে। ওকেও খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। অতএব আব বেশী কিছু লিখছি না। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদেব দেখতে চাই। আমার চিঠির কোনো জবাব দিতে হবে না। তোমবা চিঠি পেয়েই চলে এসো। ট্রেনে এসে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে চিঠিতে লেখা ঠিকানা রিকশাওয়ালাকে বললেই পৌঁছে দেবে। স্টেশন থেকে খুব বেশী দূরে নয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি লিখে ছোটমামা আরও একবার আসবাব তাড়া দিয়েছেন।

মা ছোটমামার চিঠিটা বাবাকে নিজে পড়েই শোনালেন। গোগোল আড়াল থেকে শুনছিল। আর ওর বুকটা ধুকধুক করছিল। পাঁচ বছব আগে, কলকাতায় ছোটমামার বিয়ের কথা ওর অস্পষ্ট মনে আছে। তবু যেন ছোটমামার চেহারাটা ভালো মনে করতে পারছে না। ছোট মামীমার সেই কনে সাজানো মুখটাও আবছা মনে পড়ছে। মুম্‌নি তো তখন হয়ই নি। কিন্তু ছোটমামাব চিঠিটা পড়ে মা বাবা কী বলেন, সে কথা শোনার জন্যই গোগোলের মনটা ছটফট করছে। আশা নিরাশায় বুকটা ধুকধুক করছে।

মা বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করা যায় বলো তো ?'

বাবা বললেন, 'আমি কী বলবো বলো। তুমি যা ঠিক করবে,

তাই হবে।'

মা বললেন, 'পুলুকে অনেককাল দেখিনি। এর আগেও যেখানে যেখানে থেকেছে, সবখান থেকেই যাবার জন্য চিঠি লিখেছে। কখনো যাওয়া হয়নি। এবার শিলিগুড়ি থেকে যেভাবে তাগাদা দিয়ে লিখেছে, কী করবো তাই ভাবছি।'

মা হচ্ছেন তাঁর দাদা আর ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র বোন। বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, পুলু খুবই আশা করে চিঠি দিয়েছে। আমিও তো পুলুকে অনেক-দিন দেখিনি।'

মা হেসে বললেন, 'যাই বলো, আমার কিন্তু খুবই যেতে ইচ্ছে করছে। এখন তোমার অফিসে ছুটি নিতে পারবে কী না, সেটা ভেবে দেখ।'

বাবা বললেন, 'আমি তো এমনিতেই কয়েকদিন ছুটি নেবো ভাবছিলাম। ছুটি নেওয়া হয়নি। আমার ছুটি নিতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু—'

বাবা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। গোগোল ওর আর মায়ের ঘর থেকে সব কথা শুনছিল। যদিও এখন এ ঘরটা ওর একলার বললেই চলে। ওর পড়া শোওয়া সবই এ ঘরে। তবে এখনও এ ঘরটা মায়েরই ঘর। অল্প বয়স থেকে গোগোল এ ঘরেই মায়ের সঙ্গে থাকে। বাবা মা কথা বলছিলেন, খাবার ঘরের পাশে বসবার ঘরের সোফায় বসে। বাবা হঠাৎ চুপ করে যেতে, গোগোলের যেন দম বন্ধ হয়ে এলো। বাবা কী বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। মা-ই বা কী বলবেন?

মায়ের গলা একটু পরে শোনা গেল, 'গোগোলকে নিয়েই আমার চিন্তা। নইলে আমারও কি আর বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না?'

বাবার গলা শোনা গেল, 'গোগোলকে আমি বুঝিয়ে বলেছি। কয়েকটা দিন ঘুরে এলে কী আর এমন ক্ষতি হবে। ইচ্ছে যখন করছে, তখন চলো, কয়েকদিন বেড়িয়ে আসি। আমারও কয়েকটা দিন কলকাতার বাইরে ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে।'

মা বললেন, 'পুলু যেরকম তাড়া দিয়ে লিখেছে, এতো তাড়াতাড়ি যাবো কেমন করে? ট্রেনের টিকেট আর রিজারভেশন পাওয়া চাই তো?'

বাবা বললেন, 'তার জন্যে আমি ভাবছিনে। গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যাবার ভিড় থাকে, সে-সময় টিকেট পাওয়া একটু কঠিন। তবে আমার অফিস থেকে টিকেটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর ট্রেনে যদি না-ই যাওয়া হয়, প্লেনে করে চলে যাবো। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারলাইন্সের বাসে শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছে রিক্‌শা নিয়ে নিলেই হবে।'

গোগোলের বুকে তখন খুশির মাতন লেগে গিয়েছে। মায়ের গলা শোনা গেল, 'তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি যা হোক একটা ব্যবস্থা দেখ। কোথাও যাবো না ভেবে কিছুদিন তো কেটেই গেল। আর দেরী করলে চলবে না।'

বাবা বললেন, 'আমি আজই অফিসে বেরিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।'

গোগোল ঘরের মধ্যে একটা লাফ মেরে, দেওয়ালে টাঙানো ব্রুস লির ছবির কাছে চলে গেল। বাবা ওকে ব্রুস লির এই রঙীন বড় ছবিটা এনে দিয়েছেন। পড়ার টেবিল থেকে একটু দূরে, দেওয়ালে ও ছবিটা টাঙিয়েছে। এ ছাড়াও আছে সুনীল গাভাসকার আর কপালের ছবি। গোগোলকে বাবা ময়দানের একটা ক্যারাটে শেখার ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্যারাটে শেখার ওর খুবই ইচ্ছে। ব্রুস লির একটা ফিলম্ এসেছিল, কিন্তু গোগোলদের বয়সী ছেলেমেয়েদের তা দেখতে দেওয়া হয়নি। বড়োদের ব্যাপার-স্যাপার যে কী, তা বোঝবার উপায় নেই। যাই হোক, বাবার সঙ্গে ময়দানে, ক্যারাটে শেখার ক্যাম্পে গিয়ে, ক্যারাটে কাকে বলে, মোটামুটি তার একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে।

এখন মনের আনন্দে, ঘরের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে, ও নিজেই কয়েকটা ক্যারাটের ভঙ্গিতে হাত পা চালিয়ে নিল। আর ঠিক সে-সময়েই বাবা ঢুকলেন ঘরে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছো গোগোল?'

গোগোল লজ্জা পেয়ে, লাফ দিয়ে খাটের বিছানায় পড়ে দু'হাতে মুখ চাপলো। বাবা কাছে এসে বললেন, 'বুঝেছি, শিলিগুড়ি যাবার ব্যাপার। আমার আর মায়ের সব কথাই তুমি শুনেছো। মনে হচ্ছে, এটা তোমার ভাগ্যেই ঘটে গেল। ভালোই হলো।'

গোগোল তাড়াতাড়ি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'তা হলে আমরা কবে যাচ্ছি বাবা?'

বাবা বললেন, 'আশা করছি, দু'-তিন দিনের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে দেখো, আবার যেন পাগলা হাতীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যেও না।'

দু'বছর আগে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছিল। হলংয়ে বেড়াতে গিয়ে সত্যি সত্যি এক বিশাল দাঁতালো হাতীর সঙ্গে গোগোলের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই হাতীটা নাকি ভূটান ডিঙিয়ে আসাম থেকে এসে পড়েছিল। একলা হয়ে যাবার জন্যই হোক বা যে-কোনো কারণেই হোক, সে ক্ষেপে গিয়েছিল। তার ভয়ে কেউ বাইরে বেরোতে পারছিল না। অথচ সেই হাতীর সঙ্গেই গোগোলের অদ্ভুত ভাব হয়ে গিয়েছিল, আর তার সঙ্গেই গোগোল গোটা হলং জঙ্গলটা ঘুরে দেখেছিল। চোখের সামনেই গণ্ডার, গণ্ডারের বাচ্চা, দৌড়ে

পালানো হরিণের দল, আর উড়ে যাওয়া ময়ূর দেখেছিল। ময়ূর যে ও-রকম উড়তে পারে, গোগোলের কোনো ধারণাই ছিল না। পরে শুনেছে ময়ূর পাখিদের মতো অনেক দূরে উড়ে যেতে পারে না। ভয় পেলে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেকটা বন মোরগের মতো।

গোগোল বলল, 'কিন্তু বাবা, সেই বুনো পাগলা হাতীটার সঙ্গে আমি ইচ্ছে করে বন্ধুত্ব করতে যাইনি। আমাকে একলা পেয়ে, সে নিজেই শুঁড় দিয়ে আস্তে আস্তে ঠেলে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গেছলো। ভয় তো আমারও হয়েছিল। কিন্তু হাতীটা আমাকে নিয়ে যেন খেলায় মেতে গেছলো।'

বাবা বললেন, 'আর আমাদের ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছলো। তোমার জন্যে ফরেস্ট গার্ডরা আর রেঞ্জার সাহেব নিজে বন্দুক নিয়ে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলেন।'

গোগোল কিছু না বলে হাসলো। বাবা একবার দরজার দিকে দেখে, প্রায় চুপি চুপি স্বরে বললেন, 'যাই হোক, তোমার ভাগ্যেই হয় তো ছোট-মামার চিঠিটা এসে পড়েছে। আর মামার চিঠি বলেই তোমার মাও সহজেই রাজী হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি জানি, তোমাকে বলবার দরকার নেই, তবে এবার পড়াশোনায় তোমার মনোযোগটা দেখিয়ে দিতে হবে।'

গোগোল একটু গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলো। বাবা ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'এতে তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। আমি জানি, পড়াশোনা তোমার ঠিকই আছে।'

গোগোল বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলো। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মাঝখানে মাত্র দু' দিন কাটলো। তিন দিনের দিনই যাত্রা। বাবা দার্জিলিং মেলের টিকেট আর রিজারভেশনের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। শিয়ালদহ থেকে সন্ধ্যা সোয়া-সাতটায় দার্জিলিং মেল ছাড়লো। ছোটমামা লিখেই দিয়েছিলেন, শীতের জামাকাপড় ছাড়া সঙ্গে কিছুই নিতে হবে না। সন্ধ্যাবেলা রাত্রের খাবার পাওয়া যায় না বলে মা রাত্রের খাবার তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর সঙ্গে জল।

রাত্রে বর্ধমানে পৌঁছেই খাওয়ার পাট মিটে গেল। তারপরেই ঘুম। পরের দিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই গোগোলের ঘুম ভেঙে গেল। একটাই ভাগ্য, গাড়িটা বেশী লেট করেনি। কুলির

মাথায় জামাকাপড়ের দুটো স্যুটকেস চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দেখা গেল, চারদিকে গাদা গাদা সাইকেল রিক্‌শা। ট্যাকসি বাসও কম নেই। নেপালী ড্রাইভাররা দার্জিলিং দার্জিলিং বলে প্যাসেঞ্জারদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছে।

বাবা ছোটমামাব চিঠিটা একবার দেখে সাইকেল রিক্‌শাওয়ালাদের কাছে ঠিকানা আর নামটা বলতেই অনেকে একসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'চলে আসুন বাবু, আমি চিনি।'

বাবা হেসে বললেন, 'আহা, তোমরা সবাই চেঁচামেচি করলে কী হবে। আমার দরকার দুটো। কিন্তু ঠিকানাটা তোমবা বুঝতে পেরেছো তো?'

দুজন রিক্‌শাওয়ালা তাদেব রিক্‌শা এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'কিছু ভাববেন না বাবু। পেট্রল পাম্পের ম্যানেজার সাহেবকে আমরা সবাই চিনি।'

মা আব গোগোল বসলো একটা রিক্‌শায়। বাবা দুটো স্যুটকেস নিয়ে আলাদা একটায়। তারপবেই বিক্‌শা দুটো ছুটলো। স্টেশনের ভিড় কাটিয়ে, সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গোগোলের জায়গাটা মোটেই পছন্দ হলো না। ছোটমামা কি এরকম জায়গায় থাকেন?

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই, বিরাট একটা মাঠের সামনে রিক্‌শা দুটো এসে পড়লো। একজন রিক্‌শাওয়ালা মাঠের একদিকে বড় বিল্ডিং দেখিয়ে বলল, 'ওটা হলো কলেজ।'

গোগোল দেখলো, এখানে রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কাব। বাড়িগুলো সবই প্রায় নতুন আর ঝকঝকে। একটা গ্রীলের গেট বন্ধ, সামনে বাগান, দোতলা বাড়ির সামনে দুটো রিক্‌শাই দাঁড়িয়ে পড়লো। বলল, 'এটাই সেই বাড়ি।'

রিক্‌শাওয়ালার কথা শেষ হতে না হতেই, নীল রঙের স্যুট পরা, গলায় টাই বাঁধা একজন সুন্দর চেহারার লম্বা ভদ্রলোক বাগান পেরিয়ে ছুটে এলেন। গ্রীলের দরজা খুলে, আগেই মাকে আর বাবাকে প্রণাম করে বললেন, 'যাক দিদি, তোমরা তা হলে সত্যি এসে পড়লে?'

বাবা তো প্রণামের জন্য খুবই যেন লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আরে, এসব আবার কী হচ্ছে?'

মা বললেন, 'তুই কি ভেবেছিলি, আমরা সত্যি সত্যি আসবো না?'

গোগোল বুঝেই নিল ইনিই ছোটমামা অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর ডাক নাম পুলু। তিনি বললেন, 'না এলে দেখতে, আমি নিজেই কলকাতায় গিয়ে

হাজির হয়েছি তোমাদের আনবার জন্য। নিদেন ট্রাংকল তো করতামই।'

মা ছোটমামাকে বললেন, 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তোর চানটান হয়ে গেছে, কোথাও বেরোতে যাচ্ছিলি ?'

'কোথায় আবার বেরোবো, অফিস ছাড়া ?' ছোটমামা বললেন, 'আমাকে সকালবেলাই চান করে, জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। আমি রেডি হয়ে, তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেনের কথা তো বলা যায় না, কতোটা লেট করবে। আমি একটু আগে টেলিফোনে খবর নিচ্ছিলাম, শুনলাম, গাড়ি মাত্র কুড়ি মিনিট লেট। বেশী লেট হলে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হতো। দুপুরে খেতে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা হতো। চাকরির বড় জ্বালা, বুঝলে দিদি।'

মা হাসলেন। গোগোল তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে, ছোটমামার জুতোয় হাত দিয়ে প্রণাম করলো। ছোটমামা তৎক্ষণাৎ গোগোলকে জড়িয়ে ধরে, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আরে, আমাদের আসল হিরোকেই এতোক্ষণ চোখে পড়েনি ? সরি মাস্টার গোগোল।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে হাসলো। ছোটমামা বললেন, 'দিদি মাস্টার গোগোল দেখছি বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। এখনই আমার বুকের কাছে।'

বাবা বললেন, 'ঐ জন্যই বোধহয় বলেছে, নরানাং মাতুলক্রম। গোগোল তো এখনই প্রায় আমার কাঁধের কাছাকাছি।'

বাবার কথা শেষ হবার আগেই, বাড়ির ভিতরের বাগান পেরিয়ে একজন মহিলা এগিয়ে এলেন। মায়ের থেকে বয়সে ছোট, ফরসা। তাঁর কোলে বছর দুয়েকের একটি টুকটুকে মেয়ে। গেটের সামনে এসে বললেন, 'ভাই-বোনের সব কথা কি বাড়ির বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই হবে ? বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে না ?'

গোগোলের একটু অস্বস্তিই হচ্ছিল। বাড়ির দোতলা থেকে মহিলা পুরুষরা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ওদের দেখছিলেন। আশেপাশের বাড়ির দরজা জানালা থেকেও অনেক মুখ উঁকি দিয়ে ওদের দেখছিল। মা তাড়াতাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকে বলে উঠলেন, 'অনেকদিন পরে দেখা তো। তা মমতা, তুমি আগের থেকে একটু মোটা হয়েছো। কিন্তু মুমনি ভারি সুন্দর হয়েছে।' মা হাত বাড়িয়ে মুমনিকে কোলে নিতে গেলেন।

মুমনি অচেনা মুখ দেখে, নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিল, আর ছোটমামীমাকে আঁকড়ে ধরলো। মা বললেন, 'কোনোদিন তো চোখে দেখেনি। একটু চেনা হয়ে গেলেই আসবে।'

ছোটমামীমা বললেন, 'আসবে মানে ? তখন আর আপনাকে ছাড়তেই চাইবে না। চলুন দিদি, আমরা ভেতরে যাই। গোগোল, তুমিও চলো।' তিনি গোগোলের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন।

ছোটমামা রিকশাওয়ালাদের তাড়া দিলেন, 'তোমরা স্যুটকেস দুটো ভেতরে তুলে দাও।'

বাবা ছোটমামীমাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'আমি বুঝি কেউ নই, তাই ডাকা হলো না ?'

ছোটমামীমা মিষ্টি হেসেই বললেন, 'আপনিই তো আসল অতিথি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করলে আমি কী করবো। চলে আসুন না।'

বাবা পকেটে হাত দিয়ে মনিব্যাগ বের করলেন, রিকশাওয়ালাদের ভাড়া মেটাবার জন্য। তার আগেই ছোটমামা তাঁর কোটের ভেতর পকেট থেকে তাঁর মনিব্যাগ বের করে একজন রিকশাওয়ালার হাতে দুজনের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আহা, পুলু, এটা কী হচ্ছে ? ওটা তো আমারই দেবার কথা।'

ছোটমামা বাবার হাত ধরে গেটের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ও বললে কি হয় সমীরেশদা, আপনি হলেন বাড়ির জামাই। চলুন চলুন, ভেতরে চলুন। সত্যি, ভারি আনন্দ হচ্ছে।' আমার এখন আর অফিসে যেতেই ইচ্ছে করছে না।'

গোগোল মা আর মামীমার সঙ্গে ঘরে ঢুকলো। বাইরের ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো। সোফা সেট, সেন্টার টেবিল ছাড়াও, এক পাশে রয়েছে একটা ডিভান যার ওপরের মোড়কটা রাজপুত ছবির সুন্দর প্রিন্টিং করা। এই সময়ে একটি আট দশ বছরের মেয়ে, লম্বা পর্দা সরিয়ে এ ঘরে এলো। তাকে দেখেই মুমনি পিছলে ছোটমামীমার কোল থেকে নেমে গেল। ছোট ছোট পায়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে গিয়ে তাকে ধরলো। আর সেই মেয়েটি মুমনিকে কোলে তুলে নিয়ে, আবার পর্দার আড়ালে চলে গেল।

মা বললেন, 'ওই মেয়েটিই বুঝি মুমনিকে রাখে ?'

ছোটমামীমা বললেন, 'হ্যাঁ। লক্ষ্ণৌ থেকে মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছে, ওর নাম পাতিয়া। পাতিয়াও মুমনিকে খুব ভালবাসে।' বলে ছোটমামীমা মাকে প্রণাম করলেন।

মা ছোটমামীমাকে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললেন, 'থাক্ থাক্, আজকাল আবার ওসব আছে নাকি ?'

কিন্তু ছোটমামীমা তখন গোগোলের দিকে ফিরে হাত ধরে বললেন,

'এসো গোগোল। তোমার কথা যে কতো শুনেছি।'

গোগোল নীচু হয়ে ছোটমামীমাকে প্রণাম করতে গেল। ছোটমামীমা ওকে জোর করে বুকের কাছে চেপে ধরে গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'খুব হয়েছে। তুমি এখন মস্ত গোয়েন্দা, আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না। চলো, এখন ভেতরে যাওয়া যাক।'

ভিতরে ঢুকে বোঝা গেল, আসলে নীচের একটা বড় ঘরকে, মাঝখানে পর্দা খাটিয়ে আলাদা করা হয়েছে। পর্দার এপাশে রয়েছে খাবার টেবিল, আর টেবিল ঘিরে চারটি চেয়ার। ঘরের একপাশে রান্নাঘর। কলকাতার গোগোলদের বাড়ির বঙ্কিমদার মতোই একজন রান্না ঘরে কী কাজ করছে। অন্য দিকে দরজা বন্ধ ঘর দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওদিকে বাথরুম। ঘরের এক কোণে একটা বেসিন।

এই ঘরের মাঝখান দিয়ে একটি করিডর ভিতরে চলে গিয়েছে। ঠেকেছে গিয়ে একটা দরজার সামনে। খোলা দরজাটা দেখলেই বোঝা যায়, ওটা একটা ঘর। গোগোল মা আর ছোটমামীমার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলো, করিডরের দু'পাশে দুটো ঘর। খোলা জানালা দিয়ে দেখা গেল, বাগান কেবল সামনে নয়। তিনটি শোবার ঘরের জানালা খুললেই বাগান। তার মানে, বাড়িটার চারপাশেই খোলা বাগান। মাঝখানে বাড়ি। প্রত্যেকটা ঘরেই বেশ আলো বাতাস আসে। মাকে ছোটমামীমার বলা থেকেই জানা গেল, ওপর তলায় বাড়িওয়ালা থাকে। নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া আছে।

ভিতরের খাবার ঘরের কাছ থেকে ছোটমামার গলা শোনা গেল, 'মমতা, দিদি, সমীরেশদা আর গোগোলের খিদে পেয়েছে। আগে মুখ ধোবার গরম জল আর চা দাও। তারপর জলখাবার। আমি অফিসে ঢোকবার আগে বাজারটা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার আর সময় নেই।'

ছোটমামীমা পাশের একটা ঘরে মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আর গোগোল মুমুনির সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছিল। ছোটমামীমা বললেন, 'এখানে যা করবার আমি করছি, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি তোমার কাজে যাও। আর সমীরেশদাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। বাইরের লোকের মতো বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখো না।'

ছোটমামা আর বাবা কী কথা বললেন, তারপরে তাঁদের হাসি শোনা গেল।

তারপরেই আরম্ভ হয়ে গেল বেড়াবার পালা। প্রথম দিন, দুপুরে খেতে

এসে ছোটমামা আর বোরালেন না। পড়ন্ত বেলায় চা খেয়েই, শিলিগুড়ির আশপাশটা একটা গাড়ি নিয়ে বেড়ানো হলো। ছোটমামীমা আর মুমুনিও সঙ্গে ছিল। শিলিগুড়ি মানেই, একটা দিকে হিমালয় আকাশের গায়ে ঠেকে আছে।

শহরের বুকেই মহানন্দা নদী। তার সেতুটা বেশ বড়। নদীতে জল খুবই কম। প্রধান ধারাটা এক পাশ দিয়ে বহে চলেছে সরু ধারায়। তার থেকেও দু' একটা সরু জলের ধারা রয়েছে। বাকিটা সবই বালি আর মাটি। অথচ বিরাট চওড়া নদী। ছোটমামা বললেন, বর্ষার সময় নাকি এ নদীর চেহারা বদলে যায়।

মহানন্দাব ওপার থেকে ঘুরে এসেই, গাড়ি ছুটে চললো তিস্তার ওপর সেভক ব্রিজের ওপর। বলতে গেলে, সেটা পাহাড়ের ওপরেই। নদী অনেক নীচে। আর এই সেভক ব্রিজের পাশ দিয়েই কালিম্পংয়ের রাস্তা চলে গিয়েছে। গোগোলের চেনা রাস্তা। কেন না, এর আগে দার্জিলিং বেড়াতে এসে, কালিম্পংয়ে গিয়ে, এই পথ দিয়েই ওরা নেমে এসেছিল। সেবার গরমের সময় ছিল। পাহাড়ের অনেক ওপবে বরফ গলতে আরম্ভ করেছিল। তিস্তার চেহারা ছিল অন্যরকম। আর এখন এই ব্রিজের ওপর থেকে অনেক নীচে নদীটাকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে। দু'পাশের বালুচরকে দেখাচ্ছে যেন রূপালী চাদর পাতা। ছোটমামা বললেন, 'নীচের ঐ চরেব অনেক জায়গায় নাকি চোরাবালি আছে। যারা জানে না, তারা সেই চোরাবালিতে ডুবে যায়।'

কথাটা ভেবেই গোগোলের গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। চোবাবালির কথা ও আগেই শুনেছে। একটা মানুষ একবার চোরাবালিতে পড়ে গেলে, আস্তে আস্তে তার মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। অথবা বলা যায়, চোরাবালি যেন, একটা প্রকাণ্ড অজগরের মতো, মানুষকে আস্তে আস্তে গিলে নিতে থাকে, তারপর একেবারে শেষ। মানুষটা ডুবে গেলে, সেখানে আর তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ দেখতে কেমন সুন্দর! গোগোল বইয়ে পড়েছে, দেখতে সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে এরকম অনেক বিভীষিকা আছে।

সেভক ব্রিজের ওপার দিয়ে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে খালের দিকে রাস্তা চলে গিয়েছে। ছোটমামা আগেই জানিয়ে রাখলেন, মালবাজারের দিকে বেড়াতে যাবার সময়, ঐ পথ দিয়েই যেতে হবে। তা ছাড়া, আর একটু নীচু দিয়েই চলে গিয়েছে রেলের ব্রিজ। ঐ ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলে চেপেও মালবাজার যাওয়া যায়।

সবাই মিলে হেঁটে ব্রিজের ওপার থেকে বেড়িয়ে আসা গেল। গোগোলের ইচ্ছে করছিল, আরও কয়েকবার ব্রিজের ওপর দিয়ে দৌড়ে ছুটে এপার ওপার করে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে, ছোটমামা তাড়া দিলেন। চার-পাশেই পাহাড় আর গভীর জঙ্গল। বেশীক্ষণ সেখানে থাকা উচিত নয়। আশেপাশের জঙ্গলে নাকি বাঘ আছে। অথচ গোগোল দেখছে, কালিম্পং আব মালের দিক থেকে প্রায়ই গাড়ি আসছে, অথবা যাচ্ছে। তাছাড়া, গরিব পাহাড়ি মেয়ে আর পুরুষ মজুরেরা এখনও দিব্যি পাহাড়ের ওপরে, দল বেঁধে হেঁটে চলেছে। তারা অনেকে আবার গানও করছিল।

আসল বেড়ানো শুরু হলো তার পরদিন থেকে। সেই হিসেবে প্রথম দিনেব বেড়ানোটা কিছুই নয়। গাড়ির অভাব ছিল না। পরের দিনের বেড়ানোর প্রোগ্রামটা ঠিক করলেন ছোটমামীমা। তাঁব এক দিদির বাড়ি জলপাইগুড়ি শহবে। যে-কোনো জায়গায় বেড়াতে যাবাব আগে, গোড়ায় আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করা দরকাব। ছোটমামার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হলো না। গোগোলবা ভোরবেলাই বেবিয়ে পড়লো। সময় লাগলো ঘণ্টা খানেকের মতো। ছোটমামীমাব দিদির বাড়ি পৌঁছুতেই, সেখানে যেন নিমন্ত্রণ বাড়িব মতো উৎসব লেগে গেল। সকলেই খুব খুশি। ছোট-মামীমার দিদিব দুই ছেলেব একজন গোগোলের থেকে বড়। সে তো গোগোলকে ছাড়তেই চায় না। বাড়ির বড়রাও গোগোলকে দেখে ও পেয়ে খুশি। তাঁবাও গোগোলের অনেক কাহিনী শুনেছেন।

গোগোলকে নিয়ে ছোটমামীমাব দিদির বড় ছেলে শুভ, আব ছোট দিব্য গাড়ি কবে জলপাইগুড়ি শহব ঘুরিয়ে বেড়িয়ে দেখালো। শহরের প্রায় মাঝখান দিয়েই চলে গিয়েছে করলা নদী। ছোট নদী, দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু শুভ বললো, এই করলা নদীতেই, কয়েক বছব আগে এমন বন্যা হয়েছিল, গোটা জলপাইগুড়ি শহরটাই নাকি তার নীচে চলে গিয়েছিল। গোগোল তো আতঙ্কে হাঁ। শহরটাই যদি জলের নীচে চলে যায়, তবে লোক বাঁচলো কেমন কবে?

শুভ বললো, 'বহু লোক মরে গেছলো। সবাই বলে, গভর্নমেন্ট যতো লোক মরেছে বলে হিসেব দিয়েছিল, তার থেকেও নাকি অনেক বেশী লোক মাবা গেছলো।'

গোগোল জিজ্ঞেস কবলো, 'তা হলে তোমরা বাঁচলে কেমন করে?'

শুভ বললো, 'আমাদের বাড়িটা তো তেতলা, আমবা তার ওপরে উঠে ছিলাম। সেখান অবধি জল পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু একতলা বাড়ি

প্রায় সবই ডুবে গেছলো। আর যাদের টিনের বাড়ি, তাদের তো কথাই নেই। সে-সব বাড়িও ডুবে গেছলো। সব থেকে আশ্চর্যের কথা, করলা নদীতে যে বন্যা হতে পারে, এটা কেউ ভাবেনি। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাবপরে ঠিক কখন থেকে যে এদিকে করলা নদীব জল বাড়তে আরম্ভ করেছিল, কেউ খেয়ালই করেনি। যখন নদীর পাড় ছাপিয়ে, জল শহরের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, তখন সকলের টনক নড়েছে। তখন যে যে-দিকে পেরেছে, পালিয়ে বাঁচবাব চেষ্টা করেছে। এমন কি হাসপাতালও ডুবে গেছলো।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'নিশ্চয়ই তা হলে অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মারা গেছলো।'

শুভ বললো, 'তা তো গেছলোই। বন্যার জলের যে কী তোড়, তা না দেখলে বোঝা যায় না। সাঁতার জানলেও বন্যার জলেব সঙ্গে লড়াই কবা যায় না। তাছাড়া গরু মোষ ছাগল কুকুব বেড়াল কতো যে মবেছিল, তাব কোনো হিসেবই নেই।'

গোগোল শুনছিল, আর ওর চোখের সামনে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য যেন ভেসে উঠছিল। আর এখন শীতেব সময় এই শান্ত ছোট করলা নদীকে দেখে বোঝাই যায় না, তার চেহাবা ঐরকম ভয়ঙ্কব হয়ে উঠতে পাবে। শুভ তাব কারণটাও জানিয়ে দিল। করলা নদীর উঁচু বাঁধ ভেঙে, তিস্তাব জল ঢুকে পড়েছিল।

জলপাইগুড়ি শহবে বেড়াতে বেড়াতে, আব একটা জিনিস দেখে, গোগোল খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলো। ওব এক সময়ে হঠাৎ চোখ পডলো, নীল আকাশের গায়ে, বরফ ঢাকা পাহাড়েব ঝকঝকে চূড়া জেগে আছে

শুভ বললো, 'ওটা হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা। শরৎকাল থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। যতোদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে, ততোদিনই দেখা যায়

গোগোল এর আগে যখন দার্জিলিং গিয়েছিল, সে-সময়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভালো করে দেখা যায় নি। মে মাসে আকাশ প্রায়ই মেঘে ঢাকা থাকে। পাহাড়ের ওপবে তখন কুয়াশাও বেশী। হঠাৎ মেঘ কেটে গেলে, এক পলকের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেতো। আর এখন জলপাইগুড়ি শহরেব যেখানেই যাওয়া যাক, উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে তাকালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা চোখে পড়ছে। রোদের সঙ্গে তার রঙও বদলে যাচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে সারাদিন কাটিয়ে, সন্ধ্যার পরেই আবার শিলিগুড়ি ফিরে আসা হলো। কিন্তু ছোটমামার সব ব্যবস্থা পাকা। কোথায় কবে বেড়াতে

যাওয়া হবে, সে-সব তিনি পুরো ছকে রেখেছেন। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী, শিলিগুড়িতে তরাইয়ের জঙ্গলে আর চা বাগানে অনেক জায়গা বেড়ানো হলো। তার মধ্যে ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি থেকে শুরু করে, নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত, কোন জায়গা বাদ গেল না। শীতের জন্য পাহাড়ে ওঠা হবে না, এরকম ঠিক থাকলেও মিরীক পাহাড় পর্যন্ত ওঠা হয়েছিল। তবে সেখানে থাকা হয়নি। উঠে, ঘুরে বেড়িয়ে দেখেই আবার নেমে আসতে হয়েছিল।

এ তো গেল শিলিগুড়ির আশেপাশে, অর্থাৎ দার্জিলিং জেলার পাহাড়ের নীচে ঘুরে বেড়ানো। তার মধ্যে গোগোলের সব থেকে ভালো লাগলো, বালাসন নদীর ওপর একটা কাঠের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে, কার্শিয়াং পাহাড়ি শহরকে দেখতে। মনে হচ্ছিল, সোজা হেঁটে চলে গেলেই কার্শিয়াংয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে। ও কথাটা ছোটমামাকে বলতেই, তিনি হেসে বললেন, 'তুমি যতো সহজ ভাবছো, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। প্রথম কথা, এখান থেকে যতো কাছে দেখছো, কার্শিয়াং তার থেকে অনেক দূরে। আর তুমি হেঁটে যেতে গেলে, জোঁকের দল ছেঁকে ধরে, তোমার সারা গায়ের রক্ত শুষে নেবে। এ সব জায়গায় ঘাসের ডগা থেকে, গাছের মাথা পর্যন্ত জোঁক ছেয়ে আছে। তবে হ্যাঁ, গরিব পাহাড়ি মানুষরা অনেক সময় হেঁটেই পাহাড়ে উঠে যায়। তারা সংক্ষিপ্ত রাস্তা জানে, যাকে তারা বলে, চোর বাটো। জোঁকের আক্রমণ বাঁচিয়ে একমাত্র তারাই ঐ পথে চলতে পারে।'

তারপরে বেড়াতে যাওয়া হলো জলপাইগুড়ির নানা চা বাগানে আর জঙ্গলে। ছোটমামা সব সময়ে সঙ্গে না থাকলেও, গোগোলদের জন্য নানা জায়গায় থাকবার জন্য বাংলোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন সে-সব বাংলোর রাজকীয় ব্যবস্থা। যেমন সুন্দর ঘর বিছানা, আর খাবারের আয়োজনও তেমনি। চা বাগান সম্পর্কে গোগোলের কোনো ধারণাই ছিল না। এক একটা বিশাল চা বাগান। আর চা গাছগুলোর কোনটার বয়স নাকি পঞ্চাশ থেকে একশো বছর। ছোট ছোট গাছগুলির বয়স এতো কী করে হতে পারে, গোগোলের মাথায় ঢুকলো না। ছোট ছোট গাছগুলোব গোড়া বেশ মোটা আর শক্ত। অধিকাংশ পাহাড়ি মেয়েরাই পিঠে এক ধরনের লম্বা ঝুড়ি ঝুলিয়ে চা পাতা তোলে। তাও নাকি আবার চা গাছের ডগার কচি পাতা আর কুঁড়ি তোলা হয়। বড় পাতাগুলো কোনো কাজেই লাগে না।

মালবাজারের চারপাশেও প্রচুর চা বাগান। তবে এদিকে জঙ্গল খুব বেশী। মেটেলি নামে একটা জায়গা গোগোলের খুবই ভালো লাগলো। সেখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গোগোলের বেশ ভাব

জমে গেল। তিনি বাংলোর টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে, উত্তরের চালসা ফরেস্ট দেখিয়ে বললেন, 'এই জঙ্গল চলে গেছে আসাম পর্যন্ত। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার রাস্তা আছে। গাড়ি যায়। তবে এ জঙ্গলে হাতীর উৎপাত খুব বেশী। প্রায়ই তারা দল বেঁধে এসে, লোকের মাঠের ফসল খেয়ে চলে যায়। আর ক্ষ্যাপা হাতী হলে তো কথাই নেই। সে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি ভেঙে একেবারে তছনছ করে দেয়। ইংরেজীতে ক্ষ্যাপা হাতীকে বলে আউট হল। আর এখানকার লোকেরা বলে 'হটাবাহার'। তুমি কলকাতার হাতী শিকারী চঞ্চল সরকারের নাম শুনেছো?'

গোগোল বলল, 'হ্যাঁ তাঁকে চিনি, আমি তাঁদের বাড়িও গেছি, আর অনেক হাতীর দাঁত দেখেছি।'

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ভদ্রলোক বললেন, 'উনি এখানে এসে দু' বার দুটো পাগলা হাতীকে মেরেছিলেন।'

গোগোলের মনে পড়ে গেল, হলংয়ের সেই পাগলা হাতীর কথা। ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'মারতে হলো কেন? ওরা তো ভয়েই পালিয়ে যেতো।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সত্যিকারের পাগলা হাতী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এমনিতে তাদের মারবার অর্ডার গভর্নমেন্ট দেয় না। কিন্তু যখন তারা মানুষ মারতে আরম্ভ করে, তখন আর না মেরে কোনো উপায় থাকে না। দুটো হাতী কম করে আট দশ জন ছেলেমেয়ে আর বুড়োকে মেরে ফেলেছিল হাতীর থেকে মানুষের জীবনের দাম বেশী, এটা নিশ্চয় মানো?'

গোগোল মাথা ঝাঁকালো। তা না মেনে কোনো উপায় নেই। ভদ্রলোক আরও বললেন, 'তুমি কখনও বুনো কুকুরের কথা শুনেছো?'

গোগোল অবাক হয়ে বললো, 'না তো!'

ভদ্রলোক বললেন, 'এই জঙ্গলে বুনো কুকুর আছে। তারা খুব সাঙ্ঘাতিক। সব সময়ে বিশ পঁচিশটা দল বেঁধে চলে। দেখতে অনেকটা শেয়ালের মতো, কিন্তু সরু। তারা যেখান দিয়ে যায়, সেখানে মানুষ জানোয়ার যাকে পায়, তাকেই খেয়ে ফ্যালে, আর কংকালটা শুধু পড়ে থাকে। এমন কি, বুনো কুকুরদের বাঘেরাও ভয় পায়। হাতীরাও তাদের এড়িয়ে চলে।'

শুনতে শুনতেই গোগোলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এমন ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীর কথা ও কখনও শোনেনি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তারা বাঘকেও খেয়ে ফ্যালে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, বাঘকেও খেয়ে ফ্যালে। তারা একসঙ্গে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর ফালা ফালা করে মাংস খেয়ে, কেবল কঙ্কালটা ফেলে যায়। একমাত্র গাছে উঠে পড়তে পারলেই তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তারা গাছে উঠতে পারে না।'

গোগোল যেন একটু স্বস্তি পেলো। তবু যাই হোক, সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচবার একটা উপায় তবু আছে। মনে মনে ভেবে রাখলো, কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।

এভাবে বেড়িয়েই দশ দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে ছোটমামার শিলিগুড়ির কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে দু'জন গোগোলদের সঙ্গে দু' একদিন আশেপাশে বেড়াতেও গিয়েছেন। গোগোল কারোরই ভালো নাম জানে না। দু'জনেই ছোটমামার বয়সী। একজন মণ্টুমামা, আর একজন দীপুমামা। ছোটমামা তাঁদের মণ্টু আর দীপু বলেই ডাকেন।

মণ্টুমামা বললেন, 'শিলিগুড়ি থেকে কাছেই, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের নীচে, তিস্তার ধারে আমাদের চেনাশোনা একজন নেপালী ভদ্রলোক আছেন। তাঁর বাড়িতে দু'একদিন বেড়াতে গেলে ভালো লাগবে।'

ছোটমামা বললেন, 'তুমি নওরং সিংয়ের কথা বলছো? তাকে তো আমি চিনি। তার একটা বড় ট্রাক আছে। সেই ট্রাকে করে রজনীগন্ধা ফুলের লাল লাল বীজ, নানারকম ক্যাকটাস আর অর্কিড কলকাতায় সাপ্লাই যায়। এই তো দুদিন আগেই তার বড় ছেলে ট্রাক ভর্তি মাল নিয়ে কলকাতায় গেল।'

মণ্টুমামা বললেন, 'তুমি তো সবাইকেই চিনবে। যাদেরই গাড়ি আছে, তাদের সকলেরই তোমার কাছে আসতে হয়। তবে সে আমাদের পুরনো চেনা বন্ধু।'

ছোটমামা একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, 'তোমরা এখানকার লোক, তোমাদের সঙ্গে তো নিশ্চয় পরিচয় থাকবে। লোকটি খুবই বড়লোক, কিন্তু একটুও অহঙ্কার নেই। আমাকে কয়েকবার তার তিস্তার ধারে বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছে।'

দীপুমামা বললেন, 'তা হলে চলো, সেখানে দু' একদিন বেড়িয়ে আসি। তোমার দিদি আর জামাইবাবুর ভালোই লাগবে। আর গোগোলের আশা করি ভালো লাগবে।'

মণ্টুমামা বললেন, 'নওরং সিংয়ের বাড়িতে একটা হরিণ আর একটা ময়ূর

আছে। আমি আর দীপু তিস্তায় মাছ ধরার জন্য ছিপ নিয়ে যাবো। আমরা গেলে, নওরং সিং খুব খুশি হবে।'

গোগোল তো এক পায়ে খাড়া। তৎক্ষণাৎ আলোচনা হয়ে গেল। ছোটমামীমা বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলেব নীচে, পাহাড় থেকে নেমে, তিস্তার ধারে মুম্‌নিকে নিয়ে যেতে পারবেন না। সেখানে গিয়ে মুম্‌নির শরীর খারাপ হয়ে পড়লে মুশকিল হয়ে যাবে। তাই ঠিক হলো, ছোটমামীমা মুম্‌নিকে নিয়ে বাড়িতেই থাকবেন। বাকি সবাই যাবে।

মণ্টুমামা বললেন, 'বৈকুণ্ঠপুরের রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকতে হলে পারমিশন দবকার। আমি আজই গিয়ে পারমিশন করিয়ে নিচ্ছি। কাল সকালেই আমরা বেবিয়ে পড়বো। ওহে পুলু, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তুমি অফিসে আজই গিয়ে অন্ততঃ দু'দিন ছুটির ব্যবস্থা করে ফেল।'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। পরের দিন সকাল সাতটায় মণ্টুমামা আর দীপুমামা একটা জীপ নিয়ে এসে হাজিব। গোগোলরাও তৈরি হয়ে ছিল। বেরিয়ে পড়তে দেরি হলো না। মণ্টুমামা নিজেই জীপের স্টিয়ারিংয়ে। গোগোলকে সঙ্গে নিয়ে দীপুমামাও সামনে বসলেন। কারণ জঙ্গলের ভিতবে পথ নাকি তাঁরই ঠিক চেনা আছে। মণ্টুমামা পথ ঠিক কবতে পাবেন না। আর জঙ্গলে একবাব পথ হারালে, কেবল গোলকধাঁধায় ঘুবে মরতে হয়। পিছনে বসলেন ছোটমামা, মা আর বাবা। পিছনে বসলেও, তাঁদেব বাইবের দৃশ্য দেখবাব কোনো অসুবিধে ছিল না। পিছন দিকটা খোলাই ছিল। শীতের হাওয়ার জন্য সামনের কাচ বন্ধ থাকলেও, সবকিছুই দেখা যায়।

জীপ প্রথমেই ছুটলো সেভক ব্রিজেব রাস্তাব দিকে। শহর ছাড়িয়ে যাবার পবেই, ডান দিকে জঙ্গল দেখা গেল। বাস্তা থেকে গাড়ি নিয়ে জঙ্গলে ঢোকবাব কোনো উপায় নেই। বড় বড় শালবল্লা দিয়ে শক্ত বেড়া কবা আছে। একমাত্র মানুষই তা ডিঙিয়ে ঢুকতে পারে। বনের শুকনো ডালপালা পাতা কুড়োবার জন্য গরিব মেয়ে আব ছোট মেয়েরা বেড়া ডিঙিয়ে কাছেপিঠেই ঘুরছিল। জঙ্গলের বাস্তাব ধাবে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল মিলিটারি ছোটখাটো ব্যারাক আর তাঁবু।

গোগোলের হিসাব নেই, কতো মাইল চলার পরে, মণ্টুমামা গাড়ির স্পীড কমিয়ে, রাস্তাব ডানদিকে ঘুরে গিয়ে থেমে গেলেন। যেখানে থামলেন, সেখানেই জঙ্গলে ঢোকবার গেট। চওড়া গেট, লরী ট্রাকও ঢুকতে পারে। দু'দিকে বড় বড় মোটা শালের জবরদস্ত খুঁটি। বলতে গেলে স্তম্ভ বিশেষ। দুই খুঁটির সঙ্গে মোটা আর ভারি লোহার রড। সেই রড আবার খুঁটির

গায়ের সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। আর সেই লোহার শিকলের সঙ্গে লাগানো আছে মস্ত বড় বড় তুটো তালা। খুলে না দিলে, কোনো গাড়ির পক্ষেই ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। লোহার রডে ধাক্কা খেয়েই গাড়ির মুখ ভেঙ্গে যাবে।

মন্টুমামা সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়েই নেমে গেলেন। গোগোল পিছন ফিরে দেখলো, রাস্তার ওপারে, ছোট সবুজ গেটওয়ালা একটা বাংলো বাড়ি, আর বাগান। দীপুমামা গোগোলকে বললেন, 'ওটা হলো ফরেস্ট অফিস। ওখানে ফরেস্ট অফিসার আর রেঞ্জার থাকেন। ফরেস্ট গার্ডরাও থাকে। মন্টু গিয়ে পারমিশনটা দেখালে, তবেই ফরেস্ট গার্ড চাবি নিয়ে এসে গেট খুলে দেবে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো 'যে কেউ চাইলেই কি পারমিশন পেতে পারে?'

দীপুমামা বললেন, 'তাই কখনও পায়? বনের ঠিকাদার যারা, মানে যারা গাছ কাটবার ইজারা নেয়, তাদের গাড়ি ঢুকতে পারে। শিকারী ছাড়া, এমনিতে আর কে বনে জঙ্গলে ঢুকবে? কিন্তু বন্দুক নিয়ে শিকারীদের এসব জঙ্গলে একদম ঢুকতে দেওয়া হয় না। কারণ পশু মারা একেবারে নিষেধ নেহাত মানুষখেকো বাঘ অথবা মানুষ মেরে ফেলেছে এমন কোনো হাতী ছাড়া, বনের মধ্যে কাবোকেই শিকার করতে দেওয়া হয় না। এমন কি, ঠিকাদারদের গাড়িও সার্চ করে দেখা হয়, কেউ লুকিয়ে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছে কিনা। বন্দুক দেখতে পেলে, তাদের জঙ্গলে ঢোকাই বন্ধ করে দেবে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আমাদের গাড়িও সার্চ করবে?'

দীপুমামা হেসে বললেন, 'না আমরা তো শিকার করতে বেরোইনি বন্দুকও নিইনি। তবুও সার্চ করার কথা। কিন্তু ফরেস্ট অফিসার আর রেঞ্জার আমাদের চেনা, ওঁরা জানেন, আমরা কখনো লুকিয়ে বন্দুক নিয়ে ঢুকবো না। আর তিস্তা নদীতে তুমি যতো খুশি মাছ ধর, কেউ কিছু বলবে না।'

গোগোলের মাছ ধরার কথা মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আর মন্টুমামা মাছ ধরবেন বলেছিলেন, আপনাদের ছিপ কোথায়?'

দীপুমামা জীপের মাথার ওপরে আঙুল তুলে দেখালেন। গোগোল দেখলো, তুটো ছিপ জীপের মাথায়, লোহার ফ্রেমে গোঁজা। তার শেষ দিক জীপের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, ও এতক্ষণ ছিপ তুটে লক্ষ্যই করেনি।

গোগোলের ছিপ দেখার অবসরেই মন্টুমামা এসে জীপে তাঁর জায়গায় বসলেন। একজন খাঁকি হাফ প্যান্ট আর খাঁকি রঙের ফুল হাতা মোটা উলের সোয়েটার গায়ে লোক গেটের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে তাব বড় লোহার আংটায় ঝোলানো চাবির ছড়া। সে গেটের কাছে গিয়ে, লোহাব রডের সঙ্গে শিকলে বাঁধা তালা দুটো খুলে দিল। তারপরে লোহাব বড দুটো ঠেলে দিতেই সরে গেল, আর গেট খুলে গেল।

মন্টুমামা গাড়ি স্টার্ট দিয়েই রেখেছিলেন। গেট খোলা মাত্র স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে জঙ্গলের ভিতবে ঢুকে গেলেন। সামনে শক্ত মাটির রাস্তা একটু চওড়া। গাছও কম। বড় বড় শাল সেগুন অর্জুনের ফাঁকে ফাঁকে বোদ এসে পড়েছে। কিন্তু মাটির রাস্তাটা এখনও শিশিবে ভেজা। জীপ যতোই এগিয়ে চললো, জঙ্গল ততোই গভীর হতে লাগলো। সকালেব বোদ আব তেমন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কোনো ফাঁকে একটু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। তাবপরেই যেন সন্ধ্যাবেলার মতো ঘন ছায়ায় নিবিড় হয়ে আসছে। আব জীপেব শব্দ ছাপিয়ে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। বনেব গভীরে ঢুকে, বাস্তা অনেকটা সরু হয়ে এসেছে, আব দু' একটা নতুন পথও দেখা যাচ্ছে। দীপুমামা ডিরেকশন দিচ্ছেন কোন্ পথে যেতে হবে। মন্টুমামা সেই মতো চালিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এক একটা পথ এতো সরু, তার ভিতব দিয়ে জীপ যাবাব যেন কোন উপায়ই নেই। কিন্তু দীপুমামার নির্দেশ মতো মন্টুমামা সে-পথেই ঠিক গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছেন। শিশিরে ভেজা গাছেব পাতার ঝাপটা লাগছে সামনেব কাচে। বৃষ্টিব ছাট লাগার মতো ভিজে যাচ্ছে। এমন কি ছোট ডালপালাব ঝাপটায়, গোগোলদেব গায়েও শিশিরের ফোঁটা বৃষ্টির মতো লাগছে। আব বিরাট বিরাট মাকড়সাব জাল ঝুলছে সামনে, জীপের কাচেব গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে যে এতো মাকড়সার জাল হয়, গোগোল কখনও দেখেনি।

গোগোলের কৌতূহল আসলে অন্যদিকে। বনের ঘাসে পাশেব ঘুপসি ঝাড়ের অন্ধকাবে বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে দেখছে। যদি কোনো পশু হঠাৎ সামনে এসে পড়ে বা দেখতে পাওয়া যায়। ও যখন এরকম দেখছে, তখন হঠাৎ কঁক্কঁক্ শব্দে গাছের ডালে পাতায় ঝাপটা দিয়ে কী যেন একটা উড়ে গেল। গোগোল চমকে উঠে দীপুমামার কোলের ওপব হাত রাখলো। দীপুমামা হেসে বললেন, 'ভয় নেই, ওটা একটা বনমোরগ, আমাদের জীপের শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে পালালো।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে গেল। হলংয়ে ও চোখের সামনেই এরকম বন

মোরগকে এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে পালাতে দেখেছে। তবু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এ সময়ে কোনো পশু দেখা যায় না?'

দীপুমামা বললেন, 'দেখা যেতেও পারে, ঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে দিনের বেলায় বেশীর ভাগ পশুরাই তাদের বিশেষ বিশেষ জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তাছাড়া, আমাদের জীপের শব্দ তারা অনেক দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছে, আর সাবধান হয়ে অন্যদিকে পালিয়ে যাচ্ছে। তবু হয়তো এখনই তোমার চোখের সামনে বুনো হাতীর দল এসে পড়তে পারে।'

গোগোলের মনে উত্তেজনা বাড়লো। ওর চোখ দুটো আরও বড় আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, 'যদি সত্যি এসে পড়ে, তাহলে কী হবে?'

দীপুমামা হেসে বললেন, 'কি আর হবে? সবটাই হাতীর মেজাজ-মর্জি। তাদের যদি সন্দেহ হয়, আমরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে এসেছি, তাহলে তেড়ে আসতে পারে। এলে খুবই বিপদের কথা। তবে হাতী সব বোঝে। নেহাত পাগলা না হলে, তারা আস্তে আস্তে সরে যায়।'

পিছন থেকে ছোটমামা বলে উঠলেন, 'দোহাই ভাই দীপু, তোমার ওসব গল্প থামাও। সত্যি যদি হাতীর দল সামনে পড়ে, তাহলে আমি গেছি!'

মন্টুমামা এবং সবাই হেসে উঠলেন। মা বললেন, 'সত্যি, বড় ভয়ের কথা।'

দীপুমামা বললেন, 'তাহলে দিদি আপনি মনে মনে গণেশ গণেশ জপ করতে থাকুন। এখানকার লোকেরা জঙ্গলে হাতী দেখলেই গণেশের নাম নেয়।'

এ সময়ে জীপ একটা জলার কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হচ্ছিল। এরকম আরও দু'তিনটি জলার সাঁকো আগেই পেরিয়ে আসা হয়েছে। সাঁকোটা পেরিয়েই মন্টুমামা জীপ থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'দেখ গোগোল, জলার পাশের ভেজা মাটিতে বেশ কয়েকটা হাতীর পায়ের ছাপ রয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তারা একটু আগেই এখান দিয়ে ডান দিকের জঙ্গলে চলে গেছে।'

গোগোল দীপুমামার কোলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখলো, ভেজা মাটিতে হাতীর পায়ের ছাপ। মা আর বাবাও পিছন থেকে মুখ বের করে দেখলেন। কেবল ছোটমামা বললেন, 'দাঁড়াবার দরকার কী? চালিয়ে চলো। কিছুই বলা যায় না। গণেশের দল হয়তো আশেপাশেই রয়েছে।'

আবার সবাই হেসে উঠলেন। ছোটমামার ভয় দেখে গোগোলও মনে

মনে হাসল। মন্টুমামা জীপ চালিয়ে দিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক, কিংবা কিছু বেশী সময়ের পর জীপটা এসে দাঁড়ালো বেশ একটা উঁচু জায়গায়। আশেপাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা। তিন দিক ঘিরে আছে জঙ্গল। আর একদিকে দেখা গেল, দূরে নীচে তিস্তা নদী। নদীর বিশাল লম্বা তীরে ফসলের মাঠ। দু' একটা কাঠের বাড়ির উঁচু মাথা উঁকি দিয়ে আছে। তিস্তার ওপারেও জঙ্গল, আর পাহাড়।

মন্টুমামা বললেন, 'এখানেই আমাদের নামতে হবে।'

দীপুমামা গোগোলকে নিয়ে নেমে পড়লেন। গাড়ির ভিতরের থেকে বাইরে শীত আর ভেজা ভাবটা বেশী। দীপুমামা পিছন দিকে গিয়ে, জীপের গোড়ানো পাদানীটার ছিটকিনি খুলে নামিয়ে দিলেন। মা, বাবা আর ছোটমামা নেমে এলেন। ছোটমামা বললেন, 'গাড়ি এখানেই থাকবে? কেউ নিয়ে যাবে না?'

মন্টুমামা বললেন, 'আজ পর্যন্ত যতোবার এসেছি, গাড়ি এখানেই থেকেছে। কেউ নেয়নি। তাছাড়া গাড়ি তো আর যাবে না। এবার আমাদের নীচে নামতে হবে।'

দীপুমামা ইতিমধ্যে জীপের মাথায় গোঁজা ছিপ দু'টো টেনে নামালেন। সব মিলিয়ে দু' তিনটি ব্যাগে সকলের জামাকাপড় ছিল। মন্টুমামা দু'টো ব্যাগ হাতে নিলেন। ছোটমামা নিলেন একটা। দীপুমামা বললেন, 'পুলু, তুমি দিদি আর সমীরেশদার সঙ্গে আমাদের পেছনে-পেছনে এসো।' তিনি গোগোলের একটা হাত চেপে ধরলেন।

খানিকটা এগিয়েই দেখা গেল, শুকনো ঝর্ণার মতো একটা পথ নীচে নেমে গিয়েছে। বড় বড় পাথরের চাংড়া আর চাঁই, কাঁকর আর ভেজা মাটির সরু পথ। দু' পাশে জঙ্গল। মন্টুমামা আগেই বললেন, 'সবাই সাবধানে এসো। পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বা পা পিছলে পড়ে যেও না।'

কথাটা ঠিকই। দেখলে মনে হয়, এক দৌড়েই নেমে যাওয়া যায়। তা মোটেই নয়। রীতিমতো সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। মা বাবা ছোটমামার সঙ্গে গোগোলও কয়েকবার হোঁচট খেলো। বলতে গেলে বেশ উঁচু পাহাড়ি টিলা থেকে নেমে, সমতলে এসে দাঁড়াতেই দেখা গেল, পথ মোটেই সোজা নয়। বেশ আঁকাবাঁকা, কাদামাটি, আর ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সরু আলপথ চলে গিয়েছে। শুধু তাই নয়। মাঝে পড়লো দু'টো ছোট খাল। তিস্তার জল এইসব খালের ভিতর দিয়ে এসেছে। তার ওপর সাঁকো বলতে লম্বা

চওড়া একটা শাল কাঠ। দু'পাশে ধরবার কিছু নেই। মা তো প্রথমেই বলে বসলেন, 'আমি এর ওপর দিয়ে পার হতে পারবো না। জলে পড়ে যাবো।'

বাবা বললেন, 'তুমি স্যাণ্ডেল খুলে হাতে নাও, আর আমার হাত ধর। পেছনে পেছনে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে এসো, ঠিক পার হয়ে যাবো।'

মা খুব ভরসা না পেলেও তাই করলেন। বাবা মাকে ঠিক পার করে নিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস গোগোল ক্যাম্বিসের জুতো পরে এসেছিল। ও দীপুমামার আগে আগে, ব্যালান্স রেখে ঠিক পার হয়ে গেল। ছোটমামা তো একেবারে নীচু হয়ে, শাল কাঠে হাত দিয়ে পার হলেন। যাকে বলে চার হাত পা দিয়ে। তা দেখেও সকলেই হেসে উঠলেন। ছোটমামা বললেন, 'এখন সবাই খুব হাসছো। আর যদি জলে পড়ে যেতাম? কে জানতো নওরং সিংয়ের বাড়িতে আসতে হলে এত ঝামেলা পোহাতে হবে। মমতা আর মুমুনি এলে আমাকে ফিরেই যেতে হতো।'

মন্টুমামা বললেন, 'যাক, এসে যখন পড়েছো, তখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। এখন আমরা নিরাপদ।'

গোগোলের চোখে প্রথমেই পড়লো একটি চালা ঘর। ঘরের দরজার কাছে, রোদে বসে এক বৃদ্ধ হুঁকো টানছে। কাছেই বাঁধা রয়েছে একটি মহিষ। সে তার খাবার খেতে খেতে গোগোলদের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করলো। বৃদ্ধও ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু কোনো কথা বললো না। গোগোলরা চালাবাড়িটা পেরোতেই, বড় বড় ঘাসের মতো কিছু জঙ্গলের ফাঁকে, প্রায় ওরই বয়সী একটি ছেলেকে দেখা গেল। হাফ প্যাণ্টের ওপর, ওর মাপের থেকে বড় একটা গরম ফুল হাতা ছাই রঙের সোয়েটার। মাথার চুল রুখু। কালো ঝকঝকে অবাক চোখে গোগোলদের দেখছিল। তারপরেই হঠাৎ পিছন ফিরে দৌড় লাগালো।

মন্টুমামা বললেন, 'নওরং সিংয়ের ছোট ছেলে লিম্বু।'

গোগোলের চোখে পড়েছে তখন, সামান্য দূরে, ডান দিকে উঁচু একটা কাঠের বাড়ি। মাথার ওপরে কালো রঙ করা টিনের চালা। মাথার ওপরে একটা ত্রিশূল। ওরা আরও কয়েক পা এগোতেই, বেশ লম্বা চওড়া একজন ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন। বয়সটা তাঁর মন্টুমামাদের থেকে একটু বড় হতে পারে। কোঁচকানো, প্রায় ময়লা এক চোস্ত পায়জামা, আর গায়ে কোটের ভিতর গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। মাথায় নেপালী টুপি। তাঁর চোখ নাক মুখ

দেখলেও সেইরকমই মনে হয়। গোগোলদের দেখে তাঁর মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠলো। আর মন্টুমামার হাত চেপে ধরে বেশ পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, 'আরে মন্টু ভাই, তুমি? এস এস। এস দীপু ভাই।'

মন্টুমামা বললেন, 'বাকিদের তুমি বোধহয় চিনতে পারছো না নওরংদাদা। ইনি—।'

মন্টুমামার কথা শেষ হবার আগেই, নওরং সিং ছোটমামার দিকে এগিয়ে, কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'ব্যানার্জি সাহেব এসেছেন? আমার বহুত ভাগ্য। বড় খুশি লাগছে।'

ছোটমামা নমস্কার করেও হাত বাড়িয়ে নওরং সিংয়ের হাত ধরলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এসেই পড়লাম। ইনি আমার দিদি, আর জামাইবাবু সমীরেশদা।'

নওরং সিং যেন ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে, কপালে বারবার হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'ও হো হো, সত্যি আমার বড় ভাগ্য। আসুন আসুন।'

দীপুমামা বললেন, 'আর এই হলো গোগোল, দিদির ছেলে।'

নওরং সিং দু'হাতে গোগোলকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এস বাবা, এস।' বলে জড়িয়ে ধরেই বাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে, বোধহয় নেপালী ভাষায় কিছু চিৎকার করে বললেন।

গোগোলরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। দোতলা কাঠের বাড়ি, মোটা শালের খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি সামনেই। পিছনেও মাটির দেওয়াল আর ঘাসের চালার ঘর রয়েছে। সেদিক থেকেই দু'জন মহিলা এসে দাঁড়ালেন। একজন মায়ের থেকে কিছু বড়। আর একজনের বয়স সতের আঠারোর বেশী নয়। নওরং সিং ছোটমামা, বাবা আর মায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজন লিম্বুর মা, আর একজন তার বউদি। লিম্বুর দাদা ট্রাকে মাল নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে, সে-কথাও নওরং সিং জানিয়ে দিলেন। তারপরেই মহিলাদের নেপালী ভাষায় কিছু বলে, সবাইকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন।

বেশ বড় মাথা ঢাকা লম্বা চওড়া বারান্দা। সেখানে দু'টো চেয়ার। একটা আরাম কেদারা। তিন দিকই খোলা। জঙ্গল, নদী, দূরের ক্ষেত-খামার আর দু'তিনটি মাত্র বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ঢাকা বারান্দা না বলে, এটাকে প্রায় ঘরই বলা চলে। বারান্দা থেকে ভিতরে যাবার একটা দরজা। মাঝখানে করিডর। দু'পাশে ঘর রয়েছে। নওরং সিং ব্যস্ত হয়ে সেই দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কয়েকটা হরিণের চামড়া নিয়ে। তার মধ্যে একটা গুলবাঘের চামড়াও

রয়েছে। তিনি সেগুলো কাঠের মেঝেয়, চেয়ারে, সব জায়গায় পেতে দিতে দিতে বললেন, 'আমাদের তো ভালো গদী নেই, এসব আছে।'

বাবা বললেন, 'এর থেকে সুন্দর আর কী আছে? কিন্তু আপনি এত ব্যস্ত হবেন না।'

নওরং সিং বললেন, 'ব্যস্ত আবার কি ব্যানার্জি সাহেব। আপনারা এসেছেন, আজ আমার কত খুশির দিন।'

গোগোল কখনো এরকম হরিণের চামড়ায় বসেনি। ও চামড়ার ওপর বসে একবার গড়িয়েও নিল। আর হাত দিয়ে চামড়ায় বুলিয়ে দেখলো। বাকিরা সবাই বসে পড়লেন। মা একটা চামড়া ঢাকা চেয়ারে বসলেন, বললেন, 'আসতে একটু যা কষ্ট, কিন্তু এসে এখন খুবই ভালো লাগছে। তাই না পুলু?'

ছোটমামা বললেন, 'সত্যি। চারদিকটা কী সুন্দর। গোগোল, ঐ ছ্যাখ, সেভকেব কাছে তিস্তাব ওপর দিয়ে বেলগাড়ি যাচ্ছে।'

গোগোল দেখে বললো, 'আশ্চর্য, এখান থেকে এতো দূরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে? সেভক ব্রিজটা দেখছি না তো?'

ছোটমামা বললেন, 'ওটা আর একটু ওপরে, ডান দিকে ঢাকা পড়ে গেছে।'

এইসব কথাবার্তাব মধ্যেই লিম্বুর মা আব বউদি খাবার নিয়ে এলেন। দুধ, এক ধরনের ছোট আব গোল মচমচে মুড়ি। বাড়ির তৈরি দুধেব মিষ্টি ক্ষীর। তারপরেই ডিম ভাজা আর চা। মণ্টুমামা বললেন, 'নওরংদাদা, তুমি কি সকালেই আমাদের সব খাইয়ে দেবে নাকি?'

নওরং সিং হেসে বললেন, 'মণ্টু ভাই, গরিব হতে পারি, তা বলে সকালেই সব খাইয়ে দেব কেন? এখন তোমবা সাত দিন থাকবে। যা পারি তাই খাওয়াবো।'

ছোটমামা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সাত দিন! সর্বনাশ। চাকরি চলে যাবে।'

সবাই হেসে উঠলেন। গোগোল তখন বড়োদের কাছ থেকে সরে যাবার কথা ভাবছে। কোনোরকমে খেয়ে নিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো, 'লিম্বু কোথায়? আমি হরিণ আর ময়ূর দেখবো।'

নওরং সিং বললেন, 'তুমি নীচে গেলেই লিম্বুর দেখা পেয়ে যাবে। ও তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। তবে নদীর দিকে একদম যাবে না। বলে নিজেই চিৎকার করে করে লিম্বুর নাম ধরে কিছু বললেন।

সিঁড়ির নীচে থেকেই লিম্‌বুর গলা শোনা গেল। ও কিছু বললো। গোগোল এক লাফে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলো। দেখলো, লিম্‌বু ওর হাত থেকে ছোট দানা কিছু ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর ওর পায়ের কাছে এক পাল মুরগীর খুদে বাচ্চা খুঁটে খুঁটে সেগুলো খাচ্ছে। বাচ্চাদের দু'টো মাও কাছে কাছে রয়েছে। গোগোল নেমে এসে, দু'জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, দু'জনে হাসলো। গোগোল বললো, 'আমার নাম গোগোল।

লিম্‌বু নিজের বুকে হাত দিয়ে কেবল বললো, 'লিম্‌বু।'

গোগোল বললো, 'চলো হরিণ আর ময়ূর দেখবো।'

লিম্‌বু মাথা ঝাঁকিয়ে, পিছনের মাটির ঘরের দিকে গেল। গোগোল তার সঙ্গে যেতে গিয়ে দেখলো, ডান দিকে আর একটা সিঁড়ি রয়েছে। এই সিঁড়ি দিয়ে পিছনে নামা যায়। মাটির ঘরটা আসলে রান্না ঘর। সেখানে লিম্‌বুর মা আর বউদি খুবই ব্যস্ত। আর একজন কাজের মেয়ে তাদের সঙ্গে রয়েছে। রান্না ঘরের পাশ দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিতেই দেখা গেল, শাল কাঠের কয়েক ফুট উঁচু বেড়ার মধ্যে রয়েছে একটা হরিণ। খুব বড় নয়। পিঠের দিকের রঙ গাঢ়, আর পেটের দিকটা হালকা বাদামী। মাথার ওপরে দুদিকে দুটো 'দ'-এর মতো শিং গজিয়েছে।

গোগোল কাছে যেতেই সে সরে গেল। লিম্‌বু কাছের একটা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে সামনে ধরতেই, হরিণটা এগিয়ে এসে মুখের ভিতর নিয়ে নিল। লিম্‌বু তার কপালে হাত বুলিয়ে কিছু বললো। আর একটা পাতা ছিঁড়ে গোগোলের হাতে দিল। হরিণটা সেই পাতা মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিল। তার মানে গোগোলের সঙ্গেও হরিণটার ভাব হয়ে গেল। কিন্তু কপালে হাত ঠেকাতে যেতেই সে সরে গেল। লিম্‌বু হেসে বললো, 'দু' এক দিন দেখলে, তখন নিজেই কাছে আসবে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'ময়ূরটা কোথায় আছে?'

লিম্‌বু কাঠের বাড়ির চালা থেকে বেরিয়ে আসা, একটা শাল কাঠের ওপর হাত তুলে দেখালো। গোগোল মাথা তুলে দেখলো, ময়ূরটা সেখানে বসে আরাম করে রোদ পোহাচ্ছে। ময়ূর যে ওপরে উঠতে পারে, গোগোল তা জানে। ময়ূরটা এখনও ছোট। তার ল্যাজ এখনও বড় হয়ে ঝুলে পড়েনি। কিন্তু মাথার ঝুঁটি দেখা যাচ্ছে।

একটু পরেই বড়োরা সবাই নেমে এলেন। মন্টুমামা আর দীপুমামার হাতে দুজনের দুটো ছিপ। হুইলের সঙ্গে সুতো আর বঁড়শি জড়ানো। মা আগেই গেলেন রান্না ঘরের দিকে। ভিতরে ঢুকে লিম্‌বুর মা বউদির সঙ্গে

কী সব কথাবার্তা বললেন। তারপরে সকলেই চললেন তিস্তার ধারে।

দু'পাশে চাষ-আবাদের মাঠ। মাঝখানের আলপথ দিয়ে কিছুটা গিয়ে, প্রথমেই নীচের দিকে নামতে হলো। তিস্তার নয়ানজুলির স্রোত চলেছে। চওড়া প্রায় খালের মতো। জল খুবই কম। তবু মণ্টুমামা গোগোলের হাত ধরলেন। এখন সকলেরই খালি পা। নয়ানজুলি পার হয়েই বিরাট চওড়া বালির চর। এখানে ওখানে পড়ে আছে বড় বড় পাথরের বোল্ডার। মণ্টুমামা বললেন, 'বর্ষাকালে এসব জায়গা জলে ভেসে যায়, আর তাতেই পাথর গড়িয়ে আসে।'

নদীর একেবারে ধারে গিয়ে দেখা গেল, পাড় জুড়ে বড় বড় পাথর। সে-সব পিছল পাথরে পা দিলেই হড়কে পড়ে যাবার ভয়। আর একবার পড়ে গেলে, তিস্তার স্রোত টেনে নিয়ে যাবে।

মণ্টুমামা হুইলের নাইলনের সুতো আর বঁড়শি খুললেন। সুতোর আংটায় তিন চারটে বড় আর চওড়া বঁড়শি। সবগুলোই রঙীন। এগুলো নাকি জাপানি বঁড়শি। এতে টোপ দিতে হয় না। বিশাল বিশাল মহাশোল মাছ নাকি রঙ বেরঙের বঁড়শিকেই টোপ ভেবে গিলে নেয়, আর বিঁধে যায়। মণ্টুমামা আর দীপুমামা অনেক দূরের জলে বড়শি ছুঁড়ে ফেললেন। হুইল থেকে সুতো হুড়হুড় করে বেরিয়ে যেতে লাগলো। টেনে নিতে লাগলো স্রোতের সঙ্গে। মণ্টুমামা আর দীপুমামাও সেই সঙ্গে চলতে লাগলেন।

গোগোল আর লিম্বু তীক্ষ্ণ চোখে সুতোর দিকে তাকিয়ে রইলো। বাবা মা ছোটমামা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলেন। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেও, কয়েকবার সুতো গুটিয়ে বঁড়শি ছুঁড়ে, কেউ একটা মাছও তুলতে পারলেন না। ছোটমামা ঠাট্টা করে বললেন, 'বুঝেছি, তোমাদের ভরসায় থাকলে আমাদের আর মাছ পাওয়া হবে না।'

সত্যি সত্যি মাছ পাওয়া গেল না। নওরং সিং ফিরে যাবার জন্য তাড়া দিলেন। আর তিস্তার দক্ষিণের বাঁকে দূরে হাত দেখিয়ে লিম্বু গোগোলকে বলল, 'ওদিকে আছে চুমুকডাঙি।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'চুমুকডাঙিটা কী?'

লিম্বু বললো, 'জঙ্গলের জানোয়াররা ওখানে বিকালে জল খেতে নামে।'

গোগোলের জায়গার নামটা বেশ সুন্দর লাগলো। ফিরে এসে স্নান করে ডাল, ভাজা, মুরগীর মাংস, গরম ভাত আর মিষ্টি খেয়ে বেশ একটা ঘুম দেওয়া গেল। গোগোল অবশ্য গোটা দুপুর লিম্বুর সঙ্গে আশেপাশে ঘুরে বেড়ালো।

বিকালে আবার মাছ ধরতে যাওয়া হলো। কিন্তু মাছ একটাও ধরা পড়লো না।

রাত্রে খাওয়ার পরে, গোগোল একটা ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে তিনটি খাটিয়ার ওপর নরম বিছানায় মা বাবা আর ও শুয়েছিল। কতো রাত হয়েছিল, ওর কোনো ধারণা নেই। হঠাৎ অদ্ভুত সব শব্দ কানে আসতেই, ওর ঘুম ভেঙে গেল। দেখলো ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু বাবা মা নেই। ও তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে, খোলা দরজার কাছে এসে দেখলো, সবাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে আলোও রয়েছে।

গোগোল শুনতে পেলো, দূরে কোথায় টিন পেটাবার শব্দ হচ্ছে। সেই সঙ্গে দূর থেকে ভেসে আসা অনেক লোকের চিৎকার। ও বারান্দায় এসে দেখলো, সকলেই পশ্চিমেব দিকে তাকিয়ে আছে। গোগোল দেখলো, সেদিকে, অনেকটা দূরে, ছোট ছোট মশাল জ্বলছে। আকাশটা একটু লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে পটকা ফাটাবার শব্দও ভেসে আসছে।

নওরং সিং বললেন, 'বাঘ পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম, মহানন্দা স্যাংচুয়ারির দিকে একটা পাগলা হাতী ঘুরে বেড়াচ্ছে। দার্জিলিংয়ের রেল লাইনের ধারে, গ্যাংম্যানদের নাকি কয়েকবার তাড়াও করেছে। সেই হাতীটাই এল কিনা, কে জানে?'

মন্টুমামা বললেন, 'কিন্তু মহানন্দা স্যাংচুয়ারি থেকে এদিকে হাতীটা আসবে কী করে?'

নওরং সিং হেসে বললেন, 'কী বলছ মন্টু ভাই। হাতী রাত্রে শহরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে আসতে পারে। কোথাও দিয়ে ঘুরে চলে আসতে পারে। যেদিকে গোলমালটা হচ্ছে, তার ঠিক ওপরেই এ জঙ্গলের হাতীদেব ডেরা। তাদের তাড়া খেয়েও নেমে আসতে পারে।'

ছোটমামা বললেন, 'এদিকে আসবে না তো?'

নওরং সিং বললেন, 'এলেই বা কী হবে। আমার ঘরে তিনটে বন্দুক আছে। আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।'

এই সব কথার ফাঁকেই, দূরের টিন পেটানো চিৎকার থেমে এলো। মশালগুলোও একে একে নিভে যেতে লাগলো। আকাশের লাল রঙও কালো হতে লাগলো। নওরং সিং বললেন, যে-ই আসুক, বোধ হয় পালিয়েছে। কাল সকালে সব জানা যাবে। চলুন, এখন শুয়ে পড়া যাক। কোনো ভয় নেই, আমি একটা বন্দুকে গুলি ভরে কাছে নিয়ে এ বারান্দাতেই শুচ্ছি।'

মণ্টুমামা বললেন, 'নওরংদাদা, আমিও তোমার সঙ্গেই শোব।'

নওরং সিং বললেন, 'বেশ তো, শোও না। তুমিও তো একজন শিকারী।'

কথাটা মিথ্যে নয়। মণ্টুমামা আগে অনেক শিকার করেছেন। তার মধ্যে বাঘ আর অজগরই বেশী। হাতী শিকার কখনও করেননি।

গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে শুতে চলে গেল। আবার সব নিঝুম হয়ে গেল। বাইরে কেবল ঝিঁঝিঁর ডাক। গোগোল চোখ বুজে শুলেও, ওর সহজে ঘুম এলো না। একদম জঙ্গলের নীচে, নদীর ধারে কখনও থাকে নি। কতোক্ষণ পরে, খেয়াল নেই, আবার ওর ঘুম ভেঙে গেল। এবার অন্য দিক থেকে যেন দু একটা দুমদাম শব্দ ওর কানে এলো। অবশ্য শব্দটা এলো যেন খুবই দূর থেকে। ও চোখ তাকিয়ে দেখলো, বাবা মা ঘুমোচ্ছেন। বাইরেও কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বহুদূরের কয়েকটা শব্দ পটকার হতে পারে। কিন্তু শব্দটা একেবারে অন্যদিক থেকে আসছে। গোগোলের মনে হলো, সেই চুমুকডাঙির দিক থেকে।

কয়েকটা শব্দের পর আর কিছুই শোনা গেল না। গোগোল ভাবলো, ঘুমের ঘোরে ভুলও শুনতে পারে। কারণ, সবাই ঘুমোচ্ছেন। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। ও আবার চোখ বুজলো

সকালবেলাই দেখা গেল, নওরং সিংয়ের বাড়ির সামনে কিছু লোকজন এসে দাঁড়িয়েছে। নওরং সিং, মণ্টুমামা, দীপুমামা সবাই তাদের কথা শুনছেন। গোগোল নীচে নেমে লিম্বুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। লিম্বু বললো, 'বাবা ঠিকই বলেছে। একটা হাতী কাল রাত্রে পশ্চিমের ধারে নেমেছিল। সে কারোকে মারেনি, ঘরও ভাঙেনি। কেবল ক্ষেতের ধান খেয়েছে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'লোকেরা টের পেলো কী করে?'

লিম্বু বললো, 'কী করে আবার? কুকুর ডেকে উঠেছিল। গরু মোষেরাও ভয় পেয়ে দাপাদাপি করেছে, তাতেই লোক জেগে গেছল।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'হাতীটা কি পাগলা?'

লিম্বু বললো, 'হতেও পারে। আবার দল ছাড়া হয়ে একলা ঘুরে বেড়াতে পারে। ওদের নিজেদের আলাদা আলাদা দল থাকে।'

গোগোল গতরাত্রে যে দুমদাম শব্দ শুনেছিল, লিম্বুকে সে-কথা বললো। লিম্বু বললো, 'হতে পারে। হাতীটা হয়তো তাড়া খেয়ে চুমুকডাঙির দিকে পালিয়েছিল। সেখানেও লোকে মশাল জ্বালিয়ে টিন পিটিয়ে, পটকা

ফাটিয়ে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু কেউ তো শুনতে পায়নি?'

গোগোল বললো, 'আমি যেন শুনেছিলাম।'

লিম্বু হেসে বললো, 'চল, আমরা দু'জনে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'তোমাদেব গাড়ি যেখানে আছে, সেখান থেকে ঘুরে আসব।'

গোগোলের খুবই ইচ্ছে হলো। কিন্তু বড়োবা জানতে পারলে কিছুতেই যেতে দেবে না। লিম্বু বললো, 'চল, কেউ বুঝতে পারবে না। আমরা ক্ষেতের মধ্যে ঘুবতে ঘুবতে চলে যাব।'

সকালের জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গোগোল দেখলো, সবাই গতকালের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে। ও লিম্বুর সঙ্গে বড় বড় ঘাসের মতো ফসলের মাঠের ভিতব দিয়ে আড়ালে চলে গেল। লিম্বু ওব হাত ধরলো। গোগোলবা যে-পথে গতকাল নেমে এসেছিল, সেই পথেই ওরা এগিয়ে চললো। লিম্বু এমন জায়গা দিয়ে নিয়ে এলো, সেই শুকনো ঝর্ণার চড়াই পথটা আসতে অল্প সময় লাগলো। দু'জনে হাত ধরাধরি করে ওপরে উঠে দেখলো, মণ্টুমামার জীপটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোগোল বললো, 'জীপটা চালাতে জানলে বেশ হতো, ঘুরে বেড়িয়ে আসতাম।'

লিম্বু হেসে বললো, 'বড় হলে জীপ চালাবে। চল, আমবা চুমুকডাঙির দিক থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'বেশী দেরী হবে না তো?'

'কেন দেবী হবে? 'আমরা ছুটে যাব, ছুটে চলে আসব। তুমি তো বলছিলে রাত্রে ওদিক থেকে পটকার আওয়াজ পেয়েছিলে।'

গোগোল বললো, 'তা শুনেছিলাম।'

লিম্বু বললো, 'তা হলে চল একবার ঘুরে আসি। বেশী দেরী হবে না।'

দেরী হলে খোঁজাখুঁজি পড়ে যাবে, গোগোলেব সে-ভয় আছে। তবু জঙ্গলে বেড়াবার লোভ সামলাতে পারলো না। বললো, 'চলো।'

লিম্বু গোগোলের হাত ধরে, সোজা খানিকটা গিয়ে, বা দিকে চললো। বাঁ দিকে রাস্তা বলতে কিছুই নেই। অনেকটা পায়ে চলা বাস্তাব মতো। দু'পাশে বড় বড় গাছ আর ঘন জঙ্গল। দু'হাত দিয়ে জঙ্গলের ডালপালা সরিয়ে চলতে হচ্ছে। তার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, নানা রকম ছোট পাখি এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে উড়ে যাচ্ছে। লিম্বু বললো, 'গুল্‌তিটা নিয়ে এলে ভাল হত।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কী করতে ?'

লিম্বু বললো, 'পাখি শিকার করতাম।'

গোগোল বললো, 'ছোট পাখিদের মারা ভালো নয়।'

লিম্বু হাসলো। কিছুদূরে যাবার পরেই, গোগোল থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। লিম্বুও দাঁড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো, 'কী হল ?'

গোগোল হাত তুলে, একটু দূরেই দেখালো। দেখা গেল, আশেপাশে বড় বড় গাছের মাঝখানে ঘাস ঝোপের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ে আছে বিরাট একটা হাতী। দু'টো লোক রয়েছে সেখানে। হাতীটার গায়ের ওপর পড়ে আছে একটা বিরাট দাঁত। আর একটা দাঁত একজন, হাতীর মুখটা কেমন করে যেন ফাঁক করে, করাত দিয়ে কাটছে। আর একজন হাতীর একটা পা হাঁটুর সামনে থেকে ধারালো বড় কুকরির মতো কিছু দিয়ে কোপাচ্ছে।

লোক দু'টোরই গায়ে কালো প্যান্ট আর জামা। মাথায় কালো টুপি। লিম্বু বলে উঠলো, 'এরা চোরা হাতী শিকারী।'

লিম্বুর গলা শুনতে পেয়েই লোক দু'টো মুখ তুললো। গোগোলের মনে হলো, লোক দু'টো যেন মানুষ নয়, কোনো বন্য প্রাণী। ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়েই, একজন করাত ফেলে হাতে বন্দুক তুলে নিল। আর একজন তার হাতের কুকরিটাই ওদের দিকে ছুঁড়ে মারলো। কিন্তু কুকরিটা ওদের গায়ে না লেগে, গা ঘেঁষে চলে গেল।

লিম্বু গোগোলের হাত ধরে চোঁ চোঁ দৌড় লাগালো, বললো, 'গোগোল, জলদি পালাও, এরা আমাদের ধরতে পারলে মেরে ফেলবে।'

গোগোলও সেটা বুঝেছিল, লোকটার বন্দুক হাতে নেওয়া দেখেই। লিম্বু আরও প্রাণপণে, নানাদিকে এঁকে বেঁকে দৌড়ুতে লাগলো। পিছনে পিছনে ভারী পায়ের ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছিল শুকনো পাতার ওপর। কিন্তু লিম্বু এমনভাবে ডাইনে বাঁয়ে, এঁকে বেঁকে, ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগলো, লোক দু'টোর পায়ের শব্দ ক্রমেই অন্যদিকে চলে যেতে লাগলো। তারপরে একেবারে থেমেই গেল।

লিম্বু তবু থামলো না। ও গোগোলের হাত ধরে ছুটতে লাগলো। ওরা যে কোন্‌দিকে ছুটছে, তার কোন ঠিক নেই। গোগোল কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। লিম্বু কেবল বললো, 'একদম থেম না। আমরা ঠিক এক জায়গায় পৌঁছে যাব।'

গোগোল ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়ছিল। গায়ে মোটা সোয়েটার।

ঘেমে উঠছিল। তবু থামছিল না। এভাবে কতোক্ষণ যে ছুটেছে, তার কোনো হিসেব নেই। হঠাৎ ওর কানে গাড়ির শব্দ এলো। ও অবাক হয়ে দেখলো, জঙ্গলে ঢোকবার সময়ে যে-গেট দিয়ে ওরা ঢুকেছিল, সেই গেটটার সামনে এসে পড়েছে। রাস্তাব ওপব দিয়ে গাড়ি চলেছে। রাস্তার ওপারেই সেই বাংলো।

লিম্‌বু বললো, 'আমরা একেবারে উল্টো দিকে চলে এসেছি। চল, আমরা বাংলোয় গিয়ে খবব দিই, দু'টো লোক চুরি করে হাতী শিকার করেছে।'

গোগোল এখন আব বাবা মায়েব কথা তেমন ভাবতে পাবছে না। বললো, 'চল।'

ওরা গেট ডিঙিয়ে, রাস্তা পাব হয়ে, বাংলোব বাগানেব মধ্যে ঢুকলো। লিমবু বাংলোব অফিসে ঢুকতে সাহস পেলো না। এবাব গোগোল ওব হাত ধরে বাংলোর অফিসে টেনে নিয়ে গেল। অফিসেব দবজাব বাইবে একজন ফরেস্ট গার্ড দাঁড়িয়েছিল। সে কিছু বলবাব আগেই, অফিসেব মধ্যে ঢুকে দেখলো, একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে দু জন ভদ্রলোক কথা বলছেন। দেখেই বোঝা গেল, তাঁবা ফরেস্টেব অফিসাব হবেন। তাঁবা অবাক হয়ে গোগোল আব লিম্‌বুব দিকে তাকালেন। গোগোল বললো, 'আমবা জঙ্গলের ভেতব থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি। দু'টো লোক একটা হাতীকে মেরে তাব দাঁত আব পা কেটে নিচ্ছে।

ভদ্রলোক দু'জনেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একজন বলে উঠলেন, 'হোয়াট! পোচার? কে তোমরা? কী করে দেখলে?

গোগোল ছোটমামার পরিচয় দিয়ে, সব ঘটনাটা বললো, লিম্‌বুব পরিচয়ও দিল। ভদ্রলোক দু'জন অস্থির ভাবে ছুটোছুটি করে, কাদের নাম ধরে ডেকে বললেন, 'শীগ্‌গিব গাড়ি বের কর। গেট খোল। গোগোল তুমি লিম্‌বুকে নিয়ে আমাদের জীপে গিয়ে বস। আমরা এখুনি আসছি।'

গোগোল লিম্‌বুকে নিয়ে বাইবে আসতেই, একটা জীপ গোঁ-গোঁ করে সামনে এসে দাঁড়ালো। ওবা দু'জনেই সামনের দিকে উঠে বসলো। জীপটাব মাথায় কোনো হুড নেই। সেই ভদ্রলোক দু'জন দু'টো বন্দুক হাতে উঠে সামনেই বসলেন। এমন কি গাদাগাদি করে ড্রাইভারও বসলো। পিছনে আরও দু'জন বসলো। তাদের কোমরের বেল্টের সঙ্গে কুকরি ঝুলছে। সবাই উঠে বসতেই, জীপ ছেড়ে দিল।

গেট ইতিমধ্যেই খোলা হয়ে গিয়েছিল। জীপ ছুটলো জঙ্গলের ভিতরে।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্‌দিকে হাতীটাকে আর লোক দু'টোকে দেখেছো, মনে করতে পারো ?'

লিম্বু বললো, 'আমরা চুমুকডাঙির দিকে যাচ্ছিলাম, ওদিকেই কোথাও আছে।'

জীপের ড্রাইভার বললো, 'ঠিক আছে।'

গোগোল দেখলো, এ জীপের ড্রাইভার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দারুণ স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যে এক একটা খানাখন্দ লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। গোগোল হঠাৎ বললো, 'দাঁড়ান। ডান দিকে একটা বড় গাছের আড়ালে, কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, হাতীর একটা দাঁত নিয়ে কেউ আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।'

গাড়ি তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষে থেমে গেল। সকলেই দেখলেন, সত্যি একটা লোক হঠাৎ গাছের আড়াল ছেড়ে দৌড়োচ্ছে। হাতে তার একটা বিরাট হাতীর দাঁত। বন্দুক হাতে একজন নেমে পড়েই ফায়ার করলেন। আর চিৎকার করে উঠলেন, 'থামো, নইলে গুলি করে মাথা উড়িয়ে দেবো।'

লোকটাব পিঠে বন্দুক ছিল। হাতীর দাঁতটা মাটিতে ফেলে, সে বন্দুকটা হাতে নেবাব আগেই, ফরেস্টের অফিসার বন্দুক বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গিয়ে বললেন. 'হ্যাণ্ডস আপ্‌! বন্দুকে হাত দিয়েছো কি গুলি করবো।'

লোকটা আর বন্দুক হাতে নেবার সুযোগ পেলো না। বাধ্য হয়ে মাথার ওপরে দু'হাত তুললো। জীপেব পিছন থেকে একজন হাতে দড়ি নিয়ে ছুটে গেল, আব লোকটার দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। তারপরই কোমবে শক্ত করে দড়ি বাঁধলো। আর একজন হাতীর দাঁতটা তুলে নিয়ে বললো. 'স্যার, এটা সেই মহানন্দার স্যাংচুয়ারির দলছাড়া হাতীটার দাঁত বলেই মনে হচ্ছে।'

আর একজন অফিসার নেমে এসে বললেন, 'আরে, এতো দেখছি আমাদের ইজারাদারের ভাই লছমন সিং। তোমার সঙ্গের লোকটি কোথায় ?'

লছমন সিং কোনো জবাব দিল না। তার মুখটা শক্ত আর ঠোঁট দু'টো টেপা। এক অফিসার বললেন. 'সে ব্যাটাও নিশ্চয় অন্য কোনো দিক দিয়ে পালাচ্ছে। একে আগে জীপে তোল। আগে হাতীটা কোথায় আছে দেখা যাক। তারপরে দেখা যাবে।'

লছমন সিংকে জীপের পিছনে তোলা হলো। আবার সবাই জীপে চাপতেই, গোঁ-গোঁ শব্দে জীপ চলতে আরম্ভ করলো। একজন অফিসার

গোগোলের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'গোগোল, ভাগ্যিস তুমি দেখতে পেয়েছিলে, নইলে ব্যাটা আর একটু হলেই আমাদের চোখ ফসকে বেরিয়ে যেতো।'

এই সময়েই দেখা গেল, আর একটা জীপ সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। একজন অফিসার বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও, আর একটা চোর বোধহয় পালাচ্ছে। জীপটার রাস্তা আটকাও।'

গোগোল তাব আগেই দেখে নিয়েছিল। বললো, 'না না, ওটা চোবের গাড়ি না। মন্টুমামা আসছেন।'

দু'টো গাড়ি সামনাসামনি আসতেই থেমে গেল। আগে মন্টুমামা লাফিয়ে নামলেন। তারপবে দীপুমামা, ছোটমামা, নওরং সিং আব বাবা। মন্টুমামা বললেন, 'কী ব্যাপার, মিঃ ঘোষ? খোদ ফরেস্ট অফিসাব আর রেঞ্জাব সাহেব মিঃ ছেত্রীও বেরিয়ে পড়েছেন। এদেব পেলেন কোথায়? নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছলো?'

মিঃ ঘোষ তাড়াতাড়ি সব কথা জানিয়ে বললেন, 'এরা মোটেই হারায়নি, মস্ত বড় কাজ করেছে। আপনাবা আব দেবী না কবে আমাদেব পেছনে পেছনে আসুন। আর একটা চোবা শিকারীকে ধবতে হবে।'

আর কোনো কথা হলো না। ফরেস্টের জীপ আগে ছুটলো। পিছনে মন্টুমামাব জীপ। লিম্বু পথ দেখাচ্ছিল। জঙ্গল প্রায় শেষ হয়ে আসবার মুখে। দূরে জঙ্গলের ফাঁকে তিস্তার খেয়া দেখা যাচ্ছে। গোগোলেব হঠাৎ চোখে পড়লো, উই ঢিবির মতো একটা কী। একটা খানার মধ্যে উপুড় হয়ে আছে। দেখেই চিনতে পারলো, ওটা মানুষ। ও বলে উঠলো, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওই খানাব মধ্যে কে যেন মাথা নীচু কবে বসে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ব্রেক কষলো। আর খানার মধ্যে গোঁজা মাথাটাও উঠে এলো। গোগোল দেখেই চিনতে পারলো, এ লছমন সিংয়েবই সঙ্গী। সেই কালো পোশাক আর মাথার টুপি। কিন্তু হাতে তার ধারালো একটা কুকরি। হিন্দীতে বলে উঠলো, 'আমাকে কেউ ধরতে এলে, কুকরি দিয়ে তার পেট ফাঁসিয়ে দেব।'

কিন্তু মিঃ ঘোষ আব মিঃ ছেত্রী দু'জনেই তখন বন্দুক নিয়ে নেমে পড়েছেন। মিঃ ছেত্রী বললেন, 'এও তো দেখছি চেনা, শিলিগুড়ির বাচ্চা সিং।'

মন্টুমামা ব্যাপার দেখে, বাচ্চা সিংয়ের পিছন দিকে জীপ চালিয়ে নিয়ে গেলেন। মিঃ ঘোষ বললেন, 'একটা কুকরিতে ক'টা লোকের পেট ফাঁসাবে

বাচ্চা সিং? কুকরি ফেলে হাত তোল, নইলে আমি এখুনি গুলি করবো।'

মিঃ ছেত্রী বন্দুক তুলে ধরলেন। ওদিকে মন্টুমামা জীপ থেকে নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে বাচ্চা সিংয়ের পিছনে এসেই, তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাচ্চা সিং মোটেই এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার হাতের



কুকরি গেল ছিটকে। আর হুমড়ি খেয়ে খানায় মুখ গুঁজে পড়লো। মিঃ ঘোষ লাফিয়ে গিয়ে, বন্দুক বাগিয়ে ধরলেন। কিন্তু লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর। মণ্টুমামাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মুখে তার খানার জল কাদা। সামনেই মিঃ ঘোষ আর মিঃ ছেত্রীর দু'টো বন্দুকের নল তার বুক আর মাথা লক্ষ্য করে রয়েছে।

গোগোল একটু দূরে, বাঁধের বড় বড় ঘাসের দিকে তাকিয়ে, লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়লো। ছুটে গিয়ে, বড় বড় ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা হাতীর আর একটা দাঁত কোন রকমে তুলে চিৎকার করলো, 'এই যে, আর একটা দাঁত।'

সবাই হই-হই করে উঠলো। ওদিকে ফরেস্ট গার্ডরা বাচ্চা সিংকেও লছমন সিংয়ের মতো হাত পিছমোড়া করে, আর কোমরে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। ছোটমামা গোগোলের হাত ধরে বললেন, 'তুমি এখানে এসেও একটা কাণ্ড করলে। ওদিকে দিদি কেঁদে মরছে!'

মিঃ ঘোষ বললেন, 'কাণ্ড কী বলছেন মি. ব্যানার্জি, আপনার ভাগনে আর নওরংজীর ছেলে লিম্বু বীরের কাজ করেছে। আমাদেরও চাকরি বাঁচিয়েছে।'

মিঃ ছেত্রী বললেন, 'নিশ্চয়ই। তার আগে চলুন, হাতীটা কোথায় আছে দেখা যাক।'

আবার সবাই জীপে উঠলেন। লিম্বুর দেখিয়ে দেওয়া পথে খানিকটা যেতেই দেখা গেল, সেই জায়গাটা। বিরাট হাতীটা ছোটখাটো গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে। তার একটা পা কিছুটা কাটা হয়েছিল। সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। সবাই নেমে দেখলেন। মিঃ ঘোষ বললেন, 'হাতীটা মোটেই পাগল ছিল না। ও দল ছাড়া হয়ে, পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোনো মানুষ মারেনি। কেবল ক্ষেতের ফসল কিছু খেয়েছে। আর এই শয়তান দু'টো ঠিক সুযোগ নিয়ে, নিরীহ হাতীটাকে মেরে ফেলেছে।'

গোগোল হাতীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হুলংয়ের সেই হাতীটার কথা ওর মনে পড়ে গেল, আর ও চোখ ছলছল করে উঠলো। নওরং সিং এসে গোগোলকে একেবারে কোলে তুলে ফেললেন, বললেন, 'বাবা, আমার বাড়ি বেড়াতে এসে তোমার যে কোনো বিপদ হয়নি সেটাই পশুপতিনাথের দয়া। চল, আগে তোমার মায়ের কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দিই।'

মণ্টুমামা লিম্বুকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'তুই ব্যাটা খুব সাহসী আছিস।'

লিম্বু বললো, 'কিন্তু গোগোলই হাতী আর চোরা শিকারীদের আগে দেখেছে। ও আসতে চায়নি, আমিই ওকে নিয়ে এসেছিলাম।'

মন্টুমামা বললেন, 'আচ্ছা, তার জন্য তোকে কী শাস্তি দেওয়া যায়, সেটা ভেবে দেখা যাবে। আগে সবাই বাড়ি চল।'

নওরং সিং মিঃ ঘোষকে বললেন, 'স্যার, আমার বাড়িতে সবাইকে একবার যেতে হবে। সেখানে একটু জিরিয়ে, জলপানি খেয়ে ফিরে যাবেন।'

মিঃ ছেত্রী বললেন, 'আর চোরা শিকারী দু'টোর কী হবে?'

নওরং সিং বললেন, 'ওদেরও নিয়ে চলুন। আমাদের ওখানকার লোকেরা ওদের দেখে চিনে রাখবে।'

তাই ঠিক হলো।

নওরং সিংয়ের বাড়িতে যেন উৎসব লেগে গেল। চোরা শিকারীদের থেকেও, সবাই কলকাতার গোগোলকে দেখতে লাগলো। লিমবু তাদের নিজেদের ছেলে হলেও, তাকেও সবাই প্রশংসা করতে লাগলো। মা প্রথমেই এসে গোগোলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। তারপরে আবার সরে গিয়েছেন। বাবা গোগোলের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসলেন, বোঝা গেল, তিনি রাগ করেন নি।

মিঃ ঘোষ আর মিঃ ছেত্রী বললেন, গোগোলের চোখে না পড়লে, কেউ কিছু জানতে পারতো না। খবরটা আজই কলকাতায় টেলিফোন করে জানিয়ে দিতে হবে।'

নওরং সিং গোগোলকে আবার ঘাড়ে তুলে বসালেন, বললেন, 'গোগোলবাবা আমার কেবল বীর নয়, ও হাতীটার জন্য কেঁদে ফেলেছে।'

সে-কথা শুনে অনেকেরই চোখ ছলছল করে উঠলো। একটা নিরীহ হাতীকে খুন করা কেউ চায় না।

মন্টুমামা লিমবুকে একবার ঘাড়ে তুলে বললেন, 'এবার আমাদের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে নওরংদাদার বাড়ি আসা সার্থক।'

তারপর সবাই যখন অন্যান্য কথা বলছে, আর চোরা হাতী খুনী দু'টোকে দেখছে, গোগোল আর লিম্বু তখন হাত ধরাধরি করে বাড়ির পিছন দিকে পা বাড়ালো। ছোটমামা আঁৎকে উঠে চিৎকার করলেন, 'গোগোল, আবার তোমরা কোথায় যাচ্ছো?'

গোগোল হেসে বললো, 'হরিণটাকে পাতা খাইয়ে আদর করতে যাচ্ছি।'

সবাই স্বস্তিতে হেসে উঠলেন।



গোগোলের বাবার এক বন্ধু, নাম বিধান চক্রবর্তী। গোগোল তাঁকে বিধানকাকা বলে ডাকে। বয়স তাঁর বাবার থেকে সামান্য কম হতে পারে। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। তিনি মাঝে মাঝেই সন্ধের পরে গোগোলদের বাড়ি আসেন। মোটেই আস্তে কথা বলতে পারেন না। মজার মজার গল্প বলতে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি এলেই, বাড়িতে যেন হৈচৈ লেগে যায়! এসেই, ছেলেমানুষের মত মায়ের কাছে, এটা খাব সেটা খাব করে বায়না শুরু করে দেন। মাও বিধানকাকাকে খাইয়ে খুব খুশি। অথচ বিধানকাকা নিজে নানারকম খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসেন। তার মধ্যে গোগোলের জন্য বিশেষ করে, সব থেকে সেরা চকোলেট। এত বেশী করে আনেন, গোগোলের পক্ষে একলা খাওয়া সম্ভব নয়। বাবা মা মিষ্টি খেতেই চান না। বাধ্য হয়ে গোগোল স্কুলে গিয়ে, ওর ক্লাসের বন্ধুদের খাইয়ে দেয়।

বিধানকাকা কবে আসবেন, তার কোন ঠিক থাকে না। ফিটফাট স্মার্ট লোক। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে আসেন। হঠাৎ এক একদিন সন্ধের পরে এসে হাজির হন। বাবার নাম ধরে ডাকলেও, মাকে বউদি বলে ডাকেন। গোগোল শুনেছে, বিধানকাকা বাবার সঙ্গে কলেজে পড়েছেন। এলেই হৈচৈ নানান গল্প, মায়ের কাছে এটা সেটা খাবার ফরমাশ। তারপরেই তাঁর এক কথা, 'সমীর, আমাদের বাড়ি বউদি আর গোগোলকে নিয়ে এ সপ্তাহের শেষেই চল।'

গোগোলের সঙ্গেও বিধানকাকার খুব ভাব। গোগোলের খেলার দিকে ঝোঁক বেশি। আজকাল ওর ঘরে, অনেক খেলোয়াড়দের ছবি ছাড়াও, ব্রুস্ লীর একটা বড় ছবিও টাঙানো হয়েছে। বাবার সঙ্গে গিয়ে, ময়দানের একটা শিবিরে, ক্যারাটে শেখানো দেখে এসেছে। বিধানকাকা গোগোলকে ডেকে ক্যারাটে শুরু করে দেন। না জানলেও তিনি এমন অদ্ভুত সব ভঙ্গি করেন, যেন সত্যি একজন দারুণ ক্যারাটেক। গোগোলও তাঁর সঙ্গে হাত পা চালায়। আর বিধানকাকা গলা থেকে নানা শব্দ করে, লম্ফঝম্প করেন। দেখে গোগোলের হাসি পায়। আর বাবা-মা তো হেসেই বাঁচেন না। বাবা বলেন, 'বিধান, তুই দেখতে বড় হয়েছিস, নিজের চেষ্টায় বেশ বড়লোকও হয়েছিস। কিন্তু এখনও একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস।'

বিধানকাকা বলেন, 'তোমাদের মত গোমড়ামুখো একজিকিউটিভ হয়ে আমার দরকার নেই। সারাদিন কেবল অফিসের চিন্তা, আর তাবড় তাবড় সাহেবসুবোর সঙ্গে মিটিং করা, মেজাজ খারাপ করা, ওসবের থেকে এই আমার ভাল! ধরে নাও, আমি গোগোলেরই বন্ধু। তবে গোগোলের মত গোয়েন্দাগিরি আমাকে শিখে নিতে হবে।'

গোগোল লজ্জা পায়। হেসে বলে, 'আমি মোটেই গোয়েন্দা নই বিধানকাকা। এক একটা ঘটনা ঘটে যায়, আমি কেমন করে যেন জড়িয়ে যাই। আমি গোয়েন্দাগিরি করব বলে কিছু করিনি।'

বিধানকাকা গোগোলকে আদর করে বলেন, 'তাতেই যা কাণ্ড কর, খবরের কাগজে পর্যন্ত তোমার কীর্তিকাহিনী বেরিয়ে পড়ে। তোমার কথা ভেবে আমিই ভয়ে মরে যাই।'

কিন্তু যে-কোন কথা বলাই হোক, ঘুরে ফিরে বিধানকাকার একটাই কথা, তিনি গোগোলদের নিয়ে তাঁদের দেশের বাড়ি যাবেন। এমন কিছু দূরেও নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গ্রাম। গাড়ি নিয়ে গেলে, সেখানে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়। বিধানকাকা প্রত্যেক উইক এণ্ড-এ গ্রামের বাড়িতে যান। বলেন, 'কলকাতায় কি থাকা যায় নাকি? নেহাত কাজের জন্য থাকতে হয়।'

এরকম বলতে বলতে, এক শুক্রবারের সন্ধ্যায় এসে, বিধানকাকা বলতে গেলে জোর করেই বাবা মা আর গোগোলকে নিয়ে গেলেন। বাবা মায়ের কোন আপত্তিই মানলেন না। বাবাকে বললেন, 'গোগোলের শনি রবি ছুটি। তোমাকে শনিবারটা ছুটি নিতে হবে। সেটা কাল আমাদের দেশের বাড়ির টেলিফোনে জানিয়ে দিলেই হবে।' বলে নিজেই ঘরের মধ্যে ঢুকে, সকলের

জামাকাপড় টানাটানি করতে লাগলেন।

মা বললেন, 'আচ্ছা বিধানঠাকুরপো আপনি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। জামাকাপড় আমি গুছিয়ে নিচ্ছি।'

বিধানকাকার তাড়ায় এক ঘণ্টার মধ্যে বাবা মা সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বিধানকাকা সবাইকে গাড়িতে তুলে, সাঁ সাঁ গাড়ি চালিয়ে দিলেন। বাবা বললেন, 'সত্যি বিধান, তুই একটা পাগল।'

গাড়ি তখন যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়ার দিকে চলেছে। বিধানকাকা তাঁর পাশে নিয়েছেন গোগোলকে। বাবা মা পিছনে। বিধানকাকা বললেন, 'পাগলামি না করলে, তোমাদের নিয়ে আসা হতো না।'

অন্ধকার নেমে এসেছিল। রাস্তার দু পাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গোগোল খালি বুঝতে পারছে, মাঠ গাছপালা দুদিকে। মাঝে মাঝে বাজার সিনেমা দোকানপাট আর লোকের ভিড় চোখে পড়ছে। ইলেকট্রিকের আলো রয়েছে। গোগোল আগেই শুনেছে, বিধানকাকাদের বাড়ি গ্রামে হলেও, সেখানে ইলেকট্রিক আছে।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি পৌঁছে গেল বিধানকাকাদের বাড়ি। ডান দিকের একটা খোলা গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকলো বিরাট একটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া চত্বরে। গেটের সামনেই দু দিকে দুটো পাম গাছ। চত্বরের ডাইনে বাঁয়ে বড় বড় দুটো শেডে ঢাকা আলো জ্বলছে। সামনেই দোতলা বাড়ি। ওপরে নীচে আলো জ্বলছে। ডান দিকে বেড়া ঘেরা বাগান। বাঁ দিকে, বাড়িটা যেন এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে। কিন্তু সেটা একতলা। একতলার সামনে, মাথায় ছাদ আঁটা, বড় থামে ঘেরা আর একটা ঘর। সেখানেও আলো জ্বলছে। কিছু লোকজন, ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে সেখানে। একজন ঢাকি ঢাক বাজাচ্ছে। আর বড় বাড়ির গায়ে লাগানো একতলার ঘরের মধ্যে বাজছে কাঁসর ঘণ্টা।

বিধানকাকা গাড়ি থেকে নেমে ডাকলেন, 'বেরিয়ে এস গোগোল। সবাই বেরিয়ে এস। জামাকাপড়ের ব্যাগটা কেউ এসে ভেতরে নিয়ে যাবে।'

বাবা মা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। গোগোল বাঁ দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বিধানকাকা, ওখানে কী হচ্ছে?'

বিধানকাকা বললেন, 'মহিষমর্দিনীর পূজা হচ্ছে। রোজই হয়। এখন আরতি হচ্ছে। সামনে থামওয়ালা, যে-ঘরটা দেখছ, ওটা নাটমন্দির। নাটমন্দিরের ওপর মহিষমর্দিনীর মন্দির।'

গোগোল বলল, 'আমি একটু দেখে আসব?'

বিধানকাকা বললেন, 'হ্যাঁ চলে যাও। তবে জুতো খুলে যেও, নইলে ওখানে ঢুকতে দেবে না। আর ওখান থেকে অন্য কোথাও যেও না। আমি বাবা মা'কে ভেতরে পুরে দিয়েই তোমার কাছে চলে আসছি।'

জুতোর জন্য গোগোলের ভাবনা ছিল না। ওর পায়ে স্যাণ্ডেল ছিল। নাটমন্দিরের সামনে গিয়ে, স্যাণ্ডেল খুলে রেখে ও নাটমন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঢাকের তালে তালে নাচছে। নাটমন্দিরের সামনে সিঁড়ি। ওপরে উঠলে মন্দির। মন্দিরের দরজার সামনে কয়েকজন মহিলা পুরুষ বসে আছেন। আর একজন ভিতরে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করছেন।

গোগোল সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের রকে উঠল। যারা সামনে বসেছিলেন, তাঁরা অচেনা গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল দেখল, মন্দিরের বাইরে, মাথার ওপরে ঘণ্টা। তার সঙ্গে লম্বা দড়ি বাঁধা। সেই দড়ি ধরে একজন টানছে আর ঘণ্টা বাজছে। ভিতরেও একজন কাঁসর বাজাচ্ছে। যিনি আরতি করছিলেন, তাঁর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে মহিষমর্দিনীর মূর্তি। গোগোল দেখতে পাচ্ছে না। ও সবে এসে দেখল, রকটা বেশ লম্বা। সেদিকেও বড় বড় থাম দেখা যাচ্ছে।

গোগোল সেদিকে এগিয়ে গেল। দেখল সামনে কয়েকটা বড় থাম। ভিতরে বিরাট একটা বড় ঘর একটি মাত্র টিমটিমে আলো জ্বলছে। আর কিছুই নেই কেবল কোথা থেকে এ সময়েও পায়রা ডেকে উঠছে। এই সময়ে বিধানকাকা গোগোলের সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'তুমি এখানে কী করছ গোগোল? পূজো তো হচ্ছে ওদিকের মন্দিরে।'

গোগোল বলল, 'মহিষমর্দিনীর মূর্তিটা দেখতে পাইনি। আরতি হয়ে গেলে দেখব। এ ঘরটা কিসের?'

বিধানকাকা বললেন, 'এটা হল ঠাকুর দালান। দুর্গাপূজোর সময় এখানে পূজো হয়। তখন মন্দিরের মহিষমর্দিনীর মূর্তি এখানে আনা হয়। কিন্তু মাটির বড় মূর্তিও তৈরি হয়। এবার পূজোর সময় তোমাকে নিয়ে আসব, তখন দেখবে। চল ওদিকে যাই।'

বিধানকাকা হাত ধরে গোগোলকে মন্দিরের সামনে নিয়ে গেলেন। আরতি শেষ হয়েছে। যিনি আরতি করছিলেন, তিনি পঞ্চপ্রদীপটা সকলের সামনে ধরছিলেন। সবাই প্রদীপের শিখার কাছে হাত বাড়িয়ে, নিজেদের

বুকে মাথায় ঠেকাচ্ছিল। বিধানকাকাও তাই করলেন, আর গোগোলের মাথায় বুকে প্রদীপের তাপ ছুঁইয়ে দিলেন। গোগোল তখন মহিষমর্দিনীর মূর্তি দেখতেই ব্যস্ত। ঠিক দুর্গা প্রতিমার মতই, দশভুজা। একটি সিংহাসনের ওপরে মূর্তিটা রয়েছে। লালপাড় শাড়ি, লাল জামা। গলায় চওড়া চন্দ্রহার। মাথায় সুন্দর মুকুট। দুটো চোখই ঝকঝক করছে। কপালের চোখটিও উজ্জ্বল।

বিধানককো বললেন, 'দেবীর দুটো চোখ হীরের। কপালের চোখটি পান্নার। মাথার মুকুট গলার হার, সবই সোনা আর হীরে দিয়ে গড়া। আর মূর্তি হচ্ছে অষ্ট ধাতুর।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'অষ্টধাতু কী?'

বিধানকাকা বললেন, 'অষ্টধাতু কী, আজকালকার ছেলেরা অনেকেই জানে না। তোমার জেনে রাখা উচিত। ধাতু মানে মেটাল, জানোই তো। এই অষ্টধাতু হল, সোনা রূপা পেতল কাঁসা তামা লোহা রাং আর সীসা।'

গোগোলের কৌতূহল, সিংহ আর অসুর নিয়ে। জিজ্ঞেস করল, 'সিংহ আর অসুর কোথায়?'

বিধানকাকা হেসে বললেন, 'সিংহটা সিংহাসনের জন্য ঢাকা পড়ে গেছে। অসুরটা তারও নীচে। কাল বিকালে তোমাকে দেখাব। এখন চল, বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাক!'

গোগোল দেখল, বাড়িটা বিরাট। থামওয়ালা বিরাট বারান্দা। ঘরের পর ঘর। দেওয়ালও সেইরকম। সব ঘরে আলো জ্বলছে। অথচ লোক তেমন নেই। গোগোল বিধানকাকার সঙ্গে, অনেক ঘর ঘুরে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। একটা সাজানো গোছানো ঘরে বাবা মা বসেছিলেন। গল্প করছিলেন একজন মহিলার সঙ্গে। টি. ভি. চলছিল। কেউ দেখছিলেন না। বিধানকাকা বললেন, 'জবা, এই হচ্ছে শ্রীমান গোগোল, সমীরের ছেলে।'

বাবা মায়ের সঙ্গে যিনি গল্প করছিলেন, তিনি উঠে এসে গোগোলকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন, 'বাহ্, সুন্দর ছেলে!'

বিধানকাকা বললেন, 'শুধু ডাকাত ধরে না আমার সঙ্গে ক্যারাটে লড়ে। খুদে ব্রুস লী!'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে ভাই বোন কেউ নেই?'

বিধানকাকা বললেন, 'অনেক আছে। চল, তোমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাই।'

গোগোল বিধানকাকার সঙ্গে অন্য আর একটা ঘরে গেল। সেখানে চার পাঁচজন ছেলেমেয়ে ছিল, যারা গোগোলেরই বয়সী। বিধানকাকা সকলের সঙ্গে গোগোলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুজন বিধানকাকার ছেলে আর মেয়ে। লোটন আর রুমি। তাঁর দাদার তিন ছেলেমেয়ে। তোতা, অপু আর ঝুমকি। গোগোল তাদের সঙ্গে জমে গেল।

পরের দিন শনিবার। গোগোলের ঘুমটা ভেঙে গেল, নানারকম শব্দে। ও চোখ খুলেই শব্দগুলো শুনল। শব্দগুলো নানারকম পাখির ডাক। দোয়েল শ্যামা বুলবুলি। এক সঙ্গে এত পাখির ডাক আর কখনও শোনে নি। ও চোখ তাকাল। খোলা জানালা চোখে পড়ল। দেখল, তখনও ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি। জানালা দিয়ে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে। পাশে তাকিয়ে দেখল, মা ঘুমোচ্ছেন। অন্য দিকে, আর একটা ছোট খাটে বাবা ঘুমোচ্ছেন।

গোগোল শুয়ে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। ওর গায়ে একটা জামা। যেদিকে জানালা, তার পাশেই রয়েছে একটা দরজা। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। গোগোল জানালা দিয়ে দেখল, ঘরের লাগোয়া খোলা ছাদ। ওর ভিতরে থাকতে ইচ্ছে করল না। শব্দ না করে দরজার ভারি হুড়কোটা খুলে বাইরের ছাদে এল। চারিদিকে গাছপালা, পাখির ডাক। আর বাতাসটা খুব ভাল লাগছে। গোটা বাড়িটা একেবারে নিঝুম। কেউ এখনও জাগে নি।

গোগোল খোলা ছাদের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। ছাদটার তিন দিকেই আলসে। উত্তরের আলসের কাছে গিয়ে ওর চোখে পড়ল বাড়ির গায়ের সঙ্গে লাগানো মন্দির। তার মানে এটাই মহিষমর্দিনীর মন্দির। মন্দিরের চুড়োটা দোতলার ছাদের কাছাকাছি উঠেছে। আর এই ছাদটা একতলার ওপরে।

গোগোল পুবদিকে যাবার জন্য পা বাড়াতেই, নীচে একটা শব্দ শুনতে পেল। দাঁড়িয়ে আলসের ওপর ঝুঁকে নীচে তাকাল। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। দেখল, একটা খালি-গা লোক, মন্দিরের পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। তার দু হাতে কাপড়ে জড়ানো কী একটা রয়েছে। লোকটা আশেপাশে দেখে, গোয়ালের পাশ দিয়ে ছুটল। কী ব্যাপার? লোকটার তাকানোটা মোটেই ভাল নয়। তার চেয়েও অবাক কাণ্ড, মন্দিরের পিছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা গোয়াল পেরিয়ে, ছোট বাগানের পাঁচিলের গায়ে

একটা ছোট খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কী ঘটতে পাবে? গোগোল পিছন ফিবে এসে, নীচে যাবাব দবজা খুঁজল। দবজাটা পেয়েও গেল। সিঁড়িতে এখনও অন্ধকাব। নীচে নেমে ও দেখল, একটা লম্বা দালান। সেখানেও এখনও প্রায় অন্ধকাব। উত্তবেব একটা জানালা খোলা। সেই জানালা দিয়ে গোয়ালঘব, ছোট বাগান আব পাঁচিলেব গায়ে ছোট খোলা দবজাটা চোখে পড়ল। জানালাব পাশে একটা দবজা ভিতব থেকে বন্ধ। গোগোলেব কৌতূহলটা ববাববই বেশি।



লোকটা মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়ে কী নিয়ে বেরোল? ওরকম চোরের মত তাকাচ্ছিল কেন? দরজাটা বন্ধই বা হয়ে গেল কী করে! নিশ্চয়ই তা হলে মন্দিরের মধ্যে কেউ রয়েছে। কিন্তু লোকটা কী নিয়ে গেল, সেটাই ওর আগে জানবার ইচ্ছে হল।

কথাটা মনে হতেই, গোগোল দরজা খুলে ফেলল। রক থেকে লাফিয়ে পড়ে, দৌড়ে ছোট দরজা দিয়ে বাইরে এল। এদিক ওদিক তাকাতেই, চোখে পড়ল, লোকটা উত্তর দিকে, পোড়ো জমির ওপর দিয়ে ছুটছে। এগিয়ে গেছে অনেক দূর। গোগোল ছোটবার আগেই, লোকটা বেঁকে গেল ডানদিকে। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে। কাছে পিঠে একটা লোকও নেই।

গোগোল জোর দৌড় লাগাল। লোকটা যেখান থেকে ডানদিকে মোড় বেঁকেছিল, সেখানে থম্‌কে দাঁড়াল। দেখল, চারপাশে ঘন জঙ্গল। বড় বড় গাছ। আর বিরাট উঁচু একটা ঢিবি। লোকটা কোন দিকে যেতে পারে? ঢিবিটার আড়ালে চলে গেছে? ঢিবিটা একটা যেন বিরাট লম্বা আর চওড়া দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। গোগোল আশেপাশে দেখে ঢিবিটার ওপর উঠতে গেল। গড়ানো ঢিবি, সহজে ওঠা যায় না। হড়কে যায়। নেহাত খালি পা ছিল বলেই, ছোট ছোট গাছের মুণ্ডু ধরে গোগোল ঢিবিটার ওপরে উঠে অবাক! দেখল, ঢিবিটা একটা দীঘির ধার। দীঘির চারিদিকে চারটে বাঁধানো ঘাট। কোন ঘাটে লোক নেই। কিন্তু লোকটা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই এদিকে আসে নি।

গোগোল ঢিবির ওপর থেকে নামতে যাবে। এমন সময় ওর চোখ পড়ল, দীঘির ডানদিকের কোণে, নীচের ঝোপঝাড়ে। দেখল, সেই লোকটাই কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। ভোরের আলো একটু স্পষ্ট হলেও, ভাল করে না তাকালে, কিছু বোঝবার উপায় নেই। কী করছে লোকটা? হাতের কাপড়ে মোড়া সেই জিনিসটা কোথায়? ভাবতে ভাবতে গোগোল ঢিবির ওপর দিয়ে লোকটার দিকে এগোল। অনেকটা কাছাকাছি গেল। তবু লোকটা ফিরেও তাকাচ্ছে না। ঝপ্‌ ঝপ্‌ কোদাল চালাচ্ছে। তারপরেই গোগোলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও দেখল, লোকটার কাছাকাছি শোয়ানো রয়েছে মহিষমর্দিনীর সেই মূর্তি। মূর্তিটা ও পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। মাথায় কাজ করা মুকুটটা দেখেই চিনতে পারল।

গোগোল কী করবে ভেবে পেল না। চিৎকার করবে? না কি

বাড়িতে গিয়ে বিধানকাকাকে ডেকে আনবে ?

কিন্তু কিছুই করতে হল না। গোগোল টেবই পাযনি, ওব পিছনে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছে একটা লোক। হাতে তাব একটা গামছা। সে ঝপ্ করে গামছা দিয়ে আগেই গোগোলেব মুখটা বেধে ফেলল। গোগোল পিছন ফিবে দেখাব চেষ্টা কবল। পাবল না। লোকটাব গায়ে বেশ শক্তি। এত জোবে মুখ বেঁধেছে, গোগোল একটা শব্দ কবতে পাবছে না। তাবপবেই লোকটা বাঁ হাতে গোগোলকে বুকেব কাছে চেপে ধবে, কোমবেব কাছ থেকে বেব কবল, গরু বাঁধাব দড়ি। সেই দড়ি দিয়ে গোগোলেব দু হাত পিছমোড়া কবে বেঁধে ফেলল। ফেলেই গোগোলকে কাঁধে ফেলে ঢিবিব উল্টো দিকে ঢালুতে নেমে দৌড় দিল। গোগোল জোবে জোবে পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু তাতে কোন ফলই হল না। কয়েক মিনিটেব মধ্যেই লোকটা একটা জঙ্গলেব মধ্যে ঢুকল।

জঙ্গলেব মধ্যে এখনও তেমন আলো ঢোকেনি। গায়ে মুখে মাকড়সাব জাল লাগছে। লোকটা এসে দাঁড়াল একটা ঘবেব কাছে। মাটিব দেওয়াল, মাথায় টালি। দবজায় শিকল টানা। লোকটা এক হাতে শিকল খুলেই গোগোলকে নিয়ে ঘবেব মধ্যে ঢুকল, আব ওকে শুইয়ে দিল কাঁচা মাটিব মেঝেব ওপব। ঘবটা বীতিমত অন্ধকাব। তবু গোগোল লোকটাব মুখেব দিকে তাকাল। আশ্চয। মনে হল, এ লোকটাই গতকাল মহিষ-মর্দিনীব মন্দিবেব দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। এই প্রথম লোকটা কথা বলল, 'কলকাতাব ছেলে, বেশি চালাকি শিখেছ, না? থাক এখন এখানে, আবাব ঘোব দুপুবে এসে তোমাকে ঐ দীঘিব জলে ডুবিয়ে শেষ কবে দেব।' বলে গোগোলেব হাত আব মুখেব বাঁধন ভাল কবে দেখে, ঘবেব একদিকে চলে গেল। সেখান থেকে কী যেন একটা নিল। দবজাব কাছে যখন গেল, দেখা গেল লোকটাব হাতে তালা চাবি। দবজাটা টেনে বন্ধ কবে, শিকল লাগিয়ে, তালা বন্ধ কবল। তাবপবে আব কোন শব্দ পাওযা গেল না।

গোগোল খানিকক্ষণ কিছু ভাবতেই পাবল না। তাবপবে সমস্ত ঘটনাটা পবপব ভেবেও, যেন বিশ্বাস কবতে পাবছে না, সত্যি ও ঘটনাগুলো দেখেছে কী না। কিন্তু বিশ্বাস না কবে উপায় নেই। তা না হ'লে, ওকে এভাবে এমন একটা ঘবেব মধ্যে বন্দী করে বাখত না। এখন গোগোল কী কববে? ওব কান্না পেল। তাবপবে লোকটাব কথা মনে পড়ল, জলে ডুবিয়ে মাববে। অসম্ভব কিছু না। আসল ব্যাপাবটা দেখে ফেলেছে। লোকটা ভালই

জানে। গোগোলের পা খোলা থাকলেও, কিছুই করতে পারবে না। মুখ বাঁধা, চিৎকার কবতে পারবে না। দু হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। হাত দিয়েও কিছু কবতে পারবে না।

গোগোল উঠে বসল। ওব এখনও ঘাম হচ্ছে। বাবা মা বিধানকাকা সকলেব কথা মনে পড়তে লাগল, আব গলাব কাছে কান্না ঠেলে আসতে লাগল। কেউ জানতেও পাববেন না, গোগোল কোথায় আছে। অথচ এখন কেঁদেও কোন লাভ নেই। ও দেখল, টালিব ফাঁক দিয়ে একটু আলো আসছে। কিন্তু ঘবে একটাও জানালা নেই। গোগোল দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল। হাত পিছনে বাঁধা। হাতেব ভব না দিয়ে, উঠে দাঁড়ান মুশকিল। তবু কযেকবাবেব চেষ্টায় ও উঠে দাঁডাল। দবজাব কাছে এগিয়ে গেল। সামান্য একটুও ফাঁক নেই। বাইবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লোকজনেব সাড়া শব্দও পাওযা যাচ্ছে না।

ঘবেব মধ্যে আলো বাড়ছে। টালিব ফাঁক দিয়ে দেখে বোঝা যাচ্ছে, বোদ উঠে পড়েছে জঙ্গলেব মাথা ডিঙিযে। গোগোল দেখল, ঘবটা একেবাবে ফাঁকা নয। একটা লাঙল, একটা কাস্তে, কিছু দড়ি। একটা লম্ফ আব একটা মাদুব বযেছে। কিন্তু এখান থেকে বেবোবে কী কবে। সেটাই আসল কথা। বেবোবাব কোন উপায নেই। তবু টালিব চালেব দিকে তাকিযে মনে হল, হাত দুটো খুলতে পাবলে, খুঁটি বেয়ে, টালিব বাঁশ ধবে, টালি খুলে বেবোন যায। কিন্তু হাত দুটো খুলবে কী কবে?

গোগোল জোবে দু হাত মোচড দিল। দিতেই ব্যথা লাগল। বেশ জোবে বাঁধা। লাঙলটাব লোহাব ফালেব দিকে নজব পড়তেই, সেদিকে এগিযে গেল। পিছন ফিবে, সেই লোহাব ফালে দড়িটা ঘষবাব চেষ্টা কবল। কিছুই হল না। ববং ওবই হাতে লাগল। পাটেব পাকানো মোটা দড়ি, লাঙলেব ফালে, ঘষে কাটা ওব পক্ষে সম্ভব নয। সবে এল। আব হঠাৎ ওব মাথায একটা বুদ্ধি এল। বুদ্ধিটা আসলে ওব নিজেব নয। একটা বইযে পড়েছিল।

গোগোল মেঝেতে বসে পড়ল। পিছনেব বাধা দু হাতেব ফাঁকেব মধ্যে, ও ওব পিছন দিকটা ঢুকিযে দেবাব চেষ্টা কবল। যতটা সহজ ভেবেছিল, ব্যাপারটা মোটেই তত সহজ নয়। ও বাবে বাবে চেষ্টা কবে, শেষ পযন্ত, দু হাতেব ফাঁকে পিছন দিকটা ঢুকিযে দিতে পাবল। তাবপব শুয়ে পড়ে, বাঁধা হাত দুটো নীচে দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত এনেই, আবাব ঠেকে গেল। অনেক চেষ্টাব পবে, হাঁটু ছাড়িয়ে একটা পা অনেকটা হাতের বাঁধনেব কাছে এল।

কিন্তু আর্চ করা ওর অভ্যাস নেই, পিঠে ভীষণ ব্যথা লাগছে। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় একটা পা বের করতেই, আর একটা পাও লাইনে বের করে আনল। পিছমোড়া বাঁধা দু হাত এখন ওর সামনে।

এবার খুলবে কী করে ? গোগোল তা জানে। এবার ও এগিয়ে গেল কাস্তেটার কাছে। পা দিয়ে সেটাকে বঁটির মত চেপে ধরে, দড়ি কাটতে লাগল। কয়েক মিনিটের চেষ্টায় দড়ি কেটে গেল। গোগোল এখন দরদর ঘামছে। গায়ের জামাটা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। করুক। ওর এখন তা দেখবার সময় নেই। মুখে বাঁধা গামছাটা খুলতে বিশেষ কষ্ট হল না। তারপরে ও প্রথমেই দরজার ওপর দুম্ দুম্ করে পেটাতে লাগল। কয়েকবার পিটিয়েই থেমে গেল। বুঝল, কাজটা বোকামি হচ্ছে। টের পেলে, সেই লোকটাই আবার এসে পড়বে। ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। ও একবার খুঁটির দিকে দেখে নিল। মাটির দেওয়ালের ওপরে আড়াআড়ি একটা বাঁশ রয়েছে। ওটার ওপর উঠে দাঁড়াতে পারলে, টালিতে হাত পেয়ে যাবে। দু একটা টালি খুলতে পারলেই, বেরিয়ে পড়তে পাববে।

গোগোল আর দেরি করল না। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ও খুঁটি বেয়ে, টালির মাথার বাঁশ ধরল। সেখান থেকে পা ঝুলিয়ে দিল, আড়াআড়ি বাঁশের ওপর। কোন বকমে পা ঠেকিয়ে, টালিব গায়ে হাতেব চাপ দিল। কিন্তু সহজে খুলল না। যেদিকেই সবাতে যায়, টালি যেন সহজে নড়তেই চায় না। তখন হাত দিয়ে জোরে ঘুষি মারতেই একটা টালি একটুখানি উঠে পড়ে গেল। কোন রকমে সেটাকে ঠেলে সরাতেই, গোগোলের গায়ে রোদ লাগল। পাশের টালিটা ঠেলতে সহজেই সবে গেল। কোন রকমে মাথাটা বের করে বাইরেটা একবার দেখল। চারপাশে গাছ। রোদ গাছের মাথায়। এবার ও দু হাত বেব করে, টালি ধবে বাঁশের থেকে জোরে লাফ দিয়ে পা তুলল। টালিতে ঠং ঠং শব্দ হল। কিন্তু ও টালির চালে উঠে পড়ল।

গোগোল জানে দরজাটা কোন্ দিকে। সেদিকে একবাব দেখল। দেখেই ওর বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। দেখল, সেই লোকটা ঘরের দিকে আসছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কিন্তু লোকটার নজর দরজার দিকে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সে এগিয়ে আসছে। গোগোল টালির ওপর শুয়ে পড়ল। লোকটা এগিয়ে এসে যখন তালা খুলছে, শব্দ পেয়েই গোগোল টালির চালের পিছনে গিয়ে, সামনের একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। কিন্তু গাছ বেয়ে নামার সময় আর নেই। ও দরজার পাল্লার জোর

শব্দ শুনতে গেল। পেয়েই নীচে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করল। কোন্‌দিকে ছুটছে, কিছুই জানে না। কেবল শুনতে পেল, পিছনেও কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

গোগোলের দম ফুরিয়ে আসছে। তবু প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। আর হঠাৎ ওর সামনে এসে পড়ল একটা সাইকেল। সাইকেল চালক আর ও দুজনেই লুটিয়ে পড়ল। গোগোল চিৎকার করে উঠল, 'ডাকাত! ডাকাত!'

সাইকেল যিনি চালাচ্ছিলেন, তিনি অল্পবয়সী ভদ্রলোক। আগেই গোগোলকে টেনে তুললেন, বললেন, 'কোথায় ডাকাত? কে তুমি?'

গোগোল বলল, 'আমার নাম গোগোল। বিধানকাকার বাড়ি বেড়াতে এসেছি। একটা লোক মহিষমর্দিনীর মূর্তি চুরি করেছে, আমি দেখেছি।'

ভদ্রলোক ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি দেখেছ? মহিষমর্দিনীমূর্তি নিয়ে তো গোটা গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেছে। পুলিশ এসেছে। আব একটি ছেলেকেও নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমিই তা হলে সেই ছেলে?'

গোগোল তখন পিছনে তাকিয়ে দেখছে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না, বলল, 'আপনার সাইকেলে আমাকে একটু বিধানকাকার বাড়ি পৌঁছে দেবেন? চোরকে আমি দেখেছি। আর মহিষমর্দিনী কোথায় রেখেছে, তাও জানি।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সাইকেল বাস্তা থেকে তুললেন। সীটের সামনে গোগোলকে বসিয়ে বাঁই বাঁই চালিয়ে দিলেন। মাত্র দু মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন বিধানকাকার বাড়িব সামনে। সেখানে তখন লোকজনের ভিড়। পুলিশের জীপ। বিধানকাকা কোথা থেকে ছুটে এসে গোগোলকে জড়িয়ে ধবলেন। গোগোল প্রায় অজ্ঞানের মত বিধানকাকার কোলে ঢলে পড়ল। বিধানকাকা গোগোলকে কোলে নিয়ে বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠলেন। চিৎকাব করে বললেন, 'শিগ্‌গির কেউ এক গ্লাস জল নিয়ে এস।'

গোগোলের মনে হচ্ছিল, ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বিধানকাকা ওর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। গোগোল চোখ মেলে তাকাল। বলল, 'জল খাব।'

বিধানকাকা ওর মুখের সামনে গেলাস ধরতেই চোঁ চোঁ করে চুমুক দিল। কিন্তু ভাল করে খেতে পারল না।

বলল, 'বিধানকাকা, মহিষমর্দিনীকে দীঘির এক কোণে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে। আমি সব দেখেছি। যে লোকটা আরতির সময় ঘণ্টা বাজায়, সে আমাকে দীঘির ধার থেকে ধরে নিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে একটা ঘরে আটকে

রেখেছিল। আমি……।'

একজন বলে উঠলেন, 'তুমি আর কথা বলো না গোগোল, সবই বুঝেছি আমরা যাচ্ছি।'

পুলিশ আর লোকজন সব ছুটে বেরিয়ে গেল। বিধানকাকার কোলে বসে গোগোল দেখল মা আর কাকীমা সামনে দাঁড়িয়ে। দুজনেই কাঁদছেন। বাবা ওর দিকে উদ্বেগে তাকিয়ে আছেন।

বিধানকাকা বললেন, 'সব কথা পরে শুনব গোগোল। তুমি এখন ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। আগে কিছু খেয়ে নেবে চল।'

বিধানকাকা গোগোলকে কোলে নিয়েই বাড়ির ভিতরে গেলেন।

এক ঘণ্টা পরেই, মহিষমর্দিনীর মূর্তি বাড়িতে নিয়ে আসা হল। মূর্তির দামী গহনা কিছুই খোয়া যায়নি। চোরেরা সময় পায় নি। ভেবেছিল, ধীরে সুস্থে সব কাজ করবে। কিন্তু গোগোল তাদের সঙ্গে বাদ সাধল।

বিধানকাকার বাড়ির সামনে সবাই তখন গোগোলকে দেখতে চাইছে। সবাই জেনে গেছে, গোগোলের জন্যই চোর ধরা পড়েছে। গোগোলও জানল, স্বয়ং পুরোহিত নাকি চোরদের সাহায্য করেছে। বিধানকাকা তো গোগোলকে মাথায় নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 'আমাদের সাতপুরুষের দেবীকে গোগোল পাইয়ে দিয়েছে।'

থানার ও. সি. বললেন, 'কিন্তু খুবই ভাগ্য ভাল, গোগোল বেঁচে গেছে। গোগোলকে সত্যি হয়তো জলে ডুবিয়ে মারত।'

বিধানকাকা হাসছেন, কাঁদছেন। পাগলের মত হয়ে গেছেন। বললেন, 'ভাগ্যিস গোগোলকে জোর করে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। নইলে আজ আমাদের সর্বনাশ হয়ে যেত। আর ওকে চিরদিনই মহিষমর্দিনীই রক্ষে করবেন।' বলে গোগোলকে চুমো খেয়ে আদর করলেন।

সবাই তখন চিৎকার করছে, 'জয়, গোগোলের জয়। জয় মহিষমর্দিনীর জয়।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে হাসছে।

গোগোলের রায়রাজ্যে উদ্ধার



গোগোল কখনও গ্রামের পূজা দেখে নি। পূজা বলতে দুর্গাপূজাই বোঝায়। বাবা-মায়ের মত গোগোলের আজকাল কলকাতার পূজায় ভারি অরুচি। বাবা বলেন, 'কলকাতায় পুজোয় কেবল প্রতিমা সাজানোর জাঁকজমক, চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই আর আজেবাজে গানের মাইকের কান ফাটানো চিৎকার। ভিড়ের চাপে রাস্তা চলাই দায়। পুজোয় কোথায় একটু আনন্দ হবে, তার বদলে দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, কলকাতা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।'

মা বলেন, 'আমারও কলকাতা শহরের পুজো আর ভাল লাগে না। বাড়ি থেকে তো এক পা বেরোতেও ইচ্ছে করে না। অথচ পুজোর সময় বাংলাদেশ ছেড়ে পাহাড় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেও ইচ্ছে করে না। শরৎকালের আকাশ দেখলেই আর কোথাও যেতে মন চায় না। শরৎকাল মানেই সোনার মত রোদ, মাঝে মাঝে মেঘের খেলা। আর ঢাক বেজে উঠলেই মনে হয়, আমিও যেন আমার ছেলেবেলাটা ফিরে পাই। কিন্তু কলকাতা শহরে ঢাকের বাজনা কংক্রিটের দেয়ালে লেগে, যেন কান ঝালাপালা করে দেয়। তার ওপরে তো মাইকের তাণ্ডব আছেই।'

গোগোল বাবা-মায়ের এসব কথা শোনে আর ভাবে, কথাগুলো খুবই সত্যি। অবশ্য পুজো এসে গেলে, তখন এসব বিশেষ মনে থাকে না। মনটা আপনা থেকেই আনন্দে নেচে ওঠে। তবে শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতে আর ভাল লাগে না। প্রত্যেক বছর দেখে দেখে এখন কেমন

একঘেয়ে লাগে, আর বইয়ে পড়া দুর্গা পূজার বর্ণনা মনে পড়ে যায়। সে সব অবশ্য বাংলাদেশের গ্রামের পূজা। পড়তে পড়তে গোগোল যেন কল্পনায় সেখানে চলে যায়। সেখানে খোলা আকাশের নীচে গাছপালা, নদী। নদীর ধারে কাশবন। গোগোল তো কাশবনই দেখে নি। ছবিতে দেখেছে। গোগোলের তাই মনে মনে খুব ইচ্ছে, একবার গ্রামের পুজো দেখবে। কিন্তু দেখতে চাইলেই দেখা হয় না। গ্রামে আত্মীয়স্বজন আছেন। শীতের সময় দু' একবার বাবা-মায়ের সঙ্গে গিয়েছে। পুজোর সময় কখনও যাওয়া হয় নি।

সেবারে হঠাৎ গোগোলের মনস্কামনা অদ্ভুতভাবে পূর্ণ হয়ে গেল। বাবার যে কত রকমের বন্ধু আছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। মাঝে মাঝে বাবার মুখে তাঁদের গল্প শোনা গেলেও, সকলের সঙ্গে গোগোলের পরিচয় হয়নি। বাবার মুখে তাঁর এক লেখক বন্ধুর কথাও শুনেছে। তাঁর আসল নাম গোপাল ভট্টাচার্য। কিন্তু তিনি হংসকুমার ছদ্মনামে লেখেন। বেশী বই লেখেন নি। পাঁচ-ছ'খানা লিখেছেন। সে সব বই গল্প উপন্যাস নয়। সবই ধর্ম বিষয়ে। উনি নাকি বিয়ে-থা করেন নি। এক রকমের সন্ন্যাসী সাত্ত্বিক মানুষ। নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান। সন্ন্যাসী বললে যে রকম গেরুয়া এবং জটাজুটধারী বোঝায়, উনি সেরকম নন। সাধারণ মানুষের মতই ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। বাবা বলেন, 'গোপাল মনে প্রাণে সন্ন্যাসী মানুষ। অথচ ওদের গ্রামের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। ওর দাদা ভাইয়েরা সবাই বিয়ে করেছে। গোপালকে বিয়ে করবার জন্য অনেক ধরাধরি করা হয়েছে। কিন্তু ও বিয়ে করে নি।'

বাবার এই বন্ধু গোপালবাবু মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। বাবার সঙ্গে অফিসে দেখা করেন। বাবার সঙ্গে ওঁর পরিচয়, কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় থেকে। সেই থেকে নাকি উনি অনেকবার বাবাকে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আজ অবধি বাবার যাওয়া হয়ে ওঠে নি। পুজোর আগেই উনি কলকাতায় এসে বাবাকে নাকি বলেছেন, 'তোমার স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এবার পুজোয় আমাদের দেশে চল। এতকাল ধরে বলছি, একবারও গেলে না। তোমরা খালি শহর নিয়েই মেতে আছ। ছেলেকে গ্রাম বাংলা দেখাও। শহর দেখে তো দেশটাকে চেনা যায় না। গ্রামই হচ্ছে আমাদের আসল জায়গা।'

বাবা বাড়ি এসে মাকে বলতেই মা রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, 'পুজোতে প্রত্যেকবারই কলকাতায় থাকি। এবার গ্রামেই যাব। সেই

কোন্ ছেলেবেলায় গ্রামের পুজো দেখেছি। তার চেহারাই আলাদা। গোগোলেরও নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

গোগোল তো শুনেই এক পা তুলে আছে। বাবা বললেন, 'আমিও অনেককাল গ্রামের পুজো দেখি নি। বিশেষ করে বাড়ির পুজো। গোপালকে তা হলে আগামীকাল বাড়িতেই নিয়ে আসব। তোমার আর গোগোলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে। অবশ্য আগে আমি অনেকবারই গোপালকে আমাদের ফ্ল্যাটে আসবার জন্য বলেছি। আসব আসব করে আসে নি। আমার মুখে যদি শোনে, তোমরা যেতে রাজী হয়েছ, তা হলে খুশি হয়েই চলে আসবে।'

মা বললেন, 'তাই আসতে বলো। আমি একটু জেনে নিতে পারব, ওঁদের বাড়ি গেলে থাকবার ব্যবস্থা-টাবস্থা কেমন আছে না আছে। মুখে বলতে খুবই ভাল লাগে, গাঁয়ে যাব। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকবার অনেক অসুবিধেও আছে। শত হলেও, শহরে থেকে থেকে আমাদের অভ্যাস অন্যরকম হয়ে গেছে।'

গোগোল বলল, 'কেন মা, এর আগেও তো আমরা কালীনারায়ণপুর গেছি। ইছামতীর ধারে ধলতিত্তা গ্রামে গেছি। আমাদের কোন অসুবিধে তো হয় নি?'

মা বললেন, 'সে সব গ্রাম তো কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। গ্রাম ঠিকই, তবে শহরের সব রকম ব্যবস্থাই সেখানে আছে। ইলেকট্রিকের আলো, স্যানিটারি পায়খানা, সবই আছে। অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায়, তুই তা কখনো দেখিস নি। গোপালবাবুদের গ্রাম কেমন তা তো আমরা জানি নে। তোর বাবা কোনদিন যান নি।'

বাবা বললেন, 'আমি শুনেছি, গোপালদের দেশ হল ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে। গোপাল কাল এলেই সব জানা যাবে।'

পরের দিনই বাবা অফিসের ছুটির পরে তাঁর বন্ধু গোপাল ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এলেন। মোটা ধুতির ওপরে মোটা গেরুয়া রঙের খাদির পাঞ্জাবি কাঁধে একটা কাপড়ের সাইড ব্যাগ। রোগা আর লম্বা মানুষটির রঙ ফরসা। খাড়া নাক, চোখ বেশ বড়। মাথার কাঁচাপাকা চুলের মত তাঁর গোঁফ জোড়াও কাঁচাপাকা। হাসিটি বেশ মিষ্টি। তাঁকে দেখলেই গ্রামের মানুষ বলে মনে হয়। অথচ উনি ভারতবর্ষের অনেক জায়গা ঘুরেছেন। বিশেষ করে তীর্থক্ষেত্রগুলো। তার ওপরেই উনি ধর্মের বই কিছু লিখেছেন 'হংসকুমার' ছদ্মনামে।

বাবা মায়ের সঙ্গে আগে গোপালবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার পরে গোগোলের সঙ্গে। মা আগেই শিখিয়ে রেখেছিলেন। গোগোল গোপালবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। উনি ব্যস্ত হয়ে গোগোলের হাত ধরে, সাদরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আজকালকার ছেলেরা আবার প্রণাম করে নাকি ? তাও আবার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছেলে তুমি, আর বয়স তো এইটুকু। তোমরা তো 'হ্যালো আঙ্কল, হাউ ডু ইউ ডু' বলবে !'

গোগোলের খুব লজ্জা হল। বলল, 'আমি ও রকম বলি নে। মা আমাকে যেরকম শিখিয়েছেন, আমি সেই রকমই শিখেছি।'

গোপালবাবু বললেন, 'বাঃ, এ খুব ভাল কথা। মা তোমাকে ঠিকই শিখিয়েছেন। ইংরেজী পড়, তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাও পড়তে হবে, আর সত্যিকারের বাঙালীয়ানাও শিখতে হবে। তা তুমি আমাদের গ্রামে যাবে তো ?'

গোগোল ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ, যাব।'

গোপালবাবু বললেন, 'তোমার বিষয়ে অনেক কথা শুনেছি। তুমি তো আবার এক খুদে গোয়েন্দা, খবরের কাগজেও নাম বেরিয়েছে। আমাদের গাঁয়ে সে রকম কিছু কিন্তু পাবে না। নেহাতই এক নিরীহ গ্রাম। তবে হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে ডাকাতি হয়।'

মা বললেন, 'কিছু হয়ে আর দরকার নেই। এমনিতেই ওকে নিয়ে কোথাও যেতে আমার আজকাল ভয় হয়, কোথায় আবার কী ঘটিয়ে বসবে।'

গোপালবাবু বললেন, 'না, আমাদের গাঁয়ে সে রকম কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর পাড়াগাঁয়ে ডাকাত পড়লে তার চেহারা অন্য রকম। আজকালকার ডাকাতরা অবশ্য বোমা বন্দুক নিয়ে আসে। আগেকার মত দা' সড়কি বর্শা নিয়ে আসে না, আর কুক্ পেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। অন্ধকার রাত্রে বোমা মেরে দরজা উড়িয়ে দেয়, আর বন্দুক উঁচিয়ে ভেতরে ঢোকে। তবে, বর্ষাকালেই গাঁয়ে ডাকাতি বেশী হয়। পুজো-পার্বণের সময় ওসব বিশেষ হয় না। ডাকাত পড়লে গোগোল ঘর থেকেই বেরোতে পারবে না। আর সে সব ডাকাতরা বড় নিষ্ঠুর, কোনরকম বেগতিক দেখলেই গুলি চালিয়ে দেয়।'

বাবা বললেন, 'গোপাল, তুমি যে আগে থাকতেই আমাদের ভয় দেখিয়ে দিচ্ছ। পুজোয় গিয়ে শেষটায় ডাকাতের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে না তো ?'

গোপালবাবু হেসে বললেন, 'ভয় দেখাচ্ছি নে। গোগোলকে বলছি। এ সময়ে ডাকাতি হয় না, বর্ষাকালেই হয় বেশী। আর ডাকাতরা তো এমনি আসে না, আগে থেকে খবর নিয়ে আসে, কার বাড়িতে গেলে নগদ টাকা-পয়সা গহনা পাবে। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়বে কেন ?'

বাবা বললেন, 'গরিবের বাড়িতে বুঝি দুর্গাপূজা হয় ?'

গোপালবাবু বললেন, 'আগের মত ধুমধাম কি আর হয়! অনেক কালের পুজো, একশো বছর আগে থেকে হয়ে আসছে। তাই গরিবের মত এখনো পুজোটা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার ভাইপোদের আঁমলে আর হবে কি না কে জানে ? আগে নবমীর রাত্রে মোষ বলি হত। পাঁঠা বলি হত কয়েকশো। এখন কয়েকটি পাঁঠা বলি হয় মাত্র। আমি অবশ্য বলি পছন্দ করি নে। কিন্তু বংশের প্রথা মানতেই হয়।'

তারপর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উনি জানালেন, তাঁদের গ্রাম বর্ধমান জেলার মধ্যে। নবদ্বীপঘাট স্টেশনের আগে, সমুদ্রগড়ে নেমে, তাঁদের গ্রামে যেতে হয়। গ্রামটা জলঙ্গী নদীর ধারে। তাঁদের বাড়িটা বেশ বড় আর পাকা। অনেক ঘর আছে, থাকবার জায়গার কোন অভাব হবে না। বাড়ির ভিতরে কুয়ো টিউবওয়েল স্যানিটারি প্রিভি সবই আছে। সম্প্রতি ইলেকট্রিক এসেছে। স্টেশন থেকে রিকশায় করে যাওয়া চলবে। তবে গ্রামের ভিতর পাকা রাস্তা একটিই মাত্র আছে। আর সবই কাঁচা রাস্তা।

মায়ের যা জানবার, তা জানা হয়ে গিয়েছিল। বললেন 'আর আমার জানার দরকার নেই। শুনে আমার খুব ভালই লাগছে। এখন আমরা গেলে আপনাদের বাড়ির লোকদের অসুবিধে না হলেই হল।'

গোপালবাবু হেসে বললেন, 'সেটা গেলেই দেখতে পাবেন, অসুবিধেটা কাদের হবে। আমি তো সমীরেশকে কতদিন ধরে বলে আসছি আমাদের দেশে যাবার জন্য।'

সমীরেশ হল গোগোলের বাবার নাম। কিন্তু গোগোল তখন একটা ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়েছে। ও চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, 'গোপাল কাকা, নবদ্বীপ তো নদীয়া জেলার মধ্যে। কিন্তু আপনি বলছেন, আপনাদের গ্রাম বর্ধমান জেলার মধ্যে ?'

গোপাল কাকা বললেন, 'বাঃ, তুমি ঠিক প্রশ্নই করেছ। আমাদের ওদিকে, একমাত্র নবদ্বীপই নদীয়া জেলার মধ্যে পড়েছে। আশেপাশের আর সর্বত্রই বর্ধমান জেলার মধ্যে। আসলে নবদ্বীপ এক সময়ে গঙ্গার

পূর্বপারে ছিল। প্রাকৃতিক কারণে, গঙ্গার ভাঙনে ভূগোলটাই বদলে গেছে। নবদ্বীপ চলে এসেছে গঙ্গার পশ্চিম পারে। কিন্তু নদীয়া জেলার কোন অংশই গঙ্গার পশ্চিম পারে থাকবার কথা নয়। নবদ্বীপ যেহেতু আগে ছিল নদীয়ার মধ্যে, এখনো তাই শুধু নবদ্বীপ অঞ্চলটা নদীয়া জেলার মধ্যে ধরা হয়। নবদ্বীপকে ঘিরে বাকি সব জায়গাই বর্ধমান জেলার অংশ। তুমি যখন আমাদের ওখানে যাবে, তখন আমি তোমাকে সব দেখিয়ে দেব।'

তারপরেই যাবার দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। গোগোলেব পুজোর ছুটি পড়ে গিয়েছিল। বাবা বললেন, 'আগামীকাল মহালয়া। আমরা তা হলে সপ্তমীর দিন যাব।'

গোপালকাকা বললেন, 'সপ্তমীর দিন যাবে কেন? যাবেই যখন, কয়েকদিন আগেই চল। বাড়ির পুজো দেখতে হলে পঞ্চমীর দিন থেকেই থাকা উচিত। সব থেকে ভাল হয়, আগামীকালই যদি যাওয়া হয়।'

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন. 'আগামীকাল? আমি তো এখনো অফিস থেকে ছুটিই নিই নি। তা ছাড়া, আমাদের অফিসের পুজোর ছুটি মাত্র চার দিন।'

গোপাল কাকা বললেন, 'তা বললে তো হবে না ভাই। তোমাকে কয়েক দিন বেশী ছুটি নিতেই হবে। একেবারে অফিসের গোনাগুনতি দিনে গেলে কি চলে? কী বল তুমি গোগোলবাবু?'

গোগোলের মনের ইচ্ছেটা তাই। কিন্তু বাবার অসুবিধের কথা ভাবতেই হবে। ও হেসে বাবার দিকে তাকাল। মা বাবাকে বললেন, 'তুমি ছুটি কয়েকদিন বাড়িয়েই নাও।'

গোপালকাকা মায়ের কথায় উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। আর আগামীকাল গেলে আমার সঙ্গেই যাওয়া হত। আমাকে আগামীকাল প্রথম ট্রেন ধরে চলে যেতে হবে। অবশ্য পরের দিনই আমি আবার কলকাতায় আসব। দু'দিন থেকে আবার যাব।'

বাবা বললেন, 'আগামীকাল কোন রকমেই যাওয়া হবে না। যেতে যেতে তুমি ধরে রাখ, চতুর্থী পঞ্চমী হবে।'

গোপালকাকা দর কষাকষির মত বললেন, 'আর দু' একটা দিন এগিয়ে এস। আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। কোনদিন যাও নি, হঠাৎ গিয়ে অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে।'

বাবা বললেন, 'আরে এ তো ঘরের কাছে। আমি টাইম-টেবিল দেখে ঠিক গিয়ে হাজির হব।'

গোপাল কাকা মাথা নেড়ে বললেন, 'ঘরের কাছে বলেই অসুবিধে, বুঝলে? এ হল পাড়াগাঁ জায়গা। অবশ্য রিকশায় চেপে আমাদের গাঁয়ের নাম আর আমাদের বাড়ির কথা বললে পৌঁছে যাবে ঠিকই, কিন্তু তার কী দরকার? তুমি তিন দিন বেশী ছুটি নাও, আমার সঙ্গেই চল। আমাদের লাইনে ট্রেনের গোলমাল বড় বেশী। যে সময়ে গিয়ে পৌঁছবে ভাবলে, তার থেকে হয় তো দু' ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে না গেলে, আমাকে তোমাদের জন্য স্টেশনে লোক রেখে দিতে হবে।'

বাবা কী বলবেন ভেবে না পেয়েই যেন মায়ের দিকে তাকালেন। মা বললেন, 'গোপালবাবু যা বলছেন, তাই কর। নতুন জায়গা, ওঁর সঙ্গে যাওয়াই ভাল।'

গোপালকাকা বললেন, 'এই তো ঠিক কথা। বাস্তব দিকটাই সব সময় ভাবতে হবে।'

বাবা হেসে বললেন, 'তা হলে তাই হবে। আমরা চতুর্থীর দিনই যাব।'

গোপালকাকা বললেন, 'এই তো সুবোধ বালকের মত কথা। তা হলে আমরা সকালের গাড়িতেই যাব। আমি হাওড়া স্টেশনে টিকেট কেটে রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। তোমরা সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

কথাবার্তা স্থির হয়ে গেল। গোপাল কাকা চা খাওয়া পছন্দ করেন না। মা তাঁকে মিষ্টি আর শরবত খাওয়ালেন।

ট্রেনে বেশ ভিড় থাকলেও গোগোলরা সবাই বসবার জায়গা পেয়েছিল। গোপাল কাকা আগেই বলেছিলেন, তাঁদের কাটোয়া বারহাড়োয়া লুপ লাইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা এখনও সেই আদ্যিকালের আমলে পড়ে আছে। সেকেণ্ড আর ফার্স্ট ক্লাস কেউ মানতে চায় না। ট্রেনও সময়মত চলে না। যাত্রীর তুলনায় ট্রেন কম। আর ব্যাণ্ডেলের পর, ট্রেন চলে সিঙ্গল লাইনে। আপ ডাউন ট্রেন একসঙ্গে এসে পড়লে স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। আর সব থেকে আজব নিয়ম হল, আপ বা ডাউনের যে ট্রেনটি আগে আসবে, তাকে ছাড়া হবে পরে। আর পরে যে আসবে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে আগে। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট গো নয়, লাস্ট কাম ফার্স্ট গো। গোগোলের বেশ মজাই লাগল।

গোপালকাকা ব্যাণ্ডেল স্টেশনের পর থেকে, সব স্টেশনের সঙ্গে সে-সব জায়গার অনেক পুরনো ইতিহাস শোনাতে শোনাতে চললেন। ব্যাণ্ডেল

'ছাড়বার পরেই গোগোলের মনে হল, শহরের চেহারা আর কোথাও নেই। চারদিকেই গ্রাম।

সমুদ্রগড় স্টেশনে নেমে, আশেপাশে কিছু দোকানপাট ছাড়া, চারদিকেই গ্রামের চেহারা। দেখা গেল, গোপালকাকার জন্য একজন লোক অপেক্ষা করছিল। সে ছুটে এল কাছে। গোগোলদের একটাই মাত্র স্যুটকেস আনা হয়েছিল জামাকাপড় ভরে। আব একটা ব্যাগ, যার মধ্যে তোয়ালে সাবান দাঁত মাজাব ব্রাস পেস্ট ইত্যাদি, আর বাবাব দাড়ি কামাবাব সরঞ্জাম।

গোপালকাকা লোকটিকে দেখে বললেন, 'এই যে হরি ভাই, তুমি এসে গেছ? রিকশা কি পাওয়া গেছে?'

হবি ভাই লোকটির বয়স হবে পঞ্চাশেব মত। হাঁটুর ওপরে ধুতি, আব বুকের বোতাম খোলা সামান্য একটা জামা। গলায় তুলসীব মালা। বেঁটেখাটো শক্ত চেহারা। মাথাব চুল কাঁচাপাকা। মুখটি নিরীহ। বলল, 'পাওয়া গেছে। তুমি যাদের কথা বলেছিলে, সেই খাঁদু আব পচা বিকশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। তোমবা রিকশায় এস, আমি স্যুটকেস আব ব্যাগ নিয়ে হাঁটা দিই।'

বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'গোপাল, এসব বয়ে নিয়ে যাবাব দবকাব কী? আমাদের সঙ্গে রিকশাতেই তুলে নেওয়া যাবে।'

হরি ভাই নিজেই বলল, 'আপনারা একটু ভাল কবে বসে আসুন। এ এমন কিছু বোঝা নয়। আমরা এক কুইন্টল ধানেব বস্তা মাথায় কবে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। এ তো কিছুই নয়।'

গোপালকাকা বাবাকে বললেন, 'হবি ভাইকে ওব ইচ্ছে মত যেতে দাও। আমরা রিকশা কবে গেলেও দেখা যাবে, সে হয়তো আমাদের আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

গোপাল কাকার সঙ্গে স্টেশনের পশ্চিম দিকে হেঁটে লাইন পাব হতে হল। চারদিকে গাছপালা বেশ নিবিড়। বুলবুলি আব দুর্গা টুনটুনিব ডাক শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দোয়েলের শিস্। বেলা এখন এগারোটা হবে। রোদটা দেখতে সুন্দর। কিন্তু বেশ ঝাঁজ আছে। লেবেল ক্রসিংয়েব গেট পেরিয়ে সরু একটা পীচের রাস্তা ডান দিকে মোড় নিয়ে চলে গিয়েছে। কাছেই দুটো রিকশা দাঁড়িয়েছিল। দুটোই, তার বেশী নয়। গোপাল কাকার সঙ্গে অনেকেই কথা বলছিল, আর গোগোলদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। গোপালকাকা সকলের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। গোগোল

বুঝতে পারল গোপালকাকাকে সবাই বেশ মান্য করে।

গোপালকাকা মা আর বাবাকে একটা রিকশায় তুলে দিলেন। আর নিজে গোগোলকে নিয়ে একটা রিকশায় বসলেন। খানিকটা যেতেই নদী দেখা গেল। গোপালকাকা বললেন, 'এটা হচ্ছে জলঙ্গী নদী, পুব দিকে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। এখন দেখছ নদী একটু ছোট। বর্ষাকালে জল যখন বাড়ে, তখন আরো চওড়া দেখায়। সময় পেলে তোমাকে জলঙ্গী আর গঙ্গা যেখানে মিশেছে, সেখানে নিয়ে যাব।'

গোগোল নদীর ধারের দু'পাশে নিবিড় গাছপালা দেখে খুশি হয়ে উঠল। এরকম গ্রামে ও আগে আর কখনও যায় নি। জলঙ্গী নদীতে মাঝিরা নৌকা করে বড় বড় জাল পাতছে। রাস্তাটা পীচের বটে, কিন্তু ভাঙাচোরা এবড়ো-খেবড়ো। এক সময়ে সেই রাস্তা ছেড়ে রিকশা বাঁ দিকে কাঁচা রাস্তায় ঢুকল। শুকনো শক্ত রাস্তায় অনেক ধুলো জমেছে। বৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই কাদা হত। রিকশা চালাতে কষ্ট হত। নদী আড়ালে চলে গেল। প্রায় কুড়ি মিনিট চলার পরে, রিকশা রাস্তা থেকে সোজা একটা বিরাট দোতলা বাড়ির সামনে বিশাল চত্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেই চত্বরে বিস্তর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে।

বাড়িটা দক্ষিণ মুখো। আর তার গায়ে লাগানো পশ্চিম দিকে, পুব মুখো বিরাট ঠাকুর-দালান। বেশ কয়েক ধাপ উঁচু সিঁড়ির ওপরে ঠাকুর-দালানে মোটা মোটা থাম। আজ চতুর্থীর দিনেও দেখা গেল, দালানের ভিতরে দুর্গা প্রতিমার গায়ে প্রতিমা শিল্পীরা রঙ লাগাচ্ছে। সেখানেও কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভিড় করে আছে।

গোগোল কখনও প্রতিমা গড়া দেখে নি। কলকাতায় কুমোরটুলিতে প্রতিমা গড়া হয়। দেখতে যাবার ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হয় নি। গোপাল কাকা রিকশা থেকে নেমে গোগোলের হাত ধরে দাঁড়ালেন। বাবা-মাও নামলেন। পরে রিকশা চালকেরা কোন কথা না বলে বা ভাড়া না নিয়েই চলে গেল।

বাবা বললেন, 'রিকশার ভাড়া দেওয়া হল না যে?'

গোপালকাকা বললেন, 'ভাড়া ওদের আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। চল, ভেতরে চল।'

গোগোল প্রতিমার গায়ে রঙ লাগানো দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'আমি একটু ওখানে যাব?'

গোপালকাকা বললেন, নিশ্চয়ই যাবে। আগে বাড়ির ভেতরে চল।

সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক, একটু কিছু খেয়ে নাও। তারপর যতক্ষণ খুশি প্রতিমা গড়া দেখবে।'

ইতিমধ্যে চত্বরে যে সব ছেলেমেয়েরা খেলছিল, সবাই খেলা থামিয়ে গোগোলদের দেখছিল। ঠাকুর-দালানে যারা ছিল, তারাও সিঁড়িতে নেমে এসে গোগোলদের দেখছিল। গোপালকাকা গোগোলের হাত ধরে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি নিতান্ত বিনয় করে বলেছিলেন একটা বাড়ির কথা। আসলে বাড়িটি একটি প্রাসাদের মত। লোহার গজাল পোঁতা বড় দরজা দিয়ে ঢুকলেই ভেতরে হু' দিকে সিমেন্টের তৈরি লম্বা বসার জায়গা। ভিতরে শান বাঁধানো বিরাট উঠোন। আর চারদিকে একতলা দোতলায় থামওয়ালা বারান্দা। বারান্দার ভিতর দিকে সারি সারি ঘব। অনেক মহিলাকেই সে সব ঘরে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে।

গোগোলদের দেখেই তুজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। গোপালকাকা বাবার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এই আমার বড়দা আর মেজদা।'

গোগোল দেখল, গোপাল কাকার তুই দাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা, সাদাসিধে লোক। আগেই শুনেছে, এই তুই দাদা কালনা কোর্টে ওকালতি করেন, তুজনেই হাত জোড় করে নমস্কাব করলেন। বড়দা বললেন, 'আসুন আসুন। আমাদের বিশেষ ভাগ্য, আপনারা এসেছেন।'

বাবা নমস্কার করে বললেন, 'ছি-ছি, ভাগ্য কী বলছেন! আমরা আসতে পেরে খুশি। অনেক দিন ধরেই আসার ইচ্ছে, হয়ে উঠছিল না।'

মা মাথায় ঘোমটা টেনে গোপাল কাকার তুই দাদাকে প্রণাম করলেন। তুজনেই ভারি অপ্রস্তুত হয়ে, ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলেন, 'আহা, কর কি. কর কি?'

মা বললেন, 'ঠিকই করেছি, গুরুজনদের প্রণাম করব না?'

গোগোলও মায়ের দেখাদেখি তাড়াতাড়ি তুজনকে প্রণাম করল। তু' জনেই গোগোলকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন। তারপরেই এসে গেলেন গোপাল কাকার তুই বউদি। মা তাঁদেরও প্রণাম করলেন। তাঁরা বেশ খুশি হয়ে মাকে টেনে নিলেন। গোগোলকেও কাছে টেনে নিয়ে বাঁ দিকের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে টেনে নিয়ে চললেন। বড় জ্যাঠাইমা বললেন, 'আগে আপনাদের ঘরটা দেখিয়ে দিই, তারপরে বসে কথা হবে।'

মা বললেন, 'আমাকে 'আপনি' করে বলবেন না। আর বসে কথা হবে কেন? আমিও আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে করতে কথা বলব।'

সবাই খুব খুশি হয়ে হেসে উঠলেন। বিরাট বাড়ির দোতলার কোন্

দিকে যে নিয়ে চললেন, কিছুই যেন বোঝা গেল না। একটি ঘরে এনে তুললেন সবাইকে। বেশ বড় ঘর, বিরাট মশারি চাঁদোয়া করা খাটের ওপর বিছানা। বড় বড় জানালা দিয়ে আলো বাতাস আসছে। হাত বাড়ালেই একটা ঝাড়ালো লিচু গাছের পাতা ধরা যায়। গোগোল সব থেকে অবাক হল, এ ঘরে কখন হরি ভাই পৌঁছে, স্যুটকেস আর ব্যাগ রেখে গিয়েছে। ইলেকট্রিকের আলো রয়েছে, পাখা নেই।

ঘরের মধ্যে গোপাল কাকার দুই দাদা, দুই বউদি আর তাঁর ছোট ভাই এবং তাঁর স্ত্রী, সবাই মিলে যেন একটা সভা বসে গেল। ওদিকে দরজার কাছে এসে ভিড় করেছে গোগোলের বয়সী বা দু' এক বছরের ছোট একদল ছেলেমেয়ে। গোপালকাকা তাদের ডেকে গোগোলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর ওদের সকলের নাম বলে দিলেন। এরা সকলেই তাঁর ভাইপো ভাইঝি। গোপাল কাকা তাদের বললেন, 'গোগোল একটু কিছু খেয়ে নিক, তারপরে তোমাদের সঙ্গে যাবে। গোগোলের বিষয়ে তোমরা কেউ কিছু জান?'

একসঙ্গে তিন-চার জন বলে উঠলো, 'জানি।'

গোগোল একটু লজ্জা পেয়ে গেল। ওর তখনই সকলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। কিন্তু উপায় ছিল না। গোপাল কাকার ছোট ভাইয়ের বউ অর্থাৎ কাকীমা গোগোলের জন্য খাবার আনতে চলে গেলেন। ওদিকে মা জ্যাঠাইমাদের আর বাবার সঙ্গে জ্যাঠামশাইদের আলাপ জমে উঠেছে। তাঁরা সবাই যে বেশ খুশি হয়েছেন, তা বোঝা গেল।

গোগোল লুচি তরকারি আর মিষ্টি খেয়ে পেট ভরিয়ে সকলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে জুতো মোজা খুলে ফেলল। কারণ সে দেখেছিল, সব ছেলেমেয়েরাই খালি পায়ে রয়েছে। দুপুরের স্নান খাওয়ার আগে পর্যন্ত গোগোল ঠাকুর দালানে বসে প্রতিমার রঙ করা দেখল। তিন জন শিল্পী রঙের কাজ করছিলেন। দু'জন দু'দিকে লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে রঙ করছিলেন। আর একজন দুর্গা প্রতিমাকে। গোগোল অবাক আর মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, মাটির প্রতিমার গায়ে রঙ লেগে আস্তে আস্তে কেমন জীবন্ত হয়ে উঠছিল। রঙ লাগানোর কাজ ওপর থেকে শুরু করে ক্রমে নীচে কার্তিক, গণেশ, অসুর, সিংহের ওপর নেমে আসছিল। পিছনের চালি তখনো খাটানো হয় নি, রঙও লাগানো হয় নি। গোগোল খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। আগামীকাল পঞ্চমী। পরশু ষষ্ঠীপূজা। এর মধ্যে কি করে

সমস্ত ঠাকুর আর চালি রঙ করা হবে?

বড় জ্যাঠামশায়ের ছোট ছেলে রঞ্জিত গোগোলেব বয়সী। সবাই ওকে রঞ্জু বলে ডাকে। ও বললো, 'দেখবে কাল রাত্রের মধ্যে শুধু রঙের কাজ নয়, ডাকের সাজও হয়ে যাবে।'

গোগোল জানে না, ডাকের সাজ কাকে বলে? রঞ্জু আব অন্যান্যরা অবাক হল। পরে বুঝিয়ে দিল, শোলার সাজকে ডাকের সাজ বলে। শোলা দিয়ে যেমন বিয়ের মুকুট তৈরি হয়, তেমনি প্রতিমার শাড়ি অলংকার সবই শোলা আর রাংতা দিয়ে হয়। তখন গোগোলের মনে পড়ে গেল, কলকাতায়ও এ রকম ডাকের সাজ কোথাও কোথাও হয়।

এক সময়ে গোপাল কাকা এসে সবাইকে তাড়া দিয়ে নিয়ে গেলেন দুপুরের স্নান খাওয়ার জন্য। রঞ্জুরা পুকুরে স্নান করতে গেল। কিন্তু গোগোলকে পুকুরে যেতে দেওয়া হল না। অথচ গোগোল তখন এ্যাণ্ডাবসন ক্লাবে মোটামুটি সাঁতার শিখেছে। গোপাল কাকা বললেন, 'তুমি যেখানে সাঁতার শিখেছ, তার সঙ্গে এখানকার পুকুরের অনেক তফাত। জল গভীর, কোন বাঁধানো ঘাট নেই। তুমি সেই পুকুরে নামতে পারবে না। আমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পাব। বঞ্জুরা অনেক আগে থেকে এসব পুকুরে স্নান করে সাঁতার কাটা শিখেছে।'

গোগোল বাড়ি থেকে দু' মিনিটের পথ হেঁটে পুকুব ধারে গেল। বিবাট পুকুর, জল যেন কালো রঙ। রঞ্জু আর দু' তিন জন ছোট ছাড়া, অধিকাংশই বড়রা স্নান করছিলেন। বাড়ি ফিরে গোগোলকে টিউবওয়েলেব জলে স্নান করতে হল। কিন্তু গোগোল একলা আলাদা খেতে কিছুতেই রাজী হল না। মা-ও তাই বললেন, 'বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গোগোল খেতে বসবে।'

বিরাট বাড়ি আর তাব মধ্যে আবার নীচের একটা অংশকে বলা হয় রান্নাবাড়ি। দুটো ঘরে শুধু রান্না হয়। আর বাকি দুটো বড় ঘরে খাওয়াব ব্যবস্থা। রান্নাবাড়ির পিছনেও একটা পুকুর আছে। খোলা জানালা দিয়ে খেতে বসে সেই পুকুর দেখা যায়। আর খেতে খেতেই পুকুর ধারেব বাগান থেকে নানা বকমের পাখির ডাক শোনা যায়। গোগোল কখনো গ্রামের বাড়ির এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে দিন কাটায় নি। সবাইকেই কলাপাতায় করে খেতে দেওয়া হল। দুই জ্যাঠাইমার সঙ্গে মাও এসে সেখানে দাঁড়ালেন। গোগোলের মনে হল, যেন নিমন্ত্রণ বাড়িতে খেতে বসেছে।

খাবার পরেই মা বললেন, 'গোগোল, অনেক ভোরে উঠেছ, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। বেলা দুটো বাজে। চারটের সময় উঠে আবার সকলের সঙ্গে

প্রতিমা দেখতে যাবে।'

গোগোল রঞ্জুদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর ওরা? ওরাও কি ঘুমোতে যাবে?'

গোপাল কাকা বললেন, 'সবাইকেই এখন ঘুমোতে যেতে হবে। ভয় নেই, তোমাকে একলা ফেলে কেউ কোথাও যাবে না।'

গোগোলকে অগত্যা দোতলায় শুতে যেতে হল। কিন্তু ঘুম কোথায়? চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে পাখির ডাক শুনতে লাগল আর ভাবতে লাগল কখন চারটে বাজবে? তবে ঘুমটা এমনই জিনিস, গোগোল জানতেই পারল না, পাখির ডাক শুনতে শুনতে কখন ঘুম এসে ওর চোখে চেপে বসেছে। ঘুম যখন ভাঙল, গোগোল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দেখল, খাটের একপাশে বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা ঘরে নেই। গোগোল খাট থেকে নামল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, তখন বেশ রোদ রয়েছে। ও ঘরের বাইরে গেল। কাকীমা কোথা থেকে এসে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ গোগোল?'

গোগোল বলল, 'রঞ্জুদের কাছে, প্রতিমা দেখতে।'

কাকীমা বললেন, 'মাকে বলে যাও। এস আমার সঙ্গে।' বলে গোগোলের হাত ধরে দোতলার বারান্দার একদিকে নিয়ে গেলেন।

গোগোলের কাছে বিরাট বাড়িটা একটা ধাঁধাঁর মত। বড় বারান্দার ধারে ধারে ঘর। আবার এক এক জায়গায়, ভিতরে ফালি বারান্দা ঢুকে গিয়েছে। তার পাশেও ঘর। এত ঘর কেন? কত লোকই বা থাকে? এ যেন দুর্গের মত মনে হয়। কাকীমা একটা ঘরের সামনে গোগোলকে নিয়ে এলেন। গোগোল দেখল, বড় একটা ঘরে মা দুই জ্যাঠাইমা ছাড়াও আরও কয়েকজন মহিলার সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছেন। গোগোলকে দেখে বললেন, 'এর মধ্যেই উঠে পড়েছ? চারটেও বোধহয় বাজে নি। যাই হোক, ওই জামা-প্যান্ট বদলে নীচে যাও।'

গোগোল তাই গেল। নীচে নেমে ঠাকুর-দালানে গিয়ে দেখল, রঞ্জু নেই। কিন্তু মেজ জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে নন্টু, নন্টুর বোন দীপা বসে আছে। আর গোগোল অবাক হয়ে দেখল, স্নান করতে যাবার আগে প্রতিমার যে রঙ দেখে গিয়েছিল, তার তুলনায় এখন যেন সব ঠাকুরের গায়েই রঙ লাগানো হয়ে গিয়েছে। আর চালচিত্রের গায়ে সাদা রঙ লাগানো শেষ। নন্টু গোগোলকে ডাকল।

গোগোল নন্টুর কাছে গিয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'রঞ্জু কোথায়?'

নন্টু বলতে পারল না। দীপা বলল, 'আমি জানি, রঞ্জুদা সেই পেয়ারা কাঠের গুলতিটা আনতে গেছে হরি ভাই দাদার ছেলের কাছে। হরি ভাই দাদাব ছেলে কালনা থেকে গুলতির রবার আর চামড়া নিয়ে এসেছে।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী রকম জিনিস?'

নন্টু বলল, 'তুমি গুলতি দেখ নি কখনো?'

গোগোল বলল, 'মনে হচ্ছে গল্পের বইয়ে পড়েছি। চোখে দেখি নি কখনো।'

নন্টু আর দীপা খুব অবাক হয়ে গেল। এই সময়েই বঞ্জু এসে উপস্থিত। কিন্তু হাতে তাব গুলতি নেই।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি গুলতি আনতে গেছলে?'

রঞ্জু সন্দেহের চোখে নন্টু আব দীপাব দিকে দেখল। বলল, 'না তো। সেটা এখনো তৈরি হয় নি।'

গোগোল বলল, 'হলে আমাকে দেখিও। আমি কখনো গুলতি দেখি নি।'

গোগোলেব কথা শুনে রঞ্জুও খুব অবাক হল। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু না বলে জিজ্ঞেস কবল, 'বারোয়াবি তলাব ঠাকুব দেখতে যাবে?'

গোগোল বলল, 'যাব।'

'তা হলে চল, ঘুরে আসি।'

গোগোলেব সঙ্গে নন্টু আর দীপাও উঠে দাঁড়াল। বঞ্জু বলল, 'তোবা যাবি নে। আমি গোগোলকে নিয়ে এখুনি ঘুরে চলে আসব।'

নন্টুর বাগ হয়ে গেল। বলল, 'আমি এখুনি গিয়ে ঠাকুব কাকাকে বলে দেব।'

গোগোল জানে, এবা সবাই গোপাল কাকাকে ঠাকুর কাকা বলে। বঞ্জু নন্টুর কথায় কান না দিয়ে গোগোলের হাত ধবে ঠাকুর-দালান থেকে নামতে নামতে বলল, 'বলগে যা। আমবা তো কোথাও দুষ্টুমি করতে যাচ্ছি নে।'

বাড়ির চত্বরের বাইরে বাস্তায় এসে গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'নন্টুকে সঙ্গে নিলে না কেন?'

রঞ্জু বলল, 'ও সব কথা বাড়িতে লাগিযে দেয়। বাবা কাকারা কেউ গুলতি চালানো পছন্দ করেন না। নন্টু দেখতে পেলে সবাইকে বলে দেবে।' বলে সে জামাটা তুলে কোমরে গোঁজা গুলতিটা বের করে গোগোলের হাতে দিল, 'এই হচ্ছে গুলতি। তুমি কখনো দেখ নি?'

গোগোল সত্যি কখনও দেখে নি। ইংরেজী ওয়াই অক্ষরের মত পেয়ারা

কাঠ। ওর সঙ্গে আধ ইঞ্চি চওড়া দুটো লম্বা রবার দু'দিকে বাঁধা, আর রবার দুটোর মাঝখানে গোল একটা চামড়া ফুটো করে বাঁধা। রঞ্জু প্যান্টের পকেট থেকে ছোট ইটের টুকরো বের করে গোগোলের হাত থেকে গুলতিটা নিল। চামড়ার মধ্যে টুকরোটা চেপে ধরে, কাঠের গুলতি তুলে, রবারে টান দিল। আর ইটের টুকরোটা গাছের দিকে ছুড়ে দিল। গোগোল এই সামান্য ব্যাপারেই অবাক আর মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, 'বাঃ, এ দিয়ে তো পাখিও মারা যায়?'

রঞ্জু বলল, 'যায় তো। তবে হাতের টিপ থাকা দরকার। তুমি একটা ছোড়।' বলে পকেট থেকে আর একটা ইটের টুকরো বের করে দিয়ে আবার বলল, 'এঁটেল মাটি দিয়ে গুলি তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। সেটা এখনও করতে পারি নি। পরে করে নেব। এখন এ দিয়েই গুলির কাজ চলবে। তুমি ছোড়।'

গোগোল গুলতিটা বাগিয়ে ধরল। চামড়ার মধ্যে ইটের টুকরো গুঁজে, চারপাশের গাছের দিকে দেখল, কোন পাখি দেখা যায় কী না। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। রঞ্জু একটা গাছের গায়ে কাঠ-বেড়ালি দেখিয়ে বলল, 'ওটাকে তাগ্ কর।'

গোগোল কাঠবেড়ালিটাকে তাগ্ করে রবার টেনে ছোড়বার আগেই কাঠবেড়ালি নিমেষে কোথায় হারিয়ে গেল। আর ইটের গুলি মোটেই ছুটে গেল না। রবারের ঝাপটায় জোর চোট লাগল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে। ব্যথায় ওর মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বুড়ো আঙুলটা লাল হয়ে উঠল। রঞ্জু বলল, 'প্রথম প্রথম ও রকম হয়। চালাতে শিখে গেলে, আর লাগবে না। কিন্তু তোমার হাতে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ডলে দেওয়া দরকার। চল, নদীর ধারেই বারোয়ারি তলা। সেখানে নদীর জল দিয়ে ধুয়ে ডলে দেব।'

দু'জনেই প্রায় ছুটতে ছুটতে, নদীর ধারে বারোয়ারি তলার মাঠে চলে এল। রঞ্জু গোগোলের হাত ধরে নদীর ধারে জলের কাছে নেমে গেল। জলে বেশ স্রোত। গোগোল জানে, এ রকম চোট লাগলে বরফ লাগাতে পারলেই ভাল হয়। নদীর জলও ঠাণ্ডা। হাত ডুবিয়ে, বুড়ো আঙুলটা খানিকক্ষণ ঘষল। তারপরে দুজনেই উঠে এল বারোয়ারি তলার মণ্ডপে। সেখানেও তখন শিল্পীরা প্রতিমার গায়ে রঙ লাগাচ্ছে। বারোয়ারি প্রতিমা বেশ বড়, কিন্তু দেখতে কেমন বেঢপ আর ঢ্যাঙা মত লাগছে। মুখের শ্রীও তেমন সুন্দর নয়।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'কাল পঞ্চমী, এর মধ্যে এরা কাজ শেষ করবে

কী করে?'

রঞ্জু বলল, 'আজ আর কাল সারা রাত কাজ হবে। ষষ্ঠীর দিন সকালবেলা দেখবে সব কাজ আর রঙ হয়ে গেছে। পঞ্চমীর রাত্রে ঘাম তেল লাগাবে।'

'ঘাম তেল কী?' গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রঞ্জু হেসে বলল, 'ঘাম তেল এক রকমের আঁঠা, অনেকটা গঁদের মত তবে আরো পাতলা। সেটা লাগালে প্রতিমার মুখ, অসুর, সিংহ সব চক্‌চক্‌ করে। সকলের শেষে হয় চক্ষুদান।'

গোগোল যত শোনে, ততই অবাক হয়। জিজ্ঞেস করল, 'চক্ষুদানটা কী?'

রঞ্জু বলল, 'চক্ষুদান হল চোখের মণি আঁকা। ওটা খুব কঠিন কাজ। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে প্রতিমার গজ চোখ বা ট্যারা হয়ে যেতে পারে। আব চোখের মণি আঁকা হয়ে গেলে প্রতিমাকে তখন জীবন্ত মনে হয়।'

গোগোল অবাক হয়ে রঞ্জুর কথা শুনল। কত বিষয় ও জানে না। ওর কলকাতাব বন্ধুরাও এসব জানে না। ও বলল, 'তোমবা কত কিছু জান, আমি এসব কিছুই জানতাম না।'

'কিন্তু তুমি তো অনেক বড় বড় ডাকাত ধরেছ শুনেছি।' বঞ্জু বলল, 'প্রতিমার বিষয় জানা এমন কিছু কঠিন নয়। তুমি কী করে ডাকাত ধর?'

গোগোল হেসে বলল, 'আমি কখনো ডাকাত ধরি নি। আমার চোখের সামনে এক একটা ঘটনা ঘটে, সেগুলো খুব অদ্ভুত। কী ঘটছে, আর কেনই বা ঘটছে, সেটা জানবার খুব ইচ্ছে হয়। আর তাতেই আমি জড়িয়ে পড়ি। আমি তো আব সত্যি গোয়েন্দা নই যে ডাকাতের পিছু ধাওয়া করব। যেমন ধর, একবার দিল্লী থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে ফেরবার সময়, ফার্স্ট ক্লাসেব করিডরে, আমার চোখের সামনে একজন আর একজনকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলল। তারপরে লোকটা ভাবল, আমি যখন দেখে ফেলেছি, তখন আমাকে মেরে ফেলা দরকার। তা নইলে আমি সবাইকে বলে দেব। তাই তাবা আমাকেই চুরি করেছিল। গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরের নাম শুনেছ?'

রঞ্জু অবাক হয়ে শুনছিল। বলল, 'না তো!'

'সেবার অশোক ঠাকুরই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। উনি খুব নামকরা গোয়েন্দা।'

দুজনে কথা বলতে বলতে, বারোয়ারি তলা ছেড়ে, জলঙ্গীর তীর দিয়ে চলছিল। খানিকটা যাবার পরেই, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে চোখে পড়ল বিরাট এক পুরনো দোতলা বাড়ি। বাড়ির গায়ে অনেকগুলো শিব মন্দির। বাড়িটা রঞ্জুদের বাড়ির থেকেও বড়। চারদিকে ঘিরে পুরনো পাঁচিল। আর বিরাট সিংহ দরজা। সিংহ দরজাটার একটা পাল্লা বন্ধ। আর একটা খোলা পাল্লা দিয়ে ভিতরে দেখা যায়। মস্ত বড় চত্বরের ওপারে, বড় থামওয়ালা লম্বা বারান্দা। বাড়ির ভিতরে যাবার দরজাটা খোলা, যেন সুড়ঙ্গের মত দেখাচ্ছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি খালি বাড়ি ?'

রঞ্জু বলল, 'না। ভেতরে লোক আছে। এটা খুব বড়লোকের বাড়ি। এটাকে রাজবাড়ি বলা হয়। গত বছরও এ বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়েছে। কিন্তু বাড়ির যিনি কর্তা, তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নাম রামরতন রায়। ওঁকে এখনো সবাই রায় রাজা বলে। উনি খুব ধার্মিক, গরিবদের অনেক দান ধ্যান করতেন। বুড়ো মানুষ, খুব ভাল লোক ছিলেন। আমাদের ডেকে খুব আদর করতেন। কী করে যে পাগল হয়ে গেলেন, কে জানে ? ওঁকে এখন ওপরের চিলে কোঠায় আটকে রাখা হয়েছে। আর সেজন্যই এ বছর থেকে পুজোও বন্ধ হয়ে গেছে।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পাগল হয়ে যাবার পর ওঁকে দেখ নি ?'

রঞ্জু বলল, 'সামনে থেকে দেখি নি। বাড়ির পেছন দিকে, পুকুর ধারের উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে ওঁকে চিলে কোঠার জানালায় দেখতে পেয়েছি। উনিও আমাদের দেখতে পান, আর হাতছানি দিয়ে ডাকেন। আমরা দেখলেই পালিয়ে যাই।'

গোগোল বলল, 'কেন পালিয়ে যাও ? উনি হয় তো তোমাদের কিছু বলতে চান।'

রঞ্জু হেসে বলল, 'পাগল আবার কী বলবে ? দেখলে ভয় হয় না ? আর ডাকলেই বা ওঁর কাছে যাব কেমন করে ? তা হলে পাঁচিল ডিঙিয়ে চিলে কোঠার নীচে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু তা তো হয় না। আর বাড়ির ভেতরে ঢুকেও ওঁর কাছে যাওয়া যায় না। ওঁকে সব সময়েই পাহারা দিয়ে রাখা হয়, যাতে বাড়ি থেকে বেরোতে না পারেন।'

'বেরোলে কী হবে ?'

'বাঃ কোথাও হারিয়ে যেতে পারেন। পাগলকে কিছু বিশ্বাস আছে ? হয় তো মারধোর করবেন।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'ওঁর কে আছে ?'

'এক ছেলে আছে, আমাদের ঠাকুর কাকার বয়সী। রামগোপাল রায় তাঁর নাম। তাঁর বউ আর ছেলেমেয়ে আছে। এক ছেলে আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়ে, তার নাম রামকুমার। আমরা কুমার বলে ডাকি।'

'কুমারও কি বলে, ঠাকুর্দা পাগল ?'

'হ্যাঁ, বলে, ঠাকুর্দা এক এক সময় নাকি খুব চিৎকার করেন, দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারেন। কুমারদের কাছে যেতে দেওয়া হয় না।'

গোগোলের খুব কৌতূহল হল। বলল, 'চল তো পেছনের পুকুরের সেই ঢিবির ওপরে যাই। দেখি, ওঁকে দেখা যায় কি না ?'

রঞ্জু রায়বাড়ির বিরাট চৌহদ্দির পাঁচিলের ধার দিয়ে ঘুরে পিছনের পুকুর ধারের ঢিবির ওপরে উঠল। গোগোলকে আঙুল দিয়ে চিলেকোঠার খোলা জানালাটা দেখাল। গোগোল দেখল, জানালায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। জানালাটার দু'পাশেই গাছ। ফাঁক দিয়ে পুরো জানালা দেখা যায়। গোগোল বলল, 'ওঁকে তো দেখা যাচ্ছে না ?'

'সব সময় দেখা যায় না। এক এক সময় দেখা যায়।' রঞ্জু বলল। তারপরে কী ভেবে আবার বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, একটা কাজ করি। তা হলে উনি হয় তো জানালায় আসতে পারেন।' বলেই, খুব জোরে চিৎকার করে নন্টুর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

এরকম কয়েকবার ডাকার পরেই দেখা গেল, জানালায় একটা মূর্তি ভেসে উঠল। দূর থেকেও বোঝা গেল, তাঁর মুখে সাদা গোঁফ আর দাড়ি। মাথার সাদা চুলগুলোও বড় বড়। মুখ চোখ পরিষ্কার দেখা যায় না। উনি রঞ্জু আর গোগোলকে দেখে জানালার বাইরে হাত বের করে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। আর ঘাড়টাও ঝাঁকালেন। রঞ্জু বলল, 'দেখেছ ?'

গোগোল এত অবাক হয়ে গেল, যেন ওর গলায় কথা ফুটতে চায় না। কোনরকমে বলল, 'দেখেছি।'

'এবার চল, পালিয়ে যাই।'

'পালাব কেন ?'

'তোমার ভয় করছে না ?'

'ভয় করবে কেন ? উনি তো কত দূরে, ওপরের চিলেকোঠায়। ওখান থেকে তো আর আমাদের ধরতে আসতে পারবেন না।'

'তবু আমার কেমন ভয় করে।'

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, উনি কিছু বলতে চান। ওখানে চিলে কোঠার

নীচে যাওয়া যায় না?'

রঞ্জু খপ্ করে গোগোলের হাত চেপে ধরে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! কুমারের বাবা ভীষণ রাগী লোক। টের পেলে আর আস্ত রাখবেন না। চল, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই।' বলে এক রকম জোর করেই গোগোলকে টেনে নিয়ে চলল।

গোগোল ঢিবি থেকে নামবার আগে একবার চিলেকোঠার জানালার দিকে দেখল, রায় রাজা তখনও জানালায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছিলেন।

ইতিমধ্যে দু' দিন কেটে গেল। পূজা আর ঢাকের বাজনায় গোপাল কাকাদের বাড়ি জমজমাট। ওঁদের আরও আত্মীয়স্বজন এসেছেন। বাড়ি ভর্তি লোক।

গোগোল সকলের সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দ করে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে গ্রাম ঘুরতেও যায়। কখনও রঞ্জুর সঙ্গে দুজনে দুটো সাইকেল চেপে বেড়ায়। কিন্তু গোগোলের চোখের সামনে সেই চিলেকোঠার জানালা, আর সেই সাদা গোঁফ-দাড়িওয়ালা মুখটি থেকে থেকেই ভেসে ওঠে। হাতছানি দেখতে পায় আর ভাবে, পাগলে কি ও রকম হাতছানি দিতে পারে? ওর মনে সেই সন্দেহটাই থেকে গিয়েছে, উনি বোধহয় পাগল নন। কিছু বলতে চান। অথচ এসব কথা রঞ্জু বা কারোকে বলে কোন লাভ নেই।

নবমী পুজোর দিন পর্যন্ত গোগোল পুজো নিয়ে মেতে রইল। দশমীর দিন সকালবেলা ও সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে, রঞ্জুর গুলতিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রঞ্জু কিছু মাটির গুলি তৈরি করেছিল। সেগুলো শুকিয়ে বেশ শক্ত হয়েছে। সেই গুলিও কিছু পকেটে পুরে নিল। তারপর পথ চিনে চিনে ঠিক সেই রায়বাড়ির পিছনে, পুকুর ধারের ঢিবির ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, জানালায় কেউ নেই। গোগোল ইতিমধ্যে গুলতি চালাতে শিখে গিয়েছিল। ও জানালা লক্ষ্য করে গুল্‌তি দিয়ে একটা গুলি ছুড়ল। কিন্তু গুলিটা জানালা পর্যন্ত পৌঁছুল না। ও আর একবার যতটা সম্ভব এবার জোরে টেনে, আর একটা গুলি ছুড়ল। সেটা জানালার কাছে, গাছে গিয়ে লাগল। কোন কাজই হল না। মনটা দমে গেল। বুঝতে পারল, গুল্‌তির গুলি ছুড়ে ও জানালায় মারতে পারবে না। রঞ্জুর চিৎকারের কথা মনে পড়ল। কিন্তু চিৎকার করতে ওর ভয় হল, পাছে কেউ শুনে এদিকে এসে পড়ে।

গোগোল কী করবে, সাত পাঁচ ভাবছে। এই সময়ে হঠাৎ দেখা গেল,

জানালায় সেই সাদা গোঁফ-দাড়ি ভরতি মুখ। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপরে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। গোগোল ঢিবির সামনের দিকে এগিয়ে এল। রামরতন রায়, যাঁকে রায় রাজা বলা হয়, তিনি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আঙুলের ইশারায় পাঁচিলের একদিকে বারে বারে দেখাতে লাগলেন।

গোগোল সেদিকে তাকিয়ে দেখল, উনি একটা গাছের দিকে দেখাচ্ছেন। গাছটা পাঁচিলের গায়ে। তার একটা মোটা ডাল পাঁচিলের ওপারে বাড়িব মধ্যে গিয়ে পড়েছে। গোগোল রায় রাজার ইশারাটা বুঝল। তিনি ওকে সেই গাছ বেয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতে বলছেন।

গোগোল হাত তুলে ইশারা করল, ও যাচ্ছে। তারপরে গুলতিটা প্যাণ্টেব কোমরে গুঁজে ঢিবি থেকে নেমে এল। তখন আর জানালাটা দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু গাছটা ঠিক চিনতে পারল। ওর পায়ে ছিল স্যাণ্ডেল। স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে গাছেব ওপর উঠল। পাঁচিলটা খুব উঁচু নয়। পাঁচিলের ওপর উঠতেই চিলেকোঠার জানালাটা আবার চোখে পড়ল। রায় রাজা সেখানে দাঁড়িয়ে। হাতের ইশারায় গাছের ডাল বেয়ে নেমে আসতে বললেন।

গোগোল এখন রায় রাজার মুখটা অনেক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ওঁকে মোটেই পাগল বলে মনে হচ্ছে না। বরং বেশ স্বাভাবিক, আব খুব সাবধানী। গোগোল বাড়িটার দিকে দেখল। পিছন দিকে দরজা-জানালা অধিকাংশই বন্ধ। গোটা দুয়েক জানালা খোলা রয়েছে। লোকজন কাবোকে দেখা যাচ্ছে না।

গোগোল ভিতরে, নীচের দিকে হেলে পড়া ডাল ধরে ধরে নেমে এল। মুখ তুলে রায় রাজার দিকে দেখল। তিনি ইশারায় জানালার নীচে আসতে বললেন। গোগোল ঘাসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে জানালার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটা মুখ বন্ধ খাম ওর পায়ের কাছে পড়ল। ও খামটা তুলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখল, গোপাল কাকার বড়দা, শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য নাম লেখা রয়েছে। ও ওপর দিকে তাকাল। দেখল রায় রাজা ওকে তাড়াতাড়ি চিঠিটা পকেটে রাখতে ইশারা করছেন আর তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলছেন।

গোগোলের বুক পকেটে খামটা ধরল না। প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল পাঁচিলের সেই হেলে পড়া গাছের ডালের দিকে। সেটা ধরে উঠতে না উঠতেই পিছনে পুরুষের গলা শোনা গেল,

'কেরে তুই? কে?'

গোগোলের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল। ও পিছন দিকে না তাকিয়ে কোন রকমে পাঁচিলের ওপর উঠল। তখন বাড়ির ভিতর চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছে, 'কে একটা ছেলে বাড়ির পেছন দিকে ঢুকেছিল। শীগ্‌গির ওকে পাকড়াও কর। যেমন করে হোক, ধরা চাই।'

গোগোল পিছন ফিরে দেখল, একজন লাঠিধারী ওর দিকেই ছুটে আসছে। ও বাইরের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। কিন্তু বেয়ে নামবার সময় পেল না। প্রায় সাত ফুট ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে, দৌড় দিল।



কোন্ দিকে দৌড়ুচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছুই জানে না। কেবল প্রাণপণে ছুটছে। পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া পড়েই রইল। কেবল শুনতে পেল, 'কোথায় গেল? কোন্ দিকে? তোরা সব বসে বসে গিলিস আর ঘুমোস। এদিকে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।'

গোগোল হঠাৎ দেখল, ও নদীর ধারে এসে পড়েছে। কিন্তু দাঁড়াবার উপায় নেই। সামনে যে রাস্তা পেল, সেই রাস্তা ধরেই ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে এক সময়ে রেল লাইনের ধারে, লেবেল ক্রসিংয়ের সামনে এসে পড়ল। দেখল, ও স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে। তার মানে, একেবারে উল্টো দিকে এসে পড়েছে। দরদর করে ঘামছে, আর বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করছে। কেবল একটাই সান্ত্বনা, এদিকে ওকে কেউ তাড়া করে আসে নি। তবু ও লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, খামটা ঠিকই আছে।

গোগোলের আশেপাশে দু' চারজন লোক। কেউ ওকে তেমন লক্ষ্য করে দেখল না। আর ও তখন অবাক হয়ে ভাবছে, রায় রাজা খামটার ওপরে দুলাল ভট্টাচার্য নাম লিখেছেন। সেজন্যই কি উনি বঙ্কুকে দেখলেই ডাকতেন? গোগোল খামটা বের করল। আবার দেখল, শুধু শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য লেখা নেই, আরও লেখা আছে, 'বি. এ. বি. এল. কাল্‌না কোর্টের উকীল।' তার মানে, বঙ্কুর বাবাকেই খামটা পাঠানো হয়েছে।

গোগোল সামনেই পায়ের শব্দে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি খামটা প্যাণ্টের পকেটে পুরে ফেলল। দেখল, একটি সাধারণ চাষী মানুষ মাথায় বোঝা নিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু গোগোল এখন ফিরবে কেমন করে? এতক্ষণে গোপাল কাকার বাড়িতেও নিশ্চয় ওকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গিয়েছে। ও প্ল্যাটফরম থেকে রাস্তার দিকে দেখল। দু' চারজন লোক যাতায়াত করছে। লাঠি হাতে কারোকেই ছুটে আসতে দেখা যাচ্ছে না। তবু গোগোল আধ ঘণ্টার মত স্টেশনে কাটিয়ে দিল।

এক সময়ে রেলের ঘণ্টা বেজে উঠতেই ও আস্তে আস্তে প্ল্যাটফরম থেকে নেমে এল। লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে আসতেই দেখল, একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। চালকটির মুখ চেনা। প্রথম দিন এর রিকশাতে চেপেই গোগোল গোপাল কাকাদের বাড়ি গিয়েছিল। রিকশাচালকও গোগোলের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি সেদিন গোপালবাবুর সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছিলে না?'

গোগোল বলল, 'হ্যাঁ। আমি ভুল করে স্টেশনে এসে পড়েছি।

আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দেবেন?'

রিকশাচালক চিন্তিত হয়ে বলল, 'কিন্তু এই ট্রেনে যে আমার প্যাসেঞ্জার আসছে। আগে থেকে কথা হয়ে রয়েছে।'

গোগোল করুণ মুখ করে বলল, 'বাড়িতে সবাই ভাবছে। আমি তো চিনে যেতে পারব না।'

রিকশাচালক একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা চল। ট্রেনটা আসবার আগে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি কী না দেখি।'

গোগোল লাফিয়ে রিকশায় উঠে বসল। রিকশাচালক জোর কদমে রিকশা চালাল। গোগোল কেবল সামনের দিকে দেখছে। রায় রাজার বাড়ির লোকেরা কেউ রাস্তা আগলে আছে কী না, কে জানে? বিশেষ করে একজন ওকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। সে নিশ্চয়ই ওকে চিনতে পারবে।

রিকশা এত জোরে ছুটছিল, গোগোলকে দু'দিকে শক্ত করে ধরতে হল। খারাপ রাস্তার ঝাঁকুনিতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। রিকশা যখন বাঁ দিকে ছুটল, তখন দেখল দুজন লাঠি হাতে লোক সোজা রাস্তা থেকে এদিকে ছুটে আসছে। গোগোলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। শুনতে পেল, একজন বলছে, 'এ ছেলেটা নাকি?'

আর একজন জবাব দিল, 'তাই যেন মনে হচ্ছে।'

গোগোলের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল। শুনতে পেল, 'এই রিকশা, দাঁড়া তো।'

গোগোল বলল, 'একদম দাঁড়াবেন না, জোরে ছুটুন।'

রিকশাচালক ওর কথাই রাখল। লোক দুটো তখন পিছনে পিছনে ছুটে আসছে, আর চিৎকার করছে, 'এই রিকশা, দাঁড়া বলছি—'

রিকশা যখন গোপাল কাকাদের বাড়ির চত্বরের সামনে, লোক দুটো তখন রিকশার পিছনটা টেনে ধরল। গোগোল এক লাফ দিয়ে নেমে একেবারে বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল। আর অনেকে হই হই করে উঠল, 'এই যে গোগোল এসেছে! গোগোল এসেছে!'

গোগোল ছুটতে ছুটতে একেবারে দোতলায়। গোপাল কাকা বাবা আরও কয়েকজন ছুটে ওপরে গেলেন। গোগোল ঘরের মধ্যে ঢুকে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। গোপাল কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে গোগোল? তুমি কোথায় গেছলে? তোমার মুখ এত লাল কেন? ঘেমে জল হয়ে গেছ যে!'

রঞ্জু বলে উঠল 'গোগোল নিশ্চয়ই পাগল রায় রাজার কাছে গেছল।'

গোগোল তখনও হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'হ্যাঁ। উনি চিলেকোঠার জানালা দিয়ে বড় জ্যাঠামশাইকে একটা চিঠি দিয়েছেন। আমি সেটা নিয়ে এসেছি।'

গোপাল কাকা বললেন, 'আশ্চর্য, যেখানে তুমি, সেখানেই একটা ঘটনা?'

মা বললেন, 'এটাই তো আমার অশান্তি।'

এই সময়ে বড় জ্যাঠামশাই এলেন। গোগোল প্যান্টের পকেট থেকে খামটা বের করে তাঁর হাতে দিল। তিনি অবাক হয়ে খামটা নিলেন। ঘরের মধ্যে তখন মা বাবা গোপাল কাকা দুই জ্যাঠাইমা কাকীমা, অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। বড় জ্যাঠামশাই খামের ওপর চোখ বুলিয়ে বন্ধ মুখ ছিঁড়লেন। একটি কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে সবাইকে শুনিয়ে পড়লেন, 'শ্রীমান দুলাল ভট্টাচার্য, স্নেহভাজনেষু, বাবা দুলাল, আমি বিশেষ সুযোগের সন্ধানে আছি, কি প্রকারে এই চিঠিটি তোমাকে পাঠাইব? ঈশ্বর সুযোগ দিলে তবেই পাঠাইতে পারিব। তবু লিখিয়া রাখিলাম। আমি পাগল, এই রকম প্রচার করা হইয়াছে। ইহা আমার পুত্র রামগোপালের একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। তাহার অতি হীন ও দুষ্ট প্রকৃতির কথা তোমরা গ্রামবাসিগণ কিঞ্চিৎ অবগত আছ। সম্পত্তির বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে আমার ঘোরতর মতভেদের কারণেই সে আমাকে পাগল বলিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়া এক রকম কারাবাসে বন্দী করিয়াছে। সব সময়েই আমাকে দিয়া যাবতীয় সম্পত্তি তাহার নামে লিখাইয়া লইবার জন্য নানাপ্রকার পীড়ন করিতেছে ও ভয় দেখাইতেছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার মারফত কাল্‌নার মহকুমা শাসকের নিকট একটি আবেদনপত্র পাঠাইতেছি। তুমি পত্র পাইবা মাত্র মহকুমা শাসকের হাতে আমার আবেদনপত্রটি পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবে। নচেৎ আমার সমূহ বিপদ। আশা করি, আমার কথা রাখিবে।—ইতি, আশীর্বাদান্তে, রামরতনকাকা।'

সকলের মুখ দিয়ে বিস্ময়সূচক শব্দ বেরোল। বড় জ্যাঠামশাই আর একটি কাগজ বের করলেন। সেটির ভাঁজ খুলেও পড়লেন, 'মাননীয় মহকুমা শাসক মহাশয় সমীপেষু, কাল্‌না, বর্ধমান; মহাশয়, আমি গ্রামনিবাসী শ্রীরামরতন রায় আপনার শরণাপন্ন হইয়া জানাইতেছি, আমার একমাত্র পুত্র সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার দাবী করিয়া, আমার দ্বারা উইল লেখাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে। সে আমাকে পাগল প্রচার করিয়া গৃহ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। সে অত্যন্ত হীনচেতা ও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ। নিজের সন্তান সম্পর্কে বাধ্য

হইয়া এইসব সত্য কথা আমাকে লিখিতে হইতেছে। সে আমাকে নানারকম পীড়ন করিতেছে এবং মৃত্যুভয় দেখাইতেছে। আপনি অবিলম্বে আমাকে মুক্ত না করিলে হয় তো আমাকে এই জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব আমার বিশেষ আবেদন, আমাকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং আমার সম্পত্তি বিষয়ে আপনার সমক্ষেই আমি আমার দানপত্র লিখিতে ইচ্ছা করি। জানিবেন, আমি অতি বিপদগ্রস্ত, বিলম্ব করিবেন না।—ইতি নমস্কারান্তে ভবদীয়, শ্রীরামরতন রায়।'

বড় জ্যাঠামশাইয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি গোগোলকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি সাহসের সঙ্গে একটা বড় কাজ করেছ। আমাকে এখনই কাল্‌নায় যেতে হবে। যদিও আজ ছুটির দিন, তবু আমাকে যেতে হবে। হয় তো এস. ডি. ও. কাল্‌নাতেই আছেন। ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর।'

গোপাল কাকা বললেন, 'আজ কেন যাবেন? আজ বিজয়া দশমী, বাড়িতে আজ বিসর্জন, আপনি গেলে কি চলে?'

বড় জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি না গেলে রামরতন কাকার হয় তো জীবন বিসর্জন হয়ে যাবে, এটা মনে রেখো। এখনই ট্রেন আছে, আমি চলি।'

বড় জ্যাঠাইমা বললেন, 'কিছু খেয়ে যাও, আর সঙ্গে কারোকে নিয়ে যাও।'

বড় জ্যাঠামশাই বললেন, 'তা যাব। তোমরা বাড়িতে বিজয়া দশমীর যা কিছু অনুষ্ঠান সবই কর। আমি কোথায় গেছি, এসব কথা যেন প্রচার না হয়, খুব সাবধান। আর গোগোলকে একেবারে ঘরের বাইরে যেতে দেবে না। কোথা থেকে কী বিপদ ঘটবে, কিছুই বলা যায় না।'

সকলেই গোগোলের দিকে তাকালেন। মেজ জ্যাঠাইমা গোগোলকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আমাদের প্রাণ থাকতে গোগোলকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না।'

বিজয়া দশমীর দিন বাড়িতে কেমন একটা বিপদের ছায়া ও বিষণ্ণতা নেমে এল। বড় জ্যাঠামশাই হরি ভাই এবং আরও দুইজন লোকসহ চলে গিয়েছেন। এদিকে বিকালেই বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল। গোগোলকে নীচে নামতে দেওয়া হয় নি। ও দোতলার জানালা থেকেই সব দেখছে। বাড়ির এবং পাড়ার মহিলারা সবাই দুর্গাকে বরণ করলেন। তাতেই সন্ধ্যা

হয়ে গেল। তারপরে প্রতিমাকে ঠাকুর-দালানেব বাইরে নিয়ে আসা হল।

অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল। গোপাল কাকা আর তাঁব দাদা, ছোট ভাই, আরও অনেকে প্রতিমাকে বিরাট বাঁশের চালিতে করে কাঁধে তুলল। এক সঙ্গে তখন অনেক ঢাক বাজছে। বঞ্জুরা সবাই বিসর্জনে গেল। গোগোলেব মন খাবাপ হয়ে গেল। শুনল, প্রতিমা নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ কবে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হবে। ও কখনও বিসর্জন দেখে নি। কিন্তু ওব যাবাব কোন উপায় নেই।

প্রতিমা নিয়ে চলে যাবাব পবে, বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেল। ঠাকুব-দালানে একটি প্রদীপ জ্বলছে। চাবদিকে যেন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। এই সময়ে তিনটি গুণ্ডামত লোক মুখে কালো কাপড় বেঁধে, লাঠি হাতে বাড়িব দবজায় এল। তাবা বাড়িব ভিতবে ঢুকে চিৎকাব কবে বলল, 'কলকাতা থেকে কে একটা ছেলে এসেছে, তাকে আমবা চাই।'

বাড়িতে তখন একজন পুরুষও নেই। বড় জ্যাঠাইমা দোতলাব সিঁড়িব দরজা বন্ধ কবে দিলেন। ঝিয়েবা কান্না জুড়ে দিল। মেজ জ্যাঠাইমা ওপব থেকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'তোমবা কে?'

তিন জনেব একজন বলল, 'আমবা যেই হই, কলকাতা থেকে আপনাদেব বাড়িতে যে ছেলেটি এসেছে, তাব নাম গোগোল। তাকে আমবা চাই'

মেজ জ্যাঠাইমা বললেন, কেন চাও?'

লোকটা কর্কশ স্বরে বলল, 'সে কথা পবে হবে। আগে তাকে বেব কবে দিন।'

মেজ জ্যাঠাইমা বললেন, 'দিচ্ছি, তোমবা ওপবে উঠ না, নীচেই অপেক্ষা কব।'

বলে তিনি ছুটে একটা ঘবেব মধ্যে গেলেন। সেখান থেকে বন্দুক বেব কবে তাব মধ্যে গুলি ভবে বাবান্দায় বেবিয়ে এলেন। বাশভাবী গলায় বললেন, 'তোমবা যদি এখুনি না চলে যাও, তা হলে আমি গুলি চালাব, তোমাদেব মাথা উড়িয়ে দেব।'

লোক তিনটি নীচেব উঠোনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। গোগোলকে তখন একটা ঘরের মধ্যে দবজা বন্ধ কবে রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ও সবই শুনতে পাচ্ছে।

একটি লোক বলল, 'আপনার বন্দুকে ক'টা গুলি আছে? আপনি কি বন্দুক চালাতে পাববেন? আমবা জানি, আমাদেব মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছেন। আমবা দোতলায় উঠছি।'

লোকটার কথা শেষ না হতেই মেজ জ্যাঠাইমা উঠোনের এক পাশে গুলি ছুড়লেন। লোক তিনটে লাফিয়ে দরজার কাছে সরে গেল। মেজ জ্যাঠাইমা বললেন, 'এখনো ভাল চাও তো সরে পড়, নইলে এবার তোমাদের মাথা তাগ্ করে গুলি করব।' বলেই আবার দরজার চৌকাঠে একটা গুলি করলেন।

'ওরে বাবা, এ যে রায়বাঘিনী।' একটা লোক বলে উঠল। আর তিন জনেই ছুট দিল।

এদিকে বন্দুকের শব্দ শুনে কিছু লোক বাড়ির দিকে ছুটে এল। লোক তিনটে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাল। মেজ জ্যাঠাইমা উপর থেকে চিৎকার করে ঘটনা সব বললেন। অমনি সবাই হইহই-রইরই করে ছুটল। গোপাল কাকাও বিসর্জন শেষ করে বাড়ি ফিরলেন। একটু পরেই হরি ভাই এসে খবর দিল, এস. ডি. ও. পুলিস বাহিনী নিয়ে রায়বাড়ি ঘিরে ফেলেছেন।

তখন গোগোলকে ঘরের থেকে বের করা হল। আর বাড়িতে বিজয়া দশমীর আনন্দ শুরু হল।

ঘণ্টাখানেক পরে এস. ডি. ও., বড় জ্যাঠামশাই এবং স্বয়ং রায় রাজা এলেন। তিনি গোগোলকে দেখতে চাইলেন। গোগোল কাছে আসা মাত্র তিনি তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখে তাঁর জল। ধরা গলায় বললেন, 'দাদু, তুমি আমাকে মুক্ত করেছ, প্রাণে বাঁচিয়েছ। মা দুর্গা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তোমার মত সাহসী ছেলে না হলে আমি আর বাইরের জগতে আসতে পারতাম না।'

সে দৃশ্য দেখে সকলের মুখেই হাসি ফুটল। অথচ চোখে সকলের জল।

এস.ডি.ও. কাছে এসে গোগোলের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'তোমার মত সাহসী ছেলে আজ দেশে দরকার। তুমি একটি অমূল্য প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

গোপাল কাকা বললেন, 'আজ আমরা দুর্গামায়ী কি জয় বলব, তার সঙ্গে গোগোলের জয় বলব। বল জয়, গোগোলের জয়।'

সব ছেলেমেয়ে একসঙ্গে ধ্বনি দিল, 'জয় গোগোলের জয়।'

বলেই সবাই গোগোলের সঙ্গে কোলাকুলি করার জন্য নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করে দিল। গোগোল তখন গুরুজনদের প্রণাম করতে ব্যস্ত। যদিও সবাই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই চাইছেন।



জোনাকি ভূতের বাড়ি

গোগোলের আপন মামা ছাড়াও, আরও কয়েকজন মামা আছেন। তাঁরা সকলেই মায়ের নানারকম সম্পর্কের দাদা বা ভাই। মায়ের নিজের সহোদর দাদা বা ভাই, সকলেই থাকেন কলকাতা থেকে বেশ দূরে। ছোটমামা তো কিছুকাল আগেও লখনৌতে ছিলেন। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে এসেছেন।

মায়ের এক পিসতুতো ভাই থাকেন রানাঘাটে। নাম হেরম্বকুমার চক্রবর্তী। মা তাঁকে হারুদা বলে ডাকেন। গোগোল বলে হারুমামা। হারুমামার বাড়ি রানাঘাটে। তিনি চাকরিও করেন রানাঘাটে খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে। মাঝে-মধ্যে কলকাতায় এলে, গোগোলদের বাড়িতে আসেন। মানুষটি সাদাসিধে। মুখে হাসি লেগে থাকে, কিন্তু কথা বলেন কম। রোগা বলা চলে না, তবে বেশ লম্বা। ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া তাঁকে আর কোনো বেশেই দেখা যায় না। সত্যি বলতে কী গোগোলের মনে হয়েছে, ওর আপন বা অন্য সম্পর্কের মামাদের মধ্যে হারুমামা বোধহয় সব থেকে গরিব। তিনি নিজেও বলেন, 'গোগোল, আমি তোমার এক গরিব মামা। তোমার মা বাবাকে এত করে বলি, একবার রানাঘাটে আমাদের

বাড়ি আসতে। কিছুতেই নাকি ওদের সময় হয় না। তুমিই একবার বাবা-মাকে জোর করে নিয়ে চলো।'

হারুমামা গরিব বলে বাবা-মা যেতে চান না, তা ঠিক নয়। তবে তিনি যতবার এসেছেন, প্রত্যেকবারই মা আর বাবাকে রানাঘাটে যাবার কথা বলেছেন। মা-বাবা বলেন, যাব। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। অথচ, কলকাতা থেকে রানাঘাট কত কাছে। হারুমামার মুখে গোগোল শুনেছে, তাঁদের বাড়ির কাছেই চুর্নি নদী। আসলে তাঁদের বাড়ি চুর্নি নদীর ওপারে। কালীনারায়ণপুরে। রানাঘাট বললে লোকে সহজে বুঝতে পারে বলে, রানাঘাটের নাম করেন। রানাঘাটের ওপারে চুর্নি নদীর ধারেই তাঁদের বাড়ি। কালীনারায়ণপুর গ্রাম হলেও, সেখানে হাটবাজার গঞ্জ আছে। গ্রামটাও নাকি খুব বড় আর অনেককালের প্রাচীন। বাড়িতে আছেন মামিমা, আর গোগোলের থেকে দু বছরের বড় এক মামাতো দাদা, গোগোলের থেকে বছর পাঁচেকের ছোট একটি বোন। সেই দাদা আর বোন, জীবনে মাত্র দু'বার নাকি কলকাতায় এসেছে। একবার চিড়িয়াখানা দেখতে; আর একবার জাদুঘর আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। হারুমামা হেসে বেশ সহজভাবেই বলেন, 'আমার সময় হয় না। তা ছাড়া কলকাতায় বেড়াতে আসতে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। আমি গরিব মানুষ, বেড়াবার টাকা কোথায় পাব!'

গোগোলের খুব ইচ্ছে, কালীনারায়ণপুরে হারুমামার বাড়ি বেড়াতে যায়। মা-বাবাকেও অনেকবার বলেছে। মা-বাবা খালি বলেন, 'হ্যাঁ, যাব। দু একটা দিন হাতে নিয়ে যেতে হবে তো। ফাঁক পেলেই একবার ঘুরে আসব।'

হারুমামা এমনিতে কম কথা বলেন। কিন্তু গোগোলের সঙ্গে অনেক কথা বলেন। গোগোলের চেষ্টায়, কাশ্মীরের সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা ধরা পড়ার পর থেকেই, তিনি ওকে আদর করে 'খুদে গোয়েন্দা' বলে ডাকেন। তারপরে যত ঘটনা ঘটেছে সবই তিনি গোগোলের মুখ থেকে শুনেছেন। আবার তিনিও গোগোলকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। সবই অনেককালের আগের ডাকাতদের গল্প। বলতে-বলতে আবার হেসে মজা করে বলেন, 'সেই সব ডাকাতদের আমলে তুমি যদি থাকতে, তা হলে কী ঘটত, আমি তাই ভাবি।'

রানা ডাকাতের গল্প গোগোল হারুমামার কাছ থেকেই প্রথম শুনেছে। রানা ডাকাতের নাম থেকেই নাকি জায়গাটার নাম রানাঘাট হয়ে গেছে। হারুমামা অবশ্য সেটা নিশ্চয় করে বলতে পারেন না। তবে রানাঘাটের

লোকে তা-ই বলে। গল্পটাও খুব দারুণ। রানা ডাকাত নাকি আদপে মানুষ খুন করত না। সে টাকা-পয়সা-সোনা-দানা যা চাইত, তা পেলেই চলে যেত। নেহাত কেউ কথা না শুনলে, দু চার ঘা লাগিয়ে দিত।

সব থেকে আশ্চর্য রানার ডাকাত হওয়ার গল্প। যা শুনে, গোগোল মনে-মনে রানাকে ভালবেসে ফেলেছে। আসলে রানাঘাটের নাম নাকি ছিল ব্রহ্মডাঙা। কতকাল আগের কথা হারুমামা ঠিক বলতে পারেন না। তাঁব ধারণা দুশো বছর আগের ঘটনা। রানা ছিল ব্রহ্মডাঙার এক গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে। তার ছিল এক ছোট বোন। সেকালে মেয়েদের ন' দশ বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যেত। বোনকে সে খুব ভালবাসত। কিন্তু তারা এত গরিব ছিল, কিছুতেই বোনের বিয়ে দিতে পাবছিল না। সেকালের সমাজও ছিল খুবই নিষ্ঠুর। গরিব হলেও, তাবা মানতে চাইত না। তাদের এক কথা, যেমন করে হোক মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে।

রানার বোনের বয়স দশ পেরোতেই গাঁয়ের লোকেরা যা-তা বলতে আরম্ভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত ঘটিবাটি বিক্রি করে, আর রানার মায়েব যেটুকু সোনা ছিল, তা দিয়েই বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। হলে হবে কী! সোনাব গহনা যা দেবার কথা ছিল, তাব থেকে একটু কম হয়ে গেছল। তা দেখেই, বরের বাবা বরকে বিয়ের পিঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ওদিকে রানাব বোন তখন কনে সেজে বসে আছে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ঘটনাটা খুবই অপমানকর আর লজ্জার। রানার বোন ভোরবাত্রে, বাড়িব পিছনে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা কবে। তারপর থেকেই রানা বাড়ি থেকে চলে যায়। কোথায় যায়, কেউ জানত না। তাব বোনের শোকে বাবা-মা-ও বেশিদিন বাঁচেননি।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে রানা ডাকাতের আবির্ভাব। তার নাম শুনলেই বড়লোকদের বুক কেঁপে উঠত। কিন্তু সে ডাকাতি করার জন্যই ডাকাত হয়নি। সে চারদিকে খবব রাখত, কোথায় কোন গবিব লোক টাকার অভাবে তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। খবর পেলেই, সে তার দলবল নিয়ে, চুর্নি নদীতে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। কোনও ধনী যাত্রীর নৌকো পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সোনা-দানা টাকা পয়সা যা পেত, লুট করে নিয়ে, সেই গরিব মেয়ের বাবা-মাকে দিয়ে আসত। গরিবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যেত নির্বিঘ্নে। আসলে, সে চাইত, কোনও গরিবের মেয়েই যেন তার বোনের মতো অভাবে আর অপমানে, জলে ডুবে না মরে।

হারুমামার কাছ থেকে রানা ডাকাতের গল্প শোনার পরে, গোগোল চুর্নি

নদী আর রানাঘাট দেখার জন্য মনে-মনে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমন কিছু দূরেও নয়। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে যেতে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। গোগোলের ইস্কুলে শনি রবিবারে ছুটি থাকে। ও প্রায়ই মাকে বলত, 'চলো মা, হারুমামার বাড়িতে এ-সপ্তাহে বেড়িয়ে আসি।'

মা বলতেন, 'কী করে যাব! তোমার বাবার তো শনিবারে ছুটি নেই। হারুদার বাড়ি গেলে দু-একটা দিন থাকতেই হবে, নইলে ছাড়বেন না। সেবকম সুযোগ এলেই যাব।'

গোগোল মনে-মনে যতই অস্থির হোক, দু-তিন দিনের ছুটির সুযোগ আর আসে না। ওর এলেও বাবার আসে না। বাবা মা'কে বলেন, 'তুমিই গোগোলকে নিয়ে ঘুরে এসো। আমি তোমাদের শেয়ালদায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।'

মা বাবাকে বলেন, 'তুমিই তো বলো, সেই কবে চুর্নি নদী দেখেছ, আবার দেখতে ইচ্ছে করে। যাবই যখন এক সঙ্গে যাব। তুমি অফিস থেকে দুদিন ছুটি নেবার ব্যবস্থা করো। বাবা আর ছেলে, দুজনেরই চুর্নি নদী দেখার সাধ মিটবে।'

বাবা হেসে বলেন, 'গোগোল তো কেবল চুর্নি নদী দেখতে চায় না। ও চায় রানা ডাকাতের দেশ আর তাব চুর্নি নদী দেখতে। তবে নদীটা সত্যি সুন্দর আর নামটাও। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখা যাক, কবে নাগাদ অফিস থেকে ছুটি নিতে পারি।'

গোগোল ভাবে, গ্রীষ্মেব আর পরীক্ষার পরে শীতের লম্বা ছুটি, বাবা ঠিকই ছুটি নিতে পারেন। আব সামান্য দু' তিন দিনের ছুটি নিতেই যত অসুবিধে! অবশ্য প্রত্যেক বছরেই যে বাবা গ্রীষ্মে শীতে লম্বা ছুটি নিতে পাবেন, তা নয়। গোগোল এও জানে, অফিসের কাজের চাপে, বাবার পক্ষে দু' তিন দিনের ছুটি নেওয়াও অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায়।

হঠাৎ ম্যাজিকের মতো ঘটনা ঘটে গেল। বাবা এক বৃহস্পতিবার বিকেলে অফিস থেকে ফিরে জানালেন, বিশেষ একটা কারণে, তিনি শুক্র শনি ছুটি পেয়ে গেছেন। তার মানে শুক্র শনি রবি, তিন দিন টানা ছুটি। বাবা নিজেই বললেন, এই ছুটিতেই হারুমামার বাড়ি বেড়িয়ে আসবেন। গোগোলকে শুক্রবার ছুটি নিতে হবে। শনি-রবিবার তো এমনিতেই ছুটি। ভাগ্যিস, গোগোলের এ সময়ে উইকলি পরীক্ষা ছিল না। বেড়িয়ে এসে, সোমবার দিন ইস্কুলে একটা অ্যাপলিকেশন দিয়ে দিলেই হবে। যদিও গোগোল এরকম হঠাৎ-ছুটি কখনও নেয় না। কিন্তু হারুমামার বাড়ি যাবার

উপলক্ষে একটা দিনের জন্য বাবা মা দুজনেই রাজি হয়ে গেলেন।

শুক্রবার দিন সকালবেলা জলখাবার খেয়েই, বাবা মার সঙ্গে গোগোল বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে একটা মাত্র স্যুটকেসে কয়েকদিনের জামাকাপড়, তোয়ালে, দাঁত মাজার পেস্ট, ব্রাশ, বাবার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছিল। হতে পারে জায়গাটা কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে। তবু গোগোল মনে-মনে খুব খুশি আর উত্তেজিত। হারুমামাকে কোনো খবর দেওয়া ছিল না। একরকম ভালই। মামা মামি সবাইকে বেশ চমকে দেওয়া যাবে। হারুমামা নিশ্চয় অফিসে থাকবেন। বাড়ি এসে গোগোলদের দেখে থ হয়ে যাবেন। গোগোল মনে-মনে এক চোট হেসে নিল।

ট্যাকসিতে করে শেয়ালদায় পৌঁছে আগেই টিকেট কাউণ্টারে লাইন দিতে হল। গোগোল বাবার পাশে পাশে। মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাউণ্টারে পৌঁছে বাবা যখন কালীনারায়ণপুরের টিকেট চাইলেন, গোগোল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কালীনারায়ণপুর কেন? আমরা তো রানাঘাটে যাব। সেখান থেকে চুর্নি নদীতে নৌকোয় করে কালীনারায়ণপুর যাব!'

বাবা হেসে বললেন, 'নদীর ওপারে কালীনারায়ণপুর স্টেশন আছে। আমরা সেই স্টেশনে নেমে হারুমামার বাড়ি যাব।'

গোগোল একটু বোকা বনে গেল। হারুমামার কথা থেকে ও বুঝতেই পারেনি, কালীনারায়ণপুরে কোনো স্টেশন আছে। ধারণা করেছিল, রানাঘাটে নেমে, নৌকো ছাড়া কালীনারায়ণপুরে যাওয়া যায় না। মনটা একটু খারাপও হয়ে গেল। ভেবেছিল ট্রেন থেকে নেমেই নৌকোয় চাপতে পারবে। তবে হারুমামা নিশ্চয়ই নৌকোয় চাপাবেন।

টিকিট কেটেই দৌড়োতে হল। ট্রেন ছাড়তে মাত্র দু'তিন মিনিট বাকি ছিল। কিন্তু ট্রেনে এত ভিড়, ব্যারাকপুরের আগে বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। তাও মা আর গোগোলের জায়গা হল। বাবা বসতে পেলেন নৈহাটিতে পৌঁছে। বাবার কাছেই জানা গেল, নৈহাটি জংশন স্টেশন। এখান থেকে ট্রেন বদলে গঙ্গার ওপর জুবিলি ব্রিজ পেরিয়ে, ব্যাণ্ডেল যাওয়া যায়। রানাঘাটও নাকি জংশন স্টেশন। ওখানে প্রধান লাইন চলে গেছে বহরমপুর। শান্তিপুরের শাখা লাইন। আর বনগাঁয়ে যাবার লাইনও আছে।

কল্যাণীর পর থেকেই, দু ধারের ছবি অন্যরকম। সবুজ খেত আর মাঠ এবং গ্রাম। রানাঘাটে পৌঁছে দেখা গেল, বেশ বড় স্টেশন আর জমজমাট। গোগোল হেসে বলল, 'মা হারুমামা এখন এখানেই কাজ করেন। অথচ

জানতে পারছেন না, আমরা এখান দিয়ে যাচ্ছি।'

মা হেসে বললেন, 'তাইতে বুঝি তোর খুব মজা লাগছে?'

গোগোল বলল, 'সত্যি মজা লাগছে। ইচ্ছে করছে, এখানে নেমেই হারুমামার অফিসে চলে চাই।'

মা বললেন, 'তা যাবে বই কী। চুপ করে বোস।'

রানাঘাটে গাড়ি একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াল। তারপরে গাড়ি ছেড়ে কিছুটা এগোতেই বাবা বললেন, 'গোগোল, নজর রেখো এবার চূর্নি নদী দেখা যাবে।'

বাবার কথা শেষ হতেই গোগোল জানালা দিয়ে চূর্নি নদী দেখতে পেল। এত সুন্দর ছোট নদী ও কখনো দেখেনি। নদীটা অনেক নীচে। রেললাইন আর ব্রিজটা যেন হঠাৎ অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। কিন্তু জলটা আশ্চর্য পরিষ্কার: ঠিক কাঁচের মতো। আর জলের নীচে যেন কী সব দেখা যাচ্ছে। দেখতে-দেখতে ট্রেন নদী পেরিয়ে গেল। গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, নদীর জলের নীচে কী সব যেন দেখা যাচ্ছিল!'

বাবা বললেন, 'ওগুলো জলের নীচে নানারকম জলজ ঘাস, গুল্ম আর লতাপাতা। চূর্নি নদীর এটাই সৌন্দর্য, জলের নীচে কাঁচের মতো সবই প্রায় স্পষ্ট দেখা যায়। এখন বসন্তকাল। বর্ষাকালে যখন জল ঘোলা হয়ে যায়, তখন আর দেখা যায় না।'

গোগোলের চোখের সামনে নদীটাই ভাসতে লাগল। জলের নীচে পর্যন্ত দেখা যায়, এরকম নদীর কথা ও ভাবতেই পারে না। ঐ সব ঘাস-গুল্ম-লতাপাতার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক সাপ আছে। ভাবতেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, ঐ নদীতে কি কেউ সাঁতার কাটে?'

বাবা বললেন, 'কেন কাটবে না? অবশ্য তুমি যেরকম সাঁতার শিখেছ, চূর্নিতে সাঁতার কাটতে পারবে না। জলে খুব স্রোতের টান।'

'কিন্তু যারা সাঁতার কাটে, জলের ঘাস আর গুল্মে তাদের পা আটকে যায় না?'

'আটকাবে কেন? জলের নীচে ডুব দিলে আলাদা কথা। আর যারা ডুব দেয়, তারা আটকে গেলেও, ঠিক ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে।'

'কিন্তু ঐ সব ঘাস-গুল্মের মধ্যে নিশ্চয়ই সাপ আছে?'

'তাও থাকতে পারে! তবে জলের ও-সব সাপ বিষাক্ত নয়। জলঢোঁড়া বা হেলে জাতীয় সাপ থাকতে পারে।'

বাবার কথা শেষ হতে-না-হতেই কালীনারায়ণপুর স্টেশন এসে গেল। বাবা এক হাতে স্যুটকেস, আর অন্য হাতে গোগোলের হাত ধরে নামলেন। পিছনে মা। ট্রেনটা এক মিনিটও দাঁড়াল না। ছেড়ে চলে গেল। গোগোল দেখল, মস্ত লম্বা একটা মাত্র প্ল্যাটফরম। মাঝখানে একটা টিনের শেড। এরকম একটা প্ল্যাটফরমওয়ালা স্টেশন গোগোল কখনো দেখেনি। প্ল্যাটফরম থেকে নীচে সিঁড়ি নেমে গেছে। স্টেশনটা সেখানেই। টিকেট-কলেকটরও নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবা টিকেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এখন তবু একটা প্ল্যাটফরম হয়েছে। আগে তাও ছিল না। স্টীম-ইঞ্জিনে টানা ট্রেনের দু'ধাপ পাদানি বেয়ে লাফিয়ে নামতে হত।'

স্টেশনের কাছে বেশ ভিড়। আশেপাশে অনেক দোকানপাট অথচ মোটেই শহরের মতো দেখতে নয়। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যাব কী করে?'

বাবা বললেন, 'হেঁটেই যাব। আমাদের তো আবার সেই চুর্নি নদীর ধারেই যেতে হবে। বেশি দূরে নয়। আর এখানে তুমি কোনো গাড়ি-ঘোড়ার আশা করতে পারো না। তবে, হারু-দাদার বাড়ি যাবার রাস্তাটা আমার ঠিক মনে নেই।'

মা বললেন, 'আমার আছে। বলে মা আগে-আগে চলতে লাগলেন। গোগোল বাবার সঙ্গে মায়ের পিছনে-পিছনে চলতে লাগল। কাঁচা বাড়ি, কোঠাবাড়ি, পুকুর, বাগান, আঁকাবাঁকা রাস্তার দু'পাশে নতুন বাড়ি প্রায় একটাও চোখে পড়ল না। কোঠাবাড়িগুলো সেকেলে আর পুরনো। একটা মন্দিরও দেখা গেল। গোগোলরা চলেছে পাড়ার ভিতর দিয়ে। অনেকেই ওদের তাকিয়ে দেখছে।

প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পরে, মা একটা পাঁচিল-ঘেরা খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ভিতরে দেখা যাচ্ছে, একটা পুরনো একতলা বাড়ি। ইঁটে নোনা ধরেছে, জায়গায়-জায়গায় শ্যাওলা জমেছে। দরজা-জানালার আলকাতরার রঙও উঠে গেছে। একতলা বাড়িটার একধারে, বাঁধানো রকের শেষে একটা মাটির দেওয়াল খড়ের চালাঘরও দেখা যাচ্ছে। সামনের উঠোনে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। আর-কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কুকুরটা হঠাৎ গোগোলদের দেখতে পেয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে, ঘেউঘেউ চিৎকার জুড়ে দিল।

বাবা বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে হারুদাদের সেই বাড়িটাই। কেউ নেই নাকি?'

বাবার কথা শেষ হতে না হতেই, চালাঘরের পাশ থেকে একজন মহিলা

বেরিয়ে এলেন। বয়স বোধহয় মার মতো হবে। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন। গোগোলদের দেখে অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, আর মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিলেন। গোগোল মা-বাবার মুখের দিকে দেখল। নিশ্চয় কোনো অচেনা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মা ঠোঁট টিপে হাসছেন কেন?

চালাঘরের পাশ থেকে উঠোনে বেরিয়ে আসা মহিলা হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। দরজার দিকে ছুটে আসতে-আসতে বললেন, 'নীতি ঠাকুর ঝি না? আশ্চর্য, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?'

মা বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে চারু বউদি। তুমি আমাদের চিনতেই পারছ না। আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি।'

চারু বউদি যাঁকে বলা হল, তিনি দরজার বাইরে ছুটে এসে মায়ের হাত ধরলেন। 'ইশ্! না চিনলে আমি কী করে তোমার নাম বললাম? এসো, ভেতরে এসো।' বলে মাকে টেনে নিতে নিতে বাবাকে বললেন, 'আসুন, ভেতবে আসুন নন্দাই মশাই।'

তারপরেই যেন তিনি গোগোলকে দেখতে পেলেন। অমনি গোগোলের একটি হাত চেপে ধরে একেবাবে গায়েব কাছে টেনে নিলেন, বললেন, 'এই নাকি আমাদের সেই গোগোল? বাহ্ কী সুন্দর ছেলে তোমার নীতি ঠাকুরঝি।'

গোগোল খুবই লজ্জা পেয়ে গেল। মা বললেন, 'সুন্দব না আর কিছু। খালি দুষ্টুমি করে, আর আমাদের জ্বালিয়ে মারে।'

এ-সব কথার মধ্যেই গোগোলবা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কুকুরটাও ঘেউ-ঘেউ বন্ধ করেছে। মায়েব চারু বউদি বললেন, 'না না, বেশ সুন্দর ছেলে হয়েছে। ওর মামার মুখে আমি অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু ওকে আমি এই প্রথম দেখলাম।'

মা বললেন, 'গোগোল, ইনি হচ্ছেন তোমার মামিমা। হারুমামাব বউ। প্রণাম করো।'

গোগোল নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেল। মামিমা মায়ের হাত ছেড়ে দিয়ে, গোগোলকে জোর করে টেনে তুলে বললেন, 'না বাবা, পেন্নাম-টেন্নাম করতে হবে না। এমনিতেই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। এসো, ঘরে এসো।'

মামিমা রকে উঠে, সবাইকে নিয়ে দালানে ঢুকলেন। লম্বা দালান। দালানের ধারে-ধারে ঘর। মামিমা গোগোলের হাত ছেড়ে দিয়ে, এদিক-

ওদিক ছুটে কয়েকটা সুতোয় বোনা আসন যোগাড় করে পাতলেন। বললেন, 'কিন্তু নীতি-ঠাকুরঝি তোমার দাদা তো তোমাদের আসার কথা আমাকে কিছু বলেনি ?'

মা বললেন, 'কী করে বলবে ? হারুদাকে আমরা কিছু বলিনি, কোনও চিঠিও দিইনি। গোগোলের তাড়ায় হঠাৎ না জানিয়েই চলে এলাম।'

চারু মামিমা খুশিতে ডগমগ হয়ে, গোগোলের গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'সত্যি ! গোগোলের তাড়ায় এসেছ ? খুব ভাল হয়েছে। তোমরা বোসো। আমি আগে একটু চা করি।' বলে বাবার দিকে ফিরলেন, বললেন, 'ও নন্দাই মশাই, স্যুটকেসটা হাত থেকে নামান। কেউ চুরি করবে না।'

বাবা লজ্জা পেয়ে হেসে, দেওয়াল ঘেঁষে স্যুটকেস রাখলেন। বললেন, 'আমি ভাবছি, চারু বউদি বোধহয় আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন না।'

চারু-মামিমা বললেন, 'দরজাতেই তো আপনাকে ডাকলাম। দোষ দিচ্ছেন কেন ? বসুন। চা করে নিয়ে আসি। আর গোগোলকে আগে কিছু খেতে দিই।'

গোগোল বলল, 'না না, আমি এখন কিছু খাব না। আমি নদী দেখতে যাব।'

ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। বাবা বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।'

ইতিমধ্যে মা আর মামিমার কথা থেকে জানা গেল, হারুমামা কাজে গেছেন। ছেলেমেয়েরা সবাই ইস্কুলে। একমাত্র ঠিকে ঝিও চলে গেছে। মামিমার সঙ্গে মা-ও দালানের বাইরে চলে গেলেন। গোগোল বাবার সঙ্গে দালান আর ঘরগুলোর ভেতরে ঢুকে দেখতে লাগল। দেখার মতো তেমন কিছু নেই। দেওয়ালে টাঙানো পুরনো ফোটো, নানারকমের ক্যালেণ্ডার। সেকালের উঁচু ধরনের খাট, আর বিছানা। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে বাগান আর পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। দু'তিন রকমের পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। বাবা বললেন, 'গোগোল, এখন এরকম দেখছ। এক সময়ে হারু-মামাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। অনেক জমি পুকুর ছিল। জমির ধান, পুকুরের মাছ, গোরুর দুধ, কোনো কিছুর অভাব ছিল না।'

গোগোল জানতে চাইল, এখন কেন এরকম অবস্থা হল। বাবা বললেন, 'সে অনেক কথা। হারুমামার অন্যান্য ভাই দাদারা আলাদা হয়ে চলে গেছেন। অভাবে জমিজমা বিক্রি হয়ে গেছে। সেসব তুমি এখন বুঝবে

না। কেবল জেনে রাখ, মানুষের জীবন চিরকাল একরকম থাকে না।'

এ-সব কথাবার্তার মধ্যেই, চারু মামিমা সবাইকে মুড়ি মুড়কি আর মণ্ডা ভরা থালায় খেতে দিলেন।

মা নিজের হাতে চা করে নিয়ে এলেন। চারু-মামিমা হঠাৎ বাড়ির বাইরে কোথায় চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন একটু পরেই।

কলকাতায় সাধারণত মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা খাওয়া হয় না। গোগোলের সত্যি খিদেও পেয়েছিল। খাওয়া হয়ে যেতেই বাবাকে বলল, 'চলো বাবা, নদীর ধারে চলো।'

বাবা মা আর মামিমাকে বলে, গোগোলকে নিয়ে চললেন। চালা ঘরের পাশ দিয়েই রকের শেষে একটা খোলা দরজা। সেই দরজা দিয়ে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গোগোল দেখল, চারপাশে গাছপালা, আর ঘন ছায়া। দূরে-দূরে কয়েকটা বাড়ি। খানিকটা যেতেই দেখা গেল চুর্নি নদী। নদীর ধারে এসে গোগোলের দু চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। ওপারে একটা বাঁধানো ঘাটে অনেকে স্নান করছে। এপারে ঘাট নেই, কিন্তু মাটির ধাপের সিঁড়ি নেমে গেছে। এপারেও অনেকে স্নান করছে। ওপারে চেহারাটা অন্যরকম, অনেক বেশি বড়-বড় বাড়ি, পাকা রাস্তায় সাইকেল-রিকশা চলেছে। সব থেকে যেটা অবাক করল, তা হচ্ছে, গোগোলের থেকেও ছোট ছেলেমেয়েরা দিব্যি সাঁতার কাটছে। স্রোতের টানের সঙ্গে তারা রীতিমত লড়াই করছে।

নদীটা এতই ছোট, ওপারের সব লোককে স্পষ্ট দেখা তো যাচ্ছেই,—এমন-কী তাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। গোগোল আরও খানিকটা নীচে নেমে জলের দিকে দেখল। জলের নীচে সবুজ ঘাস-গুল্ম-লতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্রোতের টানে সব একদিকে ঢলে পড়েছে আর সাপের মতোই কিলবিল করছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের একটুও ভয় নেই।

গোগোল কতক্ষণ এরকম দেখছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ কাঁধে কার হাতের চাপ পড়তেই ফিরে তাকিয়ে দেখল, হারুমামা। হারুমামা গোগোলকে একেবারে দুহাতে তুলে ধরলেন, বললেন, 'আমার খুদে গোয়েন্দা ভাগ্নেটি সত্যি এসে পড়েছে!'

গোগোলের অস্বস্তি হল। মাটিতে নেমে বলল, 'আপনি তো ওপারে অফিসে ছিলেন। এখন কী করে এলেন? বিকেলে আসবার কথা তো।'

হারুমামা বললেন, 'তোমার মামিমা পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলেন। আমি অমনি একটা রিকশা চেপে খেয়াঘাটে এলাম।

নৌকোয় এপারে এসেই দৌড়ে তোমাদের কাছে।'

বাবাও কাছে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। হারুমামা বললেন, 'তুমি যে-ভাবে সব দেখছ, তোমাকে নিয়ে আমি নদীতে চান করব। তবে আজ নয়, কাল সকালে। তোমার ভাইবোনদের নিয়ে। এখন চলো বাড়ি যাই।'

বেলা গড়িয়ে বিকেল না হতেই, ইস্কুল থেকে আগে বাড়ি ফিরল মামাতো বোন চিনি। গোগোলের থেকে বছর খানেকের ছোট। চিনি খেতে মিষ্টি আর বোন চিনি দেখতে সত্যি মিষ্টি। ওর আধঘণ্টা বাদেই এল মামাতো দাদা তিনু। গোগোলেব থেকে বছব দুয়েকেব বড়। দেখতে-দেখতেই তিনজনের মধ্যে খুব ভাব জমে উঠল। তিনু তো ইস্কুল থেকে এসে, একটু পরেই গোগোলকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। চারু-মামিমা তাড়াতাড়ি তিনুদাকে ভাত খাইয়ে দিলেন। চিনিও খেয়ে নিল। তারপরে তিনজনে নদীর দিকে গেল।

যাবার আগে হারুমামা সাবধান করে বলে দিলেন, 'তিনু জলেব ধাবে যাসনি, আর বেশি দূরেও নয়।'

তিনু বলল, 'আমবা বাড়ির কাছেপিঠেই থাকব।'

তিনুর খুব ইচ্ছে ছিল না, চিনি ওদের সঙ্গে আসুক। গোগোল বলল, 'চিনি তা হলে একলা পড়ে যাবে। ও আমাদের সঙ্গে থাকুক।'

তিনজনেই নদীর ধাবে আশেপাশে বেড়াতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে চারদিকে-পাঁচিল-ভাঙা একটা একতলা বাড়িব সামনে এসে পড়ল। আশে-পাশে বাড়ি নেই। নদীর ওপারটাও ফাঁকা জঙ্গল আর পোড়ো জমি। গোগোল এগিয়ে যেতেই, তিনুদা ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'আর যেও না গোগোল। ও বাড়িটা ভূতের বাড়ি।'

ভূতের বাড়ি! গোগোল অবাক চোখে বাড়িটাব দিকে তাকিয়ে দেখল। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বাড়িটার অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দরজা-জানালাগুলো ভাঙাচোরা হলেও, সবই বন্ধ। ভাঙাচোরা ফাঁক দিয়ে কেবল ভিতরের অন্ধকার দেখা যায়। কয়েক জায়গায় ইঁটের দেওয়ালে বড় বড় ফাটল। বাড়িটার এক পাশে একটা বাঁশঝাড়। আরও কয়েকটা ঝাড়ালো গাছের ছায়ায় নিঝুম বাড়িটা দেখলে, সত্যি কেমন গা ছমছম করে। কিন্তু গোগোল কখনও ভূতের বাড়ি দেখেনি, ভূতও দেখেনি।

চিনি বলল, 'এটা জোনাকি-ভূতের বাড়ি। এখানে আমবা একদম আসিনে। চলো, তাড়াতাড়ি চলে যাই।'

তিনুদাও বলল, 'হ্যাঁ, গাঁয়ের কেউ এদিকটায় আসে না। চলো,

চলে যাই।'

গোগোল ওদের সঙ্গে ফিরে চলল। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু জোনাকি-ভূতের বাড়ি মানে কী?'

তিনুদা বলল, 'সন্ধের পর অন্ধকার হলেই বাড়িটার দরজা-জানালার ফাঁকে-ফাঁকে টিপ-টিপ করে জোনাকি জ্বলতে দেখা যায়। আমাদের বাড়ি থেকেও দেখা যায়।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু জোনাকি আবার ভূত হয় কেমন করে?'

চিনি বলল, 'ভূতের কথা কি কেউ বলতে পারে? তারা জোনাকি হতে পারে, মৌমাছি প্রজাপতি গোরু ছাগল সবই সাজতে পারে। আবার মানুষও হয়ে যেতে পারে।'

তিনুদা বলল, 'বছর খানেক আগে ও বাড়ির পোড়োয় একটা লোককে ঘাড় ভেঙে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। রানাঘাট থেকে পুলিস এসেছিল। বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল। কিছুই দেখতে পায়নি। লোকটাকে কে কী ভাবে মারল, পুলিসও ধরতে পারেনি। অনেকদিন নজরও রেখেছিল, কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি। কেবল একটা ডাইনির মতো বুড়ি আছে, ঐ বাড়িটার থেকে একটু দূরে একটা চালাঘরে থাকে। সে-ই একমাত্র বাড়িটার পাঁচিলের গায়ে ঘুঁটে দেয়। সে আমাদের বাড়িতেও ঘুঁটে দিতে আসে। তার কাছে শুনেছি, অনেক রাত্রে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন বাড়িটার ভেতর থেকে নাকিস্বুরে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। আর দড়াম-দড়াম করে দরজা-জানালার শব্দ হয়।'

চিনি বলল, 'আমি কখনো ঘুঁটেউলি বুড়িটার সামনে যাই নে। আমার মনে হয়, ওই বুড়িটাই আসলে ভূত।'

তিনুদা শুধরে দিল, 'মেয়েমানুষ কখনো ভূত হতে পারে না। পেতনি হয়। নয়তো শাঁকচুন্নি।'

চিনি বলল, 'ভূতেরা অনেকরকম বেশ ধরতে পারে। জোনাকি ভূত, দিনের বেলা বুড়ির বেশে ঘুঁটে দেয়। মা তো সেইজন্য ওকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। বাইরে থেকেই ঘুঁটে নেয়।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'মামীমা সব জেনেও বুড়িটার কাছ থেকে ঘুঁটে নেন কেন?'

তিনুদা বলল, 'না নিলে যদি আমাদের ওপর ওর খারাপ নজর পড়ে, সেইজন্য।'

গোগোলের খুবই অদ্ভুত লাগল। বাড়ি ফিরেও হারুমামাকে জিজ্ঞেস

করল। হারুমামাও বললেন, 'বাড়িটা ভাল নয়। বহুকাল খালি পড়ে আছে। আমরা শুনেছি, ও বাড়িতে অনেককালে আগে একটি বউ নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। যাদের বাড়ি, তারা সব কলকাতায় থাকে। এখানে আসে না। তবে একটা লোককে মরা অবস্থায় ও-বাড়ির পোড়োয় পাওয়া গেছল বছর খানেক আগে। পুলিস তার কোন কূলকিনারা করতে পারেনি। আজকাল সবাই বলে জোনাকি-ভূতের বাড়ি। ওটা কিছু নয়। খালি বাড়ি, ঘরগুলো নিশ্চয়ই স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। জোনাকি রাত্রে উড়তে পারে। ভূতের বাড়ি কিনা ঠিক জানিনে। তবে ওরকম পোড়ো খালি বাড়ি দেখলেই কেমন খারাপ লাগে। বিশেষ করে বছর খানেক আগে একটা মরা লোককে পোড়োয় পড়ে থাকতে দেখে, কেউ আর ওদিকে যায় না।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'আর ঐ ঘুঁটেউলি বুড়িটা?'

হারুমামা বললেন, 'বুড়িটার সত্যি সাহস আছে। কবে কোথা থেকে যে বুড়িটা এসে ঐ বাড়ির কাছেই একটা চালা করে আছে, খেয়ালই করিনি। সারাদিন গোবর কুড়োয়, আর ঐ বাড়ির পাঁচিলেই ঘুঁটে দেয়। সে নাকি বাড়িটার ভেতর থেকে অনেক রকম শব্দ শুনতে পায়। আমরা অবশ্য কিছুই শুনতে পাইনে।'

গোগোল এরকম বাড়ি কখন দেখেনি। ভূতের গল্প পড়েছে। কিন্তু ভূত কেমন তা ভাবতেই পারে না। তিনুদা অবশ্য বলেছে, ভূত আসলে কংকালের মতোই দেখতে। কেবল তার চোখ দুটো জ্বলে। জোনাকিগুলো আসলে হয়তো সেই জ্বলন্ত চোখেরই ছিটেফোঁটা। কারণ, ভাঙা দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে তো আর পুরো চোখ দুটো দেখা যেতে পারে না।

গোগোলের সেই জোনাকি দেখবার খুবই ইচ্ছে হল। রাত্রে, খাবার আগে, তিনুদা আর চিনির সঙ্গে ও ছাদে উঠল। অন্ধকারে বাড়িটা ঠিক দেখা যায় না। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পরে দূরে বাড়িটা অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা গেল, আর হঠাৎ জোনাকি জ্বলে উঠতে দেখা গেল। দরজা-জানালার ফাঁকে-ফাঁকে, টিপটিপ জোনাকি জ্বলছে। আবার কখনো উড়ে-যাওয়ার মতো লম্বা সরু ঝিলিকও দেখা যাচ্ছে। অথচ, আশেপাশে আরও জোনাকি দেখা যাচ্ছে। সেগুলো গাছের ঝোপেঝাড়ে, নয়তো নীচের দিকে, ঘাসের কাছে।

গোগোলের মনে-মনে ভীষণ কৌতূহল হল। সত্যি কি ভূতের জ্বলন্ত চোখের স্ফুলিঙ্গ জোনাকির মতো দেখা যাচ্ছে? খুব ইচ্ছে হল, কাছে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব, তাও জানে।

পরের দিন তিন্নুদা, চিনি ইস্কুলে তো গেলই না, হারুমামাও অফিসে গেলেন না। বাড়িতে রীতিমত উৎসব লেগে গেল। নিজেকে গরিব বললেও হারুমামাদের একটা পুকুর আছে। সেখান থেকে মাছ ধরা হল। তারপর সবাই মিলে চুর্নিতে চান করতে যাওয়া হল। তিন্নুদা আর চিনি দিব্যি সাঁতার কাটল। বাবাও কয়েকবার এপার-ওপার করলেন। গোগোলকে হারুমামা নিজেই ধরে-ধরে সাঁতার কাটালেন। স্রোতের খুব টান। তাছাড়া জলের নীচে লম্বা ঘাস আর গুল্ম দেখে ওর একটু ভয়ও হল। অথচ তিন্নুদা ডুব দিয়ে জলের নীচের ঘাস-গুল্ম ছিঁড়ে নিয়ে এল। তিন্নুদার দুঃসাহসে গোগোল অবাক হয়ে গেল।

বেলা এগারোটার মধ্যেই স্নান আর সাঁতার কাটা শেষ। সকাল আটটায় এক প্রস্থ জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছল। চুর্নি থেকে ফেরার পরে চারু-মামিমা আবার অনেকটা সন্দেশ খেতে দিলেন। গোগোলের তখন তেমন খিদে পায়নি। মামিমা বললেন, 'আজ রান্না হতে দেরি হবে। এখন একটু সন্দেশ খেয়ে নাও।'

তিন্নুদা আর চিনিকেও দিলেন। তারপরে মা বাবা হারুমামা দালানে বসে গল্প জুড়ে দিলেন। কাছেই মামিমা বঁটি পেতে মাছ কুটতে বসে গেছেন। গোগোল বেরিয়ে পড়ল তিন্নুদা আর চিনির সঙ্গে। এদিকে-ওদিকে খানিকটা ঘুরে গোগোল নিজে থেকেই জোনাকি ভূতের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। খানিকটা যাবার পরেই তিন্নুদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'গোগোল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

গোগোল বলল, 'চলো না, একটু কাছে গিয়ে দেখে আসি।'

চিনি আঁতকে উঠে বলল, 'না না গোগোলদা, ও বাড়ির কাছে যেও না। তোমার কি একটুও ভয় নেই?'

গোগোলের একটু ভয় যে নেই, তা নয়। কিন্তু ওর কৌতূহলটা তার চেয়ে বেশি। ও বলল, 'বাড়িটার কাছে যাব না। আমরা নদীর ধার দিয়ে নেমে, বাড়িটার ওপাশে যাব। ওদিকটা দেখে চলে আসব।'

তিন্নুদা ঠিক করতে পারল না, কী করবে। চিনি চোখ বড় করে বলল, 'ওদিকটায় তো সেই ডাইনি বুড়িটা আছে।'

গোগোল বলল, 'ডাইনি বুড়ি বলছ কেন? ও তো ঘুঁটেউলি। তোমাদের বাড়ির দরজায় আসে। ও আমাদের কী করবে?'

তিন্নুদা চিনির দিকে তাকাল। চিনিও তাকাল। ওর চোখে ভয়। তিন্নুদা বলল, 'নদীর ধার দিয়ে গেলে বাড়িটা দূরে থাকবে। তেমন দেখাই

যাবে না। যাবি চিনি?'

চিনি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না বাবা আমি যাব না।'

গোগোল বলল, 'তিনুদা, তুমি আর আমি যাই চল।'

তিনুর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সাহস পাচ্ছে না। অথচ গোগোলের কাছে হার মানতেও লজ্জা করছে। চিনি বলল, 'যেও না দাদা। আমি বাড়ি গিয়ে এখুনি বাবাকে বলে দেব।'

গোগোল বলল, 'আমরা তো বাড়ির মধ্যে ঢুকব না। নদীর ওপাশ থেকে ওপরে উঠে, ওদিকটা দেখেই আবার চলে আসব।'

তিনুদা যেন একটু সাহস পেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমরা তো বাড়ির মধ্যে ঢুকব না।'

গোগোল নদীর দিকে পা বাড়িয়ে ডাকল, 'এসো তিনুদা। চিনিও এসো।'

তিনু গোগোলের সঙ্গে এগিয়ে গেল। চিনি চিৎকার করে বলল, 'যেও না বলছি।'

গোগোল তবু নদীর ধারে এগিয়ে গেল। তিনুও পিছনে-পিছনে চলল। চিনি বাড়ির দিকে দৌড় দিল। গোগোল আর তিনু নদীর ধারে এসে পড়ল। উঁচু ঢালু পাড়ে হাঁটু ডুবে যাওয়া জঙ্গল। কয়েকটা বড়-বড় গাছও আছে। ওপারটাও জঙ্গল আর পোড়ো। এপারে ওপারে, এদিকে কোনো লোকজন নেই। স্নানের ঘাট নেই। কেউ স্নানও করছে না। কিন্তু গোগোলের চোখে পড়ল, ওদের হাঁটু-ডোবা জঙ্গলের মধ্যে, পায়ে-হাঁটা রাস্তার সরু দাগ রয়েছে। ও বলল, 'দেখেছ তিনুদা, এখানে পায়ে চলার দাগ আছে। তাহলে এদিক দিয়ে মানুষ যায়।'

তিনু বলল, 'বোধহয় এখান দিয়েই বুড়িটা যাতায়াত করে।'

গোগোল ভাবল, একটা বুড়ি কতবার যাতায়াত করে? তার জন্য এরকম সরু রাস্তার দাগ পড়ে? কিন্তু চারদিকটা সত্যি ভারী নিঝুম। তিনু বলল, 'চলে এসো গোগোল, আর যাবার দরকার নেই।'

গোগোল বলল, 'এখানে ভয় কিসের? চলো না, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা ওপরে উঠব।'

তিনুদা কিছু বলতে পারল না। গোগোলের পিছনে-পিছনে চলল। খানিকটা গিয়ে গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য, এখানে নদীর ধারটা কেমন চ্যাটাং-মতো। আর এখানে-সেখানে কয়েকটা সরু গভীর গর্ত। এমনকী পায়ের ছাপও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর সেই পায়ের ছাপ ওপরের

জঙ্গলের দিকে উঠে মিলিয়ে গেছে। তিনুদা বলল, 'কী দেখছ গোগোল?'

গোগোল বলল, 'এখানটা ছাখো তিনুদা, মানুষের পায়ের ছাপের মতো দাগ রয়েছে। আর এই গর্তগুলো কিসের?'

তিনু দেখে অবাক হয়ে গেল। একবার ওপারের জঙ্গল আর পোড়োর দিকে মুখ তুলে দেখল। বলল, 'আশ্চর্য তো। দেখেই মনে হচ্ছে, এখানে নৌকো আসে। গর্তগুলো দেখে মনে হচ্ছে, নৌকো বাঁধবার জন্য এখানে বাঁশের লগি পোঁতা হয়।'

গোগোল হেসে বলল, 'আর তোমরা বলো, এদিকে কেউ আসে না। না এলে এসব দাগ থাকবে কেন?'

তিনুদা তো খুবই অবাক হয়ে গেল। আর ভাবনায়ও পড়ে গেল। বলল, 'তাহলে কি জেলেরা এখানে মাছ ধরতে আসে? কিন্তু সবাই বলে, এদিকে কেউ আসে না।'

গোগোল বলল, 'কেউ দেখতে পায় না বলেই জানতে পারে না। এখন দেখতে পাচ্ছ তো, এদিকে লোক আসে। চলো, আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা বাঁদিকে ওপরে উঠব। এখান দিয়ে সোজাসুজি উঠলে, একেবারে বাড়িটার সামনে পড়ে যাব।'

তিনুদা বলল, 'তার দরকার নেই। এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ওঠাই ভাল। তবে বুড়িটার জন্যই আমায় ভয় লাগছে'

গোগোল হাঁটতে-হাঁটতে বলল, 'তোমরা বলো বুড়িটা ডাইনি। আসলে তো ঘুঁটেউলি। তোমাদেরও ঘুঁটে দেয়।'

তিনুদা বলল, 'তা দেয়। তবু বুড়িটাকে দেখলেই কেমন ভয় লাগে।'

দুজনেই বেশ খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে উঁচুতে তাকাল। বাড়িটার এক পাশের মাথা দেখা যাচ্ছে। গোগোল এবার ওপরে উঠতে লাগল। এদিকটায় জঙ্গল আর মাটিতে কোনরকম পায়ের ছাপ নেই। দুজনেই ওপরে উঠে এল। কোথাও কেউ নেই। বাড়িটার পাঁচিল এদিকেও ভাঙাচোরা। একটা দরজাও আছে। দরজাটার সামনে একগুচ্ছ জঙ্গল। তিনু গোগোলের হাত টেনে ধরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে দেখছ চালাঘরটা, ওটাতেই সেই বুড়ি থাকে। রেললাইনের ওপর থেকে চালাটা দেখা যায়। কিন্তু বুড়িটা দেখছি এদিকে কোথাও নেই।'

গোগোল মুখ ফিরিয়ে দেখল, বেশ খানিকটা দূরে উঁচু রেল লাইন। ঐ লাইনটাই রানাঘাট থেকে চূর্নি নদীর ওপর দিয়ে এসেছে। ও আবার বাড়িটার দিকে তাকাল। ওদের কাছ থেকে বাড়িটা প্রায় কুড়ি হাত দূরে।

এদিকেও দরজা জানালা সব বন্ধ। তবে দু-একটা জানালার পাল্লা ভেঙে পড়েছে। একটা দরজার একটা পাল্লা খোলা। গোগোল ভাঙা পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল। তিনু বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

গোগোল বলল, 'একটু কাছে থেকে দেখে আসি।'

কিন্তু তিনুদা দাঁড়িয়েই রইল। বলল, 'দুপুরবেলাও ভূতেরা বেরোয়।'

গোগোল ভেবে অবাক হল, তার থেকে দু বছরের বড় হয়েও, তিনুদা চিনির মতো কথা বলছে। রাতের জোনাকি-ভূত দিনের বেলা দেখা যাবে কেমন করে? অবশ্য সত্যিই যদি ভূত থাকে। গোগোল কখনো ভূত দেখেনি। গল্পের বইয়ে পড়েছে। তবে সেগুলো যে ভূত, তা মোটেই প্রমাণ হয়নি। ও বলল, 'তবে তুমি দাঁড়াও, আমি একটু কাছে থেকে দেখে আসছি।'

তিনুদা দাঁড়িয়েই রইল। গোগোল মানুষ পেরুবার মতো হাঁ-করা ভাঙা পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখল, সেখানে মানুষের পায়ের ছাপ রয়েছে। অথচ বাড়িতে ঢোকবার দরজার কাছে ঘন জঙ্গল। ও তিনুদার দিকে ফিরে বলল, 'তিনুদা, দেখবে এসো, এখানে মানুষের পায়ের ছাপ রয়েছে।'

তিনুদার অবস্থা খারাপ। সে আশেপাশে ভয়ের চোখে দেখতে-দেখতে বলল, 'থাকুক। তুমি চলে এসো।'

কিন্তু গোগোলের কৌতূহল তখন বেড়ে গেছে। বলল, 'তুমি দাঁড়াও, আমি একটু ভেতরের উঠোনটা দেখে আসি।'

তিনু আর-কিছু বলবার আগেই গোগোল পাঁচিলের হাঁ-করা ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কেউ কোথাও নেই, ফাঁকা আর নিঝুম। উঠোনের চারপাশে শুকনো একরকমের কাটিঘাস গজিয়েছে। তার মাঝে-মাঝে এলোমেলো পায়ের ছাপও রয়েছে। ভূতের কি পায়ের ছাপ পড়ে? গোগোল বাড়িতে ঢোকবার এক পাল্লা খোলা দরজাটার দিকে তাকাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। রকে উঠে, দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। অন্ধকার। আর একটা ভ্যাপসা গন্ধ। কিন্তু অন্যরকমের গন্ধও যেন পাওয়া যাচ্ছে। কিসের গন্ধ? মনে করার চেষ্টা করতেই, ওর খেয়াল হল, গন্ধটা সিগারেটের ধোঁয়ার। আশ্চর্য! এখানে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ আসছে কোথা থেকে? ও তিনুদাকে বলবার জন্য মুখ ফেরাল। তাকে দেখা গেল না।

গোগোল কয়েক সেকেণ্ড ভাবল। তারপরে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সামনেই একটা ঘর। আবছা অন্ধকার। একতলা হলেও বেশ বড় বাড়ি। ঘরটার দু পাশে কয়েকটা ঘরের দরজা। সবই যেন বন্ধ। মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। তার মধ্যে মানুষের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। তা হলে কি ভিতরে কোনো মানুষ আছে? সিগারেটের গন্ধটাই বা কোন দিক থেকে আসছে?

গোগোল আশেপাশে তাকিয়ে, ডান দিকে এগিয়ে গেল। একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বন্ধ দরজা। হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা



খুলে গেল। ভেবেছিল, নিশ্চয় ঘবটা অন্ধকাব হবে। কিন্তু জানালার কাঠেব পাখরি এত ভাঙা-চোবা, অনেক ফাঁক বয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে ঘবে একটু আলো এসেছে। কিন্তু গোটা ঘবটা ভবতি ওগুলো কী? মনে হচ্ছে পলিথিন দিয়ে ঢাকা।

ভূতেব বাড়িতে এসব কী? গোগোল এগিয়ে গেল। পলিথিন ধবে টান দিতেই, একটু শব্দ হল। আব দেখল, নতুন কাপড়ের বড-বড় বাণ্ডিল। ভূতেব বাড়িতে নতুন কাপড়েব বাণ্ডিল কেন? গোগোল সবে গিয়ে আব-এক দিকেব পলিথিনেব ঢাকনা তুলল। দেখল চটেব বড়-বড় বস্তা ঠাসা কী সব বয়েছে। ভাল কবে দেখেই বুঝল, সব চিনিব বস্তা। পিঁপড়েও বয়েছে। আশ্চয। ভূত কি এত চিনি খায় নাকি?

এবাব পাশেব আব একটা ঘবেব দিকে ওব নজর পড়ল। দবজাটা খোলা। হালকা আলোও আছে। গোগোল সেই ঘবে ঢুকল। দেখল জানালাব পাল্লা বা গবাদ অধেক নেই। সেখানে পলিথিনেব ঢাকা দেওযা কিছু নেই। কেবল ঘব ভবতি মুখ-আঁটা বড বড টিন। গন্ধেই টেব পাওযা যাচ্ছে, সবগুলোই সবষেব তেলেব টিন। ভূতে কি তেলও খায?

ঠিক এই সময়েই সামান্য শব্দে গোগোল মুখ ফিবিযে দেখল, ডুটো ঘবেব মাঝখানেব দবজায় একটা লোক দাঁড়িযে বয়েছে। পাযজামাব ওপবে গেঞ্জি গায়ে, ষণ্ডা-মতো লোকটাব মুখ শক্ত। অবাক চোখ ডুটো যেন ধক ধক কবে জ্বলছে। তাব ডান হাতেব আঙুলেব ফাঁকেও সিগাবেট জ্বলছে। মোটা গলায় চাপা গর্জনেব স্বরে বলল, 'এই ছুঁচো, তুই কোথা থেকে এখানে ঢুকলি বে? কে তুই?'

ভূতেব দলে ষণ্ডামার্কা মানুষ! চিনি বলেছিল, 'ভূতেবা অনেক বকম বেশ ধবতে পাবে। এও কি তাই নাকি? গোগোল কোনো জবাবই দিতে পাবল না। লোকটাব মুখ আবও শক্ত আব ভয়ংকব হয়ে উঠল। বলল, 'জানিস এটা ভূতেব বাড়ি? ঢুকলে আব বেবোনো যায না? মববাব পাখনা গজিয়েছে?'

গোগোলেব বুকেব মধ্যে তখন ঢিপ-ঢিপ কবছে। তবু ভযে ভযে সত্যি কথাটাই বলল, 'আমি ভূত দেখতে এসেছিলাম।'

ভূত দেখতে?' লোকটা খ্যাঁক কবে উঠল, 'দেখাচ্ছি ভূত। ঘাড় মটকে এখুনি তোর ভূতেব মজা দেখাচ্ছি।'

তার কথা শেষ হবার আগেই পিছন থেকে আর একটা লোক এসে পড়ল। বলল, 'কে বে জিতু?'

গোগোল দেখল, সেই লোকটাও বেশ ষণ্ডা-মতো। জিতু নামে লোকটা বলল, 'কে জানে কে। এ এলাকার কোথা থেকে ছুঁচোটা কেমন করে ঢুকে পড়েছে।'

পিছনের লোকটা আর-একটু এগিয়ে এল। বলল, 'তা হলে তো ছাড়াছাড়ি নেই। শিগগির ধরে ঘাড়টা মটকে দে, তারপরে নদীর জলে ফেলে দিয়ে আয়।'

গোগোল ভয় পেলেও ঝট করে পাল্লা-খোলা, গরাদ বিহীন জানালাটা দেখে নিল। ইতিমধ্যে জিতু নামে লোকটা ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়েছে। গোগোল তেলের টিনের ওপর লাফ দিয়ে উঠল। জিতু চিৎকার করে উঠল, 'আরে এ ছুঁচো নয়, সাপ দেখছি। পালাচ্ছে।' বলে সেও তেলের টিনের ওপর উঠতে গেল। কিন্তু পা হড়কে পড়ে গেল।

গোগোল গরাদ-ভাঙা পাল্লা-খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে নীচে পড়ল। পায়ের একটা স্যাণ্ডেল খুলে ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু ওর তখন সেদিকে নজর নেই। শুকনো কাটিঘাসের ওপর দিয়েই পাঁচিলের দিকে ছুটল। পিছনেও ধুপ করে শব্দ হল আর চিৎকার শোনা গেল, 'জিতু, তুই একটা আস্ত মোষ। শিগগির আয়, পুঁচকে শয়তানটা পালাচ্ছে।'

গোগোল পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, একবার পিছন ফিরে দেখল। দুজনেই ছুটে আসছে। কিন্তু তিনু নেই। বরং ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা শননুড়ি-চুল বিটকেল বুড়ি। সে হাঁইমাঁই শব্দ করে গোগোলের দিকে তেড়ে এল।

গোগোল দেখল, নদীর পাড়ের দিকে যাবার উপায় নেই। ও সোজা রেললাইনের দিকে দৌড় লাগাল। পিছন ফিরে আর একবার দেখল। লোক দুটোই বেশ পেছনে। কিন্তু ছুটে আসছে। গোগোলের মাথার ঠিক নেই। ওরা হাতে পেলেই ঘাড় মটকে নদীর জলে ফেলে দেবে। ও রেল-লাইনের দিকে গিয়ে একটু দমে গেল। রেললাইন বেশ উঁচুতে। ওপরে একটা লোকও দেখা যাচ্ছে না অথচ ওপরে না উঠেও উপায় নেই। ও মরণপণ হয়ে ওপরে উঠতে লাগল। পিছনে তখন লোক দুটোর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে কারোর গলা, 'ওকে ধরতেই হবে। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

গোগোল রেললাইনের ওপরে উঠে, দিক ঠিক করতে পারল না। রেল-লাইনের ডান দিক ধরে দক্ষিণে ছুটতে লাগল। খেয়ালই নেই, ওদিকে রয়েছে চুর্নির ব্রিজ। দৌড়তে দৌড়তে ব্রিজের সামনে এসে থমকে গেল।

নীচের দিকে তাকিয়ে ওর মাথাটা ঘুরেই গেল। পিছন থেকে শোনা গেল, 'এবার কোথায় যাবে চাঁদ? নীচে পড়েই মরবে।'

গোগোল ভাবল, নীচে পড়ে যাই হোক, ও ব্রিজের ওপর দিয়েই যাবে। ভেবেই, রেলের স্লিপারের ওপর এক পা করে এগোতে লাগল। পিছনে চিৎকার শোনা গেল 'ছেলেটা নির্ঘাত মরবে।'

গোগোলের তখন পিছন ফিরে দেখবার সময় নেই। তখন পিছনে আরও অনেক লোকের গলার স্বর ভেসে আসতে শোনা গেল, 'রেল আসছে, রেল আসছে।'

গোগোল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে তাকিয়ে দেখল, সত্যি একটা ট্রেন দূরে দেখা যাচ্ছে। কোনোরকমে একবার সাহস করে নীচে তাকাল। অনেক নীচে চুর্নি নদী। ও একবার পিছনে ফিরে দেখল। ব্রিজের ওপারে অনেক লোক জমে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে সেই ষণ্ডা দুটো আছে কি না বুঝতে পারল না। ও সামনে ফিরে, দু হাত তুলে নাড়তে লাগল। কিন্তু ট্রেনটা এগিয়েই আসতে লাগল।

কী করবে গোগোল? এত উঁচু থেকে চুর্নিতে পড়লে ডুবেই মরে যাবে। পাশে কোনো রেলিং পর্যন্ত নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতেই, ও গায়ের জামা খুলে উঁচুতে হাত তুলে ওড়াতে লাগল। ট্রেনটা তখন ব্রিজের প্রায় কাছে। কিন্তু নানারকম শব্দে ব্রেক কষে, গাড়িটা ব্রিজের খানিকটা এসে থেমে গেল। গোগোল সাবধানে একটা একটা করে স্লিপার পার হতে লাগল। ইলেকট্রিক ট্রেনের সামনে আসতেই, অনেক যাত্রীর হৈচৈ শোনা গেল। সামনের ইঞ্জিনের লোকটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মরবে নাকি? শিগগির সামনের ডাণ্ডা ধরে, ওপরের থাকটার ওপর উঠে বসে পড়ো।'

গোগোলের তা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ও সামনেই দেখল, ইঞ্জিনের সামনে দু দিকে দুটো রড রয়েছে। বাফারও আছে। কিন্তু ডাণ্ডা ধরে বসবার মতো চওড়া জায়গাই আছে। ও সেখানে উঠে ডাণ্ডা ধরে বসে পড়ল। হাত-পা ঠক-ঠক করে কাঁপছে। এঞ্জিনম্যান জানালা দিয়ে দেখে, ভোঁ বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। খুব আস্তে-আস্তেই ব্রিজটা পেরিয়ে গাড়ি আবার দাঁড়াল। সেখানে তখন লোকের ভিড়ে তিল-ধারণের জায়গা নেই।

এঞ্জিনম্যান নেমে এসে, গোগোলকে দু হাতে ধরে নামাল। চোখে-মুখে রাগ আর উত্তেজনা। পারলে যেন দু ঘা লাগিয়েই দেয়, এমনি কড়া আর ধমক দিয়ে বলল, 'চলো, তোমাকে আমি এক্ষুনি পুলিসে দেব। কেন তুমি

ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলে ?'

গোগোল কোনো জবাব দিতে পারল না। ওর চোখে জল এসে পড়ল। এর মধ্যেই হারুমামা, বাবা আর তিনুদা এসে হাজির। গোগোল হারুমামাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'হারুমামা, জোনাকি ভূতের বাড়িতে ছুটো ডাকাত ছিল। তাদের তাড়া খেয়ে আমি ব্রিজের ওপর উঠে পড়েছিলাম।'

আশেপাশে অনেকেই ভয়ে আর বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, 'জোনাকি ভূতের বাড়ি ঢুকেছিল ? সর্বনাশ। তা হলে নিশ্চয় ভূতে তাড়া করেছিল।'

গোগোল বলল, 'ভূত না, ডাকাত। সেখানে অনেক কাপড় চিনি আর সরষের তেল ডাঁই করা রয়েছে।'

গোগোলের কথা শুনে সবাই হতবাক। ট্রেনের এঞ্জিনম্যান বলল, 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। সামনে সিগন্যাল দেওয়া রয়েছে। আপনারা এ-ছেলের নাম-ধাম টুকে রাখবেন। আমাকে রিপোর্ট করতে হবে।' বলেই সে লাফিয়ে ট্রেনের সামনের দরজা দিয়ে উঠে পড়ল। কয়েকবার ভোঁ দিয়ে, গাড়ি চালিয়ে দিল।

এদিকে সবাই তখন নানারকম কথাবার্তা বলছে। কোথা থেকে একজন সেপাইও চলে এল। সে বলল, 'সবাই চলুন তো, জোনাকি-ভূতের বাড়িটা দেখি গিয়ে।'

হারুমামাকে সবাই চেনে। তিনি বললেন, 'আপনারা যান। এ-ছেলেটি আমার ভাগ্নে। কী হল না হল, সব দেখে আমাদের বাড়িতে আসবেন।'

দেখা গেল, হারুমামার কথা কেউ অগ্রাহ্য করল না। সেপাইয়ের সঙ্গে সবাই ছুটল। আর, হারুমামা গোগোলের হাত ধরে বাড়ির দিকে চললেন। সঙ্গে বাবা আব তিনুদা।

ঘণ্টা খানেক পরেই হারুমামার বাড়িতে রানাঘাট থানার ও. সি, অন্য একজন বড় অফিসার আর বেশ কয়েকজন সেপাই এসে হাজির। পিছনে বিশাল একদল লোক। অফিসার বললেন, 'হারুবাবু, আপনার ভাগ্নেটি কোথায় ?'

গোগোল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অফিসার এসে গোগোলের হাত ধরে হেসে বললেন, 'তুমি এইটুকু ছেলে, সাংঘাতিক কাজ করেছ। জোনাকি-ভূতের বাড়িটা আসলে বাংলাদেশে চোরাই মাল পাঠাবার একটা গুদাম। চোরাই চালানদাররা বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি সাজিয়ে রেখেছে।'

সবাই তখন গোগোলকে দেখবার জন্য ব্যস্ত। সবাই চিৎকার করছে, 'আমরা গোগোলকে দেখব, গোগোলকে দেখব।'

অফিসার নিজেই গোগোলকে কাঁধের ওপর তুলে ধরলেন, 'দেখুন। ভূত দেখতে গিয়ে ও কী বিরাট চুরির ষড়যন্ত্র ধবে ফেলেছে।'

হারুমামা তো রীতিমত লাফালাফি করতে লাগলেন। হাসছেন আব বলছেন, 'হ্যাঁ, ও হল খুদে গোয়েন্দা গোগোল।'

কিন্তু গোগোল দেখল মা আর মামিমা বকে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। কিন্তু চিনি আর তিনুদাও হারুমামার সঙ্গে নাচছে আর হাসছে।

থানার ও সি বললেন, 'প্রায় তিন লাখ টাকার মাল ধবা পড়েছে। আমবাও জানলাম, বাড়িটা আসলে ভূতের বাড়ি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।'

হারুমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'জোনাকির মতো টিপটিপ করে কী জ্বলত?'

ও সি হেসে বললেন, 'পেন্সিল টর্চ। বেশি আলো জ্বাললে সব দেখা যাবে। ওখান থেকে নৌকোয় করে রানাঘাটে মাল নিয়ে ওবা মাজদিয়াব ওদিকে বর্ডারে মাল পাচাব কবত। একটা পাজি বুড়ি সব সময় ওখানে পাহারা দিত, কিন্তু গোগোলকে সে ঢুকতে দেখেনি। তাকেও আমবা ধরেছি।'

'সবাই এগিয়ে এসে গোগোলকে একবারটি ছুঁতে চাইল। অফিসাব গোগোলকে বকের কাছে, মায়ের সামনে নামিয়ে দিলেন। ওব গাল টিপে আদব করে বললেন, 'সত্যি, সাহসী ছেলে। তবে বড় দুঃসাহস। ব্রিজেব ওপর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পাবত। তবু বলব, শাবাশ গোগোল। শাবাশ।'

হারুমামা এসে গোগোলকে একেবারে বুকে জড়িয়ে কোলেব ওপব তুলে নিলেন।

পুলিশ অফিসাররা বসলেন দালানের মধ্যে। তাঁদের খুব চায়েব তেষ্টা পেয়েছে। বাইরে তখনও বিস্তর লোক গোগোলকে দেখবাব জন্য অপেক্ষা করছে।



মাত্র দু বছর আগের কথা। গোগোলের বাবা-মা ঠিক করে ফেললেন, সামারের ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়া হবে। ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু, টানা দার্জিলিং যাওয়ার বদলে, শিলিগুড়িতে তিন-চারদিন থাকবার কথা হল। শিলিগুড়িতে গোগোলের ন-মামা থাকেন। সেখানে ন-মামীমা আছেন, আর দাদা-দিদিরাও আছে। ন-মামা অনেকবারই যেতে বলেছেন। কখনো যাওয়া হয়নি। এবারে সেটা ঠিক করা হল।

সামারের ছুটিতে দার্জিলিং মেলে জায়গা পাওয়া আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া প্রায় এক কথা। বাবার কাজ অনেক। বেশিদিন অপেক্ষা করারও উপায় নেই। তাই প্লেনে বাগডোগরা যাওয়া ঠিক হল। সেখান থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর গাড়িতে শিলিগুড়ি সিটি অফিসে পৌঁছুতে পারলে, ন-মামার কলেজ পাড়ার বাড়িতে রিকশায় যেতে দশ মিনিটের ব্যাপার।

প্লেনের টিকিট আর আসন পাওয়া গেল তিন দিনের মধ্যেই। গোগোলের এটাই প্রথম প্লেনে চড়া নয়। আগেও প্লেনে চড়ে গৌহাটি গিয়ে, সেখান থেকে গাড়িতে শিলং গিয়েছে। অতএব প্রথম প্লেনে চড়ার উত্তেজনা ছিল না।

ফকার ফ্রেণ্ডশিপ প্লেনে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই দমদম থেকে বাগডোগরা।

ন-মামাকে চিঠি লিখে খবর দেওয়া ছিল। কলকাতার বাড়ি থেকে সকাল-বেলা বেরিয়ে দুপুরের খাবার আগেই গোগোল বাবা-মায়ের সঙ্গে ন-মামার বাড়ি পৌঁছে গেল। বড় ছোট সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের হৈচৈ পড়ে গেল।

সেই দিনটা খেয়ে-দেয়ে, মহানন্দা নদীর সেতুব ধারে বেড়িয়েই কাটল। সন্ধেবেলা বাবার সঙ্গে কথা বলে, ন-মামা জলদাপাড়া সাংচুয়ারির কেয়ার-টেকাব অফিসারকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, ঘর পাওয়া যাবে কি-না। প্রথমে জানা গেল, এত তাড়াতাড়ির নোটিসে ঘর পাওয়া সম্ভব নয়। তারপরে ভদ্রলোকের কী মর্জি হল, তিনি একটি ঘর এক রাত্রির জন্য দিতে পারবেন বলে জানালেন।

জলদাপাড়ায় হাতিব পিঠে চেপে, জঙ্গলে ঘুরে, গণ্ডার, হরিণ এমন কী বাঘেব দেখাও নাকি পাওয়া যেতে পাবে। গোগোল ব্যাপারটা ভেবে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, রাত্রে তার চোখে ঘুমই আসতে চাইল না। যদি বা ঘুম এল, সারারাত্রি প্রায় হাতির পিঠে চাপার স্বপ্ন দেখেই কেটে গেল। আর কত গণ্ডার-হরিণ যে দেখল, তাব কোন হিসাবই নেই।

বাবা যে শিলিগুড়িতে ন-মামাব বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, দার্জিলিং যাবাব কথা ভেবেছিলেন, তার আসল কাবণ জলদাপাড়ায় যাওয়া। পরেব দিন সকালে বাবা-মা'র সঙ্গে গোগোল, বুড়োদা আব মিনুদিও চলল। ন-মামা আর মামীমা গেলেন না। তবে ন-মামা গোগোলদের জলদাপাড়ার বাসে তুলে দিয়ে গেলেন।

যথেষ্ট সকালে বেবোলেও, দুপুব হয়ে গেল জলদাপাড়ায় পৌঁছুতে। কিছু খাবার আর জল সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। জলদাপাড়ায় পৌঁছতেই সব সাবাড়। আসবার পথে অনেক চা-বাগান চোখে পড়ল। বাঁদিকে ভুটানের পাহাড় আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু জলদাপাড়ায় পৌঁছে, গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল আশেপাশে ঘন বন-জঙ্গল দেখতে পাবে। তার বদলে চারদিকে মিলিটারি ক্যাম্প। ঘন ঘন ট্রাক আর জীপের যাতায়াত। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর কেবলই বন্দুকের গুলিব আওয়াজ। আর মাথার ওপর দিয়ে, প্রায় অনবরতই উড়ে চলেছে হেলিকপটার, নয়তো ছোট ছোট এরোপ্লেন।

বুড়োদা আগেও জলদাপাড়ায় এসেছে। সে বলল, 'গুলির আওয়াজ হচ্ছে চাঁদমারিতে, যেখানে রাইফেলধারী সৈন্যরা তাদের হাতের টিপ করে। আর কাছেই হাঁসিমারা বলে একটা জায়গায় এয়ারফোর্সের এয়ারবেস

রয়েছে। হেলিকপটার আর প্লেনগুলো সেখান থেকেই উড়ছে।'

গোগোলরা ফরেস্টের অফিস থেকে যখন বাংলোয় গেল, তখনও মিলিটারি দোতলা কোয়ার্টার্সের সারির পাশ দিয়েই যেতে হল। তার মানে জলদাপাড়া এখন একটা পুরোপুরি সামরিক আর বিমান ঘাঁটি। তবু যা হোক, অফিসের সামনে গোটাকয়েক হাতি বাঁধা ছিল। তাই দেখেই গোগোলের যা আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দও নষ্ট হয়ে যেতে বসল, যখন শোনা গেল, এখন বাংলোতে খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। পথ চলার জন্য খাবার কিছু সঙ্গে নেওয়া যায়। তা বলে দুপুরের খাবার কেউ বয়ে বেড়ায় না।

শেষ পর্যন্ত বাবা বাংলোর কেয়ারটেকারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন। তাঁর হাতে টাকা দিয়ে বললেন, 'এ বেলাটা কোনো রকমে ডাল-ভাত করে চালিয়ে দাও। ও-বেলা মাংস মাছ মুরগী যা যোগাড় করতে পারবে, তাই খাওয়া যাবে।'

বাংলোর দোতলায় একটা বড় ঘরই গোগোলদের দেওয়া হল। দুটো খাট ছিল। কেয়ারটেকার জানিয়ে দিলেন, রাত্রে আরও কিছু বিছানা আর একটা মশারি দিতে পারবেন। মাথার ওপরে পাখা আছে। গরমের একটা রাত কোনরকমে কেটে যাবে।

রাতটা কেটে গেল ঠিকই। ভোরের অন্ধকার থাকতেই কেয়ারটেকার গোগোলদের দরজায় ঠকঠক করে ঘুম ভাঙিয়ে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেলেন। জানিয়ে গেলেন, 'হাতি তৈরি, যত ভোরের দিকে রওনা হওয়া যাবে, ততই ভাল।'

এখবর শোনার পরে আর চা-বিস্কুটে কারোরই মনোযোগ থাকতে পারে না। অন্তত গোগোলের তো না-ই। পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে সব বেরিয়ে পড়ল। বাংলোর পিছনেই দুটো হাতি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের পিঠে মাহুত। তাছাড়াও দু-জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। মাহুত কী বলল, কী করল, কে জানে, হাতি দুটো বসে পড়ল। আর বাকি লোক দুটো, হাতির গায়ে মই লাগিয়ে দিয়ে গোগোলদের উঠতে সাহায্য করল। চটের গদি মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাহুত বলে দিল, সবাই যেন শক্ত হাতে দড়ি ধরে রাখে।

বাবা-মা উঠলেন একটা হাতির পিঠে। বুড়োদা আর মিনুদির সঙ্গে গোগোল আরেকটা হাতির পিঠে। হাতি যখন উঠে দাঁড়াল, গোগোলের মনে হল, একটা পাহাড় যেন ওকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সমুদ্রের

ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে চলল। ভীষণ মজায় ওর হাসি পেতে লাগল, আবার ভয়ও করতে লাগল। হাতির পিঠে দোলা খেয়ে ওরা সবাই হাসছিল। বাবা-মাও হাসছিলেন। তার মধ্যেই বাবা চিৎকার করে সাবধান করে দিলেন, 'সবাই শক্ত করে হাওদার দড়ি ধরে থেকো।'

গোগোল খুশি হল, এদিকে মিলিটারি ক্যাম্প নেই। গাছপালায় পাখিরা ডাকছে। এখনো সূর্য ওঠেনি। তারপরে হাতিদুটো যখন একটা নদীতে নামল, তখন গোগোলের মনে আনন্দ আর ভয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। ও জিজ্ঞেস করল, 'বুড়োদা, এটা কী নদী?'

বুড়োদা বলল, 'এটা জলঢাকা নদী। নদীর ওপারে তাকিয়ে দ্যাখ, ওটাই আসলে জলদাপাড়া ফরেস্ট।'

গোগোল বিশাল চওড়া নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখল, নিবিড় সবুজ বন। আর হাতি দুটো কখনও জলের ওপর দিয়ে, কখনো পাথর ছড়ানো চরের ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে-ফেলে চলল। এক সময়ে গভীর জলের মধ্যে হাতি দুটো সাঁতার কেটে পার হতে লাগল। গোগোলদের পায়ে জল লেগে গেল। ভয় পেয়ে ও জিজ্ঞেস করল, বুড়োদা, হাতি জলে ডুবে যাবে না তো?'

বুড়োদা বলল, 'দূর বোকা, হাতি আবার জলে ডোবে নাকি। মনে কর, আমরা এখন নৌকোয় করে নদী পার হচ্ছি।'

গভীর জলে হাতির পিঠে, ব্যাপারটা প্রায় সেই রকমই। ঠিক যেন একটা নৌকো দুলে দুলে, জল কেটে চলেছে, আর স্রোতের সঙ্গে লড়ছে, যাতে টানে ভেসে না যায়।

এপর্যন্ত খুবই ভাল কাটল। কিন্তু গোগোলদের কপাল খারাপ। নদী পার হয়ে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকটা বেলা অবধি ঘুরেও কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখা গেল না। গণ্ডার হরিণ আর বাঘ তো দূরের কথা, একটা খরগোশও চোখে পড়ল না। ইতিমধ্যে চাঁদমারির গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে। আকাশে হেলিকপটার উড়তে দেখা যাচ্ছে।

মাহুত বলল, 'জলদাপাড়ায় এখন আর গণ্ডার হরিণ বিশেষ দেখা যায় না। গুলির আওয়াজে আর হাওয়াই জাহাজের ভয়ে ওরা সব হলং-এর জঙ্গলে চলে গেছে। সেখানে এখন অনেক বড় ফরেস্ট বাংলো হয়েছে। আজকাল সবাই ওখানেই যায়।'

গোগোল মন খারাপ করে বাংলোয় ফিরে এসে বাবাকে হলং-এর বাংলোর কথা বলল। বাবা বললেন, 'হলং-এর বাংলো পেতে দেরি হয়। তাছাড়া,

নিজেদের গাড়ি না থাকলে হলং-এ যাওয়ারও অনেক অসুবিধে।'

বাবার কথা শুনে গোগোলের মনটা আরও হতাশায় ভরে গেল। বাবা কেবল বললেন, 'দেখা যাক, কী করা যায়।'

তারপরে করার আর কিছুই ছিল না। সেইদিনই শিলিগুড়িতে ফিরে, রাতটা ন-মামার বাড়িতে কাটল। পরের দিন ভোরবেলা জীপে চেপে দার্জিলিং। এ যাত্রায় বুড়োদা আর মিনুদি ছিল না। দু দিন দার্জিলিং-এ কাটিয়ে, সেখান থেকে কার্শিয়াং-এ। কার্শিয়াং-এ গিয়ে তিব্বতী লামাদের বৌদ্ধমঠে গোগোল তো এক কাণ্ডই করে বসল। যাই হোক, সে-সব কাণ্ড-কারখানার কথা এখন আর বলে দরকার নেই।

কার্শিয়াং থেকে ফিরে আবার দার্জিলিং। ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়িয়ে, গোগোল জলদাপাড়ার দুঃখটা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বাবার মতলব ছিল আলাদা। তিনি দার্জিলিং-এর ট্যুরিস্ট অফিস থেকে, হলং-এর বাংলোর দুটো ঘর দুদিনের জন্য বুক করে ফেললেন। বাবা খবর নিয়ে জেনেছিলেন, দার্জিলিং থেকে হলং-এর বাংলো বুক করার সুবিধে। বাবা গোগোলের কাঁধে হাত চেপে বললেন, 'এবার হল তো?'

গোগোল খুশি হয়ে বাবাকে একটা চুমু দিয়ে দিল। তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'কিন্তু বাবা হলং-এ যাবার গাড়ির কী হবে?'

বাবা বললেন, 'কী আর হবে? শিলিগুড়ি থেকে দু দিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।'

তাই করা হল। সেইদিনই গোগোলরা দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি ন-মামার বাড়ি ফিরে এল। ন-মামা সব শুনে, সন্ধেবেলাতেই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেললেন। পরের দিন ভোরবেলা হলং যাত্রা। গাড়ি ভোরবেলাই এসে গেল। ড্রাইভার লোকটি বাঙালী আর বেশ ভদ্রলোক। এ যাত্রায় আবার বুড়োদা আর মিনুদি সঙ্গে।

গাড়ি প্রথমে চলল জলদাপাড়ার পথেই। তারপরে এক সময়ে আসাম যাবার রাস্তায় ঘুরে গেল। সেই পথেই পড়ল হলং-এর জঙ্গলে ঢোকবার গেট। রীতিমত তালা-চাবি লাগানো রেলের লেবেল ক্রসিং-এর মতো লোহার ডাণ্ডার গেট। গেটম্যান বাবার কাছ থেকে বুকিং স্লিপ দেখে তালা খুলে দিল।

দু পাশে ঘন বন। মাঝখান দিয়ে শক্ত লাল মাটি আর কাঁকরের রাস্তা। কিন্তু গাড়ি বনের মধ্য দিয়ে চলেছে তো চলেছেই, থামবার আর নাম নেই। গোগোল বলে উঠল, 'বাংলোটা কত দূরে?'

ড্রাইভার হেসে বলল, 'গেট থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার।'

বুড়োদা হলং-এ কখনো আসেনি, তাই বলতে পারল না। গোগোল এবার বুঝল, কেন গাড়ি ছাড়া হলং-এ আসা যায় না। গাড়ি না থাকলে এতটা পথ হেঁটে যেতে হত। বাসে এলে, বাসও মাঝপথে বদলাতে হত। অনেক ঝামেলা। কিন্তু গভীর বনের ভিতর দিয়ে গাড়িতে যেতে গোগোলের দারুণ মজা লাগছে। এখানে মিলিটারি ক্যাম্প নেই, চাঁদমারির গুলির আর হেলিকপ্টারের আওয়াজ নেই। কেবল বন আব বন। তারপরেই হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা কাঠের চওড়া সাঁকো, ওপারে কাঠের সুন্দর দোতলা বাংলো।

বাংলোর চত্বরে গাড়ি দাঁড়াতেই, গোগোল দরজা খুলে নেমে পড়ল। প্রথমে বাংলোটা দেখল। জলদাপাড়ার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। বিরাট ডাইনিং রুম, বসবার ঘর আলাদা। সোফা সেট দিয়ে সাজানো। ড্রাইভার বলল, 'সাঁকোর নীচে যে নদীটা আছে, সেখানে অনেক মাছ দেখা যায়।'

গোগোল অমনি বুড়োদা আব মিনুদিব সঙ্গে সাঁকোব ওপব ছুটে গেল। দেখল নীচে কাচের মত জলে অনেক আব বড় বড় মাছ খেলা কবছে। গোগোল হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। মাছগুলোর একটুও ভয় নেই।

মাছ দেখে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে কিছুটা হেঁটে যেতেই বাঁ দিকে দেখা গেল কয়েকটা হাতি বাঁধা রয়েছে। তার মধ্যে একটা হাতি একটু দূরে, তার চারপাশে গোল করে লোহার বড় বড় ছুঁচালো গজাল পোঁতা। কেন? গোগোল বুড়োদাকে জিজ্ঞেস কবল। বুড়োদা কিছুই বলতে পারল না। হাতিগুলো লম্বা ঘাস আর গাছের ডালপাতা খাচ্ছে।

কাছেই কতগুলো কাঠের উঁচু ঘর। অন্য পাশে কাঠের একটা বাংলো-বাড়ি। রেলিঙে জামা-কাপড় শুকোচ্ছে। লোকজন বিশেষ দেখা যায় না। বোধহয় মাহুতদের পরিবারের মেয়ে- বউরাই কেউ কেউ ঘরকন্নাব কাজ করছিল। এই সময়ে মিনুদি বলে উঠল, 'ওখানে ওটা কী দ্যাখ।'

গোগোল ঘরগুলো ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে দেখতে পেল, একটা বাচ্চা হাতির গলায় শেকল বাঁধা। সেও লম্বা-লম্বা ঘাস খাচ্ছে। গোগোল তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটে গেল। বুড়োদা মিনুদিও গেল। বাচ্চা হাতিটা ফোঁস ফোঁস করে ওদের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল। বুড়োদা বলল, 'দেখিস গোগোল, কাছে যাসনে।'

গোগোল তবু একটা হোগলার মতো লম্বা ঘাস বাচ্চা হাতিটার দিকে

বাড়িয়ে দিল। বাচ্চা হাতিটা ঘাসের ডগাটা শুঁড়ে জড়িয়ে টান দিতেই, গোগোল তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বুড়োদা ধরে ফেলল। গোগোল বেশ একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে, আর অবাক হয়ে বলল, 'আরে বাস্‌রে, বাচ্চাটার গায়ে কী জোর!'

ঠিক সেই সময়েই পিছন থেকে মোটা আর গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ ভাই?'

সবাই পিছন ফিরে ফিরে দেখল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক। ডাক্তারি পড়ে গোগোলের তিতুদা অনেকটা তার মতোই দেখতে। বুড়োদাই সকলের বড়, ক্লাস এইটে পড়ে। সে বলল, 'আমরা শিলিগুড়ি থেকে এসেছি।'

মিনুদি তাড়াতাড়ি গোগোলকে দেখিয়ে বলল, 'ও কলকাতা থেকে এসেছে। তিতুদার মতো লোকটি, যার তিতুদার মতোই গোঁফ আছে, আর হাওয়াই শার্টের সঙ্গে সাদা ট্রাউজার পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গোগোলের দিকে একবার দেখলেন। মুখ তুলে চারপাশে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ, এভাবে এখানে ঘুরো না। কয়েকদিন হল একটা দাঁতাল বুনো হাতি খুব উৎপাত করছে।'

গোগোলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'উৎপাত করছে? কেন?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'বুনো হাতিটা একটু রেগে আছে।'

বুড়োদা বলে উঠল, 'তার মানে পাগলা হাতি?'

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই, পিছন থেকে বাবার ব্যস্ত আর উৎকণ্ঠিত ডাক শোনা গেল, 'গোগোল, বুড়ো, মিনু, তোমরা শিগ্‌গির বাংলোয় ফিরে এসো।'

সকলেই পিছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল, বাবা ড্রাইভারের সঙ্গে প্রায় ছুটে আসছেন।

কাছে এসে বাবা বললেন, 'তাড়াতাড়ি বাংলোয় চলো সবাই। এখানে একটা বিরাট বুনো দাঁতাল খ্যাপা হাতি আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকজনকে তাড়া করছে।' বলে সবাইকে তাড়া করে নিতে গিয়ে বাবা সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এই ফরেস্টেরই একজন রেঞ্জার। আমিও এদের বুনো হাতির কথাই বলছিলাম। তবে এত তাড়াহুড়ো করে ছোটবার কিছু নেই। বুনো হাতিটা লোকজনকে এমনিতে বিশেষ কিছু করছে না। চলুন, আপনাদের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

সকলের চোখে-মুখেই কেমন একটা ভয় নেমে এসেছিল। ভদ্রলোকের কথায় আবাব যেন সাহস ফিরে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক যেতে যেতে বললেন, 'হাতিটা পুরুষ, আর বিরাট দেখতে, দাঁত দুটোও প্রকাণ্ড। মনে হয়, আসাম থেকে, ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছে।'

ভদ্রলোককে গোগোলের এতই ভাল লেগে গেল, তাঁর কথাবার্তা বলার ধরণও এত সুন্দর, ও সবাইকে ঠেলেঠুলে, তাঁব গা ঘেঁষে চলছিল। বলে উঠল, 'আচ্ছা দাদা—'

এইটুকু বলেই গোগোল থমকে গেল। কোনো ভদ্রলোককে এরকম 'দাদা, বলে ডাকা বাবা মোটেই পছন্দ করেন না। লজ্জা পেয়ে ও বাবার দিকে তাকাল। ভদ্রলোক সেটা বুঝে, হেসে বললেন, 'আমাব নাম জয়ন্ত তুমি আমাকে জয়ন্তদা বলতে পারো।'

বাবা গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গোগোল মনে-মনে ভরসা পেল। জিজ্ঞেস কবল, 'আচ্ছা, জয়ন্তদা, আপনি কা করে জানলেন, বুনো হাতিটা ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছে?'

জয়ন্তদা বললেন, 'বর্ষাকালে পাহাড়েব আর আসামেব নদীগুলোতে বন্যা হয়। হাতিরা বন্যাকে বেশ ভয় পায়। তাছাড়া এদিকে তখন ক্ষেতে প্রচুব ফসল থাকে, হাতিরা সেই ফসল খেতে আসে। খায়, নষ্ট করে। তখন খবর পেয়ে আমরাই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ কবে ওদেব গিয়ে তাড়াই।'

এই কথা বলতে বলতে সাঁকো পেরিয়ে গোগোলরা সবাই বাংলোর চত্বরে এসে পড়ল। গোগোল দেখল, মা ভয়-ব্যস্ত চোখে ওদেরই দেখছেন বসবার ঘরেব জানালা দিয়ে। সবাইকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন।

জয়ন্তদা বলে উঠলেন, 'ওই দ্যাখো, শ্রীমান নদীর ওপারেব মাঠে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে দেখছে।'

নদী মানে, সাঁকোর নীচে দিয়ে যে ছোট জলের ধারা বয়ে গিয়েছে, বাংলোর সামনে দিয়েই তার স্রোত চলেছে। সেখানে একটা বাঁধানো ঘাট। ঘাটের ওপারে বেশ খানিকটা খোলা সবুজ মাঠ। সেই মাঠেই বিরাট বুনো হাতিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোগোল ওর জীবনে এত বড় হাতি আগে কখনো দেখেনি! এত বড় দাঁতও কোনো হাতির চোখে পড়েনি। হাতিটার নীলচে কালো গায়ের কোথাও কোথাও কাদা-মাটির দাগ। কান দুটো পিছন দিকে যেন টেনে রেখেছে, আর আস্তে আস্তে শুঁড় দোলাচ্ছে। গোগোল ভয় পাওয়ার থেকে

[redacted]
গম্ভীর আর শান্ত। পাগলামি খ্যাপামির কোনো চিহ্নই নেই। গোগোলের ইচ্ছে হল, ছুটে হাতিটার কাছে চলে যায়। গেলে কী হবে? হাতিটা ওকে মেরে ফেলবে? কথাটা ভেবেও জয়ন্তদাকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

কয়েক মিনিট পরেই হাতিটা আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

জয়ন্তদা বললেন, 'সবাই ঘরের মধ্যে চলো। ও হয়তো এখানেই আসবে।'

সবাই হুড়মুড় করে দৌড় দিতেই জয়ন্তদা বললেন, 'এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। নদীটা পেরিয়ে ও বড়জোড় ঘাটের সামনেই আসবে। বাংলোর চারপাশে এই যে দেখছ পাথরকুচি ছড়ানো, এর ওপরে হাতি কখনো পা দেবে না। পায়ের নখের ফাঁকে নরম জায়গায় বিঁধে যাবার ভয় আছে। আসলে হাতি খুবই বুদ্ধিমান জীব।'

বুড়োদা বাংলোর ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কিন্তু বুনো যে?'

জয়ন্তদা বললেন, 'বুনো হাতিরও যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। চলো, দেখি গিয়ে বসবার ঘরের জানালা দিয়ে ও এল না কি।'

সবাই বসবার ঘরেব জানালাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল। আর সকলেই অবাক হয়ে দেখল, সত্যি বুনো হাতিটা এইটুকু সময়ের মধ্যেই নদী পেরিয়ে ঘাটের ওপর বাংলোব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাথরকুচি ছড়ানো চত্বরে পা দিচ্ছে না।

গোগোলের শরীরে রীতিমতো খুশির শিহরণ বইতে লাগল। এত কাছ থেকে, এমন বিরাট বুনো দাঁতাল হাতি কোনোদিন দেখবে, ভাবতেই পারেনি। রোদ লেগে ওর দাঁত দুটো ঝকমক করছে। আর বাংলোর দিকে শুঁড় বাড়িয়ে যেন গোগোলদেরই গন্ধ শুঁকছে। গোগোলের মনে হল, কেবল রাজা নয়, ওকে যেন বইয়ে-পড়া স্বর্গের ঐরাবতের মতো মহান দেখাচ্ছে।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে, ও বাঁদিকে ফিরে আস্তে আস্তে চলে গেল। বাবা-মা'ও হাতিটাকে দেখছিলেন। এই সময়ে রসুইখানার পাচক এসে মাকে ডেকে নিয়ে গেল। গোগোল জয়ন্তদাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি যে বলছিলেন, ও উৎপাত করছে, রেগে আছে? শুধু শুধু কেন এরকম করছে?'

গোগোল আগেই জয়ন্তদার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। বাবাও মুখ টিপে হেসে একটা সোফায় বসে গেলেন। জয়ন্তদা বললেন, 'তোমরা আমাদের পোষা হাতিগুলো দেখেছ?'

সবাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানাল, দেখেছে। জয়ন্তদা বললেন, 'তার মধ্যে একটা হাতিকে লোহার ছুঁচলো গজাল পুঁতে ঘিরে বেঁধে রাখা হয়েছে, দেখেছ?'

'দেখেছি।' সবাই বলল।

জয়ন্তদা হাত তুলে বললেন, 'বেশ। ওটি হল মেয়ে হাতি, ওর নাম বনমালা। এখন এই বুনো হাতিটা চায়, বনমালাকে সে বিয়ে করবে। বনমালাও হাবেভাবে তাই চাইছে।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হাতির বিয়ে। কী করে করবে?'

জয়ন্তদা বললেন, 'ওদের অবিশ্যি পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়তে হয় না। দুজনে এক সঙ্গে মিশে, বনে চলে গেলেই ওদের বিয়ে হয়ে যায়।'

গোগোল বলল, 'তবে বিয়ে হচ্ছে না কেন?'

জয়ন্তদা বললেন, 'কী করে হবে বলো। তা হলে তো আমাদের বনমালাকে ওর সঙ্গে ছেড়ে দিতে হয়। তা তো ছেড়ে দেওয়া যায় না।'

'কেন?' গোগোল জিজ্ঞেস করল।

জয়ন্তদা বললেন, 'বনমালাকে আমাদের এখানে মালপত্র বইবার কাজ করতে হয়। তারপরে এই যেমন তোমরা বেড়াতে এসেছো, তোমাদের পিঠে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে বেড়িয়ে গণ্ডার হরিণ দেখাতে হয়। ছেড়ে দিলে তো বনমালা বনেই চলে যাবে। হয় তো ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক দূরে আসামের জঙ্গলেই চলে যাবে, আর কখনো ফিরে আসবে না। আমাদের অসুবিধে হয়ে যাবে।'

বুড়োদা খুশি হয়ে বলল, 'ও বুঝেছি. সেইজন্যই ছুঁচলো গজাল পুঁতে বনমালাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছে, বুনো হাতিটা যাতে ওকে এসে নিয়ে যেতে না পারে।'

জয়ন্তদা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

গোগোল হাসতে পারল না। জয়ন্তদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল গোগোল, তুমি কথা বলছ না যে? তোমার কি মন খারাপ হয়ে গেল?'

গোগোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

জয়ন্তদা যেন একটু অবাক হয়ে হেসে বললেন, 'কেন? বনমালার সঙ্গে বুনো হাতিটার বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে?'

গোগোল আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

সবাই হেসে উঠল। গোগোল হাসতে পারল না। ব্যাপারটা ওর কাছে খুবই অন্যায় মনে হল। কারণ বুনো হাতিটা বুনো হতে পারে, কিন্তু সে এত সুন্দর দেখতে, এত বিরাট তার চেহারা, অমন সুন্দর প্রকাণ্ড যার দাঁত, তাকে বিয়ে করতে না দেওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায়। বিশেষ করে বনমালাও যখন তাই চায়। গোগোলের কাছে সকলের হাসি খুব নিষ্ঠুর মনে হল।

জয়ন্তদা বললেন, 'গোগোল তুমি কষ্ট পাচ্ছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ, বুনো হাতিটার ভয়ে, তোমাদের আমরা আমাদের পোষা হাতির পিঠে চাপিয়ে, গণ্ডার হরিণ দেখতে পাঠাতে পারব না। বনমালা ছাড়া যে-কোনো পোষা হাতি দেখলেই বুনোটা তাদের তাড়া করছে। বুনো হাতিটা তোমাদের আনন্দও মাটি করে দিয়েছে।'

গোগোল এদিকটা ভেবে দেখেনি। বুড়োদা, মিনুদি, এমন কী বাবাও বললেন, 'সত্যি, আমাদের কপালটাই খারাপ। হলং-এ এসেও, হাতির পিঠে চেপে জন্তু জানোয়ার দেখতে পাব না।'

গোগোলেরও যে মনটা একটু খারাপ হল না, তা নয়। বন্য গণ্ডার হরিণ দেখার শখ ওরই বেশি ছিল। কিন্তু বুনো হাতিটার সেই আশ্চর্য সুন্দর আর বিরাট চেহারাটাব কথা ভেবে, তার জন্যেই ওর মনটা বেশি খারাপ হয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা গোগোলের ঘুম ভেঙে গেল। বুড়োদা মিনুদি এখনও ঘুমোচ্ছে। পাশের ঘরে বাবা-মায়েরও কোনো সাড়া শব্দ নেই। গোগোল খাটের মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। ছোট হাঁটুজল নদীটির বাঁ দিকে ঝাড়ালো গাছটায় অসংখ্য পাখি ডাকছে। গোগোল জানালা থেকে সরে, আস্তে-আস্তে দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল। বাইরে বেরিয়ে নীচে নেমে, একেবারে ঘাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রসুইখানার পাচক বা চৌকিদার নিজেদের কাজে ব্যস্ত। কেউ গোগোলকে লক্ষ্য করল না।

গোগোল ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, স্রোতের জলে চোখ মুখ ধুয়ে নিল। অবাক হয়ে দেখল, ওর হাতের সামনেই মাছগুলো ঘোরাফেরা করছে। ওর

খুব ইচ্ছে হল, একটা মাছকে হাত দিয়ে ধরে। ওর পা খালিই ছিল। জলে নেমে পড়ল। আর, একটা মাছ যেন ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওপারে নিয়ে গেল, আর চট করে হারিয়ে গেল।

গোগোল হতাশ হয়ে, ওপর দিকে তাকালো। সেই ঝাড়ালো গাছটা। ও এখন নদীর অন্য পারে। পাখি দেখবার জন্য ও উঁচু পাড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা তুলে গাছের দিকে দেখল। প্রথমেই ওর চোখে পড়ল একটা কালো পাখি, মাথায় হলুদ রঙের ঝুঁটি। পাখিটা একবার শিস্ দিয়ে ডেকেই, হঠাৎ উড়ে গেল। তারপর আরো কয়েকটা পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। কেন? গোগোলকে দেখে ভয় পেয়েছে?

ঠিক এই সময়েই গোগোলের মনে হল, ওর মাথায় হাল্‌কা গরম দমকা বাতাস লাগল, আর মাথার চুল উড়ে কপালে পড়ল। কিসের বাতাস? ও পিছন ফিরে তাকাল। ও প্রথমে দেখতে পেল, হাতির একটা শুঁড়, ওর মাথার ওপরে ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। ও ভাল করে তাকিয়ে দেখল, সেই বিশাল কালোয় নীলে মেশানো বুনো হাতিটা ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রকাণ্ড বাঁ-দিকের দাঁতটা প্রায় ওর কাঁধের কাছে নেমে এসেছে।

গোগোল প্রথমটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, আর হতচকিত হয়ে ভাবল, দৌড় দেবে কি না কিন্তু আশ্চর্য, ও দৌড় দেবার কথা ভাবতেই, হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে, আল্‌তো করে ওর মাথায় ছোয়ালো। আবার সেই রকম দমকা বাতাসের মতো নিঃশ্বাস ফেলল ওর চুলগুলো আবার উড়ে এলোমেলো হয়ে গেল। তারপরেই হাতিটা শুঁড় দিয়ে গোগোলের কাঁধে, পিঠে, কোমরে, এমন কি পায়েও আলতো করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন গন্ধ শুঁকল।

গোগোলের ভয়-ছমছমানি ভাবটা কেমন কেটে গেল। ও কি এই বুনো হাতিটার শুঁড়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবে? যেমন কলকাতার চিড়িয়াখানায় দিয়েছিল? ও মুখ তুলে হাতিটার চোখের দিকে তাকাল। চাউনিটা মোটেই রাগী দেখাচ্ছে না। কুলোর মতো কান দুটো নাড়ছে। গোগোল খুব আস্তে ওর শুঁড়ে একটু হাত বুলিয়ে দিল। অমনি বুনোটা তার শুঁড় গুটিয়ে এনে, গোগোলের ছোট নরম আঙুলগুলো শুঁকল। আঙুলের ডগাগুলো যেন লালায় ভিজে গেল। গোগোলের হাসি পেয়ে গেল।

বুনো হাতিটা হাঁ করল, তার জিভটা দেখা গেল। গোগোলের মনে হল,

ও ওর প্রকাণ্ড দাঁতে হাঁ করে হাসছে। গোগোল বলেই উঠল, 'তুমি হাসছ, না?'

বুনো শুঁড় তুলে গোগোলের কানের কাছে হাল্‌কা নিঃশ্বাস ফেলল। গোগোলের মনে হল, ও যেন বলল, 'হ্যাঁ'। গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, 'বনমালাব সঙ্গে তোমাব বিয়ে দেয়নি বলে তোমার মন খুব খারাপ, না?'

বুনো গোগোলেব নরম গালে শুঁড় ছুঁইয়ে দিল। এই সময়ে বাংলোর দিক থেকে অনেকের গলা শুনে, গোগোল সেদিকে তাকিয়ে দেখতে গেল। বুনো হাতিটা এবার গোগোলের পিঠে শুঁড় দিয়ে আস্তে ঠেলে দিল। গোগোল বাংলোর উল্‌টো দিকে দুপা এগিয়ে গেল। বুনো শুঁড় তুলে যেন হাতেব মতো দেখাল, আবাব গোগোলেব পিঠে আস্তে ঠেলে দিল। আর মাথায় আলতো করে শুঁড় দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। তারপবে খুব ঘন-ঘন শুঁড় আব কান নাড়তে লাগল।

বাংলোর দিকে তখন বীতিমতো হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে গোগোলের মনে হল, মা যেন চিৎকার করে ওকে ডাকছেন। কিন্তু গোগোল বুনোর সঙ্গে বনের দিকেই এগিয়ে চলল। বুনো মাঝে মাঝেই ওর পিঠে আস্তে করে ঠেলে দিতে লাগল, আব গালে গলায় মাথায় আল্‌তো করে ছুঁযে দিল।

গোগোল নির্ভয়ে বুনো হাতির আগে আগে চলতে লাগল। দু-একবার ওব শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিল। একবাব জিজ্ঞেস কবল, 'তুমি আমাকে ভালবাসো, না?'

বুনো বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বাংলোব দিকে গোলমাল তখন চরমে। কিন্তু গোগোলের কিছুই মনে হল না। একটা অন্ধ লোককে তার লাঠি ধবে যেমন কেউ বাস্তা পাব করে দেয়, ও সে-ভাবেই বুনোব শুঁড় ধরে ক্রমেই গভীর জঙ্গলেব মধ্যে ঢুকে গেল। তাবপরেই হঠাৎ ভয় পেয়ে থেমে চিৎকাব করে উঠল 'ওটা কী?'

বুনো বিশাল হাতি তৎক্ষণাৎ গোগোলকে আড়াল করে দাঁড়াল। আর গোগোল দেখল, একটা মস্ত গণ্ডার তাব বাচ্চা নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। গোগোল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'গণ্ডার গণ্ডার! মা আর বাচ্চা।

বুনো হাতি ওর কাঁধে শুঁড় দিয়ে যেন কিছু ইশারা করল, আর আবার হাঁ কবল। ঠিক যেন হাসছে। সে আবার গোগোলের পিঠে আলতো করে ঠেলে দিল। গোগোলও আবার তার শুঁড় ধরে এগিয়ে চলল। চলতে-চলতে গোগোলের মাথা সমান ঘাস বনে চলে এল। আর হঠাৎ একটা

ময়ূর ডানা ঝাপটিয়ে আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে দূরে গিয়ে নামল।

গোগোল প্রথমটায় চমকিয়ে উঠলেও, তারপরেই খুশি হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ময়ূর ময়ূর।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই, হাত দশেক দূরেই একদল হরিণ, ঠিক যেন ঢেউয়ের মতো ছুটে পালিয়ে গেল। গোগোল হাততালি দিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল, 'হরিণ, হরিণ!'

বুনো ওর হাতের ওপর শুঁড় ছুঁইয়ে আবার আলতো করে পিছন থেকে ঠেলে দিল। গোগোল আর তখন এগোবে কি। ওর আশে-পাশে থেকে এক-একটা হরিণ ছিটকে দিগ্‌বিদিকে ছুটতে লাগল। ময়ূর আর বুনো মুরগি থেকে থেকেই উড়তে লাগল।

গোগোল যেন আনন্দে পাগল হয়ে গেল, আর হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। বুনো হাতিটা তার বিশাল শরীর দুলিয়ে, শুঁড় আর কান দুটো খুব নাড়তে লাগল। যেন সেও বেশ খুশি।

আরো খানিকটা এগিয়ে, একটা মোটা গাছের গুঁড়ির কাছে একটা ছোট বাঘের মতো জানোয়ার দেখে গোগোল ভয় পেয়ে থমকে গেল। হাত বাড়িয়ে বুনোর শুঁড় ধরে বলল, 'বাঘ বাঘ!'

গোগোল জানে না, আসলে ওটা বাঘ নয়, একটা চিতা বিড়াল। এই



অঞ্চলের বনে প্রায়ই এদের দেখা যায়। চিতা বিড়ালটা বিশাল হাতি দেখেই, ভয়ে গুটিয়ে গিয়ে গর্‌গর্‌ করে উঠল। বুনো গোগোলের হাত থেকে শুঁড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে, দু পা এগিয়ে যেতেই চিতা বিড়ালটা এক লাফ দিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিল।

গোগোল হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। বুনো শুঁড় তুলে হাঁ করল। ঠিক যেন হাসছে! ঠিক এ সময়েই কাছাকাছি থেকে লোকজনের গলার স্বর শোনা গেল। গোগোল স্পষ্ট বাবার ডাক শুনতে পেল, 'গোগোল! গোগোল! তুমি কোথায়?

গোগোল চিৎকার করে জবাব দিল, 'আমি এখানে।'

তারপরেই প্রায় একশো হাত দূরে, একদল লোককে দেখা গেল। তাদের মধ্যে বাবা আর জয়ন্তদা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বুনো হাতি এই প্রথম অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠল, আর তার কান দুটো মাথার পিছন দিকে লেপটে গেল। গোগোল স্পষ্ট দেখল, তার চোখের চাউনিতে রাগ ফুটে উঠেছে। সে শুঁড় দিয়ে গোগোলের কাঁধে আল্‌তো করে ছোঁয়াল।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'তোমার রাগ হচ্ছে?'

বুনো গোগোলকে আড়াল করে, একশো হাত দূরে দলটার মুখোমুখি দাঁড়াল। বাবা চিৎকার করে বললেন, 'গোগোল, ও পাগলা হাতি, তোমাকে মেরে ফেলবে।'

গোগোল বলল, 'না ও আমার বন্ধু হয়ে গেছে।'

বুনো কী বুঝল, কে জানে। সে হঠাৎ দলটার দিকে দৌড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটার সঙ্গে বাবা আর জয়ন্তদাও পিছন ফিরে দৌড় দিলেন। কিন্তু চলে গেলেন না। জয়ন্তদা চিৎকার করে বললেন, 'গোগোল, তুমি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাংলোয় ফিরে এসো।'

গোগোল বলল, 'আপনারা চলে যান।'

গোগোলের কথা শুনে, বাবা, জয়ন্তদা সবাইকে নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। গোগোল বুনোর কাছে এগিয়ে এল। বুনো ওর গায়ে মুখে শুঁড় ছুঁইয়ে শুঁকল, কিন্তু তার রাগভাবটা এখনো আছে। গোগোল বলল, 'এবার ফিরে চলো, আমার মা কাঁদছে।'

বুনো শুঁড় দিয়ে, গোগোলের কানে একটু হাওয়া লাগিয়ে দিল। গোগোলের মনে হল, ও যেন বলছে, 'খুব সাবধান। ওদের বিশ্বাস নেই।'

গোগোল বলল, 'আমি আছি, তোমার কোন ভয় নেই।' বলে বুনোর

শুঁড় ধরে এগিয়ে চলল।

বুনো হাতি প্রথমে যেন একটু আপত্তি করল, তারপরে গোগোলের পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল। গোগোল বাংলোর পথ চেনে না। বুনোই তাকে টেনে, আস্তে করে ঠেলে, বাংলোর হাতায় এনে ফেলল। কিন্তু সে আর এগোলো না। দূরে বিরাট ভিড় দাঁড়িয়ে ছিল।

গোগোল বুনোর দিকে তাকাল। তার চোখে এখন রাগ নেই, ররং গোগোলের মনে হল, তার চাউনিতে কষ্ট। গোগোল তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিল। সে শুঁড় তুলে গোগোলের মাথায় তেমনি দমকা নিশ্বাস ছাড়ল। গোগোলের চুল এলোমেলো হয়ে গেল। বুনো গোগোলের কাঁধে গলায় শুঁড় ঠেকাল, ঠিক যেন আলতো করে আদর করার মতো। তারপরে আস্তে-আস্তে পিছন ফিরে চলে গেল।

গোগোলের মনটা কেমন টনটন করে উঠলো। ও সেই বিশাল সুন্দর হাতিটাকে যতক্ষণ দেখা গেল, দেখল। তারপর সে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এ সময়েই ভিড়টা দৌড়ে এল। প্রথমেই মা গোগোলকে বুকে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, বললেন, 'ওরে গোগোল, তোর জন্য ভয়েই আমি একদিন মরে যাব।'

কিন্তু মায়ের কান্নার মধ্যেও সকলেই আনন্দে হাসতে লাগল। গোগোল মায়ের সঙ্গে বাংলোর বসবার ঘরে এল।

জয়ন্তদা বন্দুকটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বললেন, 'এবার বলো তো গোগোল, ওই ভয়ঙ্কর বুনো দাঁতাল হাতিটা তোমাকে কী বলল?'

গোগোল বলল, 'কী আবার? ও নিজে এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল, আর বেড়াতে নিয়ে গেল।'

জয়ন্তদা অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এখন থেকে বুনো হাতিদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে।'

বাবা কিছুই বললেন না। তিনি এমনভাবে গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, গোগোল ফিরে এসেছে।



সোনালী পাড়ের রহস্য

গত বছর পূজায় তোমাদের আমি গোগোলের একটি গল্প শুনিয়েছিলাম। আশা করি, এর মধ্যেই তোমরা তা ভুলে যাও নি। গিয়ে থাকলেও, আমি একটুখানি তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। কাশ্মীরের লিডর নদীর ধারে, পাহেলগাঁয়ে, গোগোল অদ্ভুতভাবে একটি ডাকাতদলকে ধরিয়ে দিয়েছিল। সে জেনেশুনে কিছুই করে নি। আসলে সব কিছুতেই ওর কৌতূহলের মাত্রাটা একটু বেশী।

কৌতূহল মানেই জিজ্ঞাসা। কোনো কিছু দেখে, কৌতূহল হলেই, মনে জিজ্ঞাসা জাগবেই। অবিশ্যি সেই সঙ্গে, সব কিছু দেখবার মতো খোলা চোখও থাকা দরকার। গোগোলের সেরকম খোলা চোখও ছিল। ও যেখানে যাবে, কোনো কিছুই ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সেই-রকম খোলা চোখে, একটা ব্যাপার দেখে, ওর মনে কৌতূহল জেগেছিল, আর সেই কৌতূহল থেকেই, ওর মনে জেগেছিল জিজ্ঞাসা, যার ফলে, অতি ভয়াবহ একটি ডাকাতির ডাকাতদল ওর চোখে পড়ে গিয়েছিল। ও নিজেও জানতো না, 'ইঁদুরের খুট খুট' শব্দের মধ্যে ডাকাতদল লুকিয়ে আছে। এবার বোধহয় তোমাদের মনে পড়ছে, গোগোলের কোন্ গল্পটি তোমাদের গত পূজোয় শুনিয়েছিলাম।

কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা যেমন অনেক সময়, অনেক কিছু জানিয়ে দেয়, ধরিয়ে দেয়—মানে যাকে বলে আবিষ্কার, তেমনি অনেক সময় তা বিপদকেও ডেকে আনতে পারে। যে-বিপদের মধ্যে পড়ে, শেষটায় প্রাণ যাবার দাখিল।

তখন মনে হতে পারে, বেশী কৌতূহল না থাকাই ভালো। কিন্তু তা বললে তো আর মন মানে না। বিশেষ করে গোগোলের মতো ছেলের মন যদি হয়। আসল কথা হলো, গোগোলের যা বয়স, ওর তো বিপদ সম্পর্কে কোনো ধারণাই এখন পর্যন্ত হয় নি। ওর মনের অপার কৌতূহল যে ওকে কোনো বিপদের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে, এতোদূর দেখবার বা বোঝবার মতো পাকা মাথার বুদ্ধি ওর হয় নি।

তা যদি হতো, তা হলে ও বাঘ সেজে, হালুম গর্জন করে, ওর মাকে কখনো ভয় দেখাতো? এখনো ও নিজে বাঘ সেজে, হামাগুড়ি দিয়ে, খাটের তলায় ঢোকে। ঢুকে, সেখানে আবার বাঘের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে। কী বলে জানো তো? বলে, 'আঁমাঁর এঁখন খিঁদে পাঁয় নিঁ, তোঁরা আঁমাঁর মাঁকে বঁলে দেঁ।' ব্যাপারটা বুঝলে তো? গোগোলের মা ভাত নিয়ে বসে আছেন। আর গোগোল না খাওয়ার চেষ্টা করছে। মাকে ভয় দেখিয়ে বাঘের বাচ্চাদের দিয়ে বলাতে চাইছে। গোগোলকে তুমি সব কিছুতে পাবে। খেলাধুলা, গল্প করা, লেখাপড়া, সব কিছুতেই। কিন্তু খেতে বলো, তা হলেই মুশকিল। খাওয়া ছাড়া, সব কিছুতেই গোগোলের আনন্দ। অবিশ্যি কাজুবাদাম বলো, ফুচকা আলুকাবলি বলো, ওসব ও খুব খেতে ভালবাসে। তা বললে তো চলে না। তাই মাকে খাবার নিয়ে, এখনো ওর পিছু পিছু ঘুরতে হয়।

আবার এই গোগোলকেই দেখবে, বাবার তামাক খাবার পাইপ মুখে গুঁজে, বাবার অ্যাটাচি কেস্ নিয়ে, ওর বাবাকেই হয়তো বলবে, 'আঁপমাস্ মঙ্গে এম্‌মু দমম · · ·।'

তার মানে বুঝতে পারলে না তো? বুঝবে কি করে। গোগোল কখনো পাইপ মুখে দিয়ে কথা বলতে পারে? ওর সাত বছরের খুদে দাঁত দিয়ে, ওর মুখের থেকে বড় পাইপটা কখনো কামড়ে ধরা যায়? তাই কথা ওরকম শোনায়। সেজন্যে ওর বাবা হেসে বলেন, 'আপনি দয়া করে পাইপটা মুখ থেকে নামান, তা না হলে কথা বলতে পারবেন না। আর পাইপের নলের মুখে, তামাকের যে কষ লেগে আছে, সেটা আপনার মুখে গেলে, আপনি বমি করবেন।'

গোগোল তখন পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বলবে, 'থ্যাংকু। আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম।'

বাবা বলেন, 'বলুন, কী চান? তার আগে পাইপটা আমাকে দিন।

হাত থেকে পড়ে গেলে, ভেঙে যাবে।'

গোগোল অমনি চোখ মুখ গম্ভীর করে বলবে, 'কেন আপনি কথা বলছেন! আপনার তো অসুখ, আমি ডাক্তার। আপনাকে ইন্‌জেকশন দেব।'

বাবা বলেন, 'ওহো, তাই নাকি? বসুন বসুন ডাক্তারবাবু।'

গোগোল অ্যাটাচি কেস্ রেখে, পাইপটা টেবিলের ওপর রাখবে। তারপরে বাবার পেনসিলটা নিয়ে, তার ডগা দিয়ে, বাবার ডানহাতে আস্তে করে লাগাবে। ওটাই তার ইন্‌জেকশনের ছুঁচ। তারপরে মুখ চোখ এমন করবে, যেন তার নিজেরই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। আবাব জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার কি খুব লাগছে?'

বাবা বলেন, 'একটু একটু।'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলবে, 'এখুনি সেরে যাবে। দিন, আমার টাকা দিন।'

বলে হাত বাড়াবে। বাবাও পকেট থেকে হাত বের করে গোগোলের হাতে দেবেন। গোগোল জানে, টাকাটাও মিছিমিছি। ও টাকা নিয়ে মুঠো পাকিয়ে পকেটে ভরবে। তারপরে বলবে, 'নমস্কার, চলি।'

এমনিতরো বহু কাণ্ডকারখানাই সে করে, যা বড়দের কাজ। ওর বাবা ওর সঙ্গে বেশ পাল্লা দেন। কিন্তু মায়ের তো ঘরে অনেক কাজ। তিনি পাল্লা দিতে পারেন না। তাই মা ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন। যেমন ধরো, গোগোলের ইস্কুল হয় সকালে। দুপুরে যখন ওর মা ওকে একটু ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেন, তখনই হয় তো ও বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বলে 'আপনাদের ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গেছে, না? আমি সারাতে এসেছি।'

বলেই ও লাফ দিয়ে খাট থেকে নামবার চেষ্টা করতেই, মা ওকে ধরে ফেলেন, বলেন,, মোটেই ফ্রিজ খাবাপ হয় নি, তোমাকে আর ইঞ্জিনিয়ারিং কবতে হবে না, এখন শোও। তা না হলে পিটবো।'

মায়ের কাছে গোগোল কখনোই বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। এমন কি ঘুমের ভান করেও না। অনেক সময় ও এমন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে, মনে হবে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছাটা, মা ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি উঠে, ওদের চাকর বঙ্কিমের কাছে গিয়ে, গল্প বলবে। গল্প শুনবেও। কিন্তু মা চোখ বুজেও যে ঘুমোন না, সেটা ও সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। আর তাই যেমনি উঠতে যায়, মা খপ করে চেপে ধরেন। গোগোল তখন

ওর সাদা খুদে দাঁত ঝকঝকিয়ে, চোখ পিটপিট করে হাসে।

গোগোলের এক এক সময় মনে হয়, ও সব বোঝে, সব জানে। তখন ও সবাইকে জ্ঞান দিতে শুরু করে। এমন কি ওর বাবার বন্ধুরা যখন আসেন, তাঁদেরও অনেক কিছু বলে, বুঝিয়ে দেয়। এই যেমন ধরো, প্লেন কেমন করে ওড়ে, ট্রেন কেমন করে ছোটে, সব ও বুঝিয়ে দেবে। প্লেন পেট্রলে ওড়ে. পাইলট ওড়ায়। ট্রেন ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্টে চলে, ড্রাইভার চালায়। এর বেশী কিছু ও বলতে পারে না। তবে প্লেনে উঠতে হলে যে কোমরে বেল্ট বাঁধতে হয়, সেটা ও আগেই বলে দেবে, কারণ ও প্লেনে করে বেড়িয়েছে।

আবার এক এক সময় গোগোল যেন কিছুই বুঝতে পারে না। তখন ও এটা কী, ওটা কী, সেটা কেন, জিজ্ঞেস করে করে, কানের পোকা বের করে দেবে। এমন কি ওর বাবা পর্যন্ত বলেন, 'তোমার এতো কথার জবাব এখন দিতে পারছি না, আবার অন্যসময় দেব।'

তা বললে তো আর মন মানে না। তখন গোগোল নিজে নিজেই অনেক কিছু ভেবে নিতে থাকে। ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই কথা বলতে থাকে। সে সব কথার মধ্যে, বাঙলা, ইংরেজি, হিন্দী সব থাকে, কিন্তু কথার মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সেসব গোগোল ছাড়া, আর কেউ জানে না।

যাই হোক, গোগোলের এবারকার গল্পটা তোমাদের বলি।

গোগোলের ইস্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে। গোগোলের বাবাও কয়েকদিন ছুটি নিলেন। খুবই গরম পড়েছে, কোথাও একটু বেড়াতে যাওয়া হবে। কোথায় যাওয়া যায়? গরমে তো দার্জিলিঙ, কালিম্পং শিলং—এরকম কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বেড়াতেই ভালো লাগে। কিন্তু উপায় নেই। গোগোলের মায়ের ঠাণ্ডা গরমে, ইনফ্লুয়েঞ্জা মতো হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন, পাহাড়ে উঠলে, বুকে সর্দি লেগে যেতে পারে। তাই পুরীতে সমুদ্রের ধারে যাওয়াই ঠিক হলো।

সেটাও মন্দ না। গোগোল কাশ্মীর গিয়েছে, কিন্তু সমুদ্র কখনো দেখে নি। কেবল ছবিতেই সমুদ্র দেখেছে। চোখের সামনে সেই বিশাল ঢেউ দেখতে পাবে ভেবে, ওর আনন্দ যেরকম হলো, একটু ভয়ও হলো। তাই ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'সমুদ্রের ঢেউ আমাদের কাছে এগিয়ে আসবে না?'

বাবা বললেন, 'দূর বোকা। ঢেউ যতো দূর এগিয়ে আসার, তত দূরই

আসবে, তার বেশী না। আমরা ধারে বসে বসে দেখবো, আবার চানও করবো।'

গোগোল জোরে মাথা নেড়ে বললো, 'না না, আমি চান করবো না, ডুবে যাবো।'

বাবা হেসে বললেন, 'ডুববে কেন, আমি তো তোমাকে ধরে রাখবো। তোমার মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাবে।'

গোগোল অবাক্ হলো। বাবার কথা যেন ওর পুরোপুরি বিশ্বাস হলো না, তাই বাবার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। বাবা অনেক সময় ঠকাবার জন্য মজা করে অনেক কথা বলেন, যা সত্যি না। কিন্তু বাবা তো মিথ্যা কথা বলেন না। ও বললো, 'তাহ আবার কখনো হয় নাকি, মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাবে?'

বাবা বললেন, 'কেন হবে না? তোমাকে আমি ধরে থাকবো। যেই ঢেউটা আসবে, অমনি ডুব দেব, আর আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাবে।'

বাবার কথা শুনে গোগোলের যেন কেমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। আসলে ও তো কখনো সমুদ্রে নামে নি, ঢেউয়ের জলে চান করে নি, তাই ও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। বললো, 'তা হলে তো আমরা ডুবেই যাবো।'

বাবা আবার হেসে উঠলেন, বললেন, 'ডুববো কেন! ডুব দিয়েই উঠে পড়বো, তার মধ্যেই ঢেউটা মাথার ওপব দিয়ে চলে যাবে। তবে হ্যা, তুমি তো কখনো ঢেউয়ের জলে ডুব দাও নি, সেজন্য তোমার নাকে মুখে একটু জল ঢুকে যেতে পারে। তাতে আর কী হবে, একটু না হয় সমুদ্রের নোনা জল পেটে যাবে।'

ব্যাপারটা গোগোলের মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। ও অবিশ্যি ছুটির দিনে বাবার সঙ্গে লেক ক্লাবেব সুইমিং পুলে সাঁতার শিখতে যায়। পা দাপানো ছাড়া এখনো কিছুই করতে পারে না। তা হলেও, দু'একবার ছোটখাটো ডুব দিতে গিয়ে, ওর নাকে মুখে জল ঢুকে গিয়েছে। আর নাকে মুখে জল ঢুকে গেলে, বেশ কষ্ট হয়। সেজন্যই ব্যাপারটা ওর কাছে বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না। তার ওপরে আবার সমুদ্র বলে কথা!

বাবা বললেন, 'কী গোগোলবাবু, তুমি ভয় পেয়ে গেলে?'

গোগোল আমতা আমতা করে ঢোক গিলে বললো, 'না, ভয় পাই নি। কিন্তু নাকে মুখে জল ঢুকে গেলে, খুব খারাপ লাগে।'

বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। আমরা আজ রাত্রের গাড়িতেই তো যাচ্ছি। কাল সকালে সমুদ্রে নামলেই তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে, বাবার কাছ থেকে চলে গেল। পাশের ঘরে গিয়ে, ওর বইয়ের সুটকেশ খুলে, একটা ছবির বই বের করে, সমুদ্রের ছবি দেখতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো। সমুদ্র ওকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

পরের দিন, পুরীতে পৌঁছে, সমুদ্রের ধারে যে বাড়িতে গোগোলদের থাকবার কথা, সে বাড়িতে যাবার পথেই সমুদ্র দেখে, গোগোল একেবারে থ। শুধু জল আর জল। আর জলের রঙ যে এমন নীল হয়, আর জল যে একেবারে সেই দূরে আকাশের গায়ে গিয়ে মিশে যায়, ছবি দেখেও গোগোল তা কল্পনা করতে পারে নি। অবিশ্যি এটা ঠিকই, ছবিতে দেখা আর বাস্তবে চোখে দেখা, তুয়েতে অনেক তফাত। গোগোল আরো দেখলো, কী বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু তার মধ্যেই কতো লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে চান করছে, আনন্দে হাত তুলে নাচছে, হাসছে, চিৎকার করছে! কোনো ভয় নেই! এমন কি, গোগোলের মতো ছেলেরাও ঢেউয়ের গায়ে ঝাঁপ দিচ্ছে। শুধু তা-ই না, গোগোল দূরের সমুদ্রে অনেকগুলো নৌকো দেখতে পেয়ে, বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, নৌকো-গুলো ওখানে গেল কেমন করে?'

বাবা বললেন, 'কেমন করে আবার? জেলে-মাঝিরা স্রোতের টানে নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে গেছে।'

গোগোলের মনের ভয় অনেকখানি কেটে গেল। এতো লোকজনকে চান করতে দেখে, আর জেলেদের মাছধরা দেখে, বুঝতে পারলো, ও যতোটা ভয় পেয়েছিল, ততোটা ভয় পাবার কিছু নেই।

গোগোলদের থাকবার জন্য সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি আগেই ঠিক করা ছিল। গোগোলের বাবার বন্ধুর বাড়ি। বেশ ছোটখাটো ছিমছাম একতলা বাড়ি। তুটো বড় বড় শোবার ঘর, খাটে পরিষ্কার বিছানা পাতা। বসবার ঘরে শোফা সেট, ঝকঝকে সাজানো। গোগোলরা পৌঁছুতেই, মাঝবয়সী কালো একটি লোক ছুটে এসে, হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে, বাবাকে বললো, 'আমার নাম গৌরাঙ্গ। আপনাদের আসার কথা বাবু আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন।'

বলে, গৌরাঙ্গ গোগোলের মাকেও কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে

[redacted]

গৌরাঙ্গের পিছনে পিছনে, ঘোমটা দিয়ে, মুখ অনেকখানি ঢেকে, একটি বউ এলো। ততক্ষণে গৌরাঙ্গ গোগোলের গাল টিপে আদর করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি দাদাভাই ?'

গৌরাঙ্গের কালো কালো মোটা আঙুলের আদরটা গোগোলের তেমন ভালো লাগলো না। বললো, 'গোগোল।'

গৌরাঙ্গ বললো, 'গগল ? বাঃ, বেশ সোন্দর নাম !'

গোগোল তাড়াতাড়ি শুধরে দিয়ে বললো, 'গগল না, গোগোল।'

বাবা বললেন, 'ঠিক আছে গোগোল, ওটা পরে শুধরে দিলেও হবে।' তারপরে বাবা গৌরাঙ্গের দিকে ফিরে বললেন, 'গৌরাঙ্গ, আমিও তোমার সঙ্গে মালপত্র তুলি।'

গৌরাঙ্গ একেবারে হা হা করে উঠলো, 'ছি ছি বাবু, আপনি আবার মালপত্র তুলবেন কী ? আমি আর আমার বউ সব তুলে ফেলছি। আপনি মা ঠাকরুন আর দাদাভাইকে নিয়ে, বসবার ঘরে গিয়ে বসেন। আমি চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি। জলখাবার এখুনি হয়ে যাবে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

লোকটির কথাবার্তা গোগোলের বেশ ভালো লাগলো। বসবার ঘরে এসে বাবা মাকে বললেন, 'তুমি তো হোটেলে উঠতে চাইছিলে। এখন কী মনে হচ্ছে, এটা খুব খারাপ ?'

মা বললেন, তখন কি আর বুঝতে পেরেছিলাম, বাড়িটা সমুদ্রের ধারে, এতো সুন্দর, আর দু'জন কাজের লোক আছে ?'

বলে মা একটা শোফায় এলিয়ে বসলেন। বাবা শার্টের বুকের বোতাম খুলে দিলেন, সুইচ টিপে পাখা খুলে দিলেন। কিন্তু এসব দেখবার অবকাশ নেই, গোগোল দেখছে সমুদ্র। শুধু বসবার ঘরের থেকে না, যে ঘরেই যায়, সব ঘর থেকেই সমুদ্র দেখা যায়। সেখানেও সমুদ্রের জলে অনেকে চান করছে, তবে খুব বেশী ভিড় নেই। বাড়িটার সামনেই দু'তিনটে ঝাউ গাছ। গোগোল বারান্দা থেকে নেমে, সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে যেতে একটু ভয় ভয় করলেও, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, আস্তে আস্তে ভয় কেটে গেল। দেখলো, বাবার কথাই ঠিক। ঢেউয়ের জল আছড়ে পড়ছে, এগিয়ে আসছে, আবার সরে যাচ্ছে। ক্রমে গোগোলের মনে উত্তেজনা এলো। সমুদ্রে চান করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বাবা বললেন: [redacted]

গোগোলকে তার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। [redacted] জলখাবার খাওয়ার একটু পরেই, বাবা মা দুজনেই সাঁতারের পোশাক পরে নিলেন, যাকে বলে সুইমিং কস্ট্যুম্। গোগোল মাকে আগে কখনো সুইমিং কস্ট্যুম পরতে দেখে নি। আজ দেখে খুব ভালো লাগলো। মাকে ঠিক বিলিতী ক্যালেণ্ডারের ছবির মতো দেখাচ্ছে, কেবল জাল দিয়ে বাঁধা চুলের গোছাটা ছাড়া! ও মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'মা, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সত্যি?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ গো মা।'

মা হেসে বললেন, 'তোকে আর তোর বাবাকেও সুন্দর দেখাচ্ছে।

তারপরে জলে নেমে গোগোলের আনন্দ আর ধরে না। ভয় একেবারে কেটে গেল। মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাওয়া কাকে বলে, তা দেখলো। নাকে মুখে জল ঢুকে কাশি পেল ঠিকই, তা এমন কিছু না ওর আর জল থেকে উঠতেই ইচ্ছা করে না। তবু উঠতেই হলো এক সময়ে

গোগোল দুপুরবেলা ওর মায়ের সঙ্গে খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু একটু পরেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। সমুদ্রের গর্জন ওর কানে আসছে। ও আর কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারলো না। দেখলো, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ও আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে, অন্য শোবার ঘরে গিয়ে দেখলো, বাবাও ঘুমোচ্ছেন। বাড়ির উঠোনের এক পাশে আলাদা ঘর, সেখানে গৌরাঙ্গ থাকে। তার ঘরের দরজা বন্ধ। গোগোল বাড়ির বাইরে গিয়ে, সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। মনে হলো, এখন যেন সমুদ্রটা একটু দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু গর্জনের শব্দ একরকম।

গোগোল বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলো, দূরে দূরে কয়েকটা বাড়ি রয়েছে। কিছু ঝাউ গাছ, তেকাঁটা মনসা, কোথাও বা কেয়াগাছের ঝোপ। এই দুপুরে এদিকটা বেশ নির্জন, লোকজন নেই। গোগোল আস্তে আস্তে বাঁ দিক ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করলো। পায়ের নীচে বালি এখন গরম। ওর খালি পায়ে তাত লাগছে। তাই ছায়া ঘেঁষে পায়ে পায়ে এগোলো। একটা বাড়িরও দরজা জানালা খোলা নেই। কয়েকটা মাত্র বাড়ি, তাও বেশ দূরে দূরে।

গোগোল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। একটু দূরেই, ছাই রঙের একটা

পুরনো বাড়ির দরজার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাউজার আর শার্ট পরা, বাবার থেকেও বেশ লম্বা চওড়া, ফরসা, লোকটির চোখে চশমা। লোকটা যেন কেমন করে আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে। যেমন লুকিয়ে কিছু করতে হলে, আশেপাশে দেখে নেয়, সেইরকম। গোগোল লুকিয়ে কিছু করলে, আগে যেমন দেখে নেয়, মা কোথায় আছে। লোকটা গোগোলকে দেখবার আগেই, ও একটা ঝাউগাছের আড়ালে সরে গেল। লোকটা বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না। আশেপাশে চারদিকে দেখে নিয়ে, বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল।

লোকটিকে দেখে বেশ ভদ্রলোক মনে হলো। দূর থেকে দেখলেও, সে যে দেখতে বেশ সুন্দর, গোগোল তা বুঝতে পারলো। কিন্তু লোকটা ওরকম ভাব করছিল কেন?

গোগোল সেদিকে যাবে কী না ভাবলো। বড়োরাও অনেক সময় লুকোচুরি খেলেন। কিন্তু যে লোকটি ছাই রঙের বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল, তার হাবভাব মোটেই খেলার মতো না। গোগোলের কৌতূহল হলো। ভাবলো, দেখি তো লোকটাকে দেখা যায় কী না। ও একবার নিজেদের বাড়িটার দিকে পিছন ফিরে দেখে নিলো। তারপর পায়ে পায়ে ছাইরঙের বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখলো, দরজা বন্ধ। লোকটা নিশ্চয়ই ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। গোটা বাড়িটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গোগোল কি দরজাটা ঠেলে দেখবে, ভিতর থেকে বন্ধ করেছে কি না?

ভাবতেই গোগোলের মনটা দমে গেল। অচেনা লোকের বাড়িতে ও কোনদিন ঢোকে না। না ডাকলে, কারোর বাড়িতে যেতে নেই। কিন্তু লোকটার ওরকম ভাব-ভঙ্গি দেখেই তো গোগোলের কৌতূহল হচ্ছে। তা না হলে তো ওর কিছুই মনে হতো না। কতো লোকই তো বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ায়। গোগোলের কি তাতে কিছু মনে হয়? কিছুই না।

গোগোল সমুদ্রের দিকে একবার দেখলো। আশেপাশেও দেখলো। কেউ কোথাও নেই। গোগোল কৌতূহল চাপতে পারছে না। ও বন্ধ দরজাটা ঠেলে দেখলো, ভিতর থেকে বন্ধ। গোগোল সরে এলো। খানিকটা দূর দিয়ে, পাঁচিলের ধারে ধারে বাড়িটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখলো। বাড়িটার পিছন দিকে, যেদিকে লোক চলাচলের রাস্তা, সেদিকে আর একটা দরজা রয়েছে। এ দরজাটাও বন্ধ মনে হচ্ছে। তবু গোগোল

একবার ঠেলে দেখলো। ঠেলতেই দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। এ দরজাটা খোলা! কিন্তু পরের বাড়িতে কি না বলে কয়ে ঢোকা উচিত? বাড়ির মধ্যে যারা আছে, তারা যদি রাগ করে? যদি গোগোলকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়? ছি ছি, গোগোলের ভাবতেই লজ্জা করছে। মা শুনলে নির্ঘাত কান মুলে দেবেন। বাবাও ভুরু কুঁচকে তাকাবেন। যাক, দরকার নেই ঢুকে। তবু দরজার ফাঁক দিয়ে, গোগোল একবার ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলো। কেউ নেই। উঠোনে অল্প বালি আর আগাছায় ভরা। কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপরে খোলা বারান্দা। বারান্দায় একটা লম্বা বেঞ্চ দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে। মনে হয়, পোড়োবাড়ি, লোকজন নেই। বারান্দার দুদিকে দুটো দরজা রয়েছে, দুটোই বন্ধ। সামনের দিকের জানালাও বন্ধ। কিন্তু সেই লোকটি তো নিশ্চয়ই ভিতরে আছে। হয় তো আরো কেউ আছে।

গোগোল ফিরে যাবার জন্য মুখ ঘোরাতে যাবে, ঠিক এ সময়েই খুট করে একটা শব্দ হলো। দেখলো, একটা দরজা খুলে, ঘরের ভিতর থেকে সেই লোকটি বেরিয়ে এলো। এসে বারান্দার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, চারদিকে দেখতে দেখতে, দরজার দিকে তাকালো। গোগোল চট্ করে মুখটা সরিয়ে নিতে নিতেই দেখতে পেলো, লোকটি উঠোনে নেমে আসছে। ও আর সেখানে দাঁড়ালো না। এক ছুটে, ঘুরে একেবারে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। কিন্তু গোগোলের কৌতূহল কমলো না, আরো বাড়লো। লোকটার ভাবভঙ্গি কেমন অদ্ভুত। ও দূর থেকে বাড়িটাকে দেখলো। সামনের বন্ধ দরজা খুলে, লোকটা আবার বেরোয় কী না, খানিকক্ষণ দেখলো। বেরোচ্ছে না। গোগোল সমুদ্রের ধারের দিকে গেল। ডান দিকে তাকিয়ে দেখলো, একটু দূরেই সমুদ্রের ধারে লোকজনের ভিড় বাড়ছে। এ সময়েই ও শুনতে পেলো দূর থেকে গৌরাঙ্গ ডাকছে, 'দাদাভাই, এই যে দাদাভাই, বাড়ি এসো।'

বলতে বলতে গৌরাঙ্গ এগিয়ে আসতে লাগলো। গোগোল দেখলো, ওদের বাড়ির বসবার ঘরের সামনের বারান্দায়, বাবা আর মা দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছেন। গোগোল খানিকটা এগোতেই, গৌরাঙ্গ ওর সামনে এসে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গেছলে দাদাভাই? আমি যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

গোগোল ছাই রঙের বাড়িটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'ও বাড়িটার

কাছে গেছলাম।'

গৌরাঙ্গ বললো, 'তাই ভালো। আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি একলা সমুদ্রের ধারে চলে গেছ।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'ও বাড়িটায় কে আছে?'

গৌরাঙ্গ বললো, 'কেউ নেই বলেই তো জানি। যাদের বাড়ি, তারা অনেককাল আসে না। কেউ ভাড়াও নেয় না, কেউ দেখাশোনাও করে না। সামনের উঠোনে এক বুক বালি জমে গেছে।'

গোগোল বললো, 'বাঃ, তা কী করে হবে? আমি যে একজন লোককে দেখলাম, বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল?'

গৌরাঙ্গ জিজ্ঞেস করলো, 'কী রকম লোক বলো তো? আমাদের মতন কোন লোক?'

গোগোল বললো, 'না না, দেখতে খুব সুন্দর, শার্ট প্যান্ট পরা একজন লোক, চোখে চশমা আছে।'

গৌবাঙ্গ সহজভাবেই বললো, 'তা হলে হয় তো কেউ ভাড়া নিয়ে এসেছে। খাট আলমাবি তো কিছু কিছু আছে। তবে বাড়িটাব যা হাল, ভদ্রলোকেরা থাকবে কেমন করে কে জানে।'

গোগোল বাড়ির সামনে এসে পড়লো। বারান্দায় উঠতে না উঠতেই, মা একটু বিবক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেছিলি তুই, না বলে কয়ে?'

গোগোল বললো, 'কাছেই তো ঘুবছিলাম। আমার ঘুম আসছিল না। তুমি আর বাবা তো ঘুমোচ্ছিলে।'

মা বললেন, 'তাই তুমি এই অচেনা জায়গায় ঘুবতে বেরিয়ে গেলে। তোমার পোড়া চোখে তো ঘুম নেই।'

গোগোল বাবার দিকে তাকালো। বাবা ঠোঁট টিপে হাসছেন। একটু চোখের পাতাও কাঁপালেন। গোগোলও বাবাকে একটু ইশারা করলো। মা রাগ কবলেই, গোগোল ওব বাবার সঙ্গে একটু চোখে চোখে ইশারা করে। যার অর্থ হলো, মা এখন রেগে আছেন, এখন কোনো কথা নয়। মা কিন্তু সবই দেখতে পান। এখনো পেলেন, আর হাত বাড়িয়ে গোগোলকে ধরতে গিয়ে বললেন, 'তবেরে দুষ্টু, দেখবি?'

গোগোল বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, খিলখিল করে হেসে উঠলো। বাবাও হেসে উঠলেন। তারপরে মাও হাসলেন। গৌরাঙ্গ একটা ছোট

টেবিল সামনে বসিয়ে দিয়ে গেল। তারপরে ট্রে-তে করে চা নিয়ে এলো, আর গোগোলের জন্য দুধ। গোগোল বলে, 'জানো বাবা, ওখানে একটা ছাই রঙ বাড়ির সামনে একটা টকটকে ফরসা লোককে দেখলাম, কেমন করে যেন চারদিকে দেখছিল। তারপর ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।'

বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কেমন করে আবার দেখছিল।'

গোগোল বললো, 'মনে হলো, লোকটা যেন লুকিয়ে কিছু করছে।'

বাবা বললেন, 'তুমি তো ওরকম অনেক কিছুই দেখতে পাও।'

মা বললেন, 'এখন দুধটা খেয়ে নাও তো। আমরা জামাকাপড় বদলে এখুনি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরোব।'

গোগোলের এখনো দুধ খেতে হলেই যতো ঝামেলা। বললো, 'আমার যে খিদে পায় নি।'

মা বললেন, 'তা হলেও খেয়ে নাও, আমাদের বেড়িয়ে ফিরতে দেরি হবে। তখন খিদে পেয়ে যাবে।'

গোগোল জানে দুধ খেতেই হবে। খেতেও হলো। তারপরে বাবা মা-র সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে চললো। বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে ও অনেক ঝিনুক কুড়ালো।

পরের দিন সকালে জলখাবার খেয়ে, সমুদ্রে চান করতে যাবার আগে খানিকটা সময় পাওয়া গেল। গোগোল আবার পায়ে পায়ে হেঁটে গেল সেই ছাই রঙ বাড়িটার সামনে। এদিকটা সব সময়েই ফাঁকা, লোকজন নেই। গোগোল দেখলো সমুদ্রের দিকের দরজাটা বন্ধ। ও দরজাটার খুব কাছে গেল। পুরনো দরজা, কিন্তু এখনো বেশ মজবুত আছে। গোগোল খুঁজে দেখলো, দরজায় কোনো ছিদ্র আছে কী না। এক জায়গায়, কড়ার কাছে, ছোট একটা ছিদ্র আছে। গোগোল নীচু হয়ে সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দেখলো। গৌরাঙ্গ যা বলেছিল, তাই ঠিক। উঠানটা উঁচু বারান্দার সমান বালিতে ভরে গিয়েছে। পিছনের উঠোনে এরকম বালি নেই। গোগোল দেখলো, বারান্দা ফাঁকা। দরজা জানালা সব বন্ধ। গোগোলের খুব অবাক লাগলো। লোকটা সব সময় দরজা জানালা বন্ধ করে থাকে কেন? একা থাকে নাকি?

'কী দেখছো খোকা?'

পিছনে মোটা গলার স্বর শুনেই, গোগোল চমকে পিছন ফিরে তাকালো।

দেখলো সেই লোকটি। লোকটি মানে বেশ ভদ্রলোক। ফরসা চেহারাটা সত্যি সুন্দর। সাদা ট্রাউজার আর শার্ট একটু ময়লা দেখাচ্ছে। চোখে চশমা। গোগোল ভয় পেয়েছে, লজ্জাও পেয়েছে! ওর মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললো, 'এমনি—বাড়ির ভেতরটা দেখছিলাম!'

লোকটির চোখ দুটো যেন একটু লাল, আর এমনভাবে গোগোলের চোখের দিকে তাকালো, ওর কেমন ভয় লাগলো। লোকটি বললো, 'কেন বলো তো?

গোগোল বললো, 'এমনি।'



লোকটি আরো খানিকক্ষণ গোগোলের চোখে চোখ রেখে বললো, 'কারোর বাড়ির ভেতরে কি এরকম উঁকি দিয়ে দেখতে আছে ?'

গোগোল ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়িয়ে বললো, 'না।'

লোকটি বললো, 'তবে আর দেখো না। তুমি কোন্ বাড়িতে থাকো ?

গোগোল আঙুল দিয়ে ওদের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো। 'বেড়াতে এসেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে ?'

'কলকাতা থেকে।'

লোকটি বললো, 'ঠিক আছে। আর একটা কথা বলে দিই, এ বাড়িতে একটা ভূত আছে, যখন তখন ওবকম উঁকিঝুঁকি মেরো না।'

গোগোলের দু চোখ গোল হয়ে উঠলো। বললো, 'ভূত !'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

গোগোল যেন ভূতের থেকেও, লোকটার চোখেব দিকে তাকাতেই ভয় পাচ্ছে বেশী। তবু বললো, 'তা হলে আপনি থাকেন কেমন কবে ? ভয় কবে না ?'

লোকটি হেসে বললো, 'না, আমি ভয় পাই না।'

বলে লোকটি আস্তে আস্তে সরে গেল। গোগোলও বাড়িব দিকে যেতে যেতে, পিছন ফিবে দেখলো, লোকটি পাঁচিলেব আড়ালে চলে গেল। লোকটা বেবলো কোথা দিয়ে ? নিশ্চয়ই পিছন দরজা দিয়ে। ও তাড়াতাড়ি দৌড়ে রাস্তার দিকে গেল, যেখান দিয়ে পিছনের দরজাটা দেখা যায়। দেখতে পেলো, লোকটি ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ কবে দিল।

গোগোল এখনো যেন ওর বুকের ধকধকানি শুনতে পাচ্ছে। লোকটাব চোখ দুটো যেন কেমন ! তাকালেই বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে ! কিন্তু ভূত ? সত্যি ভূত আছে নাকি বাড়িটার মধ্যে ! ভাবতেই ও ছুটে গেল নিজেব বাড়ির দিকে। গিয়েই বাবাকে সব কথা বললো। মা অন্য কোথায় ছিলেন। বাবা কী একটা বই পড়ছিলেন। সব শুনে বললেন, 'বেশ তো, ভদ্রলোক যখন বলেছেন ভূত আছে, তুমি ওখানে আর যেও না।'

গোগোল অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভূত কি সত্যি আছে নাকি বাবা ?'

বাবা বললেন, 'কী জানি, আমি তো কোনোদিন দেখি নি। তবে

তোমার মা তো প্রায়ই জটিবুড়ীর কথা বলে। সেরকম কিছু থাকলেও থাকতে পারে।'

গোগোল বাবার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। কিন্তু বাবা মুখ নামিয়ে বই পড়ছেন।

গোগোলের কাছে জটিবুড়ীর ব্যাপারটা এখনো অস্পষ্ট। কখনো মনে হয়, মা ভয় দেখাবার জন্য বলেন। আবার কখনো মনে হয়, সত্যিও হতে পারে। তবে জটিবুড়ীরা, না খেলে, না ঘুমোলে, দুষ্টুমি করলেই শুধু ঘাড় মটকাতে আসে। ভূত কি তাই?

বাবা বললেন, 'চলো, এখন আমরা সমুদ্রে চান করতে যাবো।'

সমুদ্রে চান করতে যাবার খুশীতে, ভূতের ব্যাপারটা মাথা থেকে চলে গেল।

আবার সেই দুপুর। গোগোলের কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। এদিকে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবাও অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছেন। গোগোল আর থাকতে না পেরে উঠে পড়লো। আস্তে আস্তে বাইরে বালিতে এসে দাঁড়ালো। খা খা দুপুর। ছাই রঙের বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। লোকটার কথা মনে পড়লো। মনে হলো, লোকটা সত্যি কথা বলে নি। ভূতের সঙ্গে আবার কেউ থাকতে পারে নাকি? ভাবতে ভাবতে গোগোল সেই বাড়িটার দিকেই গেল। পাঁচিলের ধার দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখলো, দুটো দরজাই বন্ধ। গোগোল কিন্তু বাড়িটার তিন দিক দেখেছে, আর একটা দিক দেখেনি। সেদিকটায় ছোট বড় অনেকগুলো ঝাউ গাছের জটলা।

গোগোল এবার সেদিকটায় গেল। অবাক হয়ে দেখলো, পাঁচিলের এক জায়গায় অনেকখানি ভাঙা। ঠিক যেন সুড়ং মতো। অনায়াসে একজন মানুষ ঢুকে যেতে পারে। গোগোল একটু ভাবলো, ঢুকবে, কি ঢুকবে না। ভূত বা জটিবুড়ী কি সত্যি আছে? ও নীচু হয়ে, ভাঙা ফাঁক দিয়ে, ভিতরের দিকে দেখলো। পিছনের আগাছা ভরা উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। উঠোন আর বারান্দার অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। উঠোনে এক জোড়া শালিকও ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোগোল ভাঙা পাঁচিলের সুড়ং দিয়ে উঠোনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, চারদিক দেখলো। দেখলো, সামনের উঠোনটা বাড়ির এক পাশ দিয়ে খানিকটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে বালি জমে উঁচু হয়ে

উঠেছে। সেই বালি এদিকেও যেন ঢালু হয়ে নেমে এসেছে।

গোগোল বারান্দার দিকে তাকালো। কেউ নেই। ও আস্তে আস্তে খালি পায়ে বারান্দায় উঠলো। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলো, বাঁ দিকের দরজাটা খোলা। লোকটা কি ভিতরে আছে? ভূতের সঙ্গে? গোগোলের বিশ্বাস হয় না। ও আস্তে আস্তে খোলা দরজার কাছে গেল। অন্য সব জানালা দরজা বন্ধ, ঘরটা অন্ধকার মতো দেখাচ্ছে। গোগোল ঘরেব মধ্যে ঢুকলো। ঢুকে ডান দিকে আর একটা খোলা দরজা দিয়ে, পাশের ঘরটা আবছা মতো দেখতে পেল। মনে হলো, সে ঘরে খাটের ওপরে কেউ শুয়ে আছে। সেই লোকটা নাকি? একটুখানি তাকিয়ে থাকাব পরে, গোগোলের মনে হলো, খাটেব ওপর মায়ের মতো কোনো মহিলা চিত হয়ে শুয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ ওর মনে হলো, পবেব ঘরে ঢোকা ঠিক হয় নি। ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। উঠোনে নেমে পাঁচিলের সুড়ং-এর দিকে যাবার সময়েই, পিছনের দরজাটা খুলে গেল। চশমা পরা সেই লোকটা। গোগোলকে দেখেই, লোকটার মুখটা যেন কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ধমক টমক দিল না, গোগোলের দিকে তেড়ে ছুটে এলো। গোগোল সেটা বুঝতে পেরেই, সুড়ং-এব ভিতর দিয়ে গলে, দৌড় দিল। লোকটাও সুড়ং দিয়ে গলে, তাড়া করলো। গোগোলের বুকটা ভীষণ ঢিপ ঢিপ কবছে। লোকটার সেই ভয়ংকর মুখটা মনে কবে ও প্রাণপণে দৌড় দিল। কিন্তু কিসের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে, বালির ওপর ছিটকে পড়লো। আব ঠিক সে সময়েই, সামনে এসে পড়লো একদল গরিব কাঠকুড়ানি মেয়ে।

গোগোল বালি থেকে ওঠবাব আগেই, পিছন ফিরে দেখলো, লোকটা একটু দূরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাঠকুড়ানির দলটা অবাক্ হয়ে একবার গোগোলকে দেখছে, আর লোকটাকে। লোকটার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে, গোগোলের যেন নিশ্বাস আটকে এলো। ও আবার বাড়িব দিকে দৌড় দিল। বাড়ির কাছাকাছি আসবার আগেই, গৌরাঙ্গর সঙ্গে ওব দেখা হয়ে গেল। সে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে ফিরছিল। জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে দাদাভাই, এতো দৌড়ে কোথা থেকে আসছ?'

গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ে, পিছন ফিরে দেখলো। না, লোকটা আর আসছে না। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, 'জানো গৌরাঙ্গদাদা, ওই ছাইরঙ বাড়িটায় যে থাকে, সে আমাকে তাড়া করেছিল।'

গৌরাঙ্গ বলল, 'কেন?'

'আমি পাঁচিলের ভাঙা গর্ত দিয়ে, বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলাম, তাই।'

গৌরাঙ্গ একটু ভেবে বললো, 'তুমি ছেলেমানুষ, ভাঙা পাঁচিল দিয়ে ঢুকেছ বলে ভদ্দরলোক তোমাকে তাড়া করলেন?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ, খুব রেগে গেছে, মুখটা সাংঘাতিক দেখাচ্ছিল।'

'তাই নাকি?' গৌরাঙ্গ বললো, 'আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখব তো, কে এসেছেন ও বাড়িতে। কিন্তু তোমার গায়ে এত বালি কেন?'

গোগোল বললো, 'হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছলাম।'

গৌরাঙ্গ তাড়াতাড়ি তার জামা প্যান্ট থেকে বালি ঝেড়ে দিল। গোগোল বললো, 'আমি ঘরের মধ্যেও ঢুকেছিলাম। দেখলাম আমার মায়ের মতো কে খাটে শুয়ে আছেন।'

গৌরাঙ্গ হেসে বললো, 'তুমি ঘরের মধ্যেও ঢুকেছিলে? সেই জন্যই বোধ হয় ভদ্দরলোক রেগে গেছেন। চলো, তুমি এখন বাড়ি চলো।'

গোগোল বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখলো, বাবা মা তখনো ঘুমোচ্ছেন। তাঁদের ঘুম ভাঙবার পরে, গোগোল যখন ঘটনাটা বললো, তখন বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন তুমি পরের বাড়ি ঢুকতে গেছ? এটা খুব অন্যায়। আর কখনো যাবে না।'

গোগোল বললো, 'লোকটাকে দেখে আমার কেমন কেমন লাগছিল বলেই তো গেছলাম। আমি কি এমনি এমনি কারোর বাড়ি যাই?'

মা ধমক দিয়ে বললেন, 'এমনি হোক, আর তেমনি হোক, তুমি অচেনা লোকের বাড়ি কখনো যাবে না।'

গোগোলকে মেনে নিতে হলো, এটা ঠিক। অচেনা লোকের বাড়ি যেতে নেই। ভাঙা পাঁচিলের ভিতর দিয়েও না।

পরের দিন সকালবেলা, জলখাবার খেতে দেবার সময়, গৌরাঙ্গ হাসতে হাসতে বললো, 'দাদাভাই, তুমি যে দেখছি, দিনে দুপুরে জেগে স্বপ্ন দেখ। আমি আজ ভোরে সেই ছাই রঙের বাড়ির ভেতর গেছলাম। সামনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পেছনের দরজায় তালা মারা।'

গোগোল অবাক্ হয়ে বললো, 'সেই লোকটা চলে গেছে?'

গৌরাঙ্গ বললো, 'চলে যাবে কি, কেউ ছিলই না ত বাড়িতে। আমিও তোমার মতন পাঁচিলের ভাঙা গর্ত দিয়ে ঢুকেছিলাম। দেখলাম, ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, পোড়ো বাড়িটা খা খা করছে।

কোনো মানুষের চিহ্নই নেই।'

গোগোল আরো অবাক্ হয়ে বললো, 'সেই খাটে কেউ শুয়েছিল না?'

গৌরাঙ্গ বললো, 'খাটে বিছানা নেই, পুরনো, ধুলো পড়ে নোংরা হয়ে গেছে। ওখানে কয়েক বছর কেউ ঢোকেইনি।'

গোগোল বাবা মায়ের দিকে তাকালো। বাবা পাউরুটি চিবোতে চিবোতে, হেসে বললেন, 'গোগোল মনে মনে অনেক কিছু দেখতে পায়।'

গোগোল বললো, 'সত্যি বলছি বাবা, আমি দেখেছি।'

মা বললেন, 'বেশ করেছ। সত্যি সত্যি হয় তো ভূতই আছে, তুমি আর ওখানে যেও না। এখন দুধটা খেয়ে নাও।'

গোগোলেব মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এরকম ভুল ও কী কবে দেখতে পারে? সবই কি ভূতুড়ে ব্যাপার? লোকটা, আর সেই খাটে শুয়ে থাকা মহিলাও ভূত? গোগোলকে ভূতে তাড়া করেছিল।

গোগোল চুপচাপ নিজের মনে খেয়ে নিল।

খাবার পরেও সমুদ্রে চান করতে যাবাব দেরি ছিল। গোগোল প্রায় ছুটতে ছুটতে সেই ছাই বঙের বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনেব দরজাটা ঠেলে দেখলো, ভিতব থেকে বন্ধ। ও ছুটে পিছন দিকে গেল। সত্যি সত্যি, দরজার কড়ায় মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে। গোগোল তখন আর এক দিক দিয়ে ঘুরে, সেই ভাঙা সুড়ং-এর সামনে গেল। কিন্তু এখনো ওর ভয় করছে, সেই লোকটার কথা ভেবে। মনে হচ্ছে, এখুনি হয়তো টকটকে লাল চোখওয়ালা বাগী লোকটা সামনে এসে দাঁড়াবে। আব গৌরাঙ্গদাদা বলে কি না, কোন লোকই এখানে ছিল না?

দেখাই যাক্। গোগোল ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বাড়িব মধ্যে ঢুকে পড়লো। এদিক ওদিক দেখে, বারান্দায় উঠলো। সত্যি দরজাটা খোলা রয়েছে। ভিতরটা সেইরকমই অন্ধকার। গোগোল পা টিপে টিপে ঢুকলো, তাকালো ডান পাশের দবজার দিকে। খাটটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সত্যি সেখানে কেউ শুয়ে নেই। আশ্চর্য তো? চলে গেল নাকি? গোগোল আস্তে আস্তে পাশের ঘবটায় গেল। অন্ধকার হালকা। খাটে সত্যি বিছানা পাতা নেই। একপাশে একটা বন্ধ আলমারি, আর এক পাশে টেবিল চেয়ারও রয়েছে। গোগোল কি সত্যি তাহলে ভুল দেখেছিল? ঘরটাকে ঘুরে দেখতে গিয়ে, হঠাৎ ওর খালি পায়ের নীচে যেন কিছু বিঁধে গেল। গোগোল নীচু হয়ে দেখলো। চকচকে ছোট্ট জিনিসটা হাতে নিয়ে

দেখলো, ইনজেকশনের কাঁচের শিশির কাটা মুখ। ওর পায়ের তলা কেটে যায় নি, যেতে পারতো। ও সেটা ঘরের কোণে ছুড়ে দিল, আর তখনই ওর মাথার কাছে কিসের ঝাপটা লাগতেই, চমকে উঠলো। দেখলো, একটা চামচিকে উড়ছে। ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। ভাবলো, লোকটা কি তার বউকে নিয়ে কাল রাত্রে চলে গিয়েছে? তা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? এই সব ভাবতে ভাবতে, গোগোল বাড়ির সামনে বারান্দা সমান উঁচু বালির উঠোনে এসে পড়লো। সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। পাঁচিলটা মাত্র দু হাত উঁচু। কেবল দরজার কাছে বালি খানিকটা সরিয়ে ঢোকবার রাস্তা করা আছে।

গোগোল পাঁচিলের দিকে এগোতে গেল। ওর চোখে পড়লো, বালির বুকে সোনার মতো কী যেন চিকচিক করছে। ও নীচু হয়ে তুলতে গেল, কিন্তু সেটা উঠলো না। মনে হচ্ছে, একটা সোনালী রঙের শাড়ির পাড়ের মতো, বালির নীচে থেকে উঠে এসেছে। গোগোল বালি সরিয়ে সরিয়ে সেটা তুলতে চাইলো। কিন্তু কত সরাবে? বালি যতোই সরায়, সোনালী পাড়টার শেষ আর পাওয়া যায় না। গোগোল রোদে ঘেমে উঠলো। এখন বালিও বেশ তেতে উঠেছে। অথচ গোগোলের কৌতূহল বেড়ে উঠছে। সোনালী পাড়টার শেষ দেখতে চায়। কিন্তু দু হাঁত দিয়ে বালি সরিয়ে সরিয়ে, ওর হাত ব্যথা হয়ে গেল, তবু সোনালী পাড়ের থই আর পাওয়া যায় না।

এ সময়ে গোগোল চমকে উঠে দেখলো, ওর সামনে একটা মানুষের ছায়া। ও মুখ তুলে দেখলো, এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, আর গোগোলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। গোগোল সেই লোকটা ভেবে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এঁর চেহারা একেবারে অন্যরকম, বাবার থেকেও বয়স কম। অনেকটা গোগোলের পিসতুতো দাদা টিপুদার মতো। মুখটা মিষ্টি, সুন্দর চেহারা, ট্রাউজার আর শার্ট পরা। তবু গোগোলের মনে একটু ভয় হলো, উঠে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক বললেন, 'কী হলো, উঠলে কেন। কষ্ট হচ্ছে? তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে হাত লাগাতে পারি।'

গোগোল ভাবছে, ইনি কে? কখন কোথা দিয়ে এলেন? ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আমি জানি, তুমি কী ভাবছো। তুমি ভাবছো, আমি কে, কোথা থেকে এলাম, তাই না?'

গোগোল অবাক্ হয়ে ঘাড় ঝাঁকালো। উনি হেসে বললেন, 'বুঝেছি? আমার নাম অশোক—অশোক ঠাকুর। আমিও বোধ হয় তোমার মতোই, এ বাড়িতে কিছু খুঁজতে ঢুকেছি। আমার মনে হয়, তোমার আর আমার মধ্যে একটা মিল আছে, আর আমি যা খুঁজছি, সেটাও বোধ হয় তুমিই বের করে দেবে। তোমার নাম কী?'

'গোগোল।'

'বাঃ। সুন্দর নাম। একজন বিখ্যাত রাশিয়ান লেখকের নামও ছিল গোগোল। বোধহয় নিকোলাই গোগোল।'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ, আমি জানি।'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'জানো গোগোল, তুমি এই যে বালির নীচে সোনালী পাড়ের শেষ খুঁজছো, আমার মনে হয়, সেই শেষে একটা ভয়ঙ্কর কিছু লুকানো আছে। আমিও তোমার সঙ্গে হাত লাগাবো। তার আগে আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এখানে খুব রোদ। চলো আমরা ওই বারান্দার ছায়ায় যাই।'

অশোক ঠাকুর লোকটিকে গোগোলের মন্দ লাগছে না। একটু অদ্ভুত আর মজার লোক বলেই মনে হচ্ছে। ও বললো, 'চলুন'।

গোগোল ওঁর সঙ্গে বারান্দার ছায়ায় গেল। অশোক ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা গোগোল, বলো তো তুমি এ বাড়িতে কেন এসেছ?'

গোগোল যা দেখেছে, যা ওর মনে হয়েছে, সব কথাই বললো। শুনতে শুনতে অশোক ঠাকুরের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। বললেন, 'তুমি ঠিক বলছো, লোকটা ফরসা লম্বা চওড়া চশমা চোখে?'

গোগোল বললো, 'আমার খুব ভালো মনে আছে।'

অশোক ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরের মধ্যে তুমি একজন মহিলাকে শোয়া দেখেছিলে?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ, কাল দুপুরে আমি দেখেছি। কিন্তু গৌরাঙ্গদাদা বলছে, আমি নাকি ভুল দেখেছি, কেউ ছিল না।'

'গৌরাঙ্গদাদা কে?'

'আমাদের কাজকর্ম করে।'

'আরো যেন কি বলেছিলে তুমি, তোমার পায়ে বিঁধে গেছলো?'

'ইনজেকশনের শিশির ভাঙা কাঁচের মুখ।'

'সেটা এখন কোথায়?'

'আমি ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলেছি।'

অশোক ঠাকুর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ, সেটা আমরা খুঁজে পাবো ঠিকই। হয়তো ঘরের মধ্যে আরো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী?'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'তা বলতে পারি না। চলো এখন বালি খুঁড়ে, সোনালী পাড়ের শেষে কী আছে দেখি।'

এবার আর গোগোলকে বিশেষ হাত লাগাতে হলো না। অশোক ঠাকুর নিজেই, দু হাতে তাড়াতাড়ি বালি সরাতে লাগলেন। প্রায় দু হাতের মতো বালি তুলে সরাবার পরে, গোগোল দেখলো, একটা নীল রঙের শাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেটা একটু সরাতেই, মনে হলো মানুষের গায়ের চামড়া দেখা গেল। অশোক ঠাকুর বালি সরানো থামিয়ে বলে উঠলেন, 'ব্যস্, আর দরকার নেই। পাওয়া গেছে।'

'গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কী?'

অশোক ঠাকুর তাড়াতাড়ি আবার বালি চাপা দিয়ে বললেন, 'সেই ভয়ংকর জিনিসটা। এটা আমি তোমাকে পরে বলবো, কিন্তু গোগোল তুমি ছাড়া এ জিনিস খুঁজে পেতে আমার কষ্ট হতো। তুমি নিজেই জানো না, তুমি কতো বড় কাজ করেছ। এখনই আমাদের পুলিস ডাকা দরকার।'

গোগোল ভয় পেয়ে বললো, 'পুলিস?'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, পুলিস। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। বরং সব কথা শুনে, পুলিস তোমাকে মাথায় করে নাচবে। চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি: আমার হোটেলটা কাছেই, সেখান থেকে থানায় ফোন করে দেব।'

গোগোল বললো, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাবো?'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'ক্ষতি কী।'

গোগোলের মনে এখন বেশ উত্তেজনা লাগছে। ও ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছে না। অশোক ঠাকুরের হোটেলটা সত্যি খুব কাছে, আর বেশ বড়। উনি সেখান থেকে থানায় ফোন করে ইংরেজিতে কথা বললেন। খানিকক্ষণ কথা বলে, ফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'চলো গোগোল, আমরা তাড়াতাড়ি আবার সেই বাড়িতে যাই। তা না হলে, আমাদের বালির তলার জিনিসটা কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে।'

গোগোল অবাক্ হয়ে বললো, 'তাই নাকি?'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ'।

বলে তিনি প্রায় দৌড়ুতে লাগলেন। গোগোলও দৌড় দিল। বাড়িটার পিছন দিয়ে এসে দেখা গেল, সেই মস্তবড় তালাটা খোলা। অশোক ঠাকুর চিৎকার করে উঠলেন, 'সর্বনাশ! জিনিসটা বোধ হয় চুরিই হয়ে গেল।'

ওঁর পিছন পিছন গোগোল ছুটলো। সামনের বালি ঢাকা উঠোনে এসে দেখা গেল, সেই জায়গায় বালি খোঁড়া। অশোক ঠাকুর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, আর খুশী গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'পারে নি, চুরি করতে পারে নি। আমরা খুব সময় মতো এসে গেছি। চোর বালি খুঁড়তে আরম্ভ করেছিল। আর একটু সময় পেলেই চুরি করে নিয়ে যেতো।'

অশোক ঠাকুরের কথা শেষ হতে না হতেই, গুড়ুম করে শব্দ হলো, আর গোগোলের চোখের সামনে দিয়ে একটা ছোট্ট আগুনের ঝিলিক চলে গেল। অশোক ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গোগোলকে ধরে, বালির ওপর শুয়ে পড়ে বললো, 'শুয়ে পড়ো গোগোল, আমাদের দিকে কেউ গুলি ছুড়ছে।'

গোগোল তো ভয়ে প্রায় আধমরা। আবার দুটো গুলির শব্দ হলো, আর গোগোলদের মাথার ওপর দিয়ে যেন সোঁ সোঁ করে কী ছুটে চলে গেল। তারপরেই গাড়ির আওয়াজ ভেসে এলো। গাড়ির আওয়াজটা এদিকেই এগিয়ে আসছে মনে হলো। অশোক ঠাকুর বললেন, 'বোধ হয় পুলিস এসে পড়েছে। লোকটা পালাবে, আর গুলি ছুড়তে পারবে না।'

গোগোল শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ লোকটা?'

'সেই চোরটা, যে বালির নীচের জিনিসটা চুরি করতে এসেছিল।'

গাড়ির শব্দটা এবার বাড়ির দরজার কাছে এসে থামলো। ভিতরে অনেকগুলো পায়ের শব্দও ছুটে এলো। গোগোল মাথা তুলে দেখলো, বন্দুকধারী পুলিস আর রিভলবার হাতে একজন অফিসার। অশোক ঠাকুর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসে গেছেন? খুনী আমাদের গুলি করে মারবার চেষ্টা করছিল। সে আশেপাশেই লুকিয়ে ছিল।'

অফিসার তখন হুকুম দিলেন, আশেপাশে কারোকে খুঁজে পাওয়া যায় কী না। অশোক ঠাকুর অফিসারকে ইংরেজিতে বললেন, 'এখানে বালির নীচেই ডেডবডি আছে, খুঁড়ে বের করুন।'

অফিসার কয়েকজনকে বালি খুঁড়তে হুকুম দিলেন। গোগোল অবাক্ হয়ে ভাবছে, খুনী আবার কোথা থেকে এলো? বালির নীচে ডেডবডি মানে

মরা মানুষই বা কোথা থেকে এলো ?

সেপাইরা যখন বালি খুঁড়ছে, অশোক ঠাকুর তখন গোগোলকে দেখিয়ে ইংরেজিতে অফিসারকে যেন কী সব বলছিলেন। অফিসার অবাক্ হয়ে গোগোলের দিকে বারে বারে দেখছিলেন। তারপরে তিনি হঠাৎ গোগোলকে বুকের কাছে টেনে একেবারে কোলে তুলে নিলেন, আর বললেন, 'বাঃ, তুমি তো ভীষণ সাহসী ছেলে। তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।'

ইতিমধ্যে বাড়িটার উঠোনে বাইরের লোকজনেরা আসতে আরম্ভ করেছে। গোগোলের বাবা মা গৌরাঙ্গদাদাও এসে পড়েছে। গোগোল মাকে দেখেই, অফিসারের কোল থেকে নেমে, মায়ের কাছে ছুটে গেল : মা বলে উঠলেন, 'কী হয়েছে গোগোল ?'

গোগোল বললো, 'আমি কিছু জানি না মা। কে একটা লোক আমাকে গুলি করে নাকি মারতে চেয়েছিল।'

মা গোগোলকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সর্বনাশ ! কেন ?'

অশোক ঠাকুর গোগোলের বাবা মায়ের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'গোগোল আপনাদের ছেলে ? বাঃ ? আপনারা শুনে খুশী হবেন, গোগোল এক ভয়ংকর খুনের ব্যাপার আবিষ্কার করেছে। ওর জন্যেই ডেডবডি পাওয়া গেছে। খুনীও ধরা পড়বে। ওই দেখুন, সেই ডেডবডি তুলেছে।'

দেখা গেল, একজন মহিলার মৃতদেহ বালির নীচে থেকে তোলা হয়েছে। গোগোলের মনে পড়ে গেল, খাটের ওপর শোয়া সেই মহিলাকে। গোগোলের মা বলে উঠলেন, 'আমি এখান থেকে গোগোলকে নিয়ে যাচ্ছি।'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, এসব দৃশ্য ওর না দেখাই ভালো। ওকে নিয়ে চলে যান।'

বলে তিনি গোগোলের গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'তুমি যাও, আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।'

গোগোল মায়ের সঙ্গে বাড়ি চলে গেল। বাবা তখন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

বিকালবেলা অশোক ঠাকুর গোগোলদের বাড়িতে এলেন। বাবা খুব খুশী হয়ে ওঁকে ডেকে বসালেন। গোগোল দুপুরে খাবার সময়েই বাবার কাছে শুনেছে, অশোক ঠাকুর একজন বড় ডিটেকটিভ। উনি পুলিসের চাকরি করেন না। উনি লোকের কথায় অপরাধীর সন্ধান করেন। বিকেলে এসে বললেন, 'এখন আমি গোগোলের সঙ্গে একটু গল্প করবো, আপনাদের সঙ্গে না।'

বাবা মা হেসে বললেন, 'করুন।'

অশোক ঠাকুর তখন গল্প করে, গোগোলকে বুঝিয়ে বলে দিলেন। গোগোল ফরসা লম্বা চওড়া চশমা চোখে যে লোকটাকে দেখেছিল, সে লোকটা তার বউকে মেরে, বালির তলায় চাপা দিয়ে রেখেছিল। লোকটার নাম অমৃতলাল, পাঞ্জাবী। লোকটা শিক্ষিত, কিন্তু শয়তান আর নিষ্ঠুর। সে হাতে পেলে গোগোলকেও মেরে ফেলতে পারতো। অশোক ঠাকুর আরো বললেন, 'বড় হলে মানুষের জীবনের কথা তুমি আরো ভালো বুঝতে পারবে। এখন তোমার এসব নিয়ে চিন্তা করবার কিছু নেই। যারা এভাবে মানুষকে মারে, তারা এক ধরনের অসুস্থ উন্মাদ, তারা যা খুশী তাই করতে পারে। তোমার মনে যে রকম কৌতূহল দেখছি, তাতে তোমার খুব সাবধান থাকা উচিত। তুমি ঠিকই ধরেছিলে, লোকটার ভাব ভঙ্গি মোটেই ভালো ছিল না। তুমি সেটা ধরতে পেরেছিলে বলেই, সব কিছু ধরা পড়ে গেল।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'সেই লোকটা কোথায় গেল?'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'ধরা পড়েছে। পুরী থেকে কটক যাবার পথে, মোটর গাড়িতে ধরা পড়েছে। সে ভেবেছিল, কটক থেকে রাত্রে ট্রেনে করে কলকাতায় পালিয়ে যাবে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কেন সে বউকে মারলো?'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'ওই যে বললাম, সে সব তুমি বড় হয়ে বুঝবে, এখন বুঝবে না। তবে তোমাকে বলি, তুমি যে ইনজেকশনের কাঁচের টুকরো দেখেছিলে, সেই ইনজেকশন দিয়ে ভদ্রমহিলাকে অজ্ঞান করা হয়েছিল ভদ্রমহিলাকে তুমি খাটে শোয়ানো ঠিকই দেখেছিলে। তারপরে যেভাবে মহিলাকে মারা হয়েছিল, সেটা তোমার না শোনাই ভালো। তবে তোমার দ্বারাও প্রমাণ হলো, অপরাধ কখনো চাপা থাকে না।'

তারপরে এই ঘটনাটা পুরীর সমুদ্রের ধারে সকলের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, আর সবাই গোগোলকে চিনে ফেললো। সবাই গোগোলকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওই যে গোগোল, ওর জন্যই খুনটা ধরা পড়েছে।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে যায়। আর গোগোলের মা খালি বলেন, 'আর তোমাকে আমি কখনও একলা ছাড়ছি না। কোনদিন তুমি একটা সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে।' গোগোল মায়ের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে, আর সমুদ্রও যেন উল্লাসে হেসে ফেটে পড়তে থাকে।



গোগোল একটা অদ্ভুত গল্প শুনেছিল ওর মায়ের কাছে। অদ্ভুত বলতে ঠিক অদ্ভুত নয়, বেশ ভয় ধরানো গা ছমছমে, আর কেমন একটা কষ্টও হয়েছিল। গোগোল মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা সেই ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছিলেন কি না। মা হেসে বলেছিলেন, 'না, আমি নিজের চোখে তো দেখি নি বটেই। আমিও আমার ছোটবেলায় গল্পটা শুনেছিলাম আমাব দিদিমার কাছে। তোমার মত আমিও দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি ঘটনাটা দেখেছিলেন কি না। দিদিমা বলেছিলেন, তিনি দেখেন নি। তবে ঘটনাটা নাকি সত্যি ঘটেছিল দিদিমার ছেলেবেলায়। দিদিমা তো গ্রামে ছিলেন। ঘটনাটা নাকি ঘটেছিল দিদিমাদের পাশের একটা গ্রামেই। দিদিমা বিশ্বাস কবতেন, ওরকম ঘটনা সত্যি ঘটতে পারে।'

গল্পটা যা যা বলেছিলেন, তা ছিল এই রকম। তাঁর দিদিমাদের পাশের গ্রামে ছিল এক নিকিবি পরিবার। নিকিরি হল এক শ্রেণীর মৎসজীবী সম্প্রদায়। তারা ছিল অবশ্য মুসলমান। পাশের গ্রামে, নিকিরিপাড়া বলে, একটা পাড়াও ছিল। কয়েক ঘর নিকিরি সেই পাড়ায় বাস করত। সেই পাড়ায় এক নিকিরি পরিবারে ছিল কেবল দুজন। স্বামী আর স্ত্রী। স্বামীর নাম ছিল সোলেমান। আর তার বিবির নাম ছিল হাসিনা।

সোলেমানের কোন জমি-জিরেত ছিল না। খালে বিলে মাছ ধরে

বেড়াত। রাত্রের দিকেই একটা ছোট লণ্ঠন হাতে নিয়ে সে খ্যাপলা জালে মাছ ধরত। সকালবেলা বাজারে গিয়ে মাছ বিক্রি করত। তার নিজের কোন পুকুর ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই সে মাছের চারা পুকুরে ছেড়ে বড় করত। আর বড় মাছ বিক্রি করে বেশি টাকাপয়সাও রোজগার করতে পারত। কিন্তু তা না থাকায় যে সব খালে বিলে মাছ ধরলে কোনরকম কর বা ট্যাক্স দিতে হত না, সোলেমান সেই সব খালে বিলে জাল ফেলে মাছ ধরত। সে সব খালে বিলে সকলেরই মাছ ধরার অধিকার ছিল। জালে তেমন কিছুই উঠত না। ছোট ছোট ল্যাটা, মাগুর, কই, ট্যাংরা, পুঁটি। গ্রামের বাজারে তার তেমন দামও পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে ঘন বুনটের আঁটোল জাল ছেঁচে কুচো চিংড়িও ধরত।

সোলেমান ছিল এইরকম একজন গরিব নিকিরি। গরিব হলেও সে আর হাসিনা মোটামুটি সুখেই ছিল। সামান্য মাছ বিক্রি করে যা পাওয়া যেত, দু'জন মানুষের কোন রকমে চলে যেত। তা ছাড়া সোলেমান ছিল একজন গুণিন। তাকে লোকে ধার্মিক মনে করত। গরিব মানুষদের অসুখ-বিসুখে সে জলপড়া দিত। নানারকম ঘাস লতাপাতার রস দিয়ে ওষুধ তৈরি করে দিত। তাতে লোকের অসুখও সারত। এমন কি, সে মাদুলিও দিত। লোকে তাকে বিশ্বাস করত। সে এ সবের জন্য কারোর কাছ থেকে একটি পয়সাও নিত না। সেজন্য লোকে তাকে ভালবাসত। হিন্দু-মুসলমান, সকলেই তার কাছে আসত। সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ছিল খুব ভাল।

একদিন সে ঠাট্টা করে তার বিবিকে বলেছিল, 'আমি ইচ্ছে করলে পুকুর খাল বিলের সব মাছ খেয়ে ফেলতে পারি।'

বিবি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল' 'খেয়ে ফেলতে পার মানে কি? জালে ধরে এনে রেঁধে খাবার কথা বলছ?'

সোলেমান বলেছিল, 'জালে কি আর সব মাছ ধরা যায়? আর সব মাছ ধরে রান্না করে একজন মানুষ কখনো খেতে পারে? 'আমি জলে ডুবে ডুবে মস্ত হাঁ করে সব মাছ খেয়ে ফেলতে পারি।'

হাসিনা খুব অবাক হয়ে বলেছিল, 'সে আবার কেমন ব্যাপার? তা আবার কখনো হয় নাকি?'

সোলেমান বলেছিল, 'কেন হবে না? ধর, আমি যদি কুমীর হয়ে যাই, তা হলেই জলে ডুবে সব মাছ খেয়ে ফেলতে পারি। খালি মাছ কেন, তখন আমি জলের ধারে মানুষ জানোয়ার যা পাব, সবই খেয়ে ফেলতে পারি।'

হাসিনা ভেবেছিল, সোলেমান ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে। তাই সে বলেছিল, 'তা বলে তুমি তো আর সত্যি সত্যি কুমীর হতে পারবে না। হলে না হয় খেতে পারতে। কিন্তু মানুষ কখনো কুমীর হতে পারে না।'

সোলেমান বলেছিল, 'আমি কিন্তু কুমীর হতে পারি।'

হাসিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করে?'

সোলেমান বলেছিল, 'আমি একটা মন্ত্র জানি। সেই মন্ত্রপড়া জল আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেই, আমি কুমীর হয়ে যাব। আবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেই জল গায়ে ছিটিয়ে দিলেই আমি মানুষ হয়ে যাব। তবে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে হবে।'

সোলেমানের কথা শুনে হাসিনার তেমন বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিল তাকে বোকা বোঝাচ্ছে। তবু মানুষের মন। হাসিনার খুব কৌতূহল হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি সেই মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে না দেওয়া হয়?'

সোলেমান হেসে বলেছিল, 'তা হলে আর আমি মানুষ হতে পারব না।'

হাসিনার তখন অবিশ্বাসের থেকে কৌতূহলই বেশি হয়েছিল। অবিশ্বাস করার কোন কারণও ছিল না। সোলেমান কখনও মিথ্যা কথা বলত না। আর সে ছিল সত্যিকারের একজন গুণিন। হাসিনা বলেছিল, 'বেশ, তুমি আমাকে সেই মন্ত্র পড়া জল দাও। আমি তোমার গায়ে ছিটিয়ে দেব। দেখব তুমি কেমন কুমীর হও?'

সোলেমান চুপচাপ একটু ভেবেছিল। তারপরে বলেছিল, 'শোন হাসিনা বিবি, এসব করতে নেই। এ হল জীবন নিয়ে খেলা। তুমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে আমার গায়ে জল না দাও, তা হলে কিন্তু আমাকে আর ফিরে পাবে না।'

হাসিনা বলেছিল, এক ঘণ্টা কেন? আমি তোমার কুমীর হওয়া দেখে একশো পর্যন্ত গুনব, তারপরেই জল ছিটিয়ে দেব। কিন্তু বলেছ যখন, তোমাকে দেখাতে হবে।'

সোলেমান জানত, হাসিনাকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কথাটা সে যেদিন তার বিবিকে বলেছিল, সেদিনটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। তার পরের দিন অমাবস্যা। সে বলেছিল, 'ঠিক আছে। তোমার যখন এতই দেখতে ইচ্ছে করছে, কাল রাত পোহালেই দেখাব। আজ মাঝ রাত্তিরে অমাবস্যা পড়বে। তখন আমি সেই মন্ত্রপড়া জল বানাব। তুমি সকালবেলা উঠোনে আমার গায়ে সেই জল ছিটিয়ে দেবে। তবে একটা কথা। তুমিই

শুধু দেখবে, আর কারুকে বলবে না। এসব জিনিস লোকজনকে বেশি দেখতে নেই। খোদাতালার রাগ হয়।'

হাসিনা বলেছিল, সে কারোকেই বলবে না। বলেও নি। পরের দিন ভোরবেলা সোলেমান হাত-মুখ ধুয়ে অজু করে নামাজ পড়েছিল। হাসিনার যেন তর সইছিল না। ছেলেমানুষের মত ছটফট করছিল। সোলেমান ঘরেব ভিতব থেকে ছোট একটা কাঁসার বাটি নিয়ে উঠোনে এসেছিল। নিকিরি পাড়ায় ওদের বাড়িটা ছিল হিজলি খালের ধারে, এক টেরেতে। উঠোনের চাবপাশে ঘেরা ছিল প্যাকাটি কাঠির গায়ে গোবর মাটি জড়ানো বেড়া। আর একপাশে ছিল বাইরে যাতায়াত করার কঞ্চি বাঁশের ঝাঁপ দরজা। সোলেমান হাসিনাকে কঞ্চি বাঁশের ঝাঁপটা বন্ধ করে দিতে বলেছিল, যেন কেউ এসে পড়তে না পাবে। তারপরে কাঁসার বাটিটা হাসিনার হাতে দিয়ে, উঠোনের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বলেছিল, 'খোদার নাম নিয়ে এবার আমার গায়ে বাটির অর্ধেক জল ছিটিয়ে দাও। বাকি অর্ধেক জল পরে ছিটিয়ে দেবার জন্য রেখে দাও।'

হাসিনা খোদার নাম করে, সোলেমানের খালি গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঘরের চালায় একটা দাঁড়কাক কা-কা করে ডেকে উঠেছিল। জল ছিটিয়ে দেবার পর সোলেমান কয়েক মুহূর্ত যেন মড়ার মত পড়েছিল। তারপরেই হাসিনা দেখেছিল, সোলেমান নেই। উঠোনের ওপর বিশাল এক কুমীর হাসিনার দিকে ফিরেছিল। সেই ভয়ঙ্কর কুমীর দেখে হাসিনা ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। কুমীরটা যে আসলে তার স্বামী সোলেমান, সেই কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল। হাতের কাঁসার বাটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে, দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে চিৎকার করে উঠেছিল, 'ওগো, কে কোথায় আছো, শীগগিব এস। আমার উঠোনে কুমীর।'

আর কুমীররূপী সোলেমান দেখছিল, সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। যে বাকি অর্ধেক জলে তার মানুষের শরীর ফিরে পাবার কথা, হাসিনা ভয় পেয়ে সে জলই বাটিসুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল। সোলেমান কুমীর হলেও তার ভিতরে মানুষেব মনটা ছিল। ভেবেছিল, কী ভুলই না সে করেছে! হাসিনা যে ভয় পেতে পারে, এটা সে একবারও ভাবে নি। ভাবলে আগেই সাবধান করে দিত। অথচ তখন আর তার মানুষের মত কথা বলার উপায় ছিল না। সে কেবল হাঁ করেছিল।

বিরাট কুমীরের হাঁ দেখে হাসিনা আরও ভয় পেয়েছিল। তার চিৎকারে নিকিরি পাড়ার লোকজন ছুটে এসেছিল। তারাও উঠোনের মাঝখানে সেই

ভয়ংকর বিরাট কুমীর দেখে বাড়িতে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না। কুমীররূপী সোলেমান তখন উঠোনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাড়ার লোকেরা ভাবছিল, এত বড় কুমীর কোথা থেকে সোলেমানের উঠোনে এসে উঠেছে! ওদিকে হাসিনা ভয় পেয়ে, প্রথমে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেও, পরে তার মনে হয়েছিল, কী সর্বনাশ সে করেছে! সে ঘরের বাইরে এসে কুমীররূপী সোলেমানকে দেখেছিল। আর কুমীর তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়েছিল।

হাসিনা তখন কপাল চাপড়ে কেঁদে কূল পায় নি। বাটির অর্ধেক জল তখন উঠোনের মাটি শুষে নিয়েছিল। সে পাড়ার লোকজনকে সব কথা ভেঙে বলেছিল। শুনে তো সকলের মাথায় হাত! খোদার এই মর্জির উপরে তো আর কারোর খোদ্‌গিবি চলবে না। এখন উপায়? আশেপাশের গ্রামে যত গুণিন ওঝা ছিল, সবাইকে ডাকা হল। তারা কেউ কিছু করতে পারল না। পাড়ার সব থেকে বুড়ো নিকিবি দূর থেকে কুমীররূপী সোলেমানকে বার বার বলতে লাগল, 'সোলেমান, তুমি ছাড়া আর কেউ এর বিধেন কবতে পারবে না। যদি কিছু করার থাকে, তুমিই কর।'

সোলেমানের তখন আর কিছুই কবার ছিল না। সে উঠোন থেকে কাঁসার বাটিটা মুখে নিয়ে গিলে ফেলেছিল। তাতেও কিছু হয় নি। সবাই দেখেছিল, কুমীরের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। হাসিনা কপাল চাপড়ে কেঁদে বলেছিল, 'ওগো মিঞাজান, আমি কী সর্বনাশ করলাম! এখন আমার কী হবে?'

সোলেমানের আর সে জবাব দেবার উপায় ছিল না। সারাটা দিন সে উঠোনে রইল। তারপরে বিকালের দিকে কঞ্চি বাঁশের খোলা ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাসিনা পিছনে পিছনে গেল। কুমীররূপী সোলেমান হিজলি খালেব জলে নেমে ডুব দিল। হাসিনা চিৎকার করে অনেক কাঁদল। কুমীর তখন আর উঠল না।

সেই থেকে সোলেমান চিরকালের জন্য কুমীর হয়ে গিয়েছিল। হাসিনা মাঝে মাঝেই খালের ঘাটে এসে বসে থাকত। আর কুমীর জলের ওপর ভেসে উঠত। হাসিনা কেঁদে কেঁদে অনেক কথা বলত। কুমীর শুনত। তারপরে আবার ডুব দিয়ে চলে যেত। এমনি করে হাসিনা যতদিন বেঁচেছিল, সেই কুমীরকে সবাই হিজলি খালের জলে দেখতে পেত। হাসিনা মরে যাবার পরে সেই কুমীরকে কেউ আর কোনদিন খালে দেখতে পায় নি।

গোগোল গল্পটা শুনে আর কোনদিন ভুলতে পারে নি। অনেক সময় ওর মনে হয়েছে, গল্পটা নেহাতই আজগুবি। মানুষ কি কখনও কুমীর হতে

গল্পটা শেষ হয় মাথায় বিঁধে দিল। সোলেমানের জন্য ওর মনে কষ্ট হত। হাসিনার জন্যও কষ্ট হত।

একবার শীতের ছুটিতে গোগোলরা বেড়াতে গেল জরাইকেলা। পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, প্রগ্রেস রিপোর্টও বেরিয়ে গিয়েছে। গোগোল ভালভাবেই পাস করেছে। কিন্তু বেড়াতে যাবার কোন কথাই ছিল না। সেই সময়েই বাবার এক কবি বন্ধু একদিন বেড়াতে এলেন। বাবার কবি-বন্ধুর বেশ নামডাক আছে। নাম তাঁর গিরীন্দ্রশেখর মুস্তাফি। কবি হলেও তিনি একটা বড় চাকরি করেন। কিন্তু সবাই তাঁকে কাজী নজরুলের মত বিপ্লবী কবি বলে। গোগোল নজরুলের কবিতা অনেক পড়েছে। বুঝতেও অসুবিধা হয় না। গিরীন্দ্রশেখরের কবিতা এত কঠিন, গোগোল পড়েও কিছুই বুঝতে পারে না। বাবাকে সে-কথা বললে, বাবা বলেন, 'গিরীনের কবিতা তুমি এখন বুঝতে পারবে না। আরও বড় হও, তখন বুঝতে পারবে।'

গোগোলের অবশ্য গিরীন কাকার কবিতা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। মানুষটিকে ওর খুব ভাল লাগে। চেহারাটা তাঁর তেমন লম্বা-চওড়া নয়। মাথার চুলও ছোট করে কাটা। কবি বললেই যেমন রবীন্দ্রনাথ নজরুলের চেহারা মনে পড়ে, তাঁর চেহারা মোটেই সেরকম নয়। কবি সুকান্তর মতও তিনি দেখতে নন। সুকান্তর ছবি দেখলে তাঁকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। আর এ কথাও সত্যি, তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন।

গিরীন কাকাকে দেখতে আর দশটা সাধারণ লোকের মতই। তবে তাঁর চোখ দুটো বেশ বড়। হাসিটা খুব সুন্দর। তবে তাঁর কথাবার্তা বেশ তেজী ভাবের। তিনি ভগবানে বিশ্বাসী নন, এ কথাটা প্রায়ই বলেন। মানুষের কুসংস্কার সম্পর্কে তিনি খুব বিদ্রূপ করেন। সাধারণ মানুষ যা সব বলে আর বিশ্বাস করে, তিনি তা মোটেই করেন না।

গোগোল আগেও শুনেছে, গিরীন কাকার বাবা থাকেন জরাইকেলায়। তাঁর বাবা সেখানে জঙ্গলের ঠিকাদার। তাঁদের একটা বড় বাড়ি আছে সেখানে। জায়গাটা নাকি খুবই সুন্দর। আসলে জরাইকেলা হল একটা জঙ্গলের জায়গা। সারেণ্ডা নামে বিরাট জঙ্গলের ধারেই জরাইকেলা বলতে গেলে একটা ছোট গ্রাম। ঐ নামে একটা স্টেশনও আছে। আর জরাই-

সেবারে গোগোলের পরীক্ষার শেষে একদিন গিরীন কাকা এসে বাবাকে বললেন, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি, চল একবার জরাইকেলা বেড়িয়ে আসি। এখন তো গোগোলের ছুটি। সামনেই বড়দিন। বড়দিনে তো কলকাতায় থাকোই। চল এবার জরাইকেলায় আমাদের বাড়ি যাই।'

বসবার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। বাবা মা দুজনেই ছিলেন। গোগোলও ছিল। বাবা বললেন, 'গোগোলের ছুটি আছে। আমার তো নেই। টানা অন্তত এক সপ্তাহের ছুটি না পেলে যাব কেমন করে?'

বাবা কথাটা বলে মার দিকে তাকালেন। গিরীন কাকাও মার দিকে তাকিয়েছিলেন। মাকে তিনি 'তুমি' করে নাম ধরেই বলেন। বললেন, 'কী, তুমি কী বল? খুচরো ছুটিটাকে টানা করে নিলেই যাওয়া যায়। তবে এটা বলতে পারি, গেলে তোমাদের জায়গাটা ভাল লাগবে। চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। কোয়েল নদীর তো তুলনা নেই। জরাইকেলায় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন, আর সারেণ্ডা ফরেস্টে বেড়িয়ে বইও লিখেছিলেন।'

মা বললেন, 'আপনার কবিতা পড়েই আমার জরাইকেলা দেখা হয়ে গেছে। অন্তত যা পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে, খুবই সুন্দর জায়গা।'

বাবা বললেন, 'তা সত্যি।'

গিরীন কাকা হেসে বললেন, 'এতে আমার কবিতার প্রশংসা করা হল বটে, তবে আমি তা শুনতে চাই নি। কবিতা পড়ে কি আর আসল বোঝা যায়? চল ঘুরে আসি। থাকবার কোন কষ্ট নেই। অনেকগুলো ঘর আছে, বাগান আছে। পাহাড় জঙ্গল দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠলে, কয়েকটা স্টেশন পরেই রয়েছে রাউরকেলা স্টিলপ্ল্যাণ্টের শহর। তাও বেড়িয়ে আসা যাবে।'

গোগোল বাবা মার মুখের দিকে দেখছিল। বেড়াতে যাবার ভাগ্যটা তাঁদের ওপরেই নির্ভর করছে। গিরীন কাকার কবিতা পড়ে ও কখনও জরাইকেলার ছবি দেখতে পায় নি। তবে জায়গাটার কথা শুনে ওরও খুব ইচ্ছে, সেখানে একবার বেড়াতে যাবে। ও জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'সেখানে জঙ্গলে কি অনেক জানোয়ার আছে?'

গিরীন কাকা হেসে বললেন, 'শহরে গ্রামে মানুষ থাকে, আর জঙ্গলে জানোয়ার থাকবে না? সারেণ্ডায় বাঘ কেমন আছে জানি নে। তবে হাতি

আছে ভালই। ভল্লুকও কম নেই। আর আছে অজগর। বিরাট অজগরের দেশ হল সারেণ্ডা। আমি চোখে দেখি নি, শুনেছি, এক সময়ে রেল লাইনের ধারে, বিরাট গাছের গুঁড়ি আর মোটা ডাল দেখে লোকে বুঝতেই পারত না, ওটা অজগর, রেলগাড়ির কামরার ভেতর তাগ্ করে আছে। স্টেশনও তো জঙ্গলের মধ্যে। ভালুলতা বলে একটা স্টেশনে অনেক বছর আগে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। রেলের জানালায় একজন মুখ বাড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল, একটা গাছের মোটা ন্যাড়া ডাল, একটা মানুষের মুণ্ডু মুখে পুরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই বোঝা গেল, ওটা আসলে একটা অজগর।'

গোগোলের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

গিরীনকাকা বললেন, 'তারপরে আর কী? লোকজন নাকি ভয়ে কেউ এগোতেই চায় নি। অজগরের মুখে মুণ্ডু ঢোকানো লোকটা তখন হাত-পা ছুঁড়ছে। অজগরটা মাটিতে নেমে পড়েছিল। মানুষের যে কত রকম কুসংস্কার আছে! অনেকে নাকি বলেছিল, ওরকম মুখের খাবার ছিনিয়ে নিতে নেই। অজগরের তো বিষ নেই আস্তে আস্তে গিলে খায়, তারপরে মোটা পেট নিয়ে পড়ে থাকে। হজম হতে সময় লাগে। সেইজন্য বলে অজগর নাকি বছরে একবারই খায়। সব বাজে কথা। একটা গোটা হরিণ বা সম্বর গরু খেলে হয়তো হতে পারে। তা কি আর সব সময় কপালে জোটে? খরগোশ বুনো ইঁদুর বেড়াল, এসব হয় তো পায়। তবে যাই হোক, লোকজনের কাছে খবর পেয়ে সাহেব ফরেস্ট অফিসার বন্দুক নিয়ে ছুটে এসেছিল। অজগরটাকে গুলি করে মেরেছিল। কিন্তু লোকটাকে বাঁচানো যায় নি। অজগরের গ্রাসে অনেকক্ষণ মুণ্ডুটা ছিল বলে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছল। তখন তো আর রাউরকেলা স্টীলপ্ল্যান্ট হয় নি। মনোহরপুরে একটা ছোট হাসপাতাল ছিল। সেখানে লোকটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সে মরে গেছল। তবে আজকাল আর সেরকম নেই। জঙ্গলের খুব ভেতরে অজগর আছে। সে সব হল আলাদা ব্যাপার। আসলে জঙ্গলের একটা সৌন্দর্য আছে।'

মা বললেন, 'ওসব অজগর-টজগর শুনলেই ভয় লাগে।'

'আমার কিন্তু একদম লাগে না।' গোগোল বলে উঠল, 'আমি একটা বইয়ে পড়েছি, অজগর আসলে খুব ভীতু।'

মা ধমকে বললেন, 'তোমাকে বলেছে, অজগর ভীতু।'

গোগোল কিছু বলবার আগেই গিরীন কাকা বললেন, 'আহা ওকে কেন

ধমকাচ্ছ ? অজগরকে গর্ত থেকে টেনে বের করতে আমি দেখেছি। অবশ্য মুখ ধরে নয়, ল্যাজ ধরে। আর সত্যি বলতে কি, অজগর খিদে না পেলে একেবারেই নিরীহ জীব। তা সে সব ভেবে কী লাভ ? আমরা তো আর অজগরের আস্তানায় যাচ্ছি নে। জরাইকেলা এখন আধা শহর আধা গ্রাম। আর জঙ্গলে যদি আমরা বেড়াতে যাই, তা হলে তো জীপে চেপে। ভাগ্যে থাকলে হাতি চোখে পড়তে পারে। ভল্লুক এখন বিশেষ দেখা যায় না। ওরা আসে বসন্তকালে, যখন মহুয়ার ফুল হয়। গাছতলায় পড়ে থাকা মহুয়ার ফুল খেতে ওরা খুব ভালবাসে। সেও জঙ্গলের মধ্যে।'

সব শুনে বাবা বললেন, 'গিরীন যখন এত করে বলছে, তা হলে ছুটি নিতেই হয়। বিশেষ করে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় জঙ্গল সারেণ্ডা, সেটা একটু দেখা হবে।'

মাও রাজী হয়ে গেলেন। তখন যাবার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। গিরীন কাকা নিজেই স্টীল এক্সপ্রেসের টিকিট কাটার ভার নিয়ে নিলেন। মাকে বললেন, শীতের জামাকাপড় যেন ঠিকমত নেওয়া হয়। যাবার আগে গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাস্টার গোগোল, তুমি খুশি তো ?'

গোগোলের চোখ এমনিতেই খুশিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। ও কিছু বলবার আগে মা বললেন, 'কাকে জিজ্ঞেস করছেন ? গোগোলকে ? এ তো সেই কথার মত হল, সাধু খাবে, না হাত ধোব কোথায় ? গোগোল, বোধহয় মনে মনে এখনই জরাইকেলায় চলে গেছে।'

মার কথা শুনে গোগোল মজা পেয়ে গেল। গিরীন কাকা আর বাবা হো-হো হেসে উঠলেন। গোগোল তার মধ্যেই বলে উঠল, 'অজগর দেখবার ইচ্ছে তেমন নেই, তবে হাতি কি দেখতে পাব ?'

গোগোলের সঙ্গে তখনও সেই পাগলা হাতির সঙ্গে বন্ধুত্বের ঘটনাটা ঘটে নি।

গিরীন কাকা বললেন, 'সেটা তোমার ভাগ্য। গণেশ ঠাকুরের দয়া হলে তারা দেখা দিতে পারে, দয়া না হলে দেখা পাবে না।'

গোগোল বলল, 'আপনি তো ঠাকুর-দেবতা ভাগ্য-কপাল মানেন না।'

'আহা, ওটা এমনি কথার কথা বলছি।' গিরীন কাকা হেসে বললেন, "সত্যি, ওসব মানি নে। হয় তো এমনও হতে পারে, হাতির দেখা পেলে, আর সে এমন তাড়া করল, কোথায় পালাবে ঠিক করতে পারবে না। হাতি এরকম বেশ কিছু লোককে মেরেও ফেলেছে। অবশ্য হাতি এমনিতে খুবই শান্ত জীব। তবে ক্ষেপে গেলে কী করবে, কিছুই বলা যায় না। যাই

গোগোল তখন সত্যিই মনে মনে জরাইকেলায় চলে গিয়েছে।

গিরীন কাকা স্টীল এক্সপ্রেসের চেয়ার কার রিজার্ভ করেছিলেন। চেয়াব কারে বসতে আরাম। ঘুমোনো যায় না। কিন্তু সময়টা শীতের বড়দিনের ছুটির অবকাশ। চেয়ার কারের টিকেট আর রিজারভেশন পাওয়াই শক্ত। তবু গিরীন কাকা টিকেটের ব্যবস্থা করেছিলেন। ট্রেনে উঠে, জায়গা নিয়ে বসে বললেন, 'একটা তো রাত, কেটে যাবে। তাও পুবো রাত নয়। এক্সপ্রেস লেট না করলে আমরা শেষ রাত্রেই পৌঁছে যাব।'

বাবা বললেন, 'আমি এই চেয়ার-কারেই ঘুমিয়ে নেব।'

গোগোল জানালার ধারে সীট পেয়েছিল। শীতের বিকেল পাঁচটাতেই প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। তবু ভাবল, অন্ধকারে কাচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকেই ওর রাত কেটে যাবে। রাত্রে খাবার জন্য মা কিছু খাবার, কমলালেবু আর মিষ্টি এনেছিলেন। মুখোমুখি চারজনের চেয়ার-কারের মাঝখানে টেবিল। গোগোলরাও চারজন। কোন অসুবিধা ছিল না। গাড়ি ছাড়বার কথা পাঁচটায়। কিন্তু ছাড়ল দশ মিনিট দেরিতে। রিজার্ভ কামরা হলেও বেশ কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। গিরীন কাকার কথা থেকে বোঝা গেল, দাঁড়ানো যাত্রীরা সবাই ডেলি প্যাসেঞ্জার। খড়্গপুরের আগেই সবাই নেমে যাবে। তা ছাড়া গিরীনকাকা তৈবি হয়েই এসেছিলেন। গাড়ি ছাড়বার পরে ফ্লাস্ক থেকে একপ্রস্থ চা পান করে তাস বের করেছিলেন। মা বাবা আর তিনি, তিনজনে মিলে তাস খেলা শুরু করলেন। গোগোল তাস খেলা বোঝে না। ও জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল।

অন্ধকার নেমে এল বেশ তাড়াতাড়ি। দূরের কিছুই দেখা যায় না। তবে স্টেশনগুলোতে আলো জ্বলছিল। সব স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াচ্ছিল না। খড়্গপুর পৌঁছে গিরীন কাকা ডাইনিং কারের বেয়ারাকে মাখন টোস্ট, ওমলেট আর কফি দিতে বললেন। মা বললেন, 'এখন এসব খেয়ে, তারপবে খাবার খাবেন কখন?'

'রাত্রের খাবার খাব টাটায় পৌঁছে।' গিরীন কাকা বললেন, 'তার মধ্যে টোস্ট আর অমলেট হজম হয়ে যাবে। গোগোলের খিদে পেয়ে গেলে আলাদা কথা। ট্রেন ঠিকমত গেলে টাটায় পৌঁছুবে ন'টায়। এখন বাজে সাতটা। গোগোল যদি আগেই খেয়ে নিতে চায়, খেয়ে নেবে।'

তা হলে তো কোন কথাই নেই।

খড়্গপুর স্টেশন ছাড়িয়ে যেতেই টোস্ট আর ওমলেট এসে গেল। তার সঙ্গে গরম কফি। শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা নেমে যাবার পরে কামরাটাও ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বাবা খেতে খেতে গিরীন কাকাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'গিরীন কবি হলেও খেতে ভালবাসে। কবিরা তো শুনি, কবিতায় এমন ডুবে থাকেন, তাঁদের খিদে তেষ্টার কথা মনে থাকে না।'

'ওসব বাজে লোকের বাজে কথা শুনেছ।' গিরীনকাকা মাখন টোস্ট চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ওরকম আত্মভোলা কবি আজকাল আর নেই। আগেও কোনকালে ছিল বলে আমি শুনি নি। তবে হ্যাঁ, একদল কবি আছে, যারা আসলে কবি নয়, তারা কবি ভাব দেখাবার জন্য ওরকম করতে পারে। আর যাদের স্বাস্থ্য খারাপ, তারা খাবে কেমন করে? আমি অন্য ধাতুতে গড়। আমি কবিতায় স্বপ্ন দেখি না, বাস্তব জীবনকে দেখি। দরিদ্র দুঃখী মানুষের সংগ্রামের কথা আমি লিখি।'

বাবা হেসে বললেন, 'গরিবের সংগ্রামী কবি তুমি। তোমার কোন স্বপ্ন নেই?'

গিরীন কাকা ডিমের ওমলেট কাঁটা চামচেয় তুলে মুখ পুরে বললেন, 'স্বপ্ন দেখা কেন? আমি সংগ্রাম করি।'

বাবা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা বললেন, 'আহা, কেন তুমি গিরীন ঠাকুরপোর পেছনে লাগছ?'

গিরীন কাকা খাবার খেতে খেতে বললেন, 'আরে ছেড়ে দাও ওর কথা। ওর কাছে কবিতা হল প্যানপ্যানানি। আমি ওসব লিখি নে।'

গিরীন কাকার কথা শেষ হতে না হতেই ট্রেন গেল থেমে। কোন স্টেশন নেই। মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। বোধহয় সিগনাল পায় নি কোন কারণে। গোগোল ওর কফিতে বেশ খানিকটা দুধ আর চিনি মিশিয়ে নিল। সকলেরই খাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু গাড়ি আর চলতে চায় না। অন্যান্য যাত্রীরাও উসখুস করতে আরম্ভ করেছে। সকলেই খবর নেবার চেষ্টা করছে, কী কারণে গাড়ি চলছে না। কেউই কোন খবর দিতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত গিরীন কাকা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দেখি একবার কী ঘটল?'

এমন সময়ে একজন টিকেট চেকার এলেন করিডোর দিয়ে। তিনি

জানালেন, 'একটা গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে গাড়ি বেঁচে গেছে। ইঞ্জিনের ড্রাইভার দেখতে পায়, কয়েকটি লোক লাইনে কিছু করছিল। দেখতে পেয়েই ড্রাইভারের সন্দেহ হয়। সে গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দিতেই লোকগুলো অন্ধকারে পালিয়ে যায়। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দেয়। তারপর খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তারা একটা ফিসপ্লেট খুলে ফেলেছে! খড়্গপুরে খবর চলে গেছে। মেকানিকরা এখনই এসে যাবে। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সকেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।'

গিরীন কাকার দু' চোখে ভয় ফুটে উঠল। শুধু গিরীন কাকার নয়, অনেকেরই চোখে মুখে ভয়ের ছাপ! গিরীন কাকা বসে পড়লেন নিজের সীটে। বসেই বলে উঠলেন, 'এ গভর্নমেন্টকে দিয়ে কিছু হবে না। আর একটু হলেই প্রাণটা যাচ্ছিল আর কি!'

বাবা বললেন, 'যা বলেছ। তবে রাখে কেষ্ট মারে কে?'

গিরীন কাকার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। বললেন, 'কেষ্ট আবার কে? তিনি রাখবারই বা কে? ওসব বুজরুকি আমি মানিটানি নে।'

'তা হলে নিশ্চয়ই ভাগ্য মানো?' বাবা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

গিরীন কাকা রেগে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা বলে উঠলেন, 'আপনি আবার ওর কথার জবাব দিতে যাচ্ছেন? ও তো ইচ্ছে করে আপনাকে চটাচ্ছে।'

গিরীন কাকা হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমি মোটেই চটি নি। তবে আমি ভাগ্য টাগ্য মানি নে। আমি বলব, ড্রাইভারের কৃতিত্বের জন্যই আমরা বেঁচে গেছি। সে যদি দূর থেকে লোকগুলোকে না দেখতো, তা হলে নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট হত। আমি ঠিক করেছি জরাইকেলা গিয়েই খবরের কাগজে একটা চিঠি পাঠাব, যেন এই গাড়ির ড্রাইভারকে পুরস্কার দেওয়া হয়।'

বাবা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আর কিছু বলবে না। এই শীতের রাত্রে মাঠের মাঝখানে ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, তার ঠিক নেই। তার মধ্যে তোমাদের যত বাজে তর্ক।'

বাবা হেসে চুপ করলেন। গিরীন কাকা বসে থাকতে পারলেন না। সীট ছেড়ে উঠে বললেন, 'তুমিই ঠিক বলেছ। এসব আজেবাজে কথার থেকে একটু দেখা যাক, লাইন সারাতে কতক্ষণ লাগবে।'

গিরীন কাকা সামনের করিডোরের দিকে এগিয়ে গেলেন। গোগোলও বুঝতে পারছিল, বাবা হেসে কথা বলে গিরীন কাকাকে রাগাবার চেষ্টা

করছেন। তাঁদের দুই বন্ধুতে দেখা হলেই এরকম হয়। গিরীন কাকা কবি বটে। তবে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তিনি জেদ করে তর্কে মেতে ওঠেন। তাঁকে যে চটানো হচ্ছে, সেটা যেন বুঝতে পারেন না। গিরীন কাকা ছাড়া গোগোল কোন কবিকে দেখে নি। তবে অনেক কবির কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস ও পড়েছে। তাঁরাও গিরীন কাকার মত কিনা, ওর জানা নেই। তবে তাঁদের লেখা পড়লে মনে হয় না তাঁরা কেউ গিরীন কাকার মত রাগী আর তার্কিক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, আরও অনেকের ছড়া আর কবিতা গোগোল পড়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁদের ছড়াও পড়েছে। তাঁদের ছড়া আর লেখা পড়লে মনে হয়, তাঁরা যেন সব সময়ই হাসছেন। গিরীন কাকাও ছড়া লেখেন, সে সব ছড়া পড়লেই বোঝা যায়, তিনি যেন রেগে ঝেঁজে উঠছেন। কিন্তু তাঁকেও ভাল লাগে। সবাই তো আর এক রকম হন না। তিনি যে ড্রাইভারকে পুরস্কার দেবার কথা বললেন, গোগোলের সে কথাটা মনে ধরেছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা লেট্ করে গাড়ি ছাড়ল। টাটা পৌঁছুবার আগেই গোগোলের খিদে আর ঘুম, দুই-ই পেয়ে গেল। ও খেয়ে নিয়ে সীটের বোতাম টিপে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। ঘুম ভাঙল মায়ের ডাক শুনে, 'গোগোল, শীগ্‌গির উঠে পড়। আমাদের এবার নামতে হবে।'

গোগোল পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অজগরকে স্বপ্ন দেখছিল। মায়ের ডাক শুনে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বাইরে ভোর হয়েছে। গাড়ি চলেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। ওর গায়ে ছিল হাতকাটা সোয়েটার আর পুরো হাতা শার্ট। শীতটা এখন বেশি লাগছে। কিন্তু জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে শীতটা যেন গায়েই লাগছে না। গাড়ির গতি কমে এসেছে। বাবা আর গিরীন কাকা ওপরে রাখা স্যুটকেস নামাতে ব্যস্ত। গোগোলের চোখে পড়ল, জঙ্গলের ফাঁকে অনেকটা দূরে, রুপোর পাতের মত, এক পলকের জন্য একটা নদীর বাঁকা রেখা দেখা গেল। ও বলে উঠল, 'এখানে কি নদী আছে?'

গিরীন কাকা বললেন, 'সে কি, ভুলে গেলে? তোমাকে তো আগেই বলেছি, এখানে কোয়েল নামে একটা নদী আছে। এখানে যে ক'দিন থাকব, রোজই দু'বেলা আমরা কোয়েল নদীর ধারে বেড়াতে যাব। ইচ্ছে করলে চানও করতে পারি।'

ট্রেন দাঁড়াল একটা স্টেশনে। কুলি উঠে এল কামরার মধ্যে। জরাইকেলায় নামবার যাত্রী আর কেউ ছিল না। গিরীন কাকা তাড়া দিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি নামতে হবে। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না।'

সকলের সঙ্গে গোগোল প্ল্যাটফরমে নেমে এল। ট্রেনও হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিল। যেন গোগোলদের নামবার জন্যই ট্রেনটা থেমেছিল। কুলি মাল নামালেও দেখা গেল, দুজন লোক ওদের সব স্যুটকেস ব্যাগ ইত্যাদি নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। আর গিরীন কাকার থেকে ছোটই হবেন, গায়ে গলাবন্ধ সোয়েটার আর ট্রাউজার পরা এক ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে কুলিকে একটা টাকা দিলেন। কুলি খুশি হয়ে সেলাম ঠুকে চলে গেল। তা হলে এই লোক দুটি কারা? গিরীন কাকা ভদ্রলোককে দেখিয়ে বাবা-মাকে বললেন, 'এই আমার ছোট ভাই মণি অর্থাৎ মণীন্দ্র।'

মণীন্দ্র দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বাবা মা'কে নমস্কার জানালেন। গিরীন কাকা বললেন, 'মণি, তুই তো আমার বন্ধু সমীরেশের কথা অনেকবার শুনেছিস। এই হলো ওর স্ত্রী আর ছেলে গোগোল।'

মণীন্দ্র গোগোলকে হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমিই গোগোল। এ বয়সেই তো তুমি একজন নামী লোক হয়ে গেছ।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে হাসল। গিরীন কাকা বললেন, 'এ জঙ্গলে অবশ্য গোয়েন্দাগিরি করার মতো কিছু ঘটনা ঘটে না। আমার টেলিগ্রাম তা হলে ঠিক সময়মতই পেয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।' মণীন্দ্র বললেন।

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা কারা, যারা আমাদের লাগেজ নিয়ে চলে যাচ্ছে?'

মণীন্দ্র বললেন, 'ওরা হল মুণ্ডা। একজনের নাম চেকো, আর একজনের নাম বুধুয়া। ওরা আমাদের ঠিকেদারিতে কাজ করে।'

গিরীন কাকা বললেন, 'গোগোল, তোমাকে আর একটা মজার খবর দিই। এই যে দেখছ জরাইকেলা ইস্টিশন, এর প্ল্যাটফরমের একটা অংশ পড়েছে ছোটনাগপুর—মানে বিহারের মধ্যে। আর একটা অংশ উড়িষ্যার মধ্যে।'

গোগোল এরকম ইস্টিশন কোনদিন দেখে নি। বাবা বলে উঠলেন, 'তাই নাকি? তা হলে এই ইস্টিশনের প্ল্যাটফরমটাই বিহার উড়িষ্যার সীমানা বল?'

গিরীন কাকা বললেন, 'ঠিক তাই। প্ল্যাটফরমের পেছন দিকটা—মানে, আমরা যেদিক থেকে এলাম, সেদিকটা পড়েছে বিহারের মধ্যে। বাকিটা উড়িষ্যার মধ্যে। কিন্তু বোঝবার কোন উপায় নেই। রাস্তায় গেলে একটা পোস্ট দেখতে পাবে। সেটাই সীমানা। তবে কিছু লেখাটেখা নেই। কোন চেকপোস্টও নেই। যেটা আছে, সেটা হল পুলিশের একটা আস্তানা, সে অনেক দূরে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের বাড়িটা বিহারে, না উড়িষ্যায়?'

'উড়িষ্যায়।' গিরীন কাকা বললেন, 'চল এবার আমরা যাই। আর আমি তোমার গিরীন কাকা। আমার ভাই হল এখন তোমার মণি কাকা।'

মণি কাকা গোগোলের হাত ধরে পা বাড়িয়ে বললেন, 'চল যাই। ছোট জায়গা, এখানে সাইকেল রিকশা কয়েকটা আছে। কিন্তু আমরা চাপি না। বাড়িতে হেঁটে যেতে সাত আট মিনিট লাগবে।'

গোগোল উল্টো দিকের প্ল্যাটফরমের ইস্টিশনের লাল ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের টিকেট নিতে কেউ আসছেন না?'

মণি কাকা হেসে বললেন, 'ছোট ইস্টিশন। সবাই আমাদের চেনেন। দেখেও নিয়েছেন। জানেন, আমরা কখনো বিনা টিকেটে চলাফেরা করি নে। তুমি খেয়াল কর নি, টিকেট কালেকটর আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়েছিলেন। গাড়ি আসবার কথা আরও অনেক আগে, শেষ রাত্রের অন্ধকারে। চেকো আর বুধুয়া সেই সময় থেকেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। গাড়ি দেরি করল কেন তুমি জান?'

গোগোল ফিসপ্লেট সরানোর ঘটনা বলল। মণি কাকা প্ল্যাটফরমের ঢালুতে নেমে রাস্তায় এসে পড়লেন। অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? তা হলে তো তোমাদের খুব ফাঁড়া গেছে। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

মণি কাকার কথা শুনে গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ভগবান মানেন?'

'তা মানি।' মণি কাকা হেসে বললেন, 'কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলে, তাও জানি। নিশ্চয়ই আমার দাদা বলেছেন, তিনি ওসব কিছুই মানেন না?'

গোগোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'দাদা অনেক কিছুই মানেন না। তা বলে আমি মানব না কেন?' মণি কাকা লাল কাঁকরের শক্ত রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন। তারপর একটা পোস্টের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললেন, 'এটাই হচ্ছে

বিহার আর উড়িষ্যার সীমানা। আমরা এখন উড়িষ্যার মধ্যে।'

গোগোল পোস্টের দিকে তাকাল। সামান্য একটা লোহার পোস্ট। দেখে কিছুই বোঝা যায় না। রাস্তার বাঁ ধারে দেখা গেল, বড় বড় শালবল্লা ডাঁই করা রয়েছে। ভিতরে কোথায় একটা শব্দ হচ্ছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

'করাত কলের।' মণি কাকা বললেন, 'এখানে কিছুই নেই, কেবল কাঠ ছাড়া। আশেপাশে তুমি এরকম অনেক কাঠের গুদাম আর গোটা তিনেক কাঠ চেবাইয়ের স-মিল দেখতে পাবে। কাঠের ব্যবসা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। আর তার জন্যই যা কিছু দোকানপত্র। বাজার বলতে যা বোঝায়, তা এখানে নেই। তবে সব রকমের দোকানই এখানে আছে। মুদিখানা থেকে কাপড়ের দোকান। মুদিখানাতে বলতে গেলে সব কিছু পাওয়া যায়। আলু পেঁয়াজও। তরিতরকারি আর সামান্য মাছ সকালে বিকালে মুণ্ডা ওরাঁওরা নিয়ে আসে। সে সব পাওয়া যায় রেললাইনেব ওপারে। আর সপ্তাহে একদিন হাট হয়। হাটের দিন দূরের জঙ্গল পাহাড় থেকে অনেক মানুষ সওদা করতে আসে। জঙ্গলের ভেতবে একবার ঢুকে গেলে তুমি দোকানপাট কিছুই পাবে না।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে জঙ্গলের ভেতরের লোকেবা কী খায়?'

'তারা অনেক কিছু খায়, যা আমরা খাই নে।' মণি কাকা বললেন, 'তবে তারা ভুট্টা আর মকাইয়ের চাষ করে। ধানও করে। নানা রকমের বুনো শাকপাতা আছে, আর সাঁকালুর মত কয়েক রকমেব তরকারি মাটির নীচে এমনি জন্মায়। ওরা সেগুলো মাটি থেকে তুলে শুকিয়ে তরকাবি বানিয়ে খায়। ওদের সব থেকে অভাব নুনের। আলু বা আমরা যে সব তরকারি খাই, তারা সে সব খায় না। খায় না মানে, সে সব কেনবার মত পয়সা তাদের নেই। এরা গরিব, কিন্তু খুব সৎ আর হাসিখুশি। দু' একদিন থাকলেই বুঝতে পারবে।'

বাবা-মা গিরীন কাকার সঙ্গে পিছনে কথা বলতে বলতে আসছেন। মণি কাকা বাঁ দিকে মোড় নিলেন। গোগোলের চোখের সামনে রেললাইনের দু' পাশে জঙ্গল। বাঁ দিকে কিছুটা দূর থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। আরও দূরে পাহাড় আর জঙ্গল আকাশে ঠেকেছে। লাল মাটির কাঁকর ছড়ানো শক্ত বাস্তার এপাশে ওপাশে দু' একটা ছোট মাটির বাড়ি। দু' চারটে গরু ছাগল চরছে। এই শীতে ঘরগুলোর কাছে সামান্য জামা গায়ে কয়েকটি

শিশু আর বড়দের দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় এরা মুণ্ডা বা ওঁরাও।

মণি কাকা বললেন, 'এই রেললাইন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাউরকেলা। জরাইকেলার পর ভালুলতা, তারপরে বিস্‌রা। বিস্‌রার চুন খুব প্রসিদ্ধ। তারপরে বাণ্ডামুণ্ডা ইস্টিশন। বাণ্ডামুণ্ডার পরে রাউরকেলা। সেখানে স্টীল প্ল্যান্ট।'

গোগোল মন দিয়ে মণি কাকার কথাগুলো শুনছিল। এমন সময়ে ওদের সামনে এসে পড়ল এক বুড়ো, যার গায়ে একটা মোটা ময়লা চাদর জড়ানো। আর সামান্য একটা নেংটি পরা। সে মণি কাকাকে হাত তুলে নমস্কার করল, আর গোগোলের দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল। মণি কাকা হেসে বুড়োকে কিছু বললেন। বুড়ো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, গোগোলের দিকে তাকিয়ে ফোকলা মুখে হেসে চলে গেল। মণি কাকা বললেন, 'বুড়ো মুণ্ডারি ভাষায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, তুমি বেড়াতে এসেছ। বুড়ো এখন যাচ্ছে কোয়েল নদীর ধারে। সেখানে নদীর বালির মধ্যে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সোনা খুঁজবে।'

'সোনা? কিসের সোনা?' গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মণি কাকা বললেন, 'সোনা মানে সোনা, অর্থাৎ গোল্ড। অনেক কাল আগে কোয়েলের ধারে জলের সঙ্গে সোনা ভেসে আসতো। এখনো আসে, বালির সঙ্গে মিশে থাকে। এরা সেই সব বালি চিনতে পারে, যার মধ্যে সোনা মিশে থাকে। সারাদিনে দু' তিন কে.জি বালি সংগ্রহ করে, যার মধ্যে হয়তো এক আনা সোনা পাওয়া যাবে। সেই বালি এখানকার মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা এদের কাছ থেকে দু' এক টাকায় কিনে নেয়। বালি ঝেড়ে সোনা বের করতে পারে, এবকম লোক মারোয়াড়িদের আছে। যারা এরকম নদীর বালিতে সোনা খুঁচিয়ে বেড়ায়, তাদের সোনাখোঁচা বলে।'

গোগোল যতই শুনছিল, ততই অবাক হচ্ছিল। নদীর জলের বালিতে সোনা পাওয়া যায়! ও জানে, এক ভরি সোনার দাম অনেক। এক আনা সোনার দাম সেই তুলনায় কিছু কম নয়। বললো, 'এক আনা সোনার জন্য মাত্র দু' এক টাকা পায়?'

'হ্যাঁ, সকাল থেকে বিকেল অবধি বালি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যখন মাড়োয়ারির কাছে বিক্রি করতে যায়, তখন এই বুড়োকে ওরা বলে, এ তো কেবল বালি। এর মধ্যে সোনাই নেই। কিন্তু ওদের এমন লোক আছে, যারা বালি দেখলেই বুঝতে পারে, তার মধ্যে সোনা আছে। বুড়োকে যেন দয়া করে দুটো টাকা দেয়।' মণি কাকা বললেন, 'এইভাবে গরিবদের ঠকানো হয়।'

কথা শেষ হতে না হতেই ওরা চারিদিকে বেড়াঘেরা একটা বাংলোর মত বাড়ির সামনে এসে পড়ল। সামনে অনেক বড় বাগান, নানা রকম গাছপালা। বেড়ার গায়ে একটা বাঁশের ঝাঁপ দরজা দড়ির ফাঁসে আটকানো। সামনেই গাছের নীচে একটা তিন চার বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাউজারের ওপর গলাবন্ধ, মোটা সোয়েটার গায়ে। পাশে একজন মহিলা। দেখলে মনে হয় মায়ের থেকে ছোট। তাঁর গায়ে একটা উলের শাল জড়ানো। মণি কাকা বললেন, 'এটা আমাদের বাড়ির পেছন দিক।'

বাবা-মা আর গিরীন কাকাও এসে পড়লেন। যে মহিলা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি মণি কাকার স্ত্রী। তিনি এগিয়ে এসে বাবা-মাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গোগোলের হাত ধরেছিলেন আগেই। গোগোলকে দেখে বললেন, 'ভারি মিষ্টি ছেলে।'

গিরীন কাকা বললেন, 'দেখতে মিষ্টি বটে, গোগোল কিন্তু একজন নামকরা খুদে গোয়েন্দা। খবরেব কাগজে এর নাম বেরিয়েছে কয়েকবার।'

কাকিমা বললেন, 'জানি।'

পিছনের উঠোনে অনেকগুলো মুরগী চরছিল। বাগানের বাইরেও অনেকখানি খোলা জায়গা। সেখানে খুঁটিতে বাঁধা দুটো গরু। বাছুরটা ছাড়া রয়েছে। বাংলোবাড়িটা বেশ নিরিবিলি। পিছনের বাঁধানো বারান্দায় ইজিচেয়াবে বসেছিলেন একজন প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর মাথায় উলের টুপি। গায়ে জড়ানো শাল। তিনি গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। গোগোলদের দেখে মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে বললেন, 'গিরীন, তোদের আসতে এত দেরি হল কেন? ট্রেন কি লেট ছিল?'

'হ্যাঁ বাবা, গতকাল রাত্রে ড্রাইভাবের কল্যাণে আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি।' গিরীন কাকা বললেন, 'ড্রাইভার দেখতে পেয়েছিল, কয়েকটা লোক লাইন থেকে ফিসপ্লেট সবিয়ে নিচ্ছে।'

গোগোল বুঝতে পারল, ভদ্রলোক গিরীন কাকার বাবা। গিরীন কাকা সবাইকে নিয়ে বারান্দার ওপরে উঠলেন। বাবা-মাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। তারপরে গোগোলের সঙ্গে। বাবা-মা গিরীন কাকার বাবাকে প্রণাম করলেন। গোগোলও করল। গিরীন কাকার বাবা সবাইকেই আশীর্বাদ করে বললেন, 'আহা, থাক থাক। তোমরা এসেছ দেখে খুবই ভাল লাগছে! আমরা ঠিকাদার মানুষ, একরকম জঙলীই বলতে

পার। নিজেদের বাড়ির মত করে থাকবে।'

কাকিমা তখন পিছনের উঠোনে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মণি কাকার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কাছেই দাঁড়িয়েছিল কাকীমার বয়সী একটা মেয়ে। কালো রঙ কিন্তু কাকীমার মতই শাড়ি পরা। তবে তার গায়ে কোন গরম চাদর নেই। গোগোল বারান্দার ডান দিকে গেল। বাঁ দিকেও বারান্দা। মাথার ওপর টালি। ভিতরে ঘর। চারদিকেই বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে টালির চাল ঢাকা বারান্দা। দেওয়াল ইটের। গোগোল বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেকটা জায়গা জুড়ে সবুজ বন। বারান্দার ওপরে কতগুলো বেতের চেয়ার আর টেবিল রয়েছে। সেখান থেকে সারেণ্ডা ফরেস্টের পাহাড় আর জঙ্গল দেখা যায়। বেড়া ঘেরা লনের পাশ দিয়ে একটা কাঠ বোঝাই লরি চলে যাচ্ছে। ডান দিকে বাড়ির সীমানার বাইরেই বড় বড় শাল গাছের জঙ্গল। বলতে গেলে, চারদিকেই জঙ্গল। তার মাঝখানে জরাইকেলা একটা ছোট জায়গা।

'এই যে গোগোল, তুমি এখানে রয়েছ?' মণি কাকা এগিয়ে এলেন, বললেন, 'চল, গরম জলে মুখ ধুয়ে আগে একটু কিছু খেয়ে নাও। তারপরে জামাকাপড় বদলে বেড়াতে যাওয়া যাবে।'

গোগোলকে নিয়ে মণি কাকা সামনেই একটি ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। গোগোল দেখল, ঘরে একটা বড় খাট রয়েছে। বিছানা আর এলোমেলো লেপ কম্বল দেখলেই বোঝা যায়, এ খাটে কেউ শুয়েছিল। ঘরের বাঁ দিকে, ডান দিকে দুটো দরজা। আবার উলটো দিকেও একটা দরজা রয়েছে। দুটো জানালা সামনের দিকে। ডান পাশের ঘর থেকে বাবা আর গিরীন কাকার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। মণি কাকা গোগোলকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন।

গোগোল দেখল, এ ঘরটাও বেশ বড়। কিন্তু বাইরে লনের সামনে বারান্দায় যাবার কোন দরজা নেই। দুটো জানালা আছে। এ ঘরেও বড় খাট আছে। বিছানা তেমন নেই। ডান দিকের একপাশে একটা ছোট দরজা। মা আর কাকিমা এসে ঢুকলেন। স্যুটকেস্ আর ব্যাগগুলো এ ঘরেই তোলা হয়েছে। গোগোল নিজেই ব্যাগ থেকে ওর দাঁত মাজার ব্রাস বের করতে যাচ্ছিল। মা বললেন, 'তোমাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না। সব অগোছাল করে দেবে।'

কাকীমার সঙ্গে যে মেয়েটি উঠোনের ঘরের কাছে কথা বলছিল, সে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাঁড়ি নিয়ে ঢুকল। কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা

হাঁড়ি জড়িয়ে ধরা দেখেই বোঝা যায়, গরম জল এনেছে। সে ঘরের আর একটা দরজার পাল্লা পা দিয়ে ঠেলে খুলে ফেললো। হাঁড়ি নিয়ে ঢুকে গেল সেই ঘরে। কাকিমা বললেন, 'মাংরি, বড় বালতি দুটোতে এমনি জল ভরে রেখেছিস তো ?'

দরজার ভিতর থেকে জবাব এল, 'হ্যাঁ, সব ভরে রেখেছি।'

মাংরি নাম কখনও বাঙালী মেয়ের বোধহয় হয় না। অথচ কথার জবাব সে পরিষ্কার বাঙলাতেই দিল। জবাব দিয়েই বেরিয়ে এল। সকলের দিকে একবার দেখে সে ঘরের বাইরে চলে যাবার আগে কাকিমা বললেন, 'মাংরি, সবই হয়ে গেছে। আমি চায়ের জল উনানে চাপিয়ে এসেছি। তুই একটু দেখ, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

মাংরি ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে গেল। মা গোগোলের হাতে তুলে দিলেন দাঁত মাজার পেস্ট আর ব্রাস। সাবান তোয়ালেও দিতে যাচ্ছিলেন। কাকীমা বললেন, 'সাবান তোয়ালে সব বাথরুমের ভেতরে আছে। ওসব দিতে হবে না। বাথরুমের মধ্যে একটা খালি বালতি আছে, তার মধ্যে ঠাণ্ডা আর গরম জল মিশিয়ে নিলেই হবে।'

গোগোল ব্রাস পেস্ট নিয়ে বাথরুমে গেল। দরজা বন্ধ করার আগেই শুনতে পেল, গিরীন কাকা বলছেন, 'অমিতা, আমার মুখ ধোবার আগেই চা চাই। মুখ ধুয়ে তারপর আবার।'

কাকিমাকেই নিশ্চয় বললেন।

গোগোল বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল, মা ওর জন্য আলাদা জামাপ্যাণ্ট বের করে রেখেছেন। মা বললেন, 'পাশের ঘরে গিয়ে এগুলো পরে এস। ট্রেনে সারারাত্রি পরা জামা-টামা সব কেচে দিতে হবে।'

গিরীন কাকা আর বাবা তখন চা খাচ্ছেন, আর জরাইকেলার কাঠের ব্যবসার বিষয়ে আলোচনা করছেন। গোগোল পাশের ঘরে গিয়ে মায়ের দেওয়া জামাপ্যাণ্ট বদলে এল। কাকিমা ভিতরের বারান্দার দরজার সামনে এসে ডাকলেন, 'গোগোল, তুমি এস, একটু কিছু খেয়ে নেবে। তোমার মণি কাকা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'কেন, মণি গোগোলের জন্য অপেক্ষা করছে কেন ?' গিরীন কাকা জিজ্ঞেস করলেন।

কাকিমা বললেন, 'গোগোলকে নিয়ে কোয়েলের ধারে বেড়াতে যাবে। আপনারা কি যাবেন ?'

'মাথা খারাপ ?' গিরীন কাকা বললেন, 'দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে বিকেলে বেড়াতে বেরোব। গোগোল যেতে চায় যাক। আর গোগোলের মা যদি যেতে চায় যেতে পারে।'

মা মাথা নেড়ে বললেন, 'সবে এসে পৌঁছেছি, এখনই বেড়াতে বেরোব নাকি ? গোগোলের কথা আলাদা।'

গোগোল ওসবের মধ্যে নেই। ও ঘরের বাইরে গেল। চওড়া বারান্দার একপাশে, বারান্দাকেই বাড়িয়ে একটা ঘর করা হয়েছে। খাবার ঘর। কাকিমার সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকে গোগোল দেখল, মণি কাকা আর সেই চার বছরের ছেলেটি বসে আছে। মণি কাকা ডাকলেন, 'এস গোগোল। এই হল তোমার একটি ভাই, নাম খোকন।'

গোগোল দেখল, খোকন ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। মণি কাকা খোকনকে বললেন, 'খোকন, এ হল তোমার গোগোলদাদা।'

কাকিমা গোগোলকে বসতে বলে টেবিলের ওপর রাখা পাত্রের ঢাকনা খুললেন। সদ্য ভাজা লুচি থেকে ভয়সা ঘিয়ের গন্ধ বেরোচ্ছে। আর একটা পাত্রে রয়েছে আলু পেঁয়াজের চচ্চড়ি। কাকিমা মণি কাকা আর গোগোলের সামনে প্লেট দিয়ে লুচি আর চচ্চড়ি দিলেন। মণি কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি দোকান বাজারের দিকে যাবে ?'

'যাব।' মণি কাকা বললেন, 'গোগোলকে নিয়ে কাশীকাকার বাড়ি যাব। সেখানে বিলু তোতনের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেব। সবাইকে নিয়ে কোয়েলের ধারে যাব। তারপর গোগোলকে বিলুদের কাছে রেখে আমি ওদিকে যাব। বিলুরাই গোগোলকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

কাকিমা বললেন, 'তাহলে তোমাকে যা যা বলে দিয়েছি, সে সব নিয়ে এস।'

মণি কাকা খেতে খেতে ঘাড় বাঁকালেন। কাকিমা বেরিয়ে গেলেন। খোকন মণি কাকার প্লেট থেকে একটা লুচি নিয়ে চিবোচ্ছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে গোগোলের দিকেই। কাকিমা ঢুকলেন বড় বড় দুটো দুধ ভরতি কাচের গেলাস নিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'গোগোল, তুমি কি চা খাবে ?'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

কাকিমা আর একটা ঢাকনা দেওয়া পাত্র থেকে গোগোল আর মণি কাকাকে প্যাঁড়া বের করে দিয়ে বললেন, 'তাহলে দুধের পর মিষ্টি খেয়ে নিও।'

খাওয়া শেষ হতে দেরি হল না। খোকনের খাওয়া তখনও শেষ হয় নি,

মণি কাকা বললেন, 'খোকন, তুমি আস্তে আস্তে খাও। আমি গোগোল দাদাকে নিয়ে বেরোচ্ছি, কেমন?'

খোকন ঘাড় কাত করে সরু গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

'গোগোল, চল বাইরে হাত ধুয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

গোগোল এক পায়ে খাড়া। বাইরেই বারান্দায় ছিল জলের বালতি আব মগ। সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে গোগোল ঘরে গিয়ে মাকে বলল, 'মা, আমি মণি কাকার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'ঘুরে এস।' মা বললেন, 'দুষ্টুমি করো না যেন।'

গিরীন কাকা বললেন, 'ঐ তোমাদের এক দোষ। দুষ্টুমি আবার কী করবে? একটু বেড়াতে যাবে, বড় জোর দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করবে। ও কি আমাদের মত বসে থাকবে নাকি?'

গোগোল হেসে বাবার দিকে একবার তাকিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। মণি কাকা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ও মণি কাকার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে, যে রাস্তা দিয়ে ইষ্টিশন থেকে বাড়ি এসেছিল, সেই পথেই এগিয়ে গেল। কিছুটা গিয়ে বাঁ দিকের বাস্তা ধবে, আবার ডান দিকে ফিবে রেল লাইন পার হল। এদিকে দোকানপাট কিছুই নেই। দশ বার ফুট উঁচু শালবন। মণি কাকা বললেন, 'এখানে আগে অনেক বড় বড় শাল গাছ ছিল। সে সব কেটে ফেলার পরে নতুন চারা লাগানো হয়েছিল। এ সব গাছের বয়স এখন সাত আট বছর।'

জঙ্গলের ভিতরে গরুর গাড়ি চলার দাগ রয়েছে। চারদিকে নানা রকম পাখি ডাকছে। গাছেব ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রোদ। জঙ্গলেব মধ্যে সোজা খানিকটা গিয়ে মণি কাকা বাঁ দিকের একটা পায়ে হাঁটা পথে চললেন। সামনেই দেখা যাচ্ছিল একটা পাহাড়ের টিলা। তার আশেপাশে বড় বড় কয়েকটা পাথর দাঁড় করানো। মণি কাকা সেই পাথরগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এখানে মুণ্ডারা মৃতদের কবব দেয়। পাথরগুলো এক একটা সমাধি।'

জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। খাড়া করা পাথরগুলো এবরো-খেবড়ো করে কাটা। দাঁড়িয়ে আছে যেন দৈত্যাকার মানুষের মত। পাথরগুলো ঘিরে বাঁশের ডগায় কয়েকটা নিশান দাঁড় করানো রয়েছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'এ বাঁশের ডগায় কাপড়গুলো কিসের?'

'ওগুলো হল এদের অপদেবতার হাত থেকে বাঁচানোর ধ্বজা।' মণি কাকা বললেন, সমাধির মধ্যে যারা আছে, তাদের আত্মারা যাতে ভূত হয়ে

কারোর ক্ষতি না করতে পারে, সেই বিশ্বাসেই এগুলো রাখা হয়েছে।'

গোগোলরা চলে এল টিলাটার ধারে। চওড়া লাল মাটি আর কাঁকরের রাস্তার ওপর দিয়ে কলকল শব্দে জলের ধারা বয়ে চলেছে। তার ওপরে কাঠ পাতা। সেটা পার হতে হতে মণি কাকা বললেন, 'এ জল কোয়েল থেকেই আসছে।'

টিলাটাকে ডান দিকে রেখে মণি কাকা চললেন সোজা। কয়েকটা মুণ্ডা ওরাওঁদের ঘর দেখা গেল। লোক নেই একটাও। তার পরেই টিনের চালের ঘর আর মাটির দাওয়া, সামনে মস্ত উঠোন একটা বাড়িতে ঢুকলেন। গোগোলের বয়সী একটি ছেলে আর মেয়ে উঠোনের রোদে ক্যাম্বিসের বল আর হাতে তৈরি কাঠের ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। গোগোলদের দেখেই ওদের খেলা থেমে গেল। মাটির উঁচু দাওয়াতে রোদে চাদর জড়িয়ে



বসেছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। হাতে তাঁর চায়ের গেলাস। বলে উঠলেন, 'এই যে মণি, এস এস।'

মণি কাকা গোগোলকে বললেন, 'এই ভদ্রলোকের নাম কাশীনাথ গাঙ্গুলী। এঁর বাড়িতেই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এসে কয়েকদিন ছিলেন।'

বলতে বলতে মণি কাকা দাওয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। কাশীনাথবাবু গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মণি কাকা বললেন, 'দাদার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল, তাঁরা এসেছেন। দাদার বন্ধুর ছেলে, এর নাম গোগোল।'

গোগোল কাশীনাথবাবুকে প্রণাম করল। তিনি দাওয়ায় বসেই গোগোলকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'থাক, থাক দাদু। কলকাতার ছেলেরা আজকাল আবার বুড়োদের পেন্নাম করে নাকি? বেশ ছেলেটি। এস, ওপরে উঠে বস।'

'এখন আর বসব না কাকাবাবু।' মণি কাকা বললেন, 'বিলু আর তোতনের সঙ্গে গোগোলের পরিচয় করিয়ে দিতে এনেছি। আমাদের বাড়িতে তো গোগোলের সমবয়সী বন্ধু নেই।'

মণি কাকা বিলু আব তোতনকে ডেকে গোগোলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বিলু বড় ভাই, তোতন ছোট বোন। দুজনেই পিঠোপিঠি। ওদের মা বেবিয়ে এসে বললেন, 'মণি ঠাকুরপো, গোগোল নতুন এসেছে, ওকে আগে একটু মিষ্টি খাওয়াই।'

মণি কাকা তাকালেন গোগোলের দিকে। গোগোল বলল, 'আমি তো এখুনি লুচি তরকারি দুধ মিষ্টি খেয়ে এসেছি।'

'সত্যি বউদি, আমবা এইমাত্র খেয়ে এসেছি।' মণি কাকা বললেন, 'গোগোলকে খাওয়াবার অনেক সময় পাবেন। এখন আমরা একটু কোয়েলের ধাবে যাব। বিলু তোতনও যাবে।'

কাশীনাথবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তাহলে তাই যাও। খাওয়াটা পরেও হতে পারবে।'

গোগোল বিলু তোতন তিনজনেই হেসে উঠল। ওরাও গোগোলের সঙ্গে কোয়েলের ধারে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। সবাই একসঙ্গে বেরোবার সময় এক ভদ্রলোক ঘব থেকে বেরিয়ে এলেন। ধবধবে কোঁচানো ধুতির ওপরে সাদা সার্জের পাঞ্জাবি আর সাদা আলোয়ান। পায়ে চকচকে কালো পামশু। হাতে একটি ছড়ি। বয়স হবে বাবা গিরীন কাকাদের মত। মাথার চুলে টেরিকাটা। এক জোড়া কালো গোঁফ। চোখা নাক, বড় বড় চোখ, ফরসা রঙ। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে বললেন, 'চল,

তোমাদেব সঙ্গে আমিও ঘুরে আসি।'

গোগোল বিলুর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বিলু বলল, 'ইনি আমাদের মামা গদাধর চ্যাটার্জী। তিন দিন আগে কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। খুব মজার লোক। ম্যাজিক জানেন, গল্প বলতে পারেন, আর খুব সাহসী। এমন কি, উনি ফ্রেডরিক সাহেবের ভূত-বাংলোতেও ঘুরে এসেছেন, যেখানে কোনো লোক ভয়ে ঢুকতে পারে না।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবল, 'ফ্রেডরিক সাহেবের ভূত-বাংলোটা কোথায় ?'

'তুমি আসবাব সময় একটা টিলা দেখতে পাও নি ?' বিলু জিজ্ঞেস করল।

গোগোল বলল, 'দেখেছি।'

'ফ্রেডরিকের ভূত-বাংলোটা ঐ টিলার গায়েই।' বিলু বলল, 'বাংলোটা কোয়েলের দিকে মুখ করা। যাবার সময় তোমাকে দেখাব।'

গোগোলের সঙ্গে গদাধর চাটুয্যে মামারও আলাপ হয়ে গেল। তারপর সবাই মিলে বেরিয়ে পড়া গেল।

পাহাড়ী টিলাটার চারপাশেই বড় বড় গাছ। টিলাটার ওপরেও কয়েকটি গাছ, কিন্তু বলতে গেলে একরকম ন্যাড়া পাথবের টিলা। যেখান থেকে কোয়েল নদী দেখা যায়, সেদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরনো দোতলা বাংলো বাড়ি। বাড়িটার সামনে এক সময়ে বাগান ছিল, দেখলেই বোঝা যায়। বাগানের মাঝখানে গোল করে বাঁধানো একটা চত্তর। চত্তরের মাঝখানে একটা লোহার মোটা দু'ফুট উঁচু পাইপ। আর চত্তরটা ঘিরে বসবার জন্য লোহার ঢালাইকরা সেকেলের তিনটি বেঞ্চি।

বাংলোটার একতলা বড়। মাথার ওপর টালিগুলোতে শ্যাওলা ধরেছে। অনেক জায়গায় টালি খসে পড়েছে। তার ওপরে লম্বা, চারকোণা টালির ছাদের আব একটা ঘর। দেওয়াল ইটের, সেগুলো যেন এখন কঙ্কালের মত দাঁত বের করে আছে। ওপবের ঘরের সামনের জানালাটা খোলা। জানালায় কোন গরাদ নেই। পাল্লা দুটো ঝরঝর করছে। নীচের তলার অবস্থাও সেইরকম। দু' একটা জানালা খোলা। দরজাগুলো সবই বন্ধ। বাগানে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। কেবল কয়েকটা ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। টিলার নীচে বাড়িটা একেবারে নিঝুম। দেখলেই কেমন গা ছমছম করে।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'এটাকে 'ভূত-বাংলো বলা হয় কেন ?'

জবাব দিলেন মণি কাকা, 'অনেককাল আগে ফ্রেডরিক সাহেব ছিলেন সারেণ্ডা ফরেস্টের সব থেকে বড় অফিসার। খাঁটি বিলিতি সাহেব, ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন। আমি খুব ছেলেবেলায় তাঁকে দেখছি। তিনি তখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছলেন। তাঁর মেম বউ আর ছেলেমেয়েরা বিলেতে চলে গেলেও তিনি যান নি। এই বাংলোটা তৈরি করে এখানেই থাকতেন। শুনেছি, তিনি নাকি মুণ্ডা ওরাঁওদের সঙ্গে মিশে, ওদের বোঙ্গা—মানে, অপদেবতাদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেজন্য অনেকে তাঁকে পাগলও বলত। তিনি নাকি বলতেন, অপদেবতাদেব কাছ থেকে এমন সব জিনিস শিখেছেন, যা থেকে তিনি বনের যে-কোন জানোয়ারের বেশ ধরতে পারতেন। খবরটা শুনে ওঁর কাছে ওরাঁও মুণ্ডাবাও যেতে ভয় পেত। তাঁকে নাকি অনেকে সন্ধ্যাব সময় হাতি বা বাঘ হয়ে ঘুবে বেড়াতে দেখেছে এই বাগানের চারপাশেই। ভয়ে কেউ ওঁব বাড়িতে কাজ করতে চাইত না। কেবল সুবসুতিয়া নামে একটি মুণ্ডা মেয়ে তাঁব কাজ করত। সেজন্য সুরসুতিয়াব সঙ্গে কেউ মিশত না। অনেকে তাকে ডাইনী ভাবত। সেই সুবসুতিয়া এখনো বেঁচে আছে, বুড়ি হয়ে গেছে। সে থাকে বাংলোব পিছনে। একটা ঘবেব মধ্যে। তাকে দেখলে সত্যি ভয় লাগে। সনন্নুড়ি চুল, হিজিবিজি কাটা মুখ। চোখগুলো বড় আর সাপেব মত অপলক। অনেকে বলে, সাহেবেব গচ্ছিত টাকা সুরসুতিয়াকে দিয়ে গেছেন। কিছু তো নিশ্চয়ই দিয়ে গেছেন, নইলে সুরসুতিয়া খাবার কিনে খায় কেমন কবে? তাকে কোন কাজ কবতে দেখা যায় না। অথচ পয়সা দিয়ে সে বাজাব থেকে চাল ডাল কিনে আনে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'সুবসুতিয়াব জন্যই ভূত-বাংলো বলা হয়?'

'না না।' মণি কাকা বললেন, 'ফ্রেডরিক সাহেবের জন্যই ভূত-বাংলো বলা হয়। উনি শুতেন ওপরের ঐ ঘবটায়। একবার গ্রীষ্মকালে তিনি খেয়ে নিয়ে ওপরে শুতে যান। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। সেই একবার গ্রীষ্মকালে রাত্রে ঘুমোতে গিয়ে তিনি আব বেবোন নি। সুরসুতিয়া নাকি অনেকবার ডাকাডাকি করেছে, কিন্তু তিনি তিন-চার দিন দরজা খোলেন নি। বাধ্য হয়েই দরজা ভাঙতে হয়েছিল। দরজা ভেঙে দেখা গেল ফ্রেডরিক সাহেব ঘরে নেই, তিনি কোথাও উধাও হয়ে গেছেন। সাহেব বলে কথা! তখন রাউরকেলা স্টীল-প্ল্যান্ট দূরের কথা, জরাইকেলায় বাইরের লোক খুব কমই ছিল। জঙ্গলও ছিল অনেক ঘন। বিহার আর উড়িষ্যার বড় বড় সাহেব, পুলিসের লোক ফ্রেডরিককে তন্নতন্ন করেও খুঁজে পান নি। সাহেবরা মোটেই বিশ্বাস করে নি, ফ্রেডরিক ইচ্ছামত যে কোন

পশু হয়ে যেতে পারতেন, আবার মানুষের রূপ ধারণ করতে পারতেন। তাঁরা দেখেছিলেন, ফ্রেডরিকের খাটের বিছানাটা তছনছ করা। যেন কেউ খুব দাপাদাপি করেছিল। এমন কি ওপরের ঘরের কাঠের মেঝের ওপর পাতা গালিচাও এলোমেলো ছিল। কিন্তু কোথাও একফোঁটা রক্তের দাগ পাওয়া যায় নি। কেবল ফ্রেডরিকের আঙুলের একটা হীরা বসানো সোনার আংটি বিছানায় পাওয়া গেছল। ফ্রেডরিক যে কোথায় গেলেন, তাঁর কী হতে পারে, এটা কোনদিনই কেউ জানতে পারে নি। সুরসুতিয়াকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছল রাঁচীতে। কয়েক মাস বাদে ছেড়েও দিয়েছিল। কারণ ফ্রেডরিকের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। সুরসুতিয়া নিশ্চয় ফ্রেডরিককে খুন করে নি। তেমন সাহসও তার ছিল না। আর খুন করলে রক্ত তো থাকতো? গলা টিপে মারলে অনেক সময় রক্ত থাকে না। কিন্তু ডেডবডি কোথায় যাবে? সাহেবরা জঙ্গলে নদীর জলে সবখানে তোলপাড় করে খুঁজেছে। ফ্রেডরিককে আর পাওয়া যায় নি। সেই থেকেই এই অভিশপ্ত বাংলোকে ভূত-বাংলো বলা হয়।'

'আমি ওসব আজগুবি কথায় একদম বিশ্বাস করি না।' গদাধর মামা হেসে বললেন। মোটাসোটা ফরসা মানুষ, হাসলেই মুখ লাল হয়ে যায়। 'আমি ইতিমধ্যে একদিন এদের সকলের সামনেই বাংলোর ভেতরটা ঘুরে দেখে এসেছি। ওপরের ঘরেও গেছলাম। হ্যাঁ, বিছানা-টিছানা ইঁদুর আরসোলায় নষ্ট করেছে। অনেক শুকনো পাতা ছড়িয়ে রয়েছে ঘরের ভেতরে। গোটা বাংলোটার ভেতরে বাদুড় আর চামচিকে বাসা বেঁধেছে। এ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই নি। সুরসুতিয়ার সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। সে সাহেবের টাকার হদিশ হয় তো জানত, কিন্তু তাঁর উধাও হবার ব্যাপারটা সে সত্যি জানে না।'

বাংলোর সামনে থেকে কোয়েলের ধারে যেতে যেতে মণি কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে ফ্রেডরিক সাহেবের কী হল, আপনি বলতে পারেন?'

'অন্তত বনের জানোয়ার হয়ে বনে বনে ঘুরছেন না, এটা বলতে পারি।' গদাধর মামা বললেন, 'মানুষ কখনো মন্ত্রবলে জানোয়ার হতে পারে না। ওসব আজগুবি কথা। আমার মনে হয় ফ্রেডরিক গরাদহীন জানালা দিয়ে নিজেই কোথাও উধাও হয়ে গেছেন। মাথায় একবার পাগলামি চাপলে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। হয় তো সাহেব শেষ পর্যন্ত জঙ্গলে বেরিয়ে বাঘের পেটেই গেছেন।

মণি কাকা বললেন, 'গদাধরবাবু, আপনার এ কথাটা মানতে পারলাম

না। আজ পর্যন্ত এ জঙ্গলে যত মানুষকে বাঘে খেয়েছে, তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে। বাঘ তো আর গোটা কঙ্কালটা সুদ্ধ খেতে পারে না?'

'সেটা অবশ্য ভাববার কথা।' গদাধব মামা ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'তবে হাওয়া হয়ে যাবার মত ভূতুড়ে ব্যাপার কিছু ঘটে নি। সেটা এখনো অনুসন্ধান করলে জানা যেতে পারে বলে আমি মনে কবি। এখনো হয় তো কোন ক্লু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

গদাধর মামাব কথায় কেউই বিশ্বাস করে না, মুখ দেখে বোঝা গেল। গোগোলের মনে পড়েছিল, মায়ের সেই মানুষের মন্ত্রপড়া জলে কুমীব হয়ে যাব্যব কথা। বাস্তবে সে রকম ঘটনা ঘটতে পাবে কিনা, গোগোল জানে না। সেরকম যদি ঘটে থাকে, তাহলে হয়তো ফ্রেডরিক মন্ত্রবলে কোন জানোয়ার হয়ে গেছেন। পরে আর মানুষ হবার মন্ত্র মনে করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বিছানা তছনছ হয়েছিল কেন? মেঝের গালিচাই বা কেন এলোমেলো হয়েছিল? স্বরস্বুতিয়া চাব দিনেব মধ্যে কোন খবরও কেন লোকজনকে জানায় নি?

গোগোলেব মাথায় ফ্রেডবিকের ভূত চেপে গেল।

কোয়েলের ধাবে বেড়িয়ে গোগোলেব খুবই ভালো লেগেছে। নদীটা আঁকাবাঁকা, সুন্দব। নদীব মাঝে মাঝে কালো পাথরের চাংড়া যেন কালো মহিষেব মত মাথা উঁচু কবে আছে। বালিব রঙ সোনালী।

গোগোল দুপুবে খেয়ে-দেয়ে, একটু শুয়েছিল। তিনটের মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেল। বাবা মা গিবীন কাকা, সকলেব চা পর্বও শেষ। মণি কাকা কাজে গিয়েছেন। বিলু তোতন এ বাড়িতে চলে এসেছে। বাবা-মা কোয়েলের ধাবেই বেড়াতে যেতে চাইলেন। পরের দিন সারেণ্ডা ফরেস্ট বেড়াতে যাবার জন্য থলকোবাদ বলে একটা জায়গায় ফবেস্ট বাংলো বুক করা হয়েছে। জীপের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

রেল লাইন পেরিয়ে সেই ভূত-বাংলোব সামনে এসে দেখা গেল, গদাধর মামা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গিরীন কাকা আগেই সব জানতেন। গদাধব মামার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। বাবা-মাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গদাধর মামা যে ভূতে বিশ্বাস করেন না, গিরীন কাকা তাও জানতেন। বললেন, 'শুনলাম এবার আপনি একদিন ফ্রেডরিকের বাংলোয় ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ঢুকেছিলাম। কিন্তু ভূত-টুত কিছুই দেখতে পাই নি।' গদাধর মামা বললেন, 'আর মন্ত্রবলে মানুষ বনের জানোয়ার হয়ে যায়, ওসব আজগুবি কথায়ও আমি বিশ্বাস করি নে।'

গিরীন কাকা বললেন, 'যা বলেছেন মশাই। আমিও ওসবে একদম বিশ্বাস করি নে। আমার সন্দেহ, ঐ সুরসুতিয়াই কোনভাবে সাহেবকে মেরেছে। এখন সাহেবের যখ দেওয়া টাকা ভাঙিয়ে মনের সুখে খাচ্ছে।'

'আপনার অনুমান একেবারে মিথ্যে নাও হতে পারে।' গদাধর মামা হাতের পাঁচ ব্যাটারির বড় টর্চ লাইটটা নাচিয়ে বললেন, আমি আজ আবার এই বাংলোতে ঢুকছি। শীতের দিন, তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে, সেইজন্য টর্চ লাইটটা সঙ্গে নিয়েছি। ফ্রেডরিকের হাওয়া হয়ে যাওয়ার একটা ক্লু আমি খুঁজে বের করতে চাই।'

গিরীন কাকা বললেন, 'বলেন তো আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারি।'

'না না, আমার সঙ্গে কারোর যেতে হবে না।' গদাধর মামা ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন, 'আপনি বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, বেড়িয়ে আসুন। এখন শুক্লপক্ষ, আকাশে উঠবে দ্বাদশীর চাঁদ। কোয়েলের ধারে বেড়াতে খুবই ভালো লাগবে। ঘণ্টাখানেক যদি থাকেন, তাহলে আমিও এখান থেকে কোয়েলের ধারে যাব।'

গিরীন কাকা বললেন, 'তাই আসুন। আমরা ঘণ্টাখানেকের বেশিই থাকব। এখানে আর কী করার আছে! জ্যোৎস্না রাত্রে কোয়েলের ধারে বেড়াতে আমার বরাবর ভাল লাগে।'

গোগোল গদাধর মামার দিকে তাকিয়েছিল। ওর খুবই ইচ্ছা করছিল, তাঁর সঙ্গে ও বাংলোতে ঢুকবে। কিন্তু জানে, মা-বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। ও বিলু তোতনের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিয়ে কোয়েলের ধারে ছুটল।

ঘণ্টাখানেকের পরেই কোয়েলের সোনালী বালুচরে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে বাবা মা গিরীন কাকা এক জায়গায় বসে গল্প করছিলেন। গোগোলরাও দৌড়ঝাঁপ করে হাঁপিয়ে পড়েছিল। গোগোল বসে বিলু আর তোতনকে সেই মন্ত্রপড়া জলে মানুষের কুমীর হয়ে যাবার গল্পটা বলল।

প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে গিরীন কাকা সবাইকে উঠতে বললেন। গোগোল বলল, 'গদাধর মামা তো এখনো এলেন না?'

'বোধহয় এখনো বাংলোর মধ্যে ক্লু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।' গিরীন কাকা

বললেন, 'চল, যাবার সময় হাঁক দিয়ে যাব। বিলু তোতনকেও পৌঁছুতে হবে।' বলে তিনি টর্চ জ্বালালেন গাছের ছায়ায় অন্ধকারে।

চারদিক নিঝুম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে চারদিকে। গোগোলরা ভূত-বাংলোর সামনে এসে পড়ল। আগাছা ভরা বাগানে চাঁদেব আলোর ঢেউ খেলছে। তার মাঝখানে বাংলোটা যেন ভূতের মতই দাঁড়িয়ে আছে। গিরীন কাকা গদাধর মামার নাম করে হাঁক দিতে যাচ্ছিলেন।

বিলু বলল, 'ঐ তো মামা চাতালের ওপর বেঞ্চিতে বসে আছেন।'

চাঁদের আলোয় পবিষ্কাব দেখা গেল, গদাধর মামা শাল চাপিয়ে বসে আছেন। তাঁর কোঁচা লুটোচ্ছে। এমন কি বেঞ্চিতে রাখা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ লাইটটাও দেখা যাচ্ছে। গিরীন কাকা ডাকলেন, 'গদাধরবাবু, ওখানে বসে কী করছেন? আমরা এসে পড়েছি, চলুন এবার ফেরা যাক।'

গদাধব মামা কোন জবাবই দিলেন না। এমন কি নড়েচড়ে বসলেন না। ছোটবড় সকলেই অবাক! কী ব্যাপার? গদাধব মামা কোন সাড়া দিচ্ছেন না কেন? গিরীন কাকা আবাব গলা তুলে ডাকলেন, 'ও গদাধরবাবু চুপচাপ বসে কী ভাবছেন? এখন চলুন ফেরা যাক।'

গদাধব মামা কোন জবাবই দিলেন না। গিরীন কাকা অবাক হয়ে বললেন, 'ভারি আশ্চযেব ব্যাপার তো? ভদ্রলোক কি ঘুমিয়ে পড়লেন? না ভূতের খোঁজেব চিন্তায় একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন? একটু দেখে আসি।'

গিরীন কাকা বাগানেব ভিতর ঢুকলেন। গোগোলের ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারল না। গিরীন কাকাকে চত্বরের ওপব উঠে গদাধর মামাকে ডাকতে শোনা গেল। তারপর গদাধর মামার ওপর টর্চ ফেললেন। ঝুঁকে দেখলেন, দেখেই ফিরে এলেন তাড়াতাড়ি। গিরীন কাকার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবে তাঁর গলায় ভীষণ উদ্বেগ। বললেন, 'ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এখনই কাশীনাথ কাকাকে খবর দেওয়া দরকার।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে গদাধরবাবুর?'

'মনে হল, উনি আর বেঁচে নেই।' গিরীন কাকা গম্ভীর স্বরে বললেন।

গাছপালার জঙ্গলের মধ্যে সকলেরই গা ছমছম করে উঠল। সর্বনাশ! গদাধর মামা বেঁচে নেই? প্রথমেই যাওয়া হল কাশীনাথবাবুর বাড়ি।

তাঁকে খবর দেওয়া হল। তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে বেশ কিছু লোকজন সংগ্রহ করে ভূত-বাংলোয় গেলেন। কিন্তু গোগোলদের বাড়ি ফিরে যেতে হল।

সারারাত গোগোল ভালো করে ঘুমোতে পারে নি। কেবলই গদাধর মামার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনল, জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া হবে না। গদাধর মামা মারা গেছেন। কিন্তু কী করে মারা গেছেন, সেটা এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। তাঁর মৃতদেহ রাউরকেলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ভোরবেলাই ফ্রেডরিকের ভূত-বাংলোয় পৌঁছে গেছে।

গোগোল তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কোনরকমে একটু জলখাবার খেয়ে নিল। মণি কাকাই বললেন, 'চল গোগোল, দেখা যাক, পুলিস কিছু হদিশ করতে পারল কি না।'

গিরীন কাকা মুখ চুণ করে বসেছিলেন। তাঁর সেই রকম হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে না। গদাধর মামার মৃত্যু দেখে তিনি যে বেশ ঘাবড়ে গেছেন, কোন সন্দেহ নেই। গোগোল বেরোবার আগে মা ওকে সাবধান করে দিলেন, 'তুমি যেন আবার কিছু ওস্তাদি করতে যেও না।'

গোগোল মণি কাকার সঙ্গে ভূত-বাংলোর কাছে গিয়ে দেখল, পুলিশের ভ্যান গাড়ি আর জীপ দাঁড়িয়ে আছে। একদল পুলিস আর অফিসার বেবিয়ে আসছেন ভূত-বাংলো থেকে। তাঁদের সঙ্গে একটি ছোটোখাটো বুড়ি স্ত্রীলোক। গোগোলরা ছাড়াও আরও অনেক লোক বাংলোর বাইরে ভিড় করেছিল। বিলু তোতনও ছিল। বুড়ি স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে মণি কাকা বললেন, 'ঐ হল সুরসুতিয়া।'

গোগোলেব মনে হল, শনবুড়ি চুলওয়ালা একটা ছোটখাটো পুতুল। বাচ্চা ছেলের মত খাটো। পুলিসের কাছ থেকে জানা গেল, ভিতরে কিছুই পাওয়া যায় নি। গদাধর মামাকে কেউ খুন করেছে কি না, তাও বোঝা যায় নি। তাঁর শবীরের কোথাও কোন দাগ ছিল না। সুরসুতিয়া কাঁদছিল, আর কী সব বলছিল। থেকে থেকে কপাল চাপড়াচ্ছিল।

গোগোল ভেবেছিল, সুরসুতিয়াকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিজেদের গাড়িতে চেপে চলে গেল। সুরসুতিয়া আগাছার ওপর বসে পড়ল। মণি কাকা বললেন, 'এ বুড়ির কিছুই করবার নেই। গদাধরবাবুর মত লোককে ও কিছুই করতে পারে না। রাউরকেলা থেকে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলেই সব জানা যাবে।'

বিলু বলল, 'তা হলে আমরা বাড়ি গিয়ে ক্রিকেট খেলি।'

মণি কাকা বললেন, 'সেই ভালো। তোমরা সময়মত গোগোলকে পৌঁছে দিও।'

পরের দিনই জরাইকেলায় খবর এল, গদাধর মামাকে কেউ মারে নি। তিনি কোন ব্যাপারে এমনই শকড্ হয়েছিলেন, তাতেই হার্টফেল করে মারা যান। বোধহয় বাংলোর ভিতরে তিনি এমন কিছু দেখেছিলেন, যা দেখে ভয়ে বাইরে চলে আসেন। চত্বরে উঠে বেঞ্চিতে বসে বোধহয় একটু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। সেখানেই হার্টফেল করে বসে থেকেই মারা যান।

গোগোলের কৌতূহল এতে আরও বেড়ে গেল। গদাধর মামা বাংলোর ভিতরে কী দেখতে পারেন? তিনি কি ফ্রেডরিক সাহেবকে কোন জানোয়ারের বেশে দেখেছেন? অথবা ফ্রেডরিক নিজেই দেখা দিয়েছিলেন?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে গোগোল এক সময়ে একলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সকলেই গদাধর মামার কথা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ খেয়াল করেন নি, গোগোল বেরিয়ে যাচ্ছে।

বেলা তখন তিনটে। গোগোল বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে সোজা চলে গেল ভূত-বাংলোর দিকে। বাংলোর সামনে একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। এই সময় পিছন থেকে বিলুর চিৎকার শোনা গেল, 'গোগোল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

গোগোল বিলুকে দেখে ওকে হাত তুলে ডাকল। বিলু বলল, 'আমি যাব না, তুমিও যেও না।'

গোগোল সে কথায় কান না দিয়ে বাংলোর একটা খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দেখল না, বিলু রেল লাইন পেরিয়ে গিরীন কাকাদের বাড়ির দিকে ছুটেছে। গোগোল অন্ধকারে ঘরের ভিতর প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। একটা বিশ্রী গন্ধ ওর নাকে এল। কয়েকটা চামচিকে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারটা সয়ে এল। গোগোল দেখল, এ ঘরটা হলঘরের মত বড়। মাঝখানে টেবিল, চারপাশে চেয়ার। শীতের সময় আগুন জ্বালাবার জন্য একটা আগুনের চুল্লিও আছে। ডান দিকে আর সামনের দিকে দুটো ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মেঝেয় পায়ের পাতা ডুবে যাবার মত ধুলা জমেছে। টেবিল চেয়ারের অবস্থাও সেইরকম।

গোগোল সামনের আর ডান দিকের ঘরে গেল। চোখ সওয়া অন্ধকারে দেখল, দুটোই বোধহয় শোবার ঘর। সঙ্গে বাথরুমও আছে। নীচের মেঝেয় কারোর পায়ের ছাপ আছে কি না, চোখে পড়ছে না। ডান দিকের ঘরের একটা জানালা খোলা। কিন্তু গাছের ছায়ায় অন্ধকার করে রেখেছে। ভিতরে যাবার আর একটা দরজা। সেদিকে গিয়ে ইট বাঁধানো উঁচু উনোন দেখে বুঝল, এটা রান্নাঘর।

গোগোল বেরিয়ে এসে হলের বাঁ দিকে তাকাল। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে পা দিতেই মুচ্‌মুচ্‌ শব্দ হল। তবু আস্তে আস্তে ওপরে উঠল। দোতলার ঘরের সামনে কাঠের মেঝের ওপর ধূলার আস্তরন। ওপরে বেশ আলো আছে। গোগোল দেখল, কাঠেব মেঝেয় ধূলায় অনেক জুতোর দাগ। এগুলো বোধহয় পুলিসেব বুটের পায়ের দাগ। কিন্তু একটা দাগ অদ্ভুত। যেন মোটা কোন গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে গেছে, এ রকম দাগ।

গোগোল ফ্রেডরিকের দোতলার একমাত্র ঘরের খোলা দরজায় উঁকি দিল। ঘরের মধ্যেও পুরোনো কার্পেটের ধূলা আর শুকনো পাতার ওপরে অনেক জুতোর দাগ। দুদিকে তিনটে গরাদহীন জানালা খোলা। গোগোল আবার দেখল, মোটা গোল কাঠের গুঁড়ির মত দাগ রয়েছে বিছানার ওপরেও। এ দাগ যে পুরনো নয়, তা দেখলেই বোঝা যায়। এটা কিসের দাগ?

গোগোল খাটের পাশে জানালার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। জানালার মোটা কাঠের চৌকাঠের ধূলার ওপরেও সেই রকম দাগ। আর দাগটা বেশ মসৃণ। কিসের দাগ হতে পারে? হঠাৎ ঝটাপট শব্দ হতেই গোগোল ওপরের দিকে তাকাল। দেখল, দুটো বাদুড় ঝুলছে, কাঠের ভাঙা সিলিংয়ের ওপরে। সন্ধ্যা হলে গরাদহীন জানালা দিয়েই ওরা বেরোয়।

গোগোল আর কিছু দেখতে না পেয়ে নীচে নেমে এল। গদাধর মামা তাহলে কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন? বাংলোর বাইরে এসে পিছনে সুরস্মুতিয়ার ঘরের দিকে গেল। বুড়ির সঙ্গে একটু কথা বললে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে। পিছনে টালির চালের আর মাটির দেওয়ালের দুটো ঘর। এর কোন একটা ঘরেই বোধহয় সুরস্মুতিয়া থাকে।

গোগোল দেখল, দুটো ঘরের দরজাই খোলা। একটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, নেভানো উনোন, কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি। হঠাৎ ওর কানে একটা দাপানো শব্দ এল। ও সরে এসে কান পাতল। শব্দটা পাশের ঘর থেকে

আসছে। গোগোল সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়েই ভয়ে হিম হয়ে গেল! পিছিয়ে গিয়ে দৌড় দেবে, তাও যেন পারছে না। একেবারে পাথর হয়ে গেছে।

গোগোল দেখল, গোটা ঘর জুড়ে গাছের গুঁড়ির মত মোটা বিশাল এক অজগরের শরীর ছড়ানো। সুরসুতিয়ার গোটা মাথাটা তার হাঁ মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে। সুরসুতিয়া তখনও মরে নি। হাত-পা ছুঁড়ছে আর দাপাচ্ছে।

ফ্রেডরিককে কি তবে এরকম কোন অজগরই গিলে খেয়েছে? গরাদহীন জানালা দিয়ে হয় তো এই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা অজগরটাই ফ্রেডরিকের ঘরে ঢুকেছিল। ঘুমন্ত ফ্রেডরিকের মাথাটা অজগর হয়তো এমনি করেই গ্রাস করেছিল, আর চার দিন ধরে গিলে খেয়েছিল। দরজা ভাঙবার আগেই অজগরটা গরাদহীন জানালা দিয়ে টালির ছাদ দিয়ে চলে গিয়েছিল।

গোগোল শুনতে পেল, অনেকে ওর নাম ধরে ডাকছে। ও ছুটে গিয়ে দেখল, বাংলোর সামনে বাবা, মা, গিরীন কাকা, তাঁর বাবা, কাশীনাথবাবু, কাকিমা, বিলু, তোতন সব দাঁড়িয়ে। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেক লোক। গোগোল সেদিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'সুরসুতিয়াকে একটা প্রকাণ্ড অজগর গিলে খাচ্ছে।'

মা ছুটে এসে আগে গোগোলকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন, আর গালে একটি থাপ্পড় মেরে বললেন, 'কেন তুমি ও বাংলোর ভেতরে গেছলে?'

গোগোলের গালে মোটেই লাগল না। ও উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মণি কাকা, ফ্রেডরিক সাহেব দেখতে কেমন ছিলেন?'

'খুব ছোটখাটো রোগা মানুষ।' মণি কাকা বললেন, 'কেন বল তো?'

গোগোল বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, ফ্রেডরিক সাহেবকে গরাদ ছাড়া জানালা দিয়ে ঢুকে, ঐরকম বিশাল অজগর গিলে খেয়েছিল। চারদিন ধরে গিলেছে, তারপরে পালিয়েছে। আর গদাধর মামা বোধহয় গতকাল এই অজগরটাকে দোতলায় দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তিনিও বোধহয় বুঝেছিলেন, ফ্রেডরিক সাহেব কী করে উধাও হয়েছে। তবে কেন ভয় পেয়ে মরে গেলেন জানি না। এখন সুরসুতিয়াকে বাঁচানো যায় কি না, আপনারা দেখুন।'

গোগোলের কথা শুনে গিরীন কাকা বাবা আর কাশীনাথবাবু অনেক লোকজন নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। এবার বাবা-মাও সকলের সঙ্গে ঢুকলেন।

কিন্তু মা গোগোলের হাত ছাড়লেন না।

সেই ঘরটার কাছে গিয়ে কয়েকজন চিৎকার করতে লাগল। ভয়ে সবাই দূরে সরে এসেছে। অনেকে নানা দিকে ছুটে গেল। কাশীনাথবাবু সবাইকে সরিয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন, 'এখন সুরসুতিয়াকে আর বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ। আর সুরসুতিয়াকে অজগরটার মুখ থেকে টেনে বের করতে গেলে ও আমাদের দিকে তেড়ে আসবে।'

গিরীন কাকার বাবা বললেন, 'এভাবে হবে না। অজগরটার ল্যাজ ধরে ওকে পেছন থেকে টেনে বের করতে হবে। কিন্তু ল্যাজ তো রয়েছে ঘরের ভেতর। সাহস করে ঢুকবে কে? শিকার মুখে নিয়ে ও এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন বড় বড় পাথরের টুকরো অজগরের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অজগরটার যেন তাতে কিছুই লাগছে না। কয়েকজন মুণ্ডা ওরাওঁ তীর-ধনুক এনে অজগরের মাথা আর চোখে টিপ করে ধারালো লোহার তীর ছুড়তে লাগল। এবার আর অজগরটা স্থির থাকতে পারল না। সুরসুতিয়ার মাথা গ্রাস বের করে দিয়ে সে ঘরের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল। আর তাব রাগী ফোঁস ফোঁস শব্দে যেন বাগান কাঁপতে লাগল। কিন্তু তীর বিঁধে আর পাথরের ঘায়ে কাবু হয়ে মরিয়া হয়ে অজগরটা বাইরে বেরিয়ে এল। তখন সবাই চারদিকে ছুটতে লাগল।

কিন্তু অজগর মোটেই জোরে ছুটতে পারে না। দেখা গেল, সে বাংলোর খোলা দরজার দিকে এসেছে।

এর মধ্যেই কয়েকজন বড় বড় কাঠে আগুন লাগিয়ে অজগরটাকে পেটাতে আরম্ভ করেছে। পাথর ছুড়ছে। ধনুক থেকে তীরও সমানে ছোড়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অজগরটা আস্তে আস্তে নিথর হয়ে গেল। একজন এসে বলল, 'সুরসুতিয়া মারা গেছে।'

গোগোলদের সেবার আর সারেণ্ডার জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া হয় নি। অজগরের ভয়ে সবাই এমন কাবু হয়ে পড়েছিলেন, কেউ বেড়াতে যেতে রাজী হন নি। এমন কি, সাহসী গিরীন কাকাও না। তবে রাউরকেলা থেকে গোগোলের নামে একটা চিঠি এসেছিল। লিখেছিলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ। তিনি লিখেছিলেন, 'মাঃ গোগোল, তুমি যা অনুমান করেছিলে, তা ঠিক। সেই অজগরটির পেট থেকে ফ্রেডরিকের গলার সোনার ক্রস, বাঁধানো দাঁত এবং আর একটি আংটি পাওয়া গেছে।

একস্‌পার্টদের অভিমত, অজগরটার বয়স প্রায় সত্তর বছর হয়েছিল। গদাধর চ্যাটার্জীও সেই ভয়ঙ্কর অজগরটিকে অন্ধকারে দেখেই ভয় পেয়েছিলেন, এবং এখন অনুমান করা হচ্ছে, উনি সেই ভয়েই মারা যান। এমনও হতে পারে, অজগরটা তাঁকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল।

'তোমার এই আশ্চর্য ও বাস্তব অনুমানের জন্য আমি সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। তোমার বাবা মাকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবে। ইতি—

শ্রীদিবাকর মহাপাত্র

এস. পি., রাউরকেলা

সংবাদটা দেশের সব খবরের কাগজেই বেরিয়েছিল। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত গোগোলের আর সারেণ্ডা ফরেস্ট বেড়াবার সুযোগ হয় নি।

অদৃশ্য মানুষের হাতছানি



সেবার গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে গেছল দার্জিলিংয়ে। মাত্র বছর দুয়েক আগে। এর আগেও গোগোল দার্জিলিং গেছে। তখন যে-ঘটনা ঘটেছিল, তা এতদিনে সবাই জেনেও গেছে। দু বছরের আগের ঘটনাটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে-ঘটনা লোকজনের মধ্যে জানাজানি হয় নি। কোনো রকম হৈচৈও হয় নি। সেইজন্য ঘটনাটার কথা সাধারণ লোকে কিছু জানতে পারে নি।

ঘটনাটা একবকম ভূতুড়ে ঘটনা বললেই চলে।

সেবার দার্জিলিংয়ে যাবার আগে থেকে কোনো কথা ছিল না। পূজোর ছুটিতে কোথাও যাওয়া হবে না, সেটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, পূজোর ছুটির মাত্র দিন সাতেক বাকি থাকতে, হঠাৎ একটা নিমন্ত্রণ জুটে গিয়েছিল। বাবার এক বন্ধু, হাইকোর্টের তিনি একজন ব্যারিস্টার। বাবার বয়সী। ভদ্রলোকের নাম নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ে, ম্যালের আগে একটু নিচেই, হাসপাতালের খুব কাছেই, তাঁর পিতামহের আমলের একটি বাড়ি ছিল। নীলমাধববাবুর বাবা ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। নীলমাধববাবু নিজেও তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে। সেই সূত্রেই, দার্জিলিংয়ের বাড়িটি তিনি পেয়েছিলেন।

গোগোল শুনেছে, বাবার সেই ব্যারিস্টার বন্ধু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

নাকি অনেকবার বাবাকে সপরিবারে দার্জিলিংয়ে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। বাবা সময় করে উঠতে পাবেন নি। বছর দুয়েক আগে, বাবা সেবার অফিসের কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ছুটি নিতে পারেন নি। সেজন্য পূজোব পরে, অফিস থেকে ছুটি পেতে তাঁব অসুবিধা ছিল না। আর তাঁর ব্যাবিস্টাব বন্ধুর তখনও হাইকোর্ট বন্ধ। তিনি বাবাকে বিশেষ ভাবে অনুবোধ করেছিলেন।

পূজোর ছুটির পরেই, সাধারণতঃ বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসে। সেজন্য মা গোগোলেব পড়ার ব্যাপাবে, প্রথমে একটু আপত্তি তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নীলমাধববাবু মাকে বলে রাজি কবিয়েছিলেন। আব তিনি মাকে রাজি করিয়েই, বাবার সম্মতি পেয়ে নিজেব থেকেই বাগডোগবা পর্যন্ত প্লেনের টিকেট কেটেছিলেন। বাবা ট্রেনেই যাবেন বলে স্থিব কবে রেখেছিলেন, আব সেই মতো ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু নীলমাধববাবু বাবাকে বলেছিলেন, 'পূজোব ছুটিটা এখনো রয়েছে বলে ট্রেনে টিকেট পাওয়া একটু মুশকিল আছে। তাই আমি প্লেনেব টিকেটই কেটেছি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমবা দার্জিলিং পৌঁছে যাব।'

বাবা বাধ্য হয়েই প্লেনে যেতে বাজী হয়েছিলেন। তাঁব বন্ধুকে, গোগোলেব হাফ টিকেট নিয়ে, আড়াইটি টিকেটেব টাকা দিতে গিয়েছিলেন। নীলমাধববাবু তাতে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সমীবেশ, তোমার জন্য আমি টিকেট কেটেছি, তাব জন্য তুমি আমাকে টাকা দেবে? আর সে-টাকা আমি নেব, তুমি তা ভাবতে পারলে?'

বাবা তবুও তাঁর বন্ধুকে টাকাটা দেবাব চেষ্টা কবেছিলেন। নীলমাধব-বাবু টাকা নেন নি। অবশ্য নীলমাধববাবু খুবই বড়লোক, আব বাবাব ছেলেবেলারই বন্ধু। গোগোলকে বলা হয়েছিল, ও যেন নীলমাধব বন্দ্যো-পাধ্যায়কে ব্যানার্জি কাকা বলে ডাকে।

গোগোল তাবপরে শুনেছিল, নীলমাধব কাকা বিয়ে কবেছিলেন। কিন্তু কাকিমা বেশী দিন বাঁচেন নি। তিনি আব বিয়ে কবেন নি। তাঁব কোনো ছেলেমেয়েও ছিল না। অথচ লোকজন নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। গোগোলের সঙ্গে পবিচয় হয়ে যাবার পবেই, দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল।

ব্যানার্জি কাকার সব ব্যবস্থাই করা ছিল। দমদম থেকে, বাগডোগবায় প্লেনে যেতে সময় লেগেছিল মাত্র চল্লিশ মিনিট। বাগডোগরায় ব্যানার্জি কাকা খবর দিয়ে, আগেই একটি গাড়ি রেখে দিয়েছিলেন। তখন বেলা দশটায় দমদম থেকে বাগডোগরার প্লেন উড়তো। বেলা একটাতেই

গোগোলরা দার্জিলিং পৌঁছে গেছল। ট্রেনে করে যাবার মধ্যে দু রকমের আনন্দ আছে। দিনের বেলা গেলে, মাঠ ঘাট গ্রাম নদী, অনেক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। আর রাত্রের গাড়িতে গেলে, আরও একটা মজা আছে। গোগোলের ট্রেনে ঘুম এলেও, বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারে না। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। আর জেগে উঠে, হঠাৎ মনে করতে পারে না, ও কোথায় আছে। তারপর ট্রেনের শব্দে আর ঝাঁকুনিতে টের পায় ও চলেছে রাত্রের রেলগাড়িতে। টের পেয়েই, আবার শুয়ে পড়ে। আবার ঘুম ভেঙে যায়। যেন একটা স্বপ্নের খেলার মধ্য দিয়ে, ভোরের আলোয়, হঠাৎ এক নতুন দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ট্রেনে যাবার সেই ভালো লাগা একরকম। প্লেনে যাবার মজা আর একরকম। সেবারই অবশ্য গোগোলের প্রথম প্লেনে ওড়া ছিল না। আগেও প্লেনে উড়েছে। পরেও বেশ কয়েকবার উড়েছে। প্লেনে জানালার ধারে বসে যেতে পারলে, নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। তার মধ্যেও একটা মজা আর উত্তেজনা আছে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে, নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। যেমন নদী, জঙ্গল, চাষের মাঠ, রেল লাইন, রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলা ট্রেন, রাস্তা, রাস্তার ওপর দিয়ে ছোটা মোটর গাড়ি, সবই খুব ছোট আকারে দেখা যায়। গ্রামের পরে, হঠাৎ কোনো শহর বা কারখানা এলেও চোখে পড়ে। আবার প্লেন যখন কাৎ হয়ে যায়, তখন মনে হয়, এক দিকের নীচের ভূমি একদম আবছা হয়ে গেছে। উল্টো দিকের জানালায় চোখ পড়লে, নীচের আর এক দৃশ্য। বড় নদীগুলোকে দেখায় যেন বিরাট আঁকাবাঁকা অজগরের মতো। সেই অজগরের বুকে, খুব ছোট পুতুলের মতো নৌকোও ভাসতে দেখা যায়। কোনো কোনো জায়গায় নদী এত চওড়া বহুদূর পর্যন্ত তার বালির চড়া দেখা যায়। আর ছোট নদী-গুলো ছোট সাপের মতো দেখায়। সেবার ব্যানার্জি কাকার সঙ্গে অক্টোবর মাসের একেবারে শেষ দিকে যাওয়া হয়েছিল। আকাশ এত পরিষ্কার ছিল, বাগডোগরায় নামার আগেই, বরফ ঢাকা কাঞ্চনজংঘা পরিষ্কার দেখা গেছল। প্লেনে যাবার মজাটা হলো, অনেকটা পথ আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। দার্জিলিং মেলে যেতে হলে, সন্ধ্যা রাত্রি থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছতেই সকাল হয়ে যায়। তারপরে গাড়িতে দার্জিলিং পৌঁছানো। অবশ্য, দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনে গোগোল চেপেছে। জীপ বা মোটর গাড়িতে যাওয়ার চেয়ে, ওতেই আনন্দ বেশী, তবে টয় ট্রেনে যেতে সময় বেশী লেগে যায়।

দুবছর আগে ব্যানার্জি কাকার সঙ্গে, কলকাতার বাড়ি থেকে, সকাল সাড়ে আটটায় গাড়িতে বেরিয়ে, প্লেনে উড়ে, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং পৌঁছেছিল বেলা একটায়। ম্যালের বাঁ পাশ দিয়ে একটা রাস্তা নীচের দিকে নেমে, বাঁ দিকে ঘুরে হাসপাতালের দিকে গেছে। হাসপাতালের সামনে থেকেই, একটা প্রায় কুড়ি গজ চওড়া রাস্তা সোজা ব্যানার্জি কাকার বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে গেছল। গেটটা খোলাই ছিল। আর একজন নেপালী মহিলা দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়িটা সোজা শান-বাঁধানো চত্বরে ঢুকে গেছল। ব্যানার্জি কাকা গাড়ির সামনের আসনে বসেছিলেন। দরজা খুলে নামতেই, নেপালী মহিলা কপালে দুহাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে কী যেন বললেন। গোগোলদের জানালার কাঁচ তোলা ছিল। ও তাড়াতাড়ি কাঁচ নামিয়ে দিয়েছিল। ব্যানার্জি কাকাও কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে, সে-ভাষায় নেপালী মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। গোগোল তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারে নি। বাবা বলেছিলেন, ব্যানার্জি কাকা নাকি নেপালী ভাষাতেই মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমেছিল। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে, পাহাড়ের নীচে তখনও গরম ছিল। কিন্তু মা আগে থেকেই সকলের জন্য গরম জামা আর শাল বের করে রেখেছিলেন। গাড়ির কাঁচ বন্ধ থাকলেও কার্সিয়াং আসার আগেই, গোগোল একটা ফুল হাতা সোয়েটার গায়ে দিয়েছিল। দার্জিলিং'য়ে পৌঁছে ওর আর তেমন শীত করে নি। রোদ ছিল বেশ ঝকঝকে। আকাশ ছিল নীল।

ব্যানার্জি কাকার বাড়িতে ঢোকার সামনে, বাঁধানো চত্বরটা বেশ বড়। সামনেই কাঁচের মস্ত বড় দরজায়, অনেকটা আয়নার মতোই গোগোলরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছিল। ওটাই ছিল বাড়ির ভেতরে ঢোকবার দরজা। ঢোকবার দরজার পাশেই ছিল আর একটা ঘর। কাঠের দেয়ালের সেই ঘরটার দরজা ছিল খোলা। ভেতরে দেখা যাচ্ছিল, একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। কিন্তু লোকজন কেউ ছিল না। একটা জানালার কাঁচের পাল্লা ছিল বন্ধ। বাঁধানো চত্বরের সামনে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল। রেলিংয়ের ওপারে কোনো ঘর বা চালের মাথা উঁচিয়ে ছিল না। চত্বরে দাঁড়িয়ে, নীচে বেশ কিছু ছবির মতো দেখতে সুন্দর বাড়ির ওপারে, বড় আর চওড়া কার্ট রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করতে দেখা যাচ্ছিল। তার ওপরেও নানা গাছপালা বাড়ি ঘরের পাশ দিয়ে, ছোট রাস্তায় দু চারটি ছোট গাড়ি চলছিল। আর মাথার ওপরের নীল আকাশ। ব্যানার্জি কাকার বাড়িটার

পেছনে পাহাড়ের ধাপে ধাপে, কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আর সেই সব বাড়ির পাশ দিয়ে, ছোট সরু রাস্তা উঠে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল ব্যানার্জি কাকার বাড়িটা যেন ঘিঞ্জির মধ্যে। কিন্তু চত্বরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের দিকে তাকালেই কার্ট রোড, গাড়ি-ঘোড়া বাজারের কিছু অংশ লোকজনের যাতায়াত সব সময়েই দেখা যেত। তাছাড়া রাস্তার ওপরের পাহাড়ে গাছপালা বাড়িঘর ছোট রাস্তায় গাড়ি চলা আর আকাশ একেবারে অবারিত। তবে হ্যাঁ, ওদিকটায় কাঞ্চনজংঘা দেখতে পাবার কোনো আশা ছিল না।

বাড়ির ভেতর চত্বরে গাড়ি ঢুকতেই, নেপালী মহিলা গেটটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্যানার্জি কাকা গোগোল আর বাবা মায়ের সঙ্গে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মহিলার বয়স মায়ের থেকে কিছু বেশী। তাঁর ফর্সা রঙ মুখে বেশ কিছু রেখা পড়েছিল। তাঁর ছোট চোখ দুটি ছিল কালো। আর মুখের হাসিটি ভারি ভদ্র আর সুন্দর। তিনি মায়ের মতোই শাড়ি পরেছিলেন। আর একটা নীল রঙের ফুল হাতা সোয়েটার ছিল তাঁর গায়ে। তিনি বাবা মাকে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করেছিলেন। বাবা মাও তাঁকে নমস্কার জানিয়েছিলেন। তিনি বাংলায় বলেছিলেন, 'আসুন মিঃ চ্যাটার্জি, মিসেস চ্যাটার্জি, বাড়ির ভেতরে আসুন।

মহিলার বাংলা কথা শুনে বাবা মা খুব অবাক হয়েছিলেন। গোগোলও কম অবাক হয় নি। তবে তাঁর বাংলা বলার মধ্যে, উচ্চারণটা ছিল একটু অন্যরকম। ব্যানার্জি কাকা আবার নেপালী ভাষায় মহিলাকে কিছু বলেছিলেন। মহিলা পাশের কাঠের ছোট ঘরের দিকে একবার দেখে কী যেন জবাব দিয়েছিলেন। ব্যানার্জি কাকা তারপর মহিলাকে দেখিয়ে বাবা মাকে বলেছিলেন, 'এই মহিলাকে আমি ময়লি দিদি বলে ডাকি। ময়লি মানে মেজো। তার মানে মেজদিদি। তোমরাও ওকে মেজদিদি বলেই ডাকতে পার। মেজদিদি মেয়ে হলে কী হবে? তিনি একজন জবরদস্ত মহিলা। আর খুবই বুদ্ধি রাখেন। ওঁর স্বামী ছিলেন মিলিটারিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মার কাছে, জাপানীদের হাতে তিনি অনেকদিন বন্দী থাকেন। যুদ্ধের শেষে যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর শরীর খুবই ভেঙে পড়েছিল। তখন তাঁরা ম্যালের যেদিকে লেবং, সেদিকে নীচের একটা বাড়িতে থাকতেন। আমার বাবা তাঁদের এ বাড়িতে নিয়ে আসেন। আর এ বাড়িতেই ময়লি দিদির স্বামী মারা যান। জাপানীদের হাতে বন্দী হবার আগে, তিনি হাবিলদার পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন। বন্দী না হলে, বা অসুস্থ না হয়ে পড়লে, তিনি হয়তো ক্যাপটেন বা মেজর হতেন। কিন্তু

শেষ জীবন পর্যন্ত অসুস্থ সৈনিক হিসেবে, তিনি কেবল পেনশনই পেতেন।'

ব্যানার্জি কাকা প্রথমে লক্ষ্য করেন নি, তাঁর কথা শুনতে শুনতে ময়লি দিদির মুখটি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। আর ওর চোখ দুটি উঠছিল ছলছলিয়ে। গোগোলের মা সেটা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, 'ব্যানার্জি ঠাকুরপো, এসব কথা আমরা পরে শুনবো। এখন থাক।'

ব্যানার্জি কাকা তখনই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। আর লজ্জা পেয়ে, দুঃখের সঙ্গে ময়লি দিদিকে নেপালী ভাষায় কিছু বলেছিলেন। ময়লি দিদি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে হেসে নেপালী ভাষায় কিছু বলে, গোগোলকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মাস্টার চ্যাটার্জিকে আমি একটা কথাও বলি নি। তোমার জরুর খুব ভুগ লেগেছে। চলো, ভেতরে চলো। খাবার সব তৈরী আছে। কেবল গরম জলে সাবান দিয়ে হাত ধোবে, আর ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে যাবে।'

'এই হলেন আমাদের ময়লি দিদি!' ব্যানার্জি কাকা হেসে বাংলায় বলেছিলেন, 'ময়লি দিদির দুটি মেয়ে আছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার নাম দুর্গা। আর ছোট মেয়ের নাম মায়া। তার এখনো বিয়ে হয় নি। তবে হতে আর বেশীদিন দেরীও নেই। দুর্গা আর মায়াও ময়লি দিদির সঙ্গে থাকে। দুর্গার বর প্রতাপ বাহাদুর বাজারের এক শেঠ মারোয়াড়ির দোকানে চাকরি করে। দুর্গার একটি ছেলে আছে। মায়া গত বছর ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। ময়লি দিদিই আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকার। তিনিই সব দেখাশোনা করেন। ময়লি দিদি না থাকলে, আমাদের আর দার্জিলিং আসা হত না।'

ময়লি দিদি বাংলা কথা সবই বুঝতে পারছিলেন। লজ্জা পেয়ে হেসে বাংলায় বলেছিলেন, 'ব্যানার্জি ভাইয়া যাই বলুক, তিনি আমাকে প্রতি মাসে যা টাকা পাঠান, তাতেই আমি সব করতে পারি। আমার সংসার আর মেয়েদের সব তিনিই দেখাশোনা করেন। চলুন, ভেতরে চলুন। আপনারা নীচে থেকে ওপরে এসেছেন। বাইরের রোদটা ভালো লাগলেও, বেশী ঠাণ্ডা এখন লাগাবেন না। আপনাদের গরম জল রাখা আছে। আমি বলব, আজ আপনারা চান করবেন না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। বেলাও হয়েছে। এখন দুপুরের খাবার সময়। আপনারা সবাই সকালবেলা কলকাতা থেকে কতোটুকু আর খেয়ে এসেছেন?'

গোগোল বলে উঠল, 'আমরা গাড়িতে আসতে আসতে কমলালেবু, বিস্কুট, চকোলেট আর গরম দুধ খেয়েছি।'

ব্যানার্জি কাকা কাঁচের দরজার কাছে গিয়ে, দু ধাপ সিঁড়ির ওপর উঠেছিলেন। কাঁচের বড় দরজাটা খুলে ধরে বলেছিলেন, 'সবাই ভেতরে চলে এস।'

গোগোল তখন মাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'মা, ময়লি দিদিকে আমি কী বলে ডাকব?'

'তুমি আমাকে ময়লি আন্টি বলে ডাকবে গোগোল।' ময়লি দিদি নিজেই হেসে বলেছিলেন, আর গোগোলের গাল টিপে দিয়ে আদর করে বলেছিলেন, 'তুমি খুব মিষ্টি ছেলে। দিদিরা তোমাকে পেলে খুব আদর করবে।'

বাবা আর মা যখন কাঁচের দবজার ভেতরে ঢুকেছিলেন, গোগোলের চোখে পড়লো, খুবই জরাজীর্ণ খাকি রঙের মিলিটারি পোশাক পরা, রোগা আর লম্বা একজন দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় একটা নেপালী কালো টুপি। চোখের কোল বসা লোকটির চোখ দুটো যেন বড় বেশী জ্বলজ্বল করছিল। নাকের নীচে, দুদিকে ঝুলে পড়া এক জোড়া গোঁফ। জবাজীর্ণ মিলিটারি পোশাকের মধ্যে খাকি রঙেরই ছেঁড়া খোঁড়া একটা ফুল হাতা উলের সোয়েটার পরা। হাতার বাইরে হাত দুটো ময়লা আর শীর্ণ। তার মুখেও যেন নানা রকমের হিজিবিজি দাগ। কিন্তু তার চোখ দুটো ভীষণ জ্বলজ্বল করছিল। গোগোলের দিকে একবার তাকাতেই ও চোখ সরিয়ে নিল। ওর চোখে চোখ রাখা যায় না।

ব্যানার্জি কাকার ঠিক উল্টো দিকে, সিঁড়ির ওপরে, দরজার এক পাশে লোকটি দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল ব্যানার্জি কাকাকে। কিন্তু ব্যানার্জি কাকা যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না। অথবা ইচ্ছে করেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দেখছিলেন। তিনি না হয় দেখছিলেন না। বাবা মাও কি লোকটিকে দেখতে পেলেন না? আশ্চর্য! জলজ্যান্ত একটা লোক দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা মাকে জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে। অথচ বাবা মা একবার লোকটিব দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন না। দরজার ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপরে ময়লি আন্টি গোগোলের হাত ধরে, সিঁড়ির ধাপে উঠলেন। লোকটির সঙ্গে গোগোলের চোখাচোখি হলো। আর আশ্চর্য! সেই জ্বলজ্বলে চোখের চাউনিটা কেমন নরম হয়ে গেল। ঝুলে পড়া গোঁফের দু পাশে একটু হাসি ফুটল। অথচ ময়লি আন্টি সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। গোগোলকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। তারপরেই ভেতরে ঘুরে এলেন ব্যানার্জি কাকা। কাঁচের বড় পাল্লা দরজাটা

বন্ধ করে, ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। গোগোল পেছন ফিরে দেখল, দরজার বাইরে, তখনও লোকটি দাঁড়িয়ে, কাঁচের দরজা দিয়ে, ভেতরের দিকে দেখছে।

পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে, কাঠের মেঝের ওপর পাতা কার্পেটে গোগোল জুতো পায়ে হোঁচট খেল। ময়লি আন্টি বললেন, 'আহা লাগে নাই তো? কার্পেটের এ জায়গাটা একটু উঁচু হয়ে আছে।'

গোগোল তখনও পেছন ফিরে তাকিয়ে লোকটিকে দেখছিল। সেও গোগোলকেই দেখছিল। ময়লি আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বাইরে কী দেখছ? কিছু ফেলে এসেছ?'

'না!' গোগোল মাথা নেড়ে দবজার বাইরে চোখের ইশারায় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে দরজার বাইরে এক পাশে ও লোকটি কে দাঁড়িয়ে আছে?'

ময়লি আন্টির অবাক চোখে যেন হঠাৎ একটা ঝিলিক খেলে গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। বললেন, 'কই, ওখানে কেউ নেই তো! তুমি কাকে দেখতে পেলে?'

'খুব পুরনো খাকি রঙের ছেঁড়া মিলিটারি পোশাক পরা একটি লোক তো এখনো দরজাব এক পাশে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে।' গোগোল বলল, 'মাথায় কালো নেপালী টুপি, পায়ের জুতো ময়লা ছেঁড়া। হাত দুটোও ময়লা আর রোগা। মুখে এক জোড়া গোঁফ। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু একটু হাসছে। আপনারা কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছেন না?'

ময়লি আন্টি যেন কেবল অবাক হলেন না। হঠাৎ খুব বেগে উঠে, চোখ পাকিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। গোগোল আরও অবাক হয়ে দেখল, লোকটি মুখ ফিরিয়ে, আস্তে আস্তে সিঁড়ি থেকে নেমে, চত্বরের ওপব দিয়ে হেঁটে, বাঁ দিকে রেলিংয়ের ওপাশের আড়ালে চলে গেল। ময়লি আন্টি কিন্তু বললেন, 'না তো গোগোল, কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে নেই। আমরা কেউ দেখতে পাই নি। নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে তুমি বোধ হয় ভুল দেখেছ। চল, ভেতরে চল।'

গোগোল কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু ভুল যে ও দেখে নি, সে বিষয়ে ওর নিজের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। ও দেখল, বাবা মা ব্যানার্জি কাকা সেখানে নেই। কার্পেটের তিন দিকে সোফা সেট। মাঝখানে একটা গোল সেণ্টার টেবিল। সামনেই একটা কাঠের পার্টিশন। ডান দিকের কাঠের দেয়ালে রয়েছে কাঁচের পাল্লা বন্ধ একটা বড়

জানালা। সামনে পার্টিশনের এক পাশে একটি কাঁচের পাল্লার দরজা। সেই দরজা দিয়ে ভেতরে একটা বড় ঘর দেখা যাচ্ছে। ময়লি আন্টি গোগোলের হাত ধরে, সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। কাঠের মেঝের খানিকটা অংশ খোলা। বাকী সবই কার্পেট পাতা। সেখানে মস্ত বড় ডাইনিং টেবিল। টেবিলের ওপর সাদা ধবধবে কাপড় পাতা। ছুটো ছোট ফুলদানিতে ফুল। ছুটো বড় পেতলের মোমদানিতে, ছু' ইঞ্চি ডায়মেটারের মোটা গোলাপী রঙের বড় মোমবাতি রয়েছে। এখন জ্বলছে না। কোনো আলোও জ্বলছে না। ডান দিকেই, কাঠের দেয়ালে, বড় বড় ছুটো কাঁচের পাল্লার জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতেই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডাইনিং টেবিলের ওপর, চারটি প্লেটের ওপর, একটি করে চাইনিজ স্যুপের বউল রয়েছে। পাশেই রয়েছে চীনামাটির স্যুপ খাবার চামচ। প্রত্যেক প্লেটের বাঁ দিকে একটি করে ছোট প্লেট। তার প্রত্যেকটার পাশে, ছোট বড় ছুটো স্টিলের চামচ, কাঁটা চামচ, আর ছুরি ঝকঝক করছে। কাঁচের গেলাসে সাদা কাপড়ের ন্যাপকিন, ত্রিভুজ করে দাঁড় করানো রয়েছে। গোগোলের মনে হল, কলকাতার নাম-করা বড় হোটেলে যে-রকম খাবার টেবিল সাজানো থাকে, এই ডাইনিং টেবিলও সেইরকম করে সাজানো রয়েছে। কিন্তু—

ময়লি আন্টি টেবিল পেরিয়ে, গোগোলের হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেলন। গোগোল আবার পেছন ফিরে একবার দেখল। না, এবার এ ঘরের কাঁচের দরজা দিয়ে পাশের ঘরের কাঁচের দরজার সিঁড়ির কাছে কারোকে দেখতে পেল না। ময়লি আন্টি টেবিলটা পেরিয়ে কয়েক গজ গিয়ে, বাঁ দিকের একটি দরজার সামনে দাঁড়ালেন। কাঁচের দরজার ভেতরে, পর্দা টাঙানো। ভেতরটা দেখা যায় না। ময়লি আন্টি দরজার পাল্লা ঠেলে খুলে দিলেন। গোগোলের চোখের সামনে ভেসে উঠল, মস্ত একটা সুন্দর সাজানো ঘর। ঘরে প্রচুর আলো। ময়লি আন্টি গোগোলকে নিয়ে, এক ধাপ কাঠের সিঁড়ি উঠে, সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। গোগোল দেখল, সামনেই একটা বিরাট ঝকঝকে খাটের ওপর সুন্দর বিছানা। মা সেই বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছেন। বাবা একপাশের কাঠের দেয়ালের দিকে, লম্বা ড্রেসিং টেবিলের সামনে, ছুটো বড় বড় সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার সামনে চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছে। কিন্তু ঘরে এত আলো এল কোথা থেকে? বাইরের দিকে কোনো কাঁচের দেয়াল বা জানালা কিছুই নেই। তারপরেই ওর চোখ পড়ল, ঘরের মাথার দিকে। কাঠের ছাদের ঠিক

মাঝখানে স্কাই লাইট। যেন রোদের আলো সেই স্কাই লাইটের কাঁচে পড়ে, গোটা ঘরটা আলোয় ভরে দিয়েছে।

ঘরটা অনেক বড় বলেই, আর একটা খাটও ছিল পেছন দিকে। সেই খাটেও রয়েছে পরিষ্কার বেডশীট ঢাকা দেওয়া বিছানা। দুটো খাটের মাঝখানে রয়েছে একটি গোল পাথরের টেবিল। টেবিল ঘিরে চারটি খুব সুন্দর চেয়ার। চেয়ারগুলোর আকৃতি, বেগুনি রঙের গদি, সব মিলিয়ে খুবই রাজকীয়। বাবা যেদিকে বসেছিলেন, সেদিকে কাঠের দেয়ালের সঙ্গে লম্বা ড্রেসিং টেবিল জোড়া, অনেকটা তাকের মতো। তার ওপর পাতা আছে লিনেনের সাদা কাপড়। সেখানে রয়েছে, যতো রাজ্যের নাম-করা দেশী বিদেশী কোল্ড ক্রিম, পাউডার, অডিকলনের দারুণ সুন্দর দেখতে নানা আকারের শিশি বোতল। আর ওদিকের কাঠের দেয়ালে, কুঁচিয়ে সেলাই করা লিনেনের পর্দা টাঙানো। ঘরের বাকী দেওয়াল ঝকঝকে পালিশ করা। কাঠের মেঝের ওপর সুন্দব কাজ কবা পশমের কার্পেট। কাঠের দেয়ালের দু দিকে দুটো তেল রঙের ছবি। কোট-টাই পরা, গোঁফওয়ালা, চোখে চশমা ফরসা এক ভদ্রলোক। আর একটা ছবি এক মহিলার। মাথায় সামান্য ঘোমটা টানা, কাঁধের কাছে জড়োয়াব ব্রোচ আটকানো। দেখতে তিনি সুন্দরী। অনেকটা আগের কালের বড়লোক মহিলাদের মতো তাঁর সাজগোজ। ডান দিকের কাঠের দেয়ালে, একটি খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরে স্কাই লাইটের দিনের আলো নেই। আলো জ্বলছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ময়লি আন্টি গোগোলকে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেন, ঘরের একটা শেষ দিকে। সেখানে দু ধাপ সিঁড়ির ওপর একটি বন্ধ দবজা ছিল। ময়লি আন্টি দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। তিনি দু ধাপ সিঁড়ি উঠে, ভেতরেই অন্ধকারে গেলেন। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ডাকলেন, 'মাস্টার গোগোল, অন্দরে এস।'

গোগোল ভেতরে ঢুকল। দেখেই বোঝা গেল, বাথরুম। বাথরুমের মেঝে শান বাঁধানো। গিজারের লাল আলোটা জ্বলছে। একদিকে রয়েছে মস্ত বড় বাথটাব। ঠাণ্ডা গরম জলের লাইন আর শাওয়ার। বাথরুমের পাশেই রয়েছে আর একটা ঘর। খোলা দরজা দিয়ে, ভেতরে চোখে পড়ে কমোড। পাশের ঘরটার দেয়ালে রয়েছে একটা জানালা, যার কাঁচের পাল্লা বন্ধ। ময়লি আন্টি বেসিনের দুদিকের কলের মুখের একটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা খুললে, গরম জল পাবে। এই রয়েছে সাবান। আর ঐখানে রয়েছে তোয়ালে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি বাবা মাকে তাড়া দিচ্ছি।

গরম গরম খাবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম কর।'

ময়লি আন্টি বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোগোল গরম জলের কল খুলে, সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল। কিন্তু সেই ঝরঝরে মিলিটারি পোশাক পরা, মাথায় নেপালী টুপি লম্বা রোগা গোঁফওয়ালা মূর্তিটার কথা ভুলতে পারছে না। তোয়ালে দিয়ে, হাত মুখ মুছতে মুছতে ভাবল, কেবল ময়লি আন্টিই যে লোকটিকে দেখতে পান নি, তা নয়। বাবা মা ব্যানার্জি কাকা, কেউই তাঁকে দেখতে পান নি। অথচ লোকটি যে দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, গোগোলের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

ও বাথরুম থেকে বেরোবার আগেই, মা এলেন। বললেন, 'তোমার হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।' বলে গোগোল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

মা পেছন থেকে বললেন, 'গোগোল, খুব সাবধান। শীত বেশ ভালোই আছে। ঠাণ্ডা লাগিও না যেন।'

'আচ্ছা।' গোগোল বলল।

মা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবা তখনও চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। বাঁ দিকের খোলা দরজা দিয়ে ব্যানার্জি কাকা বেরিয়ে এলেন। কলকাতা থেকে তিনি এসেছিলেন স্যুটেড বুটেড হয়ে। এখন দেখা গেল, পাজামা পাঞ্জাবির ওপরে মোটা একটা শাল চাপিয়েছেন। পায়ে মোজা আর স্যাণ্ডেল। গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে? বেশ, ভালো। এবার খেতে যাবার আগে, পাশের ঘরটাও দেখে এস। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে, তারপরে দোতলাটা দেখবে।'

গোগোল পাশের ঘরে ঢুকল। এ ঘরটাও বেশ বড়। খাট রয়েছে একটাই। কাঠের চকচকে দেয়াল। এ ঘরেও রয়েছে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা গদী-আঁটা সুন্দর রাজকীয় চেয়ার। একদিকে ড্রেসিং টেবিল আর কাঠের দেয়াল জুড়ে বড় আয়না। টেবিলের ওপর প্রসাধন সামগ্রী। পেছন দিকের বন্ধ দরজাটা দেখে মনে হল, ওটা এ ঘরের বাথরুম। তবে দুদিকের দেওয়ালের ঢাকা পর্দার ফাঁকে কাঁচের অংশ চোখে পড়ল। গোগোল এগিয়ে গিয়ে, একদিকের দেয়ালের পর্দা সরাতেই, বড় কাঁচের বন্ধ জানালা দেখা গেল। জানালার বাইরে, বাঁ দিকে, কাঠের একটা আলাদা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা কাঠের ছোট একফালি বারান্দা। কোনো রেলিং নেই। বারান্দার নীচে ছোট একটুখানি খোলা জায়গা। শান বাঁধানো, পরিষ্কার। সেই খোলা জায়গার একধারে রেলিং, যেখান দিয়ে

নীচের রাস্তা, গাড়িঘোড়া, ওপারের পাহাড় আর ছবির মতো বাড়িগুলো দেখা যায়।

কাঠের একফালি সরু বারান্দায় শাড়ি পরা একজন মহিলা। বয়স তার অনেক কম। গায়ে কোনো গরম জামা আছে বলে মনে হল না। বেণী ঝুলছে পিঠে। কোলে একটি বছর খানেক বয়সের ছেলে। তার গায়ে পুরো হাতা আর গলা ঢাকা উলের সোয়েটার, মাথায়ও উলেব বোনা টুপি। গাল দুটো টুকটুকে লাল। পুতুলের মতো দেখতে। আর একজন, তাব বয়স আরও কম, লম্বা ফ্রকের মতো পোশাক গায়ে। কিন্তু গায়ে কোনো গরম জামা দেখা যাচ্ছে না। এর মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, আর খোলা। বয়স সতর আঠারর বেশী হবে না। গোগোলের মনে হল, এবাই বোধহয় ময়লি আন্টির দুই মেয়ে, দুর্গা আর মায়া। দুজনের কেউ গোগোলের দিকে দেখছে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

গোগোল পর্দা টেনে দিয়ে, ঘরের আর একপাশে গেল। সেদিককার পর্দা খুলতেই, বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে বাইবে বাগান দেখা গেল। বেশ কিছু গোলাপ গাছ রয়েছে, কিন্তু ফুল নেই। চন্দ্রমল্লিকার টব রয়েছে বেশ কয়েকটা। ক্যাকটাসও রয়েছে নানা রকম। তা ছাড়া আছে সবজি বাগান। সবজি বাগানে ফুল আর বাঁধাকপি, টমাটো, আর ধনে পাতা রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, বাগানটির নিয়মিত যত্ন করা হয়।

গোগোল পর্দাটা ফেলে সরে আসবার মুহূর্তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সেই জরাজীর্ণ মিলিটারি পোশাক পরা, নেপালী টুপি মাথায়, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, ময়লা শীর্ণ হাত, আর গোঁফওয়ালা বোগা লম্বা লোকটি, ডান দিকের কাঠের বাড়িব আড়াল থেকে বেবিয়ে এল। ডান দিকের কাঠের বাড়িটায় ময়লি আন্টি থাকেন। গোগোল একটু আগেই, বাড়িটার অন্যদিকের বারান্দায় ময়লি আন্টির বাড়ির ভেতর থেকেই দেখেছে। এ লোকটা কি ময়লি আন্টিব বাড়ির ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল ?

গোগোল ভাবতেই, লোকটা বাগানের দিকে নেমে, গোগোলের দিকে তাকাল। সে যে বাইরে থেকে, কাঁচের মধ্যে গোগোলকে দেখতে পাচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, গোগোল পর্দা ফেলে সরে আসবে ভেবেও, সরে আসতে পারল না। লোকটা যেন ওকে দেখা দেবার জন্যই কাঠের বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। গোগোলের চোখে চোখ রেখে সে অপলক তাকিয়ে আছে। কিন্তু এখন তার চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে না।

অবশ্য তার চোখ দুটো বড় বেশী সাদা। এখন সে গোগোলের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। আর যেন সামান্য ঘাড় নাড়িয়ে, কিছু একটা ইশারা করছে। তার ঝুলে পড়া গোঁফ জোড়া নড়ে উঠল কি না, বোঝা গেল না। অথচ মনে হল, সে যেন ঠোঁট নেড়ে কিছু বলল।

বাগানের সীমানার বাইরে, সাদা আর নীল রঙের একটা ছোট কাঠের বাড়ি। বাগানের পেছনে যেমন জমি ওপর দিকে উঠে গেছে, সাদা নীল বাড়িটার পেছন দিকেও তেমনি উঁচুতে জমি উঠেছে। সেখানে রয়েছে কয়েকটা পাইন আর নানা রকমের ছোট ছোট গাছপালা। যার মাঝখান দিয়ে, সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা ওপরে উঠেছে। সেই পথে দু একজন মহিলা-পুরুষকে ওঠা-নামা করতে দেখা যাচ্ছে।

গোগোল দেখল, সাদা নীল বাড়িটার সীমানার লতানে বেড়ার সামনে এসে দুটি নেপালী ছেলে দাঁড়াল। তারা এদিকের বাগানের দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে, হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলছে। গোগোলের থেকে দুজনেই বয়সে একটু ছোট হবে। মিলিটারি পোশাক পরা লোকটি একবার মুখ ফিরিয়ে ছেলে দুটির দিকে দেখল। তাদের মধ্যে দূরত্ব ছ' সাত গজের বেশী নয়। অথচ ছেলে দুটি যে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে, তা মোটেই মনে হচ্ছে না। ওরা বাগানের দিকে মুখ করে কথা বলছে, হাসছে। অথচ একবারও লোকটার দিকে ফিরে দেখছে না। অবশ্য ওরা এই জানালায়, পর্দার পাশে গোগোলকেও দেখছে না। নিজেদের কথা আর হাসিতেই ব্যস্ত।

'কী ব্যাপার গোগোল, তুমি এখনো জানালায় দাঁড়িয়ে কী দেখছ?' পেছনে মায়ের গলা শোনা গেল, 'ময়লি দিদি আমাদের গরম গরম খাবার বেড়ে দেবার জন্য তৈরী। তাড়াতাড়ি এস।'

গোগোল ডাকল, 'মা শোন, এখানে একটু এস।'

মা গোগোলের কাছে এগিয়ে গেলেন। গোগোল বন্ধ কাঁচের জানালা থেকে পর্দা আর একটু সরিয়ে বলল, 'তুমি বাইরে, বাগানে কী দেখতে পাচ্ছ বল তো?'

'কী আবার দেখব?' মা অবাক হয়ে বললেন, 'ফুলগাছ, ক্যাকটাস, কপি, টমাটো, এই সব?'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি বই কি।' মা বললেন, 'ওপাশের বাড়ির বেড়ার ধারে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, কেন বল তো?'

গোগোলের চোখ তখন সেই লোকটির দিকে। লোকটিও গোগোলের দিকেই তাকিয়ে ছিল। গোগোল তবু মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ছেলে দুটো ছাড়া, আর কারুকে দেখতে পাচ্ছ না?'

'না তো?' মা অবাক হয়ে বললেন, 'আবার কাকে দেখব? ওখানে তো আর কেউ নেই। তুমি দেখতে পাচ্ছ নাকি?'

গোগোল থতমত খেয়ে গেল। ও মাকে সত্যি কথাটা বলতে পারল না। কারণ, জানে মা বিশ্বাস তো করবেনই না। আর সমস্ত ব্যাপারটাকে আজেবাজে আজগুবি কিছু ভেবে, গোগোলকে একা আশেপাশে কোথাও একটু বেরোতেও দেবেন না। ও উড়িয়ে দেবার মতো করে বলল, 'না, দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছিল, একটা অন্য লোককে যেন হঠাৎ দেখলাম।'

'ভুল দেখেছ।' মা বললেন, 'ওই সব গাছপালার মধ্যে, লোকজন মাঝে মাঝে পাহাড়ের পথে ওঠা-নামা করছে। তাদেরই দেখেছ। আর কাকেই বা দেখতে পাবে। এখন তাড়াতাড়ি খেতে চল।'

গোগোলের চোখে চোখ রেখে, লোকটা তখনও একইভাবে দাঁড়িয়েছিল। সে যেন ঘরের ভেতরে মায়ের কথা শুনতে পেল, আর ঘাড় ঝাঁকিয়ে, গোগোলকে চলে যেতে ইশারা করল। গোগোল তাতে আরও অবাক হল। মা আবার তাড়া লাগাবার আগেই ও পর্দাটা টেনে দিল। মায়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে আসতেই গোগোল চীনা খাবারের গন্ধ পেল। গন্ধ পেয়েই অনেকক্ষণের চাপা পড়া খিদেটা যেন চনমনিয়ে উঠল। বাবা আর ব্যানার্জি কাকা পাশের ঘরে ছিলেন না। গোগোল মায়ের সঙ্গে বাইরে গেল। বাবা আর ব্যানার্জি কাকা টেবিলের কাছে বসে পড়েছিলেন। ময়লি আন্টি একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ছোট মেয়ে মায়া। ময়লি আন্টি মায়াকে মা আর গোগোলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপরে এগিয়ে এলেন টেবিলের সামনে।

টেবিলের ওপরে তখন ঢাকা দেওয়া বেশ কয়েকটি চীনা মাটির পাত্র এসে গেছে। ময়লি আন্টি একটির ঢাকনা খুলতেই ধোঁয়া বেরোল। সেটাতে ছিল চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ। সয়াবিন সস্ আর চিলি সসের পাত্র সামনে রাখা ছিল। মায়া কাঁচের গেলাসগুলো থেকে ন্যাপকিন তুলে, গেলাসে গেলাসে জলের জাগ থেকে জল ঢেলে দিল। ময়লি আন্টি একটা স্যুপ তোলার বড় হাতায় করে, স্যুপের পাত্র ঘেঁটে, প্লেটের ওপরে উল্টে

ঢেলে দিলেন। গোগোল চটপট স্যুপের বউলে খানিকটা সয়াবিন সস্ ঢেলে দিল। মা বলে উঠলেন, 'গোগোল, তুমি চিলি সস্ খেও না।'

গোগোল জানত, মা ওকে চিলি সস্ খেতে বারণ করবেনই। ও একটু নুন আর গোলমরিচ মিশিয়ে নিল। ন্যাপকিনটা কোলের ওপর পেতে, চামচে করে স্যুপ মুখে দিয়ে, সামনের দিকে তাকাল। সেই হিলকার্ট রোডের লোকজন যানবাহনের ভিড়। ওপারের পাহাড়ের গাছপালা বাড়িঘর। ওদিকে কোথাও সেই লোকটি নেই।

স্যুপ খেতে খেতে গোগোল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তারপরে, ওর প্রিয় চিকেন ফ্রায়েড চীনা ভাত, টক মিষ্টি দিয়ে তৈরী কর্ন, নরম করে ভাজা হাড়বিহীন ভেড়ার চীনা রান্না মাংস, আর মিষ্টি, সবই ও বেশ পেট ভরে খেল। কিন্তু সেই লোকটাব চিন্তা ওর মাথা থেকে দূর হল না।

বাবা মা ব্যানার্জি কাকা, সবাই ময়লি আন্টির চীনা রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। ময়লি আন্টি মায়াকে দেখিয়ে বললেন, 'আমি একা করি নাই। মায়াও আমার সঙ্গে খাবার বানিয়েছে।'

মায়ার মুখ এমনিতেই অনেকটা লাল। সকলের প্রশংসা শুনে, আরও লাল হয়ে উঠল। খাওয়ার শেষে, ব্যানার্জি কাকা বললেন, 'দার্জিলিংয়ে দুপুরে ঘুমোলে আমার শরীর ম্যাজ্-ম্যাজ করে। তবে আজ আমরা সবাই একটু শুয়ে বিশ্রাম করব। বিকেলে চা খেয়ে, দোতলাটা তোমাদের সবাইকে দেখাব।'

ব্যানার্জি কাকা নেপালী ভাষায় ময়লি আন্টিকে কিছু বললেন। তারপরে গোগোল সামনের ঘরে, বড় খাটে বাবার কাছে শুয়ে পড়ল। খাওয়ার পরে শীতটা যেন বেড়ে গেল। মা অন্য খাটে শুলেন। ব্যানার্জি কাকা চলে গেলেন পাশের ঘরে। খানিকক্ষণ পরেই গোগোল টের পেল, বাবা মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওর মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। ওর চোখের সামনে ভাসছে সেই লোকটির চেহারা। কী আশ্চর্য! কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ গোগোল কেমন করে দেখছে? ও জীবনে এমন ঘটনা কখনও দেখে নি। একেই কি ভূত বলে? নাকি, সেই অদৃশ্য মানুষের গল্পই সত্যি। তাই যদি হবে, অদৃশ্য মানুষকে গোগোল একা দেখবে কেন? তাকে তো কেউ দেখতে পায় না। অথচ সে নানান কাণ্ড করে।

গোগোল ঘুমন্ত বাবাকে একবার দেখে, আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল। দরজা খুলে ঘরের বাইরে গেল। ডাইনিং টেবিল আবার ফিটফাট সাজানো হয়ে গেছে। সামনের বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের সেই দৃশ্য দেখা

যাচ্ছে। ও কাঁচের দরজা খুলে, পাশের বসবার ঘরে গেল। তাকাল বাইরের ঢোকবার বড় কাঁচের দরজার দিকে। সেখানে এখন কেউ নেই। চত্বরের একপাশে. রোদে মোটর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বসবার ঘরের কাঠের দেয়ালে, একটি খোলা দরজা চোখে পড়ল। দরজার ওপারে সেই মিলিটারি পোশাক পরা লোকটি দাঁড়িয়ে. গোগোলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। গোগোল শুধু চমকে উঠল না। ওর গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। এখন কাছে-পিঠে কেউ নেই। শুধু ও আর লোকটা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভেতরে একটা অন্ধকার ঘর। প্রথম ঢোকবার সময়, ওই দরজাটা খোলা ছিল না। ঘরটাও দেখা যায় নি।

গোগোল কী করবে, বুঝতে পারছে না। এর আগে দুবার লোকটিকে ঘরের বাইরে দেখেছে, এখন ঘরের ভেতরে! লোকটার সাদা অপলক চোখের কালো মণি দুটো স্থির। গোগোলের দিকে তাকিয়ে যেন গোঁফের ফাঁকে হাসছে। গোগোল সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

লোকটি কোনো জবাব দিল না। কিন্তু তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। তারপরে সে গোগোলকে অবাক করে দিয়ে, বাইরে যাবার কাঁচের দরজাটা না খুলেই, বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কাঠের মেঝের ওপর তার ছেড়া ক্যাম্বিসের জুতোর কোনো শব্দ হল না। কিন্তু দরজা না খুলে. কাঁচ ফুঁড়ে সে বেরিয়ে গেল কেমন করে? বাইরে গিয়েও লোকটি, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গোগোলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। আর মনে হল, যেন ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে গোগোলকে ইশারায় ডাকল।

গোগোল দু পা এগোতেই, পেছন থেকে ময়লি আন্টির গলা শোনা গেল, 'কোথায় যাচ্ছ মাস্টার গোগোল? তুমি শোওনি?'

গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'আমার ঘুম আসছিল না। তাই বেরিয়ে এসেছি।'

ময়লি আন্টি বললেন, 'আর একটু পরেই তোমার বাবা মা উঠে পড়বেন। আমি চা তৈয়ার করব। তারপরে তোমরা ম্যালে বেড়াতে যাবে। এখন তুমি ঘরেই যাও।'

'আচ্ছা ময়লি আন্টি, বাইরে দরজার ধারে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে. সে কে?' গোগোল জিজ্ঞেস করল।

ময়লি আন্টি বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে, ভুরু কুঁচকে দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'কই, দরজার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে নেই তো?'

'কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি।'

'কী রকম লোক দেখতে পাচ্ছ বল তো?'

'খুব পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া মিলিটারি পোশাক, খাকি রঙেরই ছিঁড়ে যাওয়া উলের সোয়েটার, মাথায় নেপালী টুপি, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো।'

ময়লি আন্টি যতই শুনছিলেন, তাঁর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠছিল। আর একটা আতঙ্ক ফুটে উঠছিল তাঁর দৃষ্টিতে। বাইরের কাঁচের দরজার দিকে তাকিয়ে, তিনি আবার গোগোলের দিকে তাকিয়ে, ওর একটা হাত ধরলেন। বললেন, 'ও কিছু নয়। তুমি ভুল দেখছ। চল, ঘরের ভেতরে চল।'

ময়লি আন্টি গোগোলকে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আরে, এ ঘরের দরজাটা আবার কে খুলল? এটা তো খোলা ছিল না।'

'ওই লোকটি একটু আগে এই দবজায় দাঁড়িয়েছিল।' গোগোল বলল, 'আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? কোনো জবাব দিল না।'

ময়লি আন্টি খোলা দরজাটা টেনে, বাইরে থেকে শিকল টেনে দিয়ে বললেন, 'তুমি যে-রকম লোকের কথা বললে, সেরকম কোনো লোক ঘরের অন্দরে ঢুকতেই পারে না। তুমি ভুল দেখেছ। এখন চল, ঘরে গিয়ে আধঘণ্টা শুয়ে থাক। আমি এবার চায়ের জল গরম করতে যাচ্ছি।'

ময়লি আন্টি গোগোলকে হাত ধরে, খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। গোগোল পেছন ফিরে দেখল, লোকটি তখনও বড় কাঁচের দরজার বাইরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তাকে যদি আর কেউ দেখতে না পায়, গোগোল কী করেই বা সবাইকে বিশ্বাস করাবে। আর লোকটা গোগোলকেই কেন শুধু দেখা দিচ্ছে? এর মধ্যেই বা কী রহস্য আছে?

গোগোল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। দেখল বাবা মা উঠে বসেছেন। ব্যানার্জি কাকাও এ ঘরে এসেছেন। গল্প করছেন তিনজনেই। গোগোলকে দেখে ব্যানার্জি কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেছলে গোগোল? ময়লি দিদির ঘরে নাকি?'

'না। খাবার ঘর থেকে বাইরের দিকে দেখছিলাম।' গোগোল বলল। লোকটার কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারল না। কারণ, কেউ বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু গোগোলই বা নিশ্চিন্ত থাকবে কেমন করে? ওর চোখের সামনে ময়লি আন্টির মুখটা ভেসে উঠল। লোকটির কথা শুনতে শুনতে, তাঁর চোখে মুখে কেমন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল। গোগোলের মনে হয়েছিল, উনি কিছু জানেন। অথচ ভুল বলে উড়িয়ে

দিয়েছিলেন। বহস্যটা কি অজানাই থেকে যাবে?

চা পর্বেব পবে, সবাই বাইবে যাবাব জন্য তৈবী হলেন। মা গোগোলকে সোয়েটারেব ওপব কোট পবে নিতে বললেন। বাইবে যাবাব আগে, খাবাব ঘবেব পাশেব বসবাব ঘবেব বন্ধ দবজাটা ব্যানার্জি কাকা খুললেন। ভেতবে গিয়ে আলো জ্বাললেন। বাবা মায়েব সঙ্গে গোগোল ঢুকল। দেখল, এ ঘবটা প্রায় ফাঁকা। সাজানো গোছানোও তেমন নেই। এ ঘবেবই বাঁ দিকে, দোতলায ওঠাব কাঠেব সিঁড়ি বয়েছে।

ময়লি আন্টি এ সময়ে এসে পড়লেন। ব্যানার্জি কাকা সবাইকে ডেকে, ওপবে নিয়ে গেলেন। ওপবটা আবও সুন্দব। সমস্ত কাঁচেব জানালায় ঢাকা দেওয়া মোটা পর্দাগুলো ময়লি আন্টি সবিযে দিলেন। বিকালেব উজ্জ্বল আলো তখনও ছিল। ওপব তলাব কাঠেব ঘব বাবান্দা সবই কার্পেট দিয়ে মোড়া। তিনটে পাশাপাশি ঘব সাজানো। কিন্তু মাঝেব ঘবেব পেছনেব দরজা খুলতেই দেখা গেল, সেখানে বয়েছে অর্ধগোলাকাব বাবান্দা। অনেকটা গাড়ি বাবান্দাব মতো। তাব সবটাই কাঁচেব জানালা। ময়লি আন্টি পর্দা সরিয়ে দিলেন। একটি গোল টেবিল ও খান কযেক চেয়াব সেখানে রয়েছে। এ বাবান্দা থেকে ম্যালেব কাছাকাছি ওপবেব দিক এবং আকাশ দেখা যায়।

ব্যানার্জি কাকা সব ঘুবিয়ে ঘুবিয়ে দেখালেন। মাঝখানেব ঘবেব বাইবে, বসবাব ঘবেব একটা আবামকেদাবা দেখিয়ে বললেন, 'আমাব ঠাকুর্দাব নেমন্তন্নে, ববীন্দ্রনাথ একদিন বিকেলে চা খেতে এসে এই আবামকেদাবাটায় বসেছিলেন। আব বলা হয, এ বাড়িতে বিবেকানন্দও এসে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁব স্মৃতি বাখা আছে পাশেব ঘবে।'

পাশেব ঘবে দেখা গেল, গুল বাঘেব ছালেব ওপবে ছোট গদিব বিছানা, বালিশ, আব পাশ বালিশ। ওখানে বিবেকানন্দ থাকতেন। সামনেব দবজা খোলা থাকত। তা ছাড়া, ব্যানার্জি কাকাব ঠাকুর্দাব আমলে, দার্জিলিংয়েব অনেক সাহেব-সুবোরাও আসতেন। ঠাকুর্দা, বাবা ছুটি পেলেই দার্জিলিংয়ে চলে আসতেন। ব্যানার্জিকাকাব বছবে একবাবও হয়তো আসা হয়ে ওঠে না। তবে তিনি বাবা ঠাকুর্দাব প্রিয় বাড়িটি সযত্নে রক্ষা কবছেন। তাব জন্য, ময়লি আন্টির কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ। কাবণ, কেবল টাকা দিয়েই মানুষের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। ময়লি আন্টি বাড়িটিকে সযত্নে রক্ষা করেন।

দোতলা দেখা হয়ে যাবার পরে, গোগোল সকলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল, সেই লোকটি সকলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। অথচ কাঠের সিঁড়িতে কোনো শব্দ হচ্ছে না। ব্যানার্জি কাকা বললেন, 'দাঁড়ালে কেন গোগোল? ওপরে আরো কিছু দেখবে?'

'না না।' গোগোল সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল।

লোকটি গোগোলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। গোগোল তার পেছনে পেছনে নেমে এল। লোকটি ঘরের বাইরে, বসবার ঘর থেকে কাঁচের দরজা ঠেলে, বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। গোগোল কী করবে, বুঝতে পারছিল না। পেছন থেকে ব্যানার্জি কাকা বললেন, 'চল গোগোল, বাইরে চল। আমরা গাড়িতে চেপে, ম্যালের কাছে যাব। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি পার্ক করে, আমরা ম্যালে বেড়াতে যাব।'

গোগোল ব্যানার্জি কাকার কথা ভালো শুনতে পেল না। ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি দরজার বাইরে, পাশে সরে দাঁড়াল। তার অপলক চোখের দৃষ্টি এখন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। সে গোগোলকে দেখছিল না। গোগোল দরজা টেনে খুলে বাইরে বেরোল। লোকটা এবার ওর দিকে তাকাল। অমনি জ্বলজ্বলে ভাবটাও কেটে গেল। শান্ত আর করুণ হয়ে উঠল। ব্যানার্জি কাকা পেছন থেকে বললেন, 'আবার এখানে দাঁড়ালে কেন গোগোল?'

গোগোল সিঁড়ির দু ধাপ নেমে চত্বরে এগিয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখল, লোকটি সবাইকে দেখছে। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। ময়লি আন্টি এগিয়ে গিয়ে, গেট খুলে দিলেন। বাগডোগরা থেকে যে-গাড়িটি এসেছিল, আর যে ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তার কোনো বদল হয় নি। ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন চালিয়ে, এগিয়ে নিয়ে এল। ব্যানার্জি কাকা সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। গোগোল বাবা মার সঙ্গে পেছনে, দরজার পাশে বসল। দেখল, লোকটি ওদের গাড়ির দিকেই। কিন্তু হঠাৎ সে গাড়ির কাছে দৌড়ে এল। আর দরজাটা খুলে ফেলল। গোগোল প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল।

ব্যানার্জি কাকা অবাক হয়ে বললেন, 'আরে, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করি নি দেখছি। হঠাৎ খুলে গেল।' বলে দরজাটা আবার টেনে, লক করে দিলেন।

গোগোল দেখল, ব্যানার্জি কাকা আর ড্রাইভারের মাঝখানে লোকটা

সামনে মুখ করে বসে আছে। কী মতলব লোকটার? কোনো বিপদ-আপদ ঘটবে না তো? গাড়ি তখন হাসপাতালের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। একমাত্র গোগোল ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না, গাড়িতে আর একটা লোক। আশ্চর্য। ব্যানার্জি কাকা বা ড্রাইভারও টের পাচ্ছেন না, তাঁদের মাঝখানে একজন বসে আছে!

ম্যালে যাবার রাস্তার যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়, ড্রাইভার সেখানে গাড়ি দাঁড় করাল। ব্যানার্জি কাকা সামনের সিট থেকে নামলেন। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে নামল। তখনও রোদ আছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। গোগোলের চোখ লোকটার ওপর। দেখল, লোকটা গাড়ি থেকে নেমে, গোগোলের দিকে তাকাল। এবার সে স্পষ্টই হাসল।

ব্যানার্জি কাকার সঙ্গে তখন বাবা মা ম্যালের দিকে হেঁটে চলেছেন। লোকটি হাত তুলে গোগোলকে ইশারায় সেদিকে দেখাল। বাবাও তখন পেছন ফিরে ডাকলেন, 'গোগোল এস, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

গোগোল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। লোকটা গোগোলদের ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল। রাস্তায় নানা রকমের, নানা পোশাকের লোকজন। দু পাশে কত রকমের দোকান। গোগোলের কোনোদিকে খেয়াল নেই। ও দেখছে, লোকটি আগে আগে চলেছে, আর মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে গোগোলদের দেখছে।

গোগোলরা ম্যালে এসে পৌঁছুল। যেদিকে লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর চা বাগান, সেদিকে দেখতে গিয়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্য গোগোল লোকটির কথা ভুলে গেল। বিশেষ করে, পরিষ্কার আকাশে, তখন কাঞ্চনজংঘা দেখা যাচ্ছে। এ সময়ে ময়লি আন্টির মেয়ে মায়াকে কাছে দেখা গেল। ব্যানার্জি কাকা মায়ার সঙ্গে নেপালী ভাষায় কিছু কথা বললেন। মায়াও বলল। গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপরেই ওর চোখ পড়ল সেই লোকটির দিকে। সে এই প্রথম হাতছানি দিয়ে গোগোলকে ডাকল।

গোগোল দেখল, বাবা মা ব্যানার্জি কাকা গল্প করছেন। মায়াদিদিও দুই নেপালী মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেড়াচ্ছে। গোগোল লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা লেবংয়ের দিকে, রেলিং ঘেরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। আর মাঝে মাঝে গোগোলকে পেছন ফিরে দেখতে লাগল।

গোগোল দেখল, রোদ চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। ও থেমে পড়ল। লোকটাও থেমে পড়ে, গোগোলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। এমন

ভাবে ডাকল, যেন বলতে চায়, 'কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে এস, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

গোগোল কৌতূহল দমন কবতে পাবল না। ও লোকটার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। বিকেলেব আলো খুব তাড়াতাড়ি যেন ম্যাজিকেব মতো নিভে গিয়ে, সন্ধ্যা নেমে এল। বাতি জ্বলে উঠতে আরম্ভ কবেছে বাস্তাব ধাবে। নীচেব বাড়িগুলোতে। চা বাগানেব কোথাও কোথাও। লোকটি যেখানে দাঁড়াল, সেখানে রেলিং শেষ হয়ে ডান দিকে নীচে বাস্তা নেমে গেছে। লোকটা সেই দিকেই চলল। যাবাব আগে গোগোলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। গোগোলেব আশপাশ দিয়ে যাবা যাতায়াত কবছে, তাদেব ও দেখতে পেল না। তাবাও সব অচেনা লোক। কেউ গোগোলকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কবে দেখল না।

লোকটি ক্রমেই আঁকাবাঁকা পথে নীচে নেমে চলেছে। অন্ধকাব নেমে এল। এদিকটায় আলোও বিশেষ নেই। কিন্তু গোগোল লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে। সে হাতছানি দিচ্ছে। আব গোগোল দমবন্ধ কৌতূহল নিয়ে তাব পেছনে পেছনে চলেছে।

এক সময় মনে হল, লোকটি একটি পুরনো অন্ধকাব বাড়িব, পোড়ো লনে গিয়ে দাঁড়াল। গোগোলও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটি হাত তুলে সামনে দেখিয়ে, এগিয়ে গেল গোগোলও গেল। লোকটি লনেব নীচে যাবাব একটা কাঁচা সরু পথে নামতে লাগল। গোগোলও নেমে চলল।



এক সময় গোগোলের কানে এল, ক্ষীণস্বরে ওকে যেন কেউ ডাকছে। কিন্তু তখন আর ও থামতে পারছে না। লোকটির পেছনে পেছনে যেন স্বপ্নের ঘোরে চলেছে। ক্রমেই ওর নাম ধরে ডাকা মেয়েলি স্বর কাছে এগিয়ে আসছে যেন! লোকটি পেছন ফিবে গোগোলকে দেখছে, আর পাহাড়ি সরু পথে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। কাছে-পিঠে আর একটাও বাড়ি নেই।

গোগোল দেখল, লোকটি এবাব এক জায়গায় থামল। পেছন ফিরে গোগোলকে ওপরের দিকে হাত তুলে দেখাল। গোগোল দেখল, একটা ছোট চূড়া। লোকটি হাতছানি দিয়ে সেই চূড়োয় উঠতে লাগল। গোগোলও উঠতে লাগল। চূড়োয় উঠে, লোকটি একবার থামল। তাবপব হাতছানি দিয়ে, সোজা সামনেব দিকে এগিয়ে গেল। গোগোলও গেল। কিন্তু লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আব কে যেন পেছন থেকে চিৎকার করে গোগোলেব ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল।

গোগোল দেখল, সেই লোকটি নেই। আর ওব সামনে একটা বিশাল অন্ধকাবের শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু কে ওকে জড়িয়ে ধবেছে? এই সময়েই টর্চ লাইটের আলো পড়ল ওদেব গায়ে। ব্যানার্জি কাকার গলা শোনা গেল, 'মায়া মায়া।'

গোগোলেব কাছ থেকে মায়া চিৎকাব কবে বলল, 'আংকল, গোগোল মিলেছে। তবে আর কয়েক সেকেণ্ড গেলে, ওকে আর পাওয়া যেত না। কিন্তু গোগোল, তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'আমাকে একজন ডেকে এনেছে যাকে আমি ছাড়া কেউ দেখতে পায়নি।'

'সে দেখতে কেমন?'

গোগোল লোকটাব চেহাবা আব পোশাকের বর্ণনা দিল। মায়া কেঁদে উঠে বলল, 'তুমি তো আমাব বাবাব কথা বলছ। তিনি তো চাব পাঁচ বছব আগে মাবা গেছেন।'

'মারা গেছেন!'

'হ্যাঁ, অসুখে ভুগে ভুগে মনের দুঃখে আমার বাবা এখান থেকেই নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মাবা গেছলেন। উঃ, আমি না এসে পড়লে তুমিও নিশ্চয় নীচে গিয়ে পড়তে।'

গোগোলের শিরদাঁড়াটা কেঁপে উঠল। ও ভয়ে মায়াকে জড়িয়ে ধরল।

সেবাবে তারপরেও যে-কদিন গোগোল দার্জিলিংয়ে ছিল, ওকে সব সময়েই চোখে চোখে রাখা হতো। কিন্তু আশ্চর্য! সেই অন্যেব চোখে অদৃশ্য লোকটি আর গোগোলকে দেখা দেয়নি।



গোগোলের অনেক কাণ্ডকারখানার নানা কাহিনী আমি তোমাদের শুনিয়েছি। আর গোগোল কী রকম ছেলে, সেটাও ইতিমধ্যেই অনেকে জেনে গিয়েছ। কাশ্মীরের পহলগাঁও-এর ঘটনা বা পুরীর সমুদ্রের ধারের ঘটনা, দুটো ঘটনাই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। আমি একটা কাহিনীর নাম দিয়েছিলাম, 'ইঁদুরের খুট্ খুট্' আর একটির নাম দিয়েছিলাম 'সোনালি পাড়ের রহস্য'। আশা করি, পাঠকেরা তা ভুলে যায় নি। প্রথম ঘটনাটি ছিল একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতির, আর একটা অতি ভয়ংকর হত্যার ঘটনা। অবিশ্যি, এ কথা সবাই জানে, গোগোল এখন মাত্র একটি আট বছরের ছেলে। ও গোয়েন্দা না, বা সেরকম নিজেকে ও কখনো ভাবে না। আসলে, ওর কৌতূহলের মাত্রাটাই বেশী। যা কিছু দেখবে, যা কিছু শুনবে, সব কিছুতেই ওর কৌতূহল মেটানো চাই।

ছেলেমানুষদের কৌতূহল থাকাটা যে খারাপ, তা কেউ বলবে না। কিন্তু অনেক সময়, এমন সব ঘটনা ঘটে, কৌতূহল নিয়ে সেই ঘটনার পিছনে ছুটলে, বিপদও ঘটতে পারে। গোগোল সেরকম বিপদেও পড়েছিল। আসলে

বিপদের কথাটা তো ও বুঝতেই পারে না। যদি বুঝতে পারতো, তা হলে হয় তো ভয়ে সেদিকে যেতো না। এখনো ওর সে-বোধই হয় নি। তা না হলে, পুরীর সমুদ্রের ধারে, একটা খুনে লোক তো ওকে মেরেই ফেলতো। কারণ, লোকটা ওর জন্যই ধরা পড়ে গিয়েছিল। অথচ ও কিন্তু জানতোই না, লোকটা একটা খুনের মতলব নিয়ে কিছু করছে। নিতান্ত ছেলেমানুষী কৌতূহলবশতঃ, লোকটার সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে ও শুধু দেখতে চেয়েছিল, লোকটা একটা খালি বাড়িতে কী করছে। দেখতে গিয়েই, যতো গোলমাল।

যাক, সে ঘটনা একবার বলা হয়ে গিয়েছে, নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। গোগোলের মাথায় এক এক সময়, এক একটা ব্যাপার চেপে বসে। আজকাল ও আর ওর বাবার পাইপ নিয়ে, মুখে দিয়ে, বাবার মতো কথা বলবার অনুকরণ করে না, কিংবা বাবার অ্যাটাচি নিয়ে, খুব গম্ভীর ভাবে কাজে যাবার ভাব করে না। হাতে সময়ও কম। নিয়মিত স্কুলে যেতে হয়। বাড়িতেও সন্ধ্যেয় একজন আন্টি পড়াতে আসেন। গোগোল খুব মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। পড়াশোনার যতো চাপ বাড়ছে, ততোই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এক এক সময় ভেবেই পায় না, কেন এতো লেখাপড়া করতেই হবে। তবু করতেই হয়। তা না হলে, বড় বড় লেখকের ভালো ভালো বই কখনো পড়তে পারবে না, কিছু বুঝতেও পারবে না।

ইদানিং গোগোলের খুব পয়সার দরকার হয়েছে। সব সময়েই, মায়ের কাছে দশ পয়সা, কুড়ি পয়সার বায়না করে। ছোট ছেলেপিলেদের এতো পয়সার দরকার কিসের? ওর মা খুব বিরক্ত হন। বাবাকেও ছাড়ে না।

গোগোল প্রথম প্রথম পয়সা নিতো, গরিব-দুঃখীদের দেবার জন্য। বাড়ির দরজায় কেউ এসে দাঁড়ালেই হলো, হাত পেতে কিছু চাইলেই হলো। অমনি গোগোল ছুটলো মায়ের কাছে পয়সার জন্য। আজকাল রেশনের দিনে মাথা পিছু যেরকম চাল আটা দেয়, তাতে তো আর গরিব-দুঃখীদের পেট ভরে খাওয়ানো যায় না। পয়সা দিয়েই বিদায় করতে হয়। কিন্তু পয়সাই কি সব সময়ে হাতের কাছে থাকে? গোগোল তা শুনবে না। পয়সা ওকে দিতেই হবে। হাতের কাছে না থাক, মাটির ভাঁড়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যা জমানো আছে, তার থেকেই দিতে হবে। তার ফলে যা হবার, তা-ই হয়। মা রেগে যান, বকুনি দেন। বেশী জেদ করলে, মায়ের কাছে চড়-চাপড়টাও খেতে হয়।

কিন্তু গোগোলই বা কি করবে? গরীব-দুঃখীদের দেখলে, ওর মন মানে

না। এদিকে, আজকাল আবার খুব কথা বলতেও শিখেছে। মাকে বলে, 'আমরা কতো খাই, আর ওরা গরিব বলে, খেতে পাবে না? ওদের পয়সা না দিলে যে পাপ হয়, তা বুঝি জানো না?'

মা ধমক দিয়ে বলেন, 'বেশী পাকা পাকা কথা বলো না! তোমার জন্য আমি কি দানছত্র খুলে রেখেছি, যে এসে হাত পাতবে, তাকেই পয়সা দিতে হবে? এতো পয়সা আমার নেই।'

কয়েক মাস আগে তো, বেশ একটা মজার ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল। ঘটনাটা বলছি।

সকালবেলা ইস্কুলে যাবার আগে, গোগোল নিজের মনেই একটা ব্যাটারি-সেট ট্যাংক, ঘরের মেঝেয় চালিয়ে খেলছিল। ওর বাবা গিয়েছেন বাথরুমে চান করতে। মা রান্নাঘরের দিকে ব্যস্ত। আর আজকাল ইলেকট্রিক কারেন্টের ব্যাপারটা সবাই জানে। যাকে বলে লোডশেডিং, যে কোনো শিশুও তা জানে। হয়তো সারাদিনই কারেন্ট নেই। পাখা চলে না, আলো জ্বলে না, রেফ্রিজারেটর চলে না। বলতে গেলে, সবই অচল হয়ে যায়। কবে যে দেশের এ দুর্গতি ঘুচবে, কে জানে।

যাই হোক, লোডশেডিং-এর জন্য, গোগোলদের কলিংবেলটাও বাজছিল না। ওদের বাড়িতে কাজ করে যে গুরুপদ, সে হয়তো কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিল, বাইরের দরজাটা খোলাই ছিল। দরজার কাছে কারোর পায়ের শব্দ পেয়ে, গোগোল দৌড়ে গেল দেখতে, কে এসেছে। গিয়ে দেখলো, ঢলঢলে ময়লা একটা ট্রাউজার, আর তেমনি পুরনো ঘামে ভেজা জামা গায়ে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির পায়ের জুতোর অবস্থা আরো খারাপ, ছেঁড়া, তালি মারা, ধুলো কাদায় ভরা। মুখে গুচ্ছের কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথার চুলগুলো তেমনি উস্কোখুস্কো। দেখেই গোগোলের মনে হলো, লোকটা যেন ধুঁকছে, কতোদিন খায় নি। প্রথমে গোগোলের অবিশ্যি একবার সন্দেহ হয়েছিল, লোকটা ছেলেধরা, বা সেই ধরনের কিছু কী না। কিন্তু লোকটার কাঁধে কোনো ঝোলা ছিল না। ও হাত তুলে ইশারা করে লোকটিকে বললো, 'দাঁড়াও।'

বলে ভিতরে গিয়ে বাবার পড়ার টেবলের কাছে গেল। গোগোল দেখে রেখেছিল, বাবা ওখানে কিছু খুচরো পয়সা রেখেছেন। ও একটি দশ পয়সা নিয়ে, দরজার কাছে গিয়ে লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'খাবার দাবার কিছু নেই, এই দশ পয়সা নাও।'

লোকটি অবাক্ হয়ে কয়েক মুহূর্ত গোগোলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপরে নিজের হাত পা দেখে, মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বললো, 'মাত্র দশ পয়সা ? আর কিছু বেশী পাওয়া যায় না ?'

গোগোল ঠোঁট টিপে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'আচ্ছা দেখছি।'

গোগোল আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে, বাবার টেবল থেকে আরো একটি দশ পয়সা নিয়ে এলো। লোকটির হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আর নেই, এই নাও।'

লোকটি সেই দশ পয়সা নিয়ে বললো, 'থ্যাংক্যু। তবে কী না, আমার আরো কিছু বেশী পেলে ভালো হতো।'

গোগোল এবার যেন একটু হকচকিয়ে গেল। কোনো গরিব-দুঃখী, যারা ভিক্ষে করে, তাদের মুখে ও কখনো 'থ্যাংক্যু' শব্দটা শোনে নি। কথাটার মানে ও ভালোই জানে। তা ছাড়া, লোকটির গলার স্বর বেশ গম্ভীর, কথার উচ্চারণও বেশ পরিষ্কার। ওর মনে কেমন খটকা লাগলো। ও লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

সেই সময়েই ওর বাবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে, তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন, গোগোল বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'গোগোল, তুমি ওখানে কী করছ ?'

গোগোল পিছন ফিরে বাবার দিকে তাকালো। আর ঠিক সে সময়েই দরজার বাইরের লোকটি বলে উঠলো, 'আপনার কলিংবেলটা বাজছে না, আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলুম।'

গোগোলের বাবা, বাইরের দরজার কাছে একটু ঝুঁকে পড়ে, ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ওহো, মিস্টার ঘটক ? আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

গোগোল তো থ! সেই ময়লা ছেড়া পোশাক আর জুতো পরা লোকটি, গোঁফ দাড়ির ফাঁকে হাসলেন। বাবার সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন। বাবা বললেন, 'কলিংবেলের আর দোষ কী বলুন, আজকাল তো আর লোডশেডিং-এর দিনক্ষণ বলে কিছুই নেই। যখন খুশী হলেই হলো। আসুন, আপনি একটু বসুন, আমি জামাকাপড় বদলে আসছি।'

মিস্টার ঘটক যাঁর নাম, তিনি গোগোলের একটি হাত চেপে ধরলেন, ওর বাবাকে বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যস্ত হবেন না, আপনি আসুন। আমি ততোক্ষণ এর সঙ্গে কথা বলছি। এটি কে ?'

গোগোলের দিকে তাকিয়ে ওর বাবা ভিতর দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আমার ছেলে।'

গোগোলের অবস্থা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছে। মিঃ ঘটক বললেন, 'অনুমান করেছিলাম। এসো, তোমার সঙ্গে একটু গল্পটল্প করা যাক।'

কিন্তু গোগোলের আর সে ইচ্ছা মোটেই নেই। লজ্জাও করছিল, ভয়ও করছিল। বাবার কথা শুনেই বুঝেছে, ও একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছে। ইনি মোটেই ভিখারী নন। বেশ মান্যগণ্য কোনো ভদ্রলোকই হবেন, তা না হলে বাবা ওরকম ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতর ডেকে এনে বসাতেন না। গোগোল মিঃ ঘটকের সঙ্গে বাইরের বসবার ঘরে গেল, কিন্তু থাকতে চাইলো না। বললো, 'আমি এখন মা'র কাছে যাবো।'

মিঃ ঘটক বললেন, 'তা তো নিশ্চয়ই যাবে। এখন, সত্যি করে বলো তো, আমাকে তুমি পয়সা দিলে কেন? আমাকে ভিখারী ভেবেছিলে, তাই না?'

গোগোল মিঃ ঘটকের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানালো, হ্যাঁ।

মিঃ ঘটক হেসে বললেন, 'ভেরি গুড, কারণ তুমি সত্যি কথা বলেছ। অবিশ্যি আমার জামাকাপড়ের যা দশা, তোমাকে দোষ দিতে পারি না। তবে আমি ভিখারী নই। পয়সাগুলো তুমি পেলে কোথায়?'

গোগোল বাবার টেবল দেখিয়ে বললো, 'ওখান থেকে।'

'ওখানে কার পয়সা রয়েছে?'

'বাবার।'

'তার মানে, বাবাকে না বলেই তুমি পয়সাগুলো নিয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি ঠিক হয়েছে?'

গোগোল অবাক্ হয়ে বললো, 'আমি তো বাবাকে বলেই দিতুম।'

মিঃ ঘটক বললেন, 'তবু এভাবে না বলে পয়সা নেওয়াটা ঠিক না, বাবা হয় তো রাগ করতে পারেন, তাই না?'

গোগোল স্বীকার করলো। কারণ, বাবা দু একবার সত্যি সত্যি রাগ করেছেন।

মিঃ ঘটক আবার বললেন, 'তোমার মনটা অবিশ্যি খুবই ভালো। তবু তোমাকে বলে রাখি, ময়লা আর খারাপ পোশাকের লোক দেখলেই তাকে ভিখিরী ভেবো না। আমি অবিশ্যি গরিব মানুষ, কিন্তু ভিখিরী না; কাজকর্ম করি। সেইজন্যই তোমাকে আর একটা কথা বলে রাখি, কেউ যেচে তোমার কাছে ভিক্ষে না চাইলে, কখনো কারোকে ভিক্ষে দিও না। নাও, পয়সাগুলো

যেখান থেকে নিয়েছিলে, আবার সেখানেই রেখে দাও।'

মিঃ ঘটক কুড়ি পয়সা গোগোলের হাতে দিলেন। গোগোল পয়সাগুলো বাবার টেবলে রেখেই, অন্য দরজা দিয়ে, একেবারে ভিতরে চলে গেল। আর মিঃ ঘটকের সামনে এলোই না। একেবারে দক্ষিণের ব্যালকনির এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে রইলো। ওর ধারণা হয়েছিল, মিঃ ঘটকের কাছ থেকে সব শুনে, বাবা নিশ্চয় রাগ করবেন, আর ওকে খুবই বকুনি দেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গোগোল চান করে খেয়ে, গুরুপদর সঙ্গে ইস্কুলে চলে গেল। বাবা ওকে একবারও ডাকলেন না, সেই মিঃ ঘটকের সঙ্গে, কী সব বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। গোগোলের আরো আশ্চর্যবোধ হলো, যখন সন্ধ্যাবেলাও বাবা বা মা, কেউ ওকে মিঃ ঘটকের কথা বললেন না। অথচ গোগোলের হয়েছে মুশকিল, ও কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারছে না।

রাত্রে খাবার আগে, গোগোল নিজেই, মায়ের সামনে, বাবাকে ঘটনাটা বলে ফেললো। বাবা মা দুজনেই একটু হাসলেন। তারপরে বাবা বললেন, 'আমি দেখছিলাম, তুমি নিজেই ঘটনাটা বলো কী না। আমি সবই জানি। জেনে রাখো, এই মিঃ ঘটক একজন মস্ত বড় পণ্ডিত লোক। বলতে গেলে, তিনি পৃথিবীর সব দেশের ভাষা জানেন।'

গোগোলের তো চক্ষু চড়কগাছ! বললো, 'পৃথিবীর সব দেশের ভাষা?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, আর সেই সব নিয়েই তিনি চর্চা করেন, বই লেখেন। আসলে, এক ধরনের লোক আছেন, যাঁরা কাজে কর্মে এমন ডুবে থাকেন, জামাকাপড়ের কথা তো তাঁদের মনে থাকেই না, এমন কি খাওয়ার কথাও মনে থাকে না।'

গোগোল বললো, 'বাবা, আমি একটুও বুঝতে পারি নি।'

বাবা বললেন, 'তা জানি। তবে, আমি আর নতুন করে তোমাকে কিছু বলবো না। মিঃ ঘটক তোমাকে যা বলে গেছেন, সেসব কথা মনে রেখো, বুঝলে?'

গোগোল ঘাড় কাত করে বললো, 'রাখবো।'

সেই থেকে গোগোলের শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। পোশাক দেখে মানুষ বিচার, এটা যে একটা মস্ত বড় ভুল, তা ও আরো নানান ভাবে লক্ষ্য করে দেখেছে। ও যে পাড়ায় থাকে, সেই পাড়াতেই দেখেছে। পোশাক দেখে গরিব বড়লোক মোটেই চেনা যায় না। আর পণ্ডিত মানুষ? তা তো একেবারেই না। গোগোলদের পাড়ায় যে সব থেকে অশিক্ষিত, একেবারেই

লেখাপড়া করে না, জীবনে কোনো দিন বই নিয়েই নাকি বসে নি, অথচ গোগোলেরই বয়সী, পাড়ায় সারাদিন খারাপ খারাপ কথা বলে বেড়ায়, সেই ভোলা রোজ রোজ ভালো ভালো জামা প্যান্ট পরে সেজে ঘুরে বেড়ায়। গোগোল শুনেছে, ভোলা নাকি চুরি করে, আর চুরি করেই ওসব সুন্দর পোশাক পরে। কথাটা গোগোল আগেও জানতো। কিন্তু মিঃ ঘটকের কথা শোনার পর থেকে এসব কথা ওর নতুন করে মনে হয়েছে।

গোগোল মিঃ ঘটককে জেনে শুনে ভিখিরী বলে অপমান করে নি। ভুলবশতঃ একটা অন্যায় করে ফেলেছে। কিন্তু মিঃ ঘটকের কথাগুলো ওর মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। পোশাক দেখে ভুল করার তো কোন কথাই নেই, তা ছাড়া না চাইতে, যেচে কখনো কারোকে ভিক্ষে দেওয়া একটা মস্ত বড় অন্যায়।

গোগোলেব ভিক্ষে দেওয়ার কথাটাই আসল না। আজকাল যে ওর পয়সার দিকে ঝোঁক হয়েছে, সেটা কেবল ভিক্ষে দেবার জন্য নয়। দশ পয়সা, কুড়ি পয়সা, যখন তখন চাওয়ার অন্য একটা কারণও আছে। গোগোলের এবারের গল্পটার আসল কারণটাও সেখানেই।

কনফেকশনারি কথাটা আজকাল সবাই জানে। টফি লজেন্স চকোলেট বিশুদ্ধ আর পরিচ্ছন্ন ভাবে তৈরী হলে, ছোটরা সবাই খেতে চায়। কিন্তু একটা সময় আসে, রাস্তার যে কোন দোকান থেকে চানাচুর, চাটনি, ধুলোবালি মাখা আলুকাবলি ছোট ছেলেমেয়েরা খেতে খুব ভালবাসে। গোগোলেরও সেই অবস্থা চলছিল। গরিব-দুঃখী দেখলে ভিক্ষে দিতে যেমন ওর ইচ্ছে হতো, চানাচুর চাটনি ঘুগনি আলুকাবলি দেখলেও ওর তেমনি খেতে ইচ্ছে করতো। আর ইচ্ছে করলেই, মায়ের কাছে বারে বারে পয়সা চাইতো। মা বিরক্ত হতেন, ধমক দিতেন, বকুনি দিতেন, কিন্তু গোগোল জেদ করলে কিছুতেই ওকে থামানো যেতো না। সব থেকে মজার কথাটা হলো এই, গোগোল মাকে একটু-আধটু মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। ও যে রাস্তার ধারের ধুলোবালি মাখা খোলা খাবার কিনে খায়, মাকে কখনো তা বলতো না। বরং মা যদি জিজ্ঞেস করতেন গোগোল কোনো বাজে জিনিস কিনে খায় কী না, ও তা মাকে বেমালুম চেপে যেতো।

কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? গোগোল অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রথম প্রথম পেট খারাপ। মাঝে মাঝে বমিও করেছে। গোগোলের বাবা মা, গোড়ার দিকে ব্যাপারটা তেমন বুঝতে পারেন নি। সামান্য ওষুধেই সেরে গিয়েছে। তারপরে দেখা গেল, গোগোলের গা প্রায়ই গরম থাকে। ওর

খিদে হয় না। চেহারাটা দিনকে দিন কেমন যেন রোগা মতো হতে লাগলো। ওর বাবা একজন ভালো ডাক্তারকে দেখালেন। যেদিন দেখালেন, সেদিন গোগোলের বেশ জ্বর। ডাক্তার সব দেখে শুনে জানালেন, গোগোল আজে-বাজে খাবার খেয়ে, শরীরটা খারাপ করেছে। ওর লিভার খারাপ হয়েছে, পেটে কৃমিও জন্মেছে, তা ছাড়া, আমাশয়ের বীজাণুও রয়েছে। ওকে এখন কিছুদিন বাইরে বেরোতে দেওয়া উচিত না। ইস্কুলে যাওয়াও বন্ধ। বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হবে, নিয়মিত ওষুধ আর পথ্য করতে হবে।

গোগোলের এখন সেই অবস্থা চলছে। জ্বরটা তেমন নেই, আগের থেকে একটু ভালো আছে। কিন্তু বাড়ি থেকে ওকে একেবারেই বেরোতে দেওয়া হয় না। অথচ গোগোল আর শুয়ে থাকতেও পারে না। ঘরের মধ্যেই বই খেলনা নিয়ে কাটায়। বিকালবেলা ওদের দোতলার ব্যালকনি থেকে বন্ধুদের খেলাধূলা দেখে।

গোগোলদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাড়িতে, বড় একটা বাগান আছে। ও বাড়িতে লোকজন কেউ থাকে না, গোগোল জানে, ওটা একটা অফিস বাড়ি। সরকারি অফিস বাড়ি। সারাদিন লোকজন কাজ করে। কিন্তু বাগানের দিকে বিশেষ কেউ আসে না। বাগানটা হলো বাড়ির পিছন দিকে। কোনো কোনো সময় হঠাৎ দু একজন হয় তো আসে। কথা বলে, বিড়ি সিগারেট খায়, আবার চলে যায়। ও বাড়িটার দিকে গোগোলের কোনো মনোযোগ নেই।

বাগানের বাঁ দিকের বড় বাড়িটার মধ্যে অনেকগুলো ঘর। সেখানে অনেক খ্রীষ্টান পরিবার থাকে। ওরা নাকি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। অর্থাৎ যাদের বাবা মায়ের মধ্যে একজন ইংরেজ, আর একজন ভারতীয়। গোগোল 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান' মানে কী, ওর বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে এ কথা জানতে পেরেছে।

গোগোল যে ইস্কুলে পড়ে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদেরও কেউ কেউ সেই ইস্কুলে পড়ে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে গোগোলের বন্ধুত্বও হয়েছে। বিশেষ করে জর্জ আর গ্যাবি।

জর্জ আর গ্যাবিদের বাড়িটা চারতলা। গোগোল অনেকদিন লক্ষ্য করেছে, চারতলার জানালা থেকে জর্জ প্রায়ই একটা আয়না নিয়ে ভারী মজার খেলা খেলে। খেলাটা এমন কিছু না। জর্জদের চারতলার জানালায় যখন রোদ পড়ে, জর্জ তখন ছোট একটা আয়না নিয়ে সেই রোদের বুকে

মেলে ধরে। আয়নায় রোদ পড়লে, সেই রোদের একটা প্রতিফলন হয়। সেই প্রতিফলনটাও একটা আলো, যা অনেকটা টর্চ লাইটের আলোর মতো, যেখানে সেখানে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফেলা যায়। আসলে, ওটা রোদের আলোরই একটা প্রতিফলন। আয়নাটা যেদিকে ঘোরাবে, সেদিকেই আলোর ঝলক পড়ে। জর্জ অনেক সময় গোগোলের মুখেও আলো ফেলেছে। অথচ জর্জদের জানালাটা বেশ দূরে। সেই আলো চোখে পড়লে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু বেশ মজাও লাগে। আয়নায় রোদ পড়ে অনেক দূরে আলো ছিটকে পড়তে দেখলে, আর ইচ্ছামতো সেই আলোকে যেখানে খুশী ফেলতে পারলে, মজা লাগবারই কথা।

গোগোলের খুব ইচ্ছে, ও ওরকম আলো নিয়ে খেলা করে। কিন্তু ওদের বাড়িতে সেরকম ছোট আয়না একটাও নেই। ছোট আয়না বলতে, বাথরুমে, জলের বেসিনের ওপরেই, দেওয়ালে ঝোলানো একটা আয়না আছে, যেখানে বাবা মা দাঁত মাজেন, বাবা দাড়ি কামান। কিন্তু জর্জদের আয়নার থেকে, সেই আয়নাটা অনেক বড়। দেওয়াল থেকে পেড়ে আনাও মুশকিল। মায়ের কাছে অনেকবাব বায়না করেছে, একটা ছোট আয়না কেনবার জন্য। মা রাজী হন নি, বরং বলেছে, 'ওসব বাজে খেলা খেলতে হবে না। খোলা জানালা দরজা দিয়ে, লোকের ঘরের মধ্যে তুমি আলো ফেলবে, সেটা আবার কেমন করে ভালো খেলা হতে পারে? ওতে লোকেরা রাগ করে।'

গোগোল রোদে আয়না ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিকে আলো ফেলতে লাগলো। জর্জদের চারতলায় খোলা জানালায় আলো ফেলতেই জর্জের দিদি এসে জানালায় দাঁড়ালেন। গোগোল তাড়াতাড়ি আলোটা সরিয়ে নিল, একটু ভয়ও পেলো। হয় তো জর্জের দিদি রাগ করেছেন। কিন্তু জর্জের দিদি হেসে, হাত নেড়ে একটু ইশারা কবলেন, তারপরে জানালার কাছ থেকে সরে গেলেন।

গোগোল জর্জদের বাড়ি থেকে আলোটা সরিয়ে নিয়ে, বাগানের বড় গাছে ফেললো। পাতাব ছায়ায় একটা কাক বসেছিল। গায়ে আলো পড়তেই, কাকটা ভয় পেয়ে, কা-কা করে ডেকে উড়ে চলে গেল। গোগোলের হাসি পেয়ে গেল। বাগানওয়ালা বাড়িটার এদিকে লোকজন বিশেষ আসে না। কিন্তু পিছন দিকের বারান্দায়, বা খোলা জানালা দিয়ে, ঘরের ভিতর লোকজন দেখা যায়। আজ দেখা যাচ্ছে না। দরজা জানালা বন্ধ। বারান্দায়ও কেউ নেই। সাধারণতঃ রবিবারেই এরকম হয়ে থাকে, বা অন্য কোনো ছুটির দিনে। ছুটির দিনে লোকজন কেউ কাজে আসে না।

গোগোল দেখলো, বাড়িটার ছাদের আলসেয় একটা চিল বসে আছে। তৎক্ষণাৎ গোগোল আয়নার আলো চিলটার গায়ে ফেললো। চিলটা চমকে উঠলো, কিন্তু তখুনি উড়ে পালালো না। এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। গোগোল ভেবেছিল, চিলটা নিশ্চয়ই পালাবে। পালালো না দেখে, ওর জেদ বেড়ে গেল। আয়নার আলোটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বাবে বারে চিলটার গায়ে মুখে ফেলতে লাগলো। চিলটাও যেন বাবে বাবে মুখ ফিবিয়ে দেখতে লাগলো. মুখটা নামিয়ে নিতে লাগলো। তবু পালাবার নাম নেই। গোগোল তখন চিলটাব চোখেব ওপর আলো ফেলতে লাগলো। চিলটাও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে লাগলো। গোগোল মনে মনে রেগেই গেল। চিলেব এতো সাহস! একটু ভয় পায় না? বারে বারে চিলটার গায়ে আলো ফেলতে, হঠাৎ এক সময় চিলটা পাখা মেলে উড়লো। কিন্তু বেশী দূবে কোথাও গেল না। পুরনো অফিস বাড়িটারই চিলেকোঠাব ছাদের ধাবে গিয়ে বসলো।

গোগোলও ছাড়বাব পাত্র না। ও আয়নাব আলোটা ঠিক নিশানা কবে, চিলেকোঠাব ছাদেব ওপব, চিলেব গায়ে ফেলবার চেষ্টা কবলো। আব তখুনি. ও দেখতে পেলো, কেউ যেন চিলেকোঠার দরজাব কাছে, মাথা নীচু কবে বসে পড়লো। আয়নাব আলোটা তখন চিলেকোঠাব দবজার কাছেই পড়েছিল গোগোলের মনে হলো, কোনো মানুষেব মুখে আলোটা পড়তেই. সে যেন ঝুপ কবে বসে পড়লো।

গোগোল খুব অবাক্ হয়ে গেল। ওব নিজেবই ধাঁধা লেগে যায় নি তো? ও কি ঠিক কোনো মানুষকেই দেখেছে? নাকি, আয়নাব চোখ ধাঁধানো আলোতে ওবকম মনে হলো? গোগোল তখনো সেই দিকেই তাকিয়ে আছে। ওদেব বাড়ি থেকে, অফিস বাড়িব ছাদ বা চিলেকোঠা বেশ দূবে' ও বাড়িটাব সামনেব দিক পড়েছে পাশেব বাস্তায। গোগোল দেখেছে মস্ত গেটওয়ালা বাড়ি। সামনেব দিকে গাড়ি. লোকজন অনেক। কিন্তু আজ তো বাড়িটা বন্ধই মনে হচ্ছে।

গোগোল লক্ষ্য করলো, চিলটা নীচের দিকে মাথা নামিয়ে কিছু দেখছে। আর গোগোলের আয়নার আলো যে তখন কোথায় পড়েছে, খেয়ালই নেই। গোগোল আব একটা জিনিস লক্ষ্য করলো, চিলেকোঠার দরজাটা খোলা। ও ঠিক মনে কবতে পাবলো না, দরজাটা রোজই খোলা থাকে কী না। এ ঘরে গোগোল বিশেষ আসে না। এটা বাবাব শোবার ঘর। ছুটি ছাটার দিনে, বাবা না থাকলে, মাঝে মাঝে আসে। বাবা অবিশ্যি দিনের বেলা এ

ঘরে আসেনই না। বাড়িতে থাকলে তিনি সারাদিন তাঁর কাজের ঘরে থাকেন, যেমন আজও আছেন। তা ছাড়া, গোগোল এ ঘরে এলেও, অফিস বাড়িটার দিকে বিশেষ তাকায় না, লক্ষ্যও করে না। কারণ, ও বাড়িটার প্রতি কোনো আকর্ষণই ওর নেই। তার চেয়ে, ডাইনে বাঁয়ে যে সব বাড়ি আছে, প্রায় সব বাড়িতেই, ওর বয়সী চেনাজানা ত্থ একজন বন্ধু আছে। সেইজন্যই, ও মোটে মনেই করতে পারলো না, অফিস বাড়ির চিলেকোঠার দরজাটা রোজই ওরকম খোলা থাকে কী না।

ইতিমধ্যে গোগোলের আয়নার রৌদ্রের প্রতিফলিত আলো অন্য একদিকে গিয়ে পড়েছে, কারণ চিলেকোঠার দরজার কথা ভাবতে গিয়ে, ওর হাতের আয়না একটু ঘুরে গিয়েছে। ও মনে মনে ভাবলো, ওটা তো কোনো লোকের বাড়ি না, একটা অফিস বাড়ি। একতলা দোতলায় সারাদিন লোকেরা কাজ করে, বিকাল পাঁচটার পরে ফাঁকা হয়ে যায়। নীচে ত্থ একজন দারোয়ান থাকে। এরকম বাড়ির চিলেকোঠা খোলা থাকলো, বা বন্ধ থাকলো, কে দেখতে যাচ্ছে?

কিন্তু চিলটা চিলেকোঠার ছাদ থেকে, ওরকম মাথা নীচু করে কী দেখছে? শুধু দেখছে না, চিলটা মাঝে মাঝে এমন ভাব করছে, যেন ভয় পেয়ে উড়ে যাবো যাবো করছে, অথচ যাচ্ছে না। কেবল, ত্থ এক পা এদিকে ওদিকে সরে যাচ্ছে।

গোগোলের আবার জেদ চাপলো, ও আবার আয়নার আলো, চিলের গায়ে ফেলার চেষ্টা করলো। আয়নার প্রতিফলিত আলোটা এতক্ষণ একটা গাছের মাথায় ঠেকেছিল। গোগোল খুব আস্তে আস্তে, হাতের নিশানা ঠিক করে, আলোটা ফেললো চিলেকোঠার গায়ে। তারপরে একটু বাঁ দিকে নিয়ে চিলেকোঠার দরজার পাশ থেকে ওপরের দিকে তুলতে লাগলো, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, একটা মানুষের মাথা আর উঁচুতে তোলা হাতও দেখতে পেলো। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যই, যেন পলক ফেলতে না ফেলতে, সেই মাথা আর হাত আবার আলসের আড়ালে, নীচে নেমে গেল। ফলে গোগোলের হাতের নিশানা আবার গোলমাল হয়ে গেল। ও হকচকিয়ে অবাক্ হয়ে, চিলেকোঠার দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। আশ্চর্য তো সত্যি কি ওখানে লোক আছে নাকি? থাকলে, লোকটা করছেই বা কী?

গোগোলের দৃষ্টি গেল আবার চিলটার দিকে। চিলটাকে দেখেও মনে হচ্ছে, ও যেন নীচের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে। ওর ঘাড় নীচু করে দেখার ভাবভঙ্গী, ঠিক যেন একটা বুড়ো মানুষের মতো। কিন্তু গোগোল কি সত্যি

কোনো মানুষের মাথা আর হাত দেখেছে ? না দেখলে, শুধু শুধু মনে হবে কেন ? ও তো অন্ধ না। ওদের ক্লাসে পড়ে, সুকুমার বলে একটি ছেলে, তার চোখে খুব মোটা কাচের চশমা। সুকুমার যখন বই পড়ে, তখন বইটা প্রায় নাকের ডগায় তুলে নেয়। যেন পড়ার বদলে, বইটা শুঁকছে। আসলে তা না, সুকুমারের চোখ খুব খারাপ। গোগোলের ভাবলেই কষ্ট হয়। সুকুমারকে কতো কষ্ট করে পড়তে হয়।

তা যাই হোক, সুকুমারের মতো খারাপ চোখ হলে হয় তো গোগোল ভুল কিছু দেখতে পারতো। কিন্তু পলকের জন্য হলেও, গোগোল ভুল দেখেছে বলে, মানতে পারলো না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই, গোগোল কখন যে হাতের আয়নাটা রোদ থেকে সরিয়ে এনেছে, খেয়াল নেই। ওর হাতের আয়নাটা তখন, জানালার ভিতরে, উঁচু করে তুলে ধরা অবস্থায় রয়েছে। গোগোল ভাবলো, আর একবার আয়নার আলোটা ফেলে দেখা যাক, সেরকম কিছু দেখা যায় কী না। এই ভেবে, ও আয়নাটার দিকে তাকাতেই, দেখতে পেলো, আয়নার বুকে, চিলেকোঠাটার অনেকখানি দেখা যাচ্ছে।

গোগোল এবার একটা নতুন মজার খেলা পেলো। ও একবার চিলে-কোঠার দিকে তাকিয়ে, আবার আয়নার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে আয়নাটাকে একটু পাশ ফিরিয়ে, পুরো চিলেকোঠাটাকে দেখলো। কিন্তু চিলটাকে দেখতেই হবে। ও আয়নাটাকে আর একটু হেলিয়ে দিতেই, চিলেকোঠার ছাদটা, এবং চিলটাকেও দেখতে পেলো। চিলটা এখনো তেমনি বসে আছে। এটাও একটা মন্দ মজার খেলা না। ঘরের মধ্যে আয়নার বুকে, বাইরের ছবি দেখতে পাওয়া। গোগোলের খুব হাসি পেলো। চিলটা জানেই না, ওকে গোগোল কীরকম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। চিলেকোঠা, চিলেকোঠার ছাদ, তার ওপরে একটা চিল, পিছনে নীল আকাশ।

গোগোল দেখলো, চিলটা হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে, দু দিকে দুই পাখা মেলে দিল। উড়বে উড়বে করেও, উড়লো না, পাখা মেলেই কেমন যেন দুলতে লাগলো। তারপরেই, পাখা ঝাপটা দিয়ে কয়েক হাত ওপরে উড়ে গেল। একটা একটা পাক দিয়ে, আবার নেমে এলো একই জায়গায়।

গোগোলের মনে হলো, চিলটা যেন একলা আপন মনে খেলা করছে। ওর লক্ষ্য ছিল চিলটার ওপরেই। হঠাৎ চিলেকোঠার দরজার কাছে, আবার মানুষের মূর্তি জেগে উঠতেই, ও আয়নার বুকে স্থির চোখে তাকালো।

আয়নার বুকে ও স্পষ্ট দেখতে পেলো, কোনো একজনকে দুহাতে জাপটে ধরে, আর একজন চিলেকোঠার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

গোগোল এবার অবাক্। তাহলে সত্যি ওখানে মানুষ ছিল? এখন তো আর সন্দেহ করার কিছু নেই। আয়নার বুকে ছবি কি কখনো ভুল হতে পাবে? তাহলে তো নিজেদের মুখ, চেহারা, সবই দেখা ভুল হয়ে যাবে। গোগোল ঘাড় ফিরিয়ে, চিলেকোঠাটার দিকে তাকালো। অনেকটাই দূরে, তবু খোলা চোখে দেখলো, সত্যি দরজাটা বন্ধ। অথচ এতক্ষণ খোলাই ছিল।

গোগোলের চোখে পড়লো, ঠিক ওদের বাড়িব দিকেই মুখ করা, চিলেকোঠার একটা জানালা বয়েছে, তার একটা পাল্লাও খোলা রয়েছে। গোগোলেব মনে হলো, খোলা চোখে দেখাব থেকে, আয়নাতেই যেন দূরের ছবি বেশী ভালো দেখা যায়। ও পিছন ফিরে, আয়নাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, জানালাটা দেখতে চাইলো। খানিকটা বাঁ দিকে নিয়ে, একটু নীচু করে ধরতেই আয়নার বুকে জানালাটা দেখা গেল। জানালার খোলা পাল্লায় চোখ রেখে, গোগোল ঘরের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলো। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না, ভিতরটা অন্ধকাব। কেবল খোলা পাল্লা দিয়ে, একটুখানি আলো ঘবেব দেওয়ালে পড়েছে, তাও ঝাপসা দেখাচ্ছে।

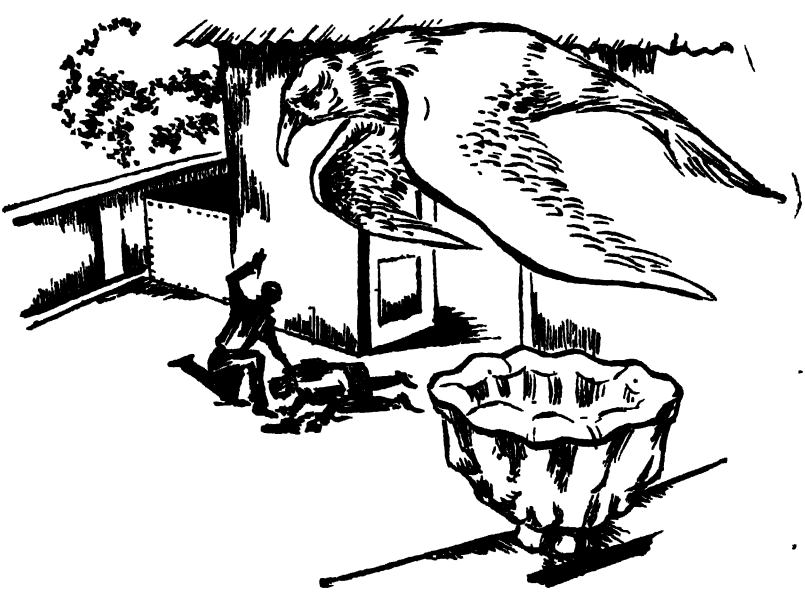
গোগোল আগেব ছবিটা মনে করার চেষ্টা করলো। একটা লোক, আব একটা লোককে যেন দুহাতে জাপটে ধরে, ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। কারোবই মুখ দেখা যায় নি যে লোকটা আর একজনকে জাপটে নিয়ে ঢুকছিল, তাব পেছনটাই, গোগোল এক পলকের জন্য আয়নায় দেখতে পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, লোকটার মাথায় কালো বড় বড় চুল। আর পুরো হাত ঢাকা, হলুদ গোছেব রঙেব একটা শার্ট। ট্রাউজারের রংটা মনে কবতে পারছে না। কোমরে বেল্ট ছিল কী না, তাও মনে পড়ছে না।

গোগোল অবাক্ হয়ে ভাবলো, লোক দুটো কী করছিল ওখানে? এখনই বা দরজা বন্ধ করে, ঘরের মধ্যে কী করছে? এ কথা ভাবতে ভাবতেই, আয়নার বুকে, জানালার খোলা পাল্লা দিয়ে, ঘরের মধ্যে ও কিছু একটা ঝলকিয়ে উঠতে দেখলো। কী ওটা? আয়নাটা স্থির রেখে, গোগোল চোখের তারা দুটো বড় বড় করে দেখলো। আবার সেইরকম কী একটা ঝলকে উঠলো ঘবের মধ্যে, এবার তার সঙ্গে একটা হাতও দেখা গেল। যে হাতটা দেখে মনে হলো, সেই হলুদ হলুদ রঙের জামা পরা হাতটা।

গোগোল আয়নার দিকে তাকিয়ে, আরো কয়েকবার সেই রঙের জামা পরা হাতের সঙ্গে ঝকঝকে কী একটা ঝলকিয়ে উঠতে দেখলো। গোগোলের কেমন মনে হলো, আর নিজের মনেই জিজ্ঞেস করলো, ঝলকে ওঠা জিনিসটা কি ছোরা? ওর যেন সেইরকম সন্দেহ হলো। তার মানে কী? চিলেকোঠার মধ্যে কি ছোরা মারামারি হচ্ছে নাকি?

গোগোল যখন এ কথা ভাবছে, তখন আর হাত বা কিছু ঝলকিয়ে উঠতে আর দেখা গেল না। কিন্তু জানালার খোলা পাল্লার সামনে একটা মুখ ভেসে উঠলো। গোগোল এবার অনেকটা পরিষ্কার দেখলো, একটি লোকের মুখ, খোলা জানাল' দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখছে। সেই হলুদ মতো রঙেরই জামা, বুকেব কাছে বোতাম খোলা। জামার হলুদের ওপব সবুজ রঙের সরু ডোরাও যেন আছে। লোকটাব মাথায় বড় বড় চুল, কপালের ওপব এমনভাবে পড়েছে, চোখ দুটো প্রায ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

লোকটার ভাবভঙ্গী, গোগোলের মোটেই ভালো লাগলো না। সে এমন ভাবে জানালা দিয়ে নীচের দিকে দেখছে, যেন লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু করবছে। অনেকটা দূরে, আয়নার বুকে তেমন স্পষ্ট না হলেও, মনে হচ্ছে, লোকটাব মুখ যেন ঘামে ভেজা, আব হাঁপাচ্ছে। গোগোল আয়না থেকে মুখ ফিবিয়ে খোলা চোখে, চিলেকোঠার জানালাব দিকে তাকালো। দেখলো, জানালাব



পাল্লাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। লোকটাকে আর দেখা গেল না।

গোগোল ভাবলো, এবার নিশ্চয় বন্ধ দরজাটা খুলে, লোক ছুটো বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সময় চলে যেতে লাগলো, দরজা খুললো না, কেউ বেরলোও না। হতে পারে গোগোলের বয়স এখন মাত্র আট বছর, তবু ওর মনে কেমন খটকা লাগলো। খুব একটা কৌতূহল জাগলো, জানবার জন্য। চিলেকোঠার ঘরের মধ্যে কী ঘটছে?

কিন্তু জানবার কোন উপায় নেই। এক তো গোগোলের এখন বাড়ি থেকে বেরনোই বারণ। তা ছাড়া, অফিস বাড়িটাতে ও ঢুকবেই বা কেমন করে? ছাদেই বা উঠবে কী করে? দারোয়ানরা ওকে ঢুকতেই দেবে না।

গোগোলের এই ভাবনার ফাঁকেই, হঠাৎ ওর লক্ষ্য পড়লো, চিলেকোঠার দরজা খুলে গেল। সেই লোকটাই মুখ বাড়িয়ে, যেন খুব সাবধানে বাইরে উঁকি দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। গোগোলের কী খেয়াল হলো, ও তৎক্ষণাৎ আয়নাটা রোদে ধরে, তার প্রতিফলিত আলো দরজার ওপরে ফেলবার চেষ্টা করলো। আলো চিলেকোঠার দেওয়ালে দু'একবার কেঁপে উঠেই দরজায় পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মুখ সরিয়ে নিল, আর দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

লোকটার এই লুকিয়ে পড়ার ভাবভঙ্গী, গোগোলের মনে আরো খটকা ধরিয়ে দিল। ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো, চিলটা কখন সেখান থেকে উড়ে চলে গিয়েছে। হঠাৎ গোগোলের খেয়াল হলো জর্জদের চারতলার জানালার ঠিক মুখোমুখি চিলেকোঠার দরজাটা। যদিও অনেকটা ফারাক, তবু ওখান থেকে কিছু দেখা যেতে পারে। কথাটা মনে হতেই, ও হাতের আয়না ঘুরিয়ে, জর্জদের জানালায় আলো ফেললো। আলোটা দু চারবার কেঁপে উঠতেই জর্জের দিদিকে আবাব জানালায় দেখা গেল। গোগোল জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে, আঙ্গুল দিয়ে জর্জের দিদিকে অফিসবাড়ির চিলেকোঠার দিকে দেখালো।

জর্জের দিদি অ্যালিস কিছু না বুঝে মাথা ঝাঁকিয়ে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গী করলেন। গোগোল আঙ্গুল দিয়ে বারে বারে চিলেকোঠার দরজার দিকে দেখাতে লাগলো। ওর ইশারা আব সংকেত মতো, অ্যালিস চিলেকোঠার দিকে তাকালেন। আবার গোগোলের দিকে তাকালেন, ঘাড় বাঁকালেন একই ভঙ্গীতে। তার মানে, তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, বুঝতেও পারছেন না।

গোগোল একবার ভাবলো, চিৎকার করে কিছু বলে। কিন্তু বাবা কাজ

করছেন, মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন বা বই পড়ছেন। গোগোল চিৎকার করলে, নিশ্চয়ই এ ঘরে তাঁরা কেউ এসে পড়বেন, গোগোলকে এভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে আয়না হাতে দেখলে রাগ করবেন। তাই ও হাত নেড়ে নেড়ে, ঘাড় ফিরিয়ে, চিলেকোঠা দেখিয়ে, অ্যালিসকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অ্যালিস কিছুই বুঝলেন না। ছেলেমানুষের ছেলে-মানুষি ভেবেই, হেসে, হাত নেড়ে, জানালা থেকে সরে গেলেন।

গোগোলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা জানবার জন্য, ওর মনটা ছটফট করতে লাগলো। আর ঠিক সেই সময়েই, গোগোল দেখলো, লোকটা এবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, শিকল টেনে বন্ধ করছে। কিন্তু আর একজন কোথায় গেল? তাকে কি ঘরের মধ্যে আটকে রাখছে? গোগোল আবার তাড়াতাড়ি রোদে আয়না ধরে, প্রতিফলিত আলো লোকটার মুখের ওপর ফেলবার চেষ্টা করলো। আলো লোকটার বুকের কাছে পড়তেই, চমকে গোগোলদের বাড়ির দিকে তাকালো। গোগোল এবার লোকটার মুখের ওপর আলো ফেললো। ফেলতেই, লোকটা দু হাতে মুখ ঢেকে, দরজার কাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে নীচু হলো। আলসের আড়াল পড়ায়, তাকে আর দেখা গেল না।

গোগোল আয়নাটা সরিয়ে নিয়ে এলো। আরো বেশ খানিকক্ষণ অফিস বাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুই দেখতে পেলো না। তখন গোগোলের মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগলো, আচ্ছা, অফিস বাড়িটা আজ বন্ধ কেন? আজ তো ছুটির দিন না। সব ব্যাপারটাই গোগোলের মনে কেমন একটা খটকা ধরিয়ে দিল। ভাবলো, বাবাই একমাত্র বলতে পারেন অফিসটা আজ কেন বন্ধ।

গোগোল মায়ের ঘরে ঢুকে দেখলো, মা বুকের কাছে বই নিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ও গেল বাবার ঘরে। বাবা এখন এক মনে কী যেন লিখছেন। গোগোলের ঘরে ঢোকা টেরই পেলেন না। কিন্তু গোগোল কিছুতেই মনের কৌতূহল চাপতে পারলো না। ও আস্তে আস্তে বাবার সামনে গিয়ে ডাকলো, 'বাবা।'

বাবা মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলছো?'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা বাবা, ও পাশের রাস্তার অফিস বাড়িটা আজ বন্ধ কেন?'

বাবা এবার অবাক্ হয়ে গোগোলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ অফিস বাড়িটা?'

গোগোল বললো, 'আমাদের বাড়ির পেছনের অফিস বাড়িটা।'

বাবা অবাক্ হয়ে, একটু ভাবলেন, তারপরে বললেন, 'ও, তুমি ওই অফিসটার কথা বলছো? ওই অফিসের কোন্ একজন বড় অফিসার কাল রাত্রে মারা গেছেন, তাই আজ ছুটি দিয়েছে। তা তোমার আবার অফিসের খোঁজে কী দরকার পড়লো?'

বলতে বলতেই, বাবার নজর পড়লো, গোগোলের হাতের আয়নার দিকে। অমনি বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এই বুঝি তোমার দুপুরের বিশ্রাম হচ্ছে। আবার তুমি গুরুপদব আয়না নিয়ে এসে, ওইসব বাজে খেলা খেলছো?'

গোগোল বাবাকে কিছু বলতে গেল। বাবা শুনলেন না, বললেন, 'না, এখন কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি গুরুপদর আয়না রেখে দিয়ে এসো, তারপরে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। শীগ্‌গির যাও।'

বাবা এমন ভাবে বললেন, গোগোলের আর কোনো কথা বলতে সাহস হলো না। ও নীচে গিয়ে, গুরুপদর ঘরে ঢুকে দেখলো, সে তখনো ঘুমোচ্ছে। গোগোল আয়নাটা রেখে দিয়ে, আবার ওপরে উঠে, বাবাব ঘরেই গেল। অফিস বাড়ির ছাদ আর চিলেকোঠার দিকে দেখলো। চিলেকোঠার দরজায় শিকল লাগানো। সেখানে কেউ নেই।

গোগোল খানিকক্ষণ দেখলো, তাবপরে বাবার বিছানাতেই শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ ভাবলো আর ভাবতে ভাবতেই, ওর চোখ বুজে এলো, চোখে ঘুম নেমে এলো। ঘুম আসাটা খুবই স্বাভাবিক। গোগোলের শরীর এখনো বেশ দুর্বল। তার ওপবে চিলেকোঠাব ব্যাপারটা নিয়ে এতো বেশী ভেবেছে, তাতেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

বিকাল প্রায় সাড়ে চারটের সময়, গোগোল ওদের রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, লোকজন গাড়ি ঘোড়া দেখছিল। ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায়, গাড়ি কমই চলে। বাস্তার ওপরেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করে, যারা অনেকে ওরও বন্ধু।

সেই সময়েই এলো জর্জ। বাবা মা চা খেতে খেতে, আর একজন বাইরের ভদ্রলোকের সঙ্গে, ঘরের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। জর্জকে দেখে গোগোল খুব খুশী হয়ে উঠলো। জর্জ ওর কাছে ব্যালকনিতে এসে, প্রথমেই বললো, 'গোগোল, তুমি আজ আয়নার আলো নিয়ে খেলছিলে?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ।'

জর্জ আবার বললো, 'তুমি কি জানলায় আলো ফেলে আমাকে

ডাকছিলে? কিন্তু ও সময়ে আমি তো ইস্কুলে ছিলাম।'

গোগোল বললো, 'জানি। আসলে আমি তোমার দিদিকে একটা জিনিস দেখাতে চেয়েছিলাম।'

জর্জ বললো, 'তাই নাকি? দিদিও বলছিল, গোগোল যেন আমাকে কী একটা বলছিল, আর অফিস বাড়ির ছাদের দিকে হাত দেখাচ্ছিল। সত্যি নাকি?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার দিদি বুঝতে পারেন নি।'

জর্জ বললো, 'ঠিক তাই। সেই জন্যই তো দিদি আমাকে তোমার কাছে পাঠালো। কী দেখাতে চেয়েছিলে তুমি?'

গোগোল তখন জর্জকে সব কথা বললো। গোগোল অবিশ্যি ইংরেজিতেই জর্জকে যতোটা সম্ভব, সব ব্যাপারটা বললো। জর্জ গোগোলের থেকে ইংরেজি ভালো জানে, কারণ ও ইংরেজিতেই সব সময় কথা বলে। তবে জর্জ বাংলাও একটু একটু বলতে পারে। ওর অনেক বাঙালী ছেলে বন্ধুও আছে।

জর্জ সব শুনে অবাক্ হয়ে বললো, 'তাই নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার তো? দিদি তোমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি, তা হলে ঠিকই দেখতো। আমি বাড়ি গিয়ে দিদিকে সব বলবো।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা জর্জ, চিলেকোঠায় কী হয়েছে তোমার মনে হয়?'

জর্জ মাথা নেড়ে বললো, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দিদি কী বলে দেখি।'

ওরা আরো খানিকক্ষণ অন্যান্য গল্প করলো। তারপরে জর্জ চলে গেল। গোগোল ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজন, ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা দেখতে লাগলো। একটু পরেই, গোগোলের মা এসে ওর পাশে দাঁড়ালেন। ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'চলো ভেতরে, এবার তুমি একটু খাবার খেয়ে ওষুধ খাবে।'

দুটো জিনিসেই গোগোলের বিশেষ আপত্তি। খাবার এবং ওষুধ। কিন্তু এখন অসুখ করেছে, কথা শুনতেই হবে, তা না হলে অসুখ সারবে না। গোগোল মায়ের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গেল।

গোগোল খাবার আর ওষুধ খেয়ে, সবেমাত্র শুকতারাটা নিয়ে পড়তে বসেছে, আর ওর মা তখন শাঁকে ফুঁ দিচ্ছেন, তখনই বহুলোকের

চিৎকার ভেসে এলো, 'আগুন আগুন। আগুন লেগে গেছে।'···

গোগোল দৌড়ে রাস্তার ধারের ব্যালকনিতে গেল। দেখলো লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। গোগোলের মাও এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। ওর বাবা একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে কমলবাবু, কোথায় ছুটছেন? কোথায় আগুন লেগেছে?'

কমলবাবু নামে ভদ্রলোক না দাঁড়িয়েই বললেন, 'আপনাব বাড়ির পেছনে, অফিস বাড়িতে।'

বাবা শুনেই তাঁর শোবার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। গোগোলও মায়ের সঙ্গে ছুটে গেল। জানালা দিয়ে দেখলো, অফিস বাড়ির গা বেয়ে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে। সন্ধ্যেবেলাব আকাশ কালো হয়ে উঠছে। বাগানের গাছে কাকগুলো কা কা করে উড়ছে। আগুনের রেশ সামান্য এক আধবার দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়াই বেশী।

আশ্চয তো! গোগোল ভাবলো। আজই হঠাৎ অফিস বাড়িতে আগুন লাগলো? গোগোল বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী কবে আগুন লাগলো বাবা?'

বাবা বললেন, 'আমি কী করে জানবো বলো। তুমি, আমি, আমরা তো সবাই বাড়িতেই রয়েছি।'

এই সময়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির ঠং ঠং শব্দ শোনা গেল। বাবা বলে উঠলেন, 'যাক, ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা তাড়াতাড়িই এসে গেছে।'

দেখা গেল, হেড লাইট জ্বালিয়ে, একটা গাড়ি, বাড়িটার এক পাশ দিয়ে, পিছনের বাগানে এসে পড়লো। তখন কয়েকটা আগুনের শিখাও দেখা যাচ্ছে। ফট্ ফট্ শব্দে যেন কিছু ফাটছে, মনে হলো। বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়া গাড়িটা থেকে, দিনের আলোব মতো উজ্জ্বল আলো বাড়িটার গায়ে পড়লো। আর হোস্ পাইপ্ দিয়ে জল ছুড়তে লাগলো। মানুষের চিৎকারের তো কোনো কথাই নেই।

গোগোল দেখলো, আব একটা গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে বাগানের দিকে এলো। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই, সেই গাড়ি থেকে কয়েকজন লাফিয়ে নামলো। গোগোলের বাবা বলে উঠলেন, 'পুলিসও এলো দেখছি।'

গোগোল পুলিস দেখে বুঝতে পারে নি। জানালা থেকে দেখলো, কয়েকজন হাত মুখ নেড়ে কী সব বলাবলি করছেন, আর ছাদের দিকে দেখাচ্ছেন। বাড়ির একটা দিকে তখন আগুনের লাল রেশ দেখা যাচ্ছে।

তারপরেই দেখা গেল, অদ্ভুত ধরনের মই ছাদের আলসের সঙ্গে আটকে, একজন লোক ছাদের উপরে উঠছে। গোগোলের বুক কেঁপে উঠলো। ছাদেব একদিকে তখন আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

একজন ছাদে উঠে কোথায় গেল, সেটা বুঝে ওঠবার আগেই আর একজনকে সেই মই বেয়ে ছাদে উঠতে দেখা গেল। তখন ছাদের দিকে, ঠিক সাপের জিভের মতো আগুনের শিখা যেন ছোবল মারছে।

বাবা নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'ব্যাপাবটা ঠিক কী ঘটেছে, বোঝা যাচ্ছে না। ছাদের ওপরে কি কোনো মানুষ আছে নাকি ?'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কবে বুঝলে ?'

বাবা বললেন, 'কেউ না থাকলে, ওরা ছাদে উঠলো কেন ? ছাদটা তো এখন জ্বলন্ত কয়লার মতো তেতে আছে, যে কোন মুহূর্তেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। কাবোকে বাচাবাব দবকার না থাকলে, এতো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চয় ছাদে উঠতো না !'

ছাদের দিকে তখন আগুনেব শিখা বেশ লেলিহান হয়ে উঠেছে। জলেও সে আগুন বাধা মানতে চাইছে না, যেন ফোঁস ফোঁস কবে, বাগে দাউ দাউ করে উঠছে। তাব মধ্যেই দেখা গেল, ছাদ থেকে, সেই মই বেয়ে কাবোকে যেন নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। একজনেব কাঁধেব ওপবে, একজনের শরীর। দুজনে, সাবধানে মই বেয়ে নেমে আসছে। ধোঁয়ায় আর আগুনেব শিখায়, তাবা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, যদিও তাদেব গায়েব ওপব আলো ফেলা আছে। আরো কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে, মইয়ের কাছে দাঁড়ালো। অনেকটা নীচে আসতেই, কয়েকজন হাত বাড়িয়ে তাদেব ধবলো। আর ঠিক সে সময়েই ভীষণ শব্দে বাড়িটাব এক অংশ ভেঙে পড়লো। সেই সঙ্গে লোক-জনের আর্ত চিৎকাব।

গোগোলের বাবা বললেন, 'ভাগ্যিস বাগানটা ছিল। বাড়িটা যদি আমাদের বাড়িব গায়ে গায়ে হতো, তা হলে কী সর্বনাশই না হতো।'

গোগোলের গা কেঁপে উঠলো, ও মায়েব কোল ঘেঁসে দাঁড়ালো। বাবা যে কথাটা কেন বললেন, ও তা বুঝতে পেরেছে। গায়ের সঙ্গে লাগালাগি হলে, গোগোলের বাড়িতেও আগুন লেগে যেতো। কিন্তু অফিস বাড়িটাব চারপাশেই অনেকখানি খালি জায়গা, ফাঁকার ওপরে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, আগুন কমে আসতে লাগলো। হোস্ পাইপের জলের তোড়ও বাড়তে লাগলো। কিন্তু বাড়িটার অনেকখানিই তখন পুড়ে গিয়েছে। এমন কি চিলেকোঠাটাও যেন মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে, থমকে

দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

গোগোল ওর জীবনে এরকম ভয়ংকর দুর্ঘটনা চোখের সামনে দেখে নি। বাগানের পিছন থেকে গাড়ি ছুটে। যখন চলে গেল, বাবা জানালা বন্ধ করে দিলেন। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে, সামনের বসবার ঘরে গেল। সেখানে গিয়ে, টেবলের ওপর টাইমপিস ঘড়িতে দেখা গেল, রাত্রি নটা বেজেছে।

বাবা বললেন, 'ন'টা বেজে গেল? আশ্চর্য! তার মানে তিন ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বললো, এখনো জ্বলছে। সব নিভতে এখনো জল ঢালতে হবে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, ওরা ছাদ থেকে কাকে নামালো?'

বাবা বললেন, 'সেটাই তো আমিও ভাবছি। ওই সময় ছাদে কে ছিল? নিশ্চয়ই খবর পেয়ে ওরা ছাদে উঠেছিল। দেখা যাক, কাল সকালের খবরের কাগজেই সব জানা যাবে।'

মা বলে উঠলেন, 'নটা বেজে গেল! গোগোল, শীগ্‌গির চল্, তোর খাবার খেয়ে, ওষুধ খেয়ে শোবার সময় হয়ে গেছে।'

গোগোলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খাবার আর ওষুধ আর শোয়া। কবে যে শরীরটা পুরোপুরি সেরে উঠবে! এখন ওর মোটেই খেতে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু উপায় নেই। যেতেই হবে। ও মায়ের সঙ্গে ভিতরের ঘরে গেল।

পরের দিন সকালে, গোগোল ঘুম থেকে উঠেই, বাবার কাছে গেল। খবরের কাগজে কী লিখেছে, তা শোনবার জন্য বাবা তখন খবরের কাগজই পড়ছিলেন।

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা কালকের কথা কাগজে কী লিখেছে?'

বাবা বললেন, 'কিছুই না। লিখেছে, আগুন লেগেছিল, অনেক কাগজ-পত্র নষ্ট হয়ে গেছে। পুলিস জানিয়েছে, আগুন লাগার ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এখনো বিশেষ কিছু জানা যায় নি।'

গোগোলের মনটা মোটেই খুশী হলো না। ও বাথরুমের দিকে গেল দাঁত মেজে মুখ ধুতে। সেই সময়েই ওদের কলিংবেল বেজে উঠলো। বাথরুম থেকেই, গোগোল টের পেলো, বেশ কয়েকজনের জুতোর শব্দ হচ্ছে। বাইরের ঘরে কী সব কথাবার্তা হচ্ছে। তার মধ্যে একজন মহিলার গলাও শোনা গেল, ইংরেজিতে কথা বলছেন।

গোগোল খুব কৌতূহল বোধ করলো। ভালো করে দাঁত মাজা হবার আগেই, বেসিনের কলের মুখ খুলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললো। আর ঠিক

তখনই ওর বাবা এসে বাথরুমের দরজায় দাঁড়ালেন। বললেন, 'গোগোল, তুমি কাল দুপুরে অফিস-বাড়ির চিলেকোঠায় কিছু দেখেছিলে?'

গোগোল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হলো, ভয়ও পেলো। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

বাবা বললেন, 'এসো, বসবার ঘরে এসো।'

গোগোল অবাক্ হয়ে বাবার পিছনে পিছনে বসবার ঘরে এলো। দেখলো ঘর ভরতি পুলিশের পোশাক পরা লোক। তার মধ্যে জর্জের দিদি অ্যালিসও আছেন। গোগোল মনে মনে আরো ঘাবড়িয়ে গেল। গোগোলের দিকে তাকিয়ে সকলেই বড় বড় চোখ করে তাকালেন। তাঁদের চোখে অপার কৌতূহল আর বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা ফুটে রয়েছে। অ্যালিস এসে জড়িয়ে ধরলেন গোগোলকে। বললেন, 'গোগোল, কাল দুপুরে, জানালায় আলো ফেলে, তুমি অফিস বাড়ির দিকে আমাকে কী দেখাচ্ছিলে?'

গোগোল বলল, 'আমি তো জর্জকে সব বলেছি।'

অ্যালিস বললেন, 'এঁদের সকলের সামনে তুমি সব ব্যাপারটা বলো তো।'

গোগোল বাবার দিকে তাকালো। বাবা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বলো. তুমি যা দেখেছ, সব বলো ওঁদের।'

একজন পুলিস অফিসার, যাঁর কোমরের বেল্টে পিস্তল রয়েছে, তিনি উঠে বললেন, 'গোগোল তুমি বসে বসে, সব মনে করে বলো। তোমার কোনো ভয় নেই, বরং তুমি সব কথা ঠিক মতো বলতে পারলে, একটা বিরাট অপরাধ ধরা পড়বে।'

গোগোল আবার ওর বাবার দিকে তাকালো। বাবা ডেকে বললেন, 'এসো, তুমি আমার কাছে বসে সব কথা বলো।'

গোগোল বাবার গা ঘেঁসে বসে একটু স্বস্তিবোধ করলো। তারপর দুপুরে গুরুপদর ঘর থেকে আয়না নিয়ে এসে, খেলতে খেলতে, যা যা ওর চোখে পড়েছিল, আর মনে হয়েছিল, সব কথা একে একে বলে গেল। গোগোল লক্ষ্য করেছিল, একজন অফিসার সব কথাই লিখে নিচ্ছিলেন। আর একজন ভদ্রলোকও। ওর কথা শেষ হতেই, একজন ওর ফটো তুলে নিল।

অ্যালিস বললেন, 'গোগোল যা বললো, এসব কথাই আমি আমার ছোট ভাই জর্জের মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু তখনো ব্যাপারটাকে আমি তেমন আমল দিই নি। তারপরে অফিস বাড়িতে আগুন লাগতে দেখেই গোগোলের

কথাগুলো মনে পড়ে গেল, কেমন একটা সন্দেহ হলো। আমি বাড়ির বাইরে ছুটে গিয়ে, ওষুধের দোকান থেকে থানায় ফোন করেছি।'

একজন পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনি তা করেছিলেন বলেই, চিলেকোঠা থেকে আমরা মৃতদেহ আবিষ্কার করতে পেরেছি, আর তার ফলেই একটা বিবাট ষড়যন্ত্র এবং সেই সঙ্গে অপরাধীও ধরা পড়ছে।'

অ্যালিস বলে উঠলেন, 'না না অফিসার, আমি কেউ নই, সব আমার এই ছোট্ট ভাইটি গোগোলের কৃতিত্ব।'

বলেই অ্যালিস এগিয়ে গিয়ে গোগোলকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরলেন। অফিসার অ্যালিসের কাছ থেকে গোগোলকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে, তার গালে একটি চুমো খেয়ে বললেন, 'আমি জানি, আসলে সব কৃতিত্বই আমাদের এই সোনার টুকরো ছেলেটির।'

সবাই গোগোলকে আদরে আদরে ভরে দিতে লাগলো। বাইরে রাস্তায়, গোগোলদের বাড়ির সামনে তখন বিরাট জনতার ভিড়। পুলিস সামলিয়ে রাখতে পারে না। তারা জানতে চায়, ঘটনাটা কী ঘটেছে। একটু পরেই জনতার মুখে মুখে গোগোলের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে গোগোলের মাও ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশের বড় অফিসার গোগোলের বাবা মা, দুজনের কাছেই মাথা নত করে, আবেগের সঙ্গে বললেন, 'আপনাদের সন্তান গোগোল, আমাদের সকলের গর্ব। অনেক ছেলেই আয়না নিয়ে খেলা করে, কিন্তু খেলতে খেলতে তার চারপাশের সমস্ত খুঁটিনাটি কেউ এমন করে লক্ষ্য করে না। সে দৃষ্টিশক্তি আর ভাবনা করার ক্ষমতা সকলেব থাকে না, যা গোগোলের আছে। সেইখানেই গোগোলের কৃতিত্ব।'

সকলেই গোগোলকে আরো কয়েক দফা আদর করে, অনেকগুলো ফটো তুলে বেরিয়ে গেলেন। গোগোলের বাবা মায়ের ফটোও বাদ গেল না। কিন্তু গোগোল দেখলো, মায়ের চোখে জল। সবাই চলে যাবার পরে গোগোল মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা তুমি কাঁদছো কেন?'

মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওরে, তুই যে এমন এক একটা কাণ্ড করিস, আমার বুকের মধ্যে কাঁপে। আমাব একটা ছেলে তুই, কোন দিন যে কী বিপদে পড়বি, তাই ভাবি।'

গোগোল মায়ের গলা জড়িয়ে ধবে বললো, 'ইস, বিপদে কেন পড়বো? আমি দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবো।'

মা ওকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, 'তাই যেন আসতে পারো। এখন

চলো তাড়াতাড়ি, তোমার ওষুধ খাবাব সময় হয়ে গেছে।'

উঃ, আবার সেই খাবার আর ওষুধ।

পরের দিন খবরের কাগজে, গোগোলের সঙ্গে অ্যালিস ভগ্নী আব বাবা মায়ের ছবিসহ, সরকারি অফিস ভবনেব আগুন লাগা ও ষড়যন্ত্রেব কাহিনী প্রকাশ হলো। কিন্তু গোগোল ব্যাপাবটা কিছুই বুঝতে পাবলো না। ও বাবাকে গিয়ে ধবলো।

বাবা বললেন, সব বিষয়টা বোঝবাব মতো বুদ্ধি তোমাব এখনো হয় নি। আমি তোমাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে লোকটিকে তুমি গতকাল চিলেকোঠায় একজনকে জাপটে ধরে ঢুকতে আব বেবোতে দেখেছিলে, সে লোকটা আসলে একজন জঘন্য খুনী। সেও একজন বড় অফিসাব ছিল, কিন্তু বহু লক্ষ লক্ষ সবকাবি টাকা সে চুবি কবেছিল। সেসব যাঁবা টেব পেয়েছিল, তাঁদেব দুজনকে সে দুদিনে মেবে ফেলেছে। প্রথমে একজনকে তাঁব বাড়িতে, সে কাবণে অফিস বন্ধ ছিল। দ্বিতীয়, যাঁকে গতকাল চিলেকোঠায় মারতে দেখেছ। কিন্তু লোকটা তাতেও শান্ত হয়নি, কাগজপত্রেব প্রমাণ লোপাট কবাব জন্য, দাবোয়ানেব সঙ্গে শলাষড়যন্ত্র কবে, গোটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমাব ঘটনাটা যদি অ্যালিসেব মাবফত পুলিসেব কানে না যেতো, তবে পুলিস কিছুই ধবতে পাবতো না।'

গোগোল অবাক্ হযে সব শুনলো, তাবপবে জিজ্ঞেস কবলো, 'সেই লোকটা ধবা পড়েছে?' বাবা বললেন, 'এখনো পড়ে নি, তবে তুমি যে বর্ণনা দিয়েছ, তাব থেকে পুলিশ তাকে চিনতে পেবেছে। সে পালিযে আছে কোথাও, তাকে খোঁজা হচ্ছে।'

গোগোল অবাক হয়ে, মনে মনে সেই লোকটাব কথা ভাবতে লাগলো। এখন ও বুঝতে পেবেছে, চিলেকোঠাব মধ্যে তাহলে ছুবি ঝলকিয়ে উঠতেই দেখেছিল!

বাবা বললেন, 'ওই, তোমাব আযনা নিয়ে খেলাব জ্বালায কতো বড কাণ্ড হয়ে গেল।'

গোগোল বাবাব দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওব মুখে দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠলো।

কাইরং মঠে গোগোলের কাণ্ড



গোগোলের কীর্তিকলাপেব কাহিনী আগেই তোমাদেব কিছু জানা হয়েছে। ওর শেষ কীর্তি 'আয়না নিয়ে খেলতে খেলতে' জানাজানি হয়ে গেছে। সেবারে গোগোল অসুস্থ ছিল। বাড়ি থেকে বেবনো ছিল বন্ধ। কিন্তু ঘরেব জানালায় বোদে আয়না বেখে, আলোব খেলা খেলতে খেলতে এক অফিস বাড়ির আগুন লাগাবাব ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছিল

গোগোল কিন্তু আর আগেব মত নেই। আগে যেমন ওর বাবাকে সব বিষয়েই নকল করতো, সে রকম আর কবে না। নকল করার ব্যাপার-গুলো দেখলেই তো হাসি পাবার কথা। ওর বাবা যেমন করে সিগারেট খান আর এ্যাটাচি হাতে নিয়ে চলেন, আগে ও প্রায়ই তা নকল কবতো। বাইবের কেউ বাবাকে ডাকতে এলে, এমন চালে কথা বলতো, যেন ও একটা আদ্যিকালের বুড়ো।

গোগোল এখন আর ওসব কবে না। আট বছর বয়েস হলো। এখন ছবি আঁকা আর গল্পের বই পড়ার দিকে ঝোঁক হয়েছে বই পড়ার ঝোঁকটা অবশ্য খুবই ভালো। অনেক কিছু নিজের থেকেই জানা যায়। কিন্তু আবার বই পড়ে অন্য ঝোঁকও বাড়ে। যেমন গোগোলের বেলায় হয়েছে। ও যখন পুরী বেড়াতে গিয়েছিল বাবা মায়ের সঙ্গে, সেবার এক খালি বাড়ির উঠোনে

পর্বতপ্রমাণ বালির ঢিবিতে সোনালী পাড় দেখতে পেয়েছিল, আর সেই পাড়ের নিচেই লুকিয়ে রাখা ছিল এক মহিলার মৃতদেহ। মহিলাকে খুন করে গুম করা হয়েছিল। গোগোলের দ্বারাই সব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

গোগোল সে-সব কথাই মনেই রাখে নি, এখন ও বই পড়ে জানতে পেরেছে, পুরীব জগন্নাথ দেবের যে মন্দির, সেই মন্দিরে নাকি ভগবান বুদ্ধের দাঁত রাখা আছে। যেমনি জানা, অমনি পুরীর মন্দির নিয়ে ওর ভাবনা বেড়ে গিয়েছে। বুদ্ধদেবের দাঁত! কেন সেখানে রাখা আছে, কী ভাবে রাখা আছে, আর বুদ্ধদেবের কোনো মূর্তি সেখানে নেই কেন? আব জগন্নাথ দেবই বা কে, তাঁর সঙ্গে বলরাম, শুভদ্রা, তাঁরাই বা কে? আর ওর যতো জানতে চাওয়া, সবই ওর বাবার কাছে।

গোগোলের বাবা ওকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বুদ্ধের যাঁরা ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁবাই ওই মন্দিবের নিচে বুদ্ধের দাঁত রেখে দিয়েছেন। জগন্নাথ দেবের মন্দির পরে হয়েছে। আসলে মন্দিরটা আগে ছিল একটি বৌদ্ধদের স্তূপ। বুদ্ধের সেবকদের বৌদ্ধ বলে। আর তাঁরা স্তূপ করে, সেখানে ধ্যান করতেন। বৌদ্ধ আর হিন্দু, দুটো আলাদা ধর্ম। এখন কথা হচ্ছে, পুবীর বৌদ্ধ স্তূপ কেমন করে হিন্দু দেবতা জগন্নাথের মন্দিব হলো, সে সব জানতে আর বুঝতে হলে, গোগোলকে আর একটু বড় হতে হবে। পড়তে হবে অনেক ইতিহাস, আব তাব জন্য দরকার জ্ঞান লাভ করা।

গোগোল এমনিতেই কল্পনাবাগীশ। একটা কিছু শুনলেই তা নিয়ে ও ভাবতে আরম্ভ করে। তারপর থেকে ও যতোবারই পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কথা ভেবেছে, ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে এক পাটি দাঁত। যদিও এটা ভাববাব কোনো কারণ নেই, আড়াই হাজার বছর আগে যে দাঁত রাখা হয়েছিল, এখনো তা অটুট আছে। সব থেকে বড় কথা, বুদ্ধের দাঁত ওখানে রাখা ছিল। অতএব ভগবান বুদ্ধেব স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে, জায়গাটি পুণ্যের।

এসব থেকে বোঝা যায়, গোগোলের ভাবনা চিন্তা আজকাল একটু অন্য-রকম হয়েছে। কৌতূহল ওর বরাবরই বেশি। আর কৌতূহল না মিটলে ওর অশান্তির শেষ নেই। এর মধ্যে আবার এক এক সময় খুব ছেলেমানুষিও দেখা যায়। যেমন সম্প্রতি তিব্বত দেশ সম্পর্কে, একটা বই পড়তে পড়তে ওর খেয়াল হলো, ঘোড়ায় চাপবে। ওর ধারণা, ও কখনো ঘোড়ায় চাপে নি। প্রথমে গিয়ে ও ওর মাকে ধরলো, 'আমার খুব ঘোড়ায় চাপতে ইচ্ছে করছে। আমি কখনো ঘোড়ায় চাপিনি।'

মা বললেন, 'সে কি! যেবারে আমরা কাশ্মীর গেলুম, সেবারে পহেল-গাঁওয়ে তুই ঘোড়ায় চেপেছিলি।'

গোগোল মনে করবার চেষ্টা করলো। একটু যেন আব্‌ছা আব্‌ছা মনে হলো, ও ঘোড়ায় চেপে আছে, আর কেউ ওকে দু হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু তাতে ওর মন একটুও ভরলো না। বললো, 'সে তো কত বছর আগের কথা, আমি ভুলে গেছি।'

মা বললেন, 'সেটা অবিশ্যি হতে পারে। তখন তুই বেশ ছোট ছিলি। তবু তো একটা ডাকাতদল তোর জন্যই ধরা পড়েছিল।'

গোগোল চোখ বড় করে বললো, 'সেই ইঁদুরের খুট্‌ খুট্‌ তো?'

মা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ইঁদুরের খুট্‌ খুট্‌ই বটে।'

গোগোল বললো, 'জানো মা, আমি কিন্তু চোখ দুটোর কথা কখনো ভুলি না। সেই যে গাড়ির পেছনের চারদিক ঢাকা ওয়াগনের দেয়ালের ফুটোয় চকচকে চোখ আমাকে দেখেছিল।'

মা হেসে বললেন, 'ওসব মাথায় থাকলে আর ঘোড়ায় চাপার কথা কখনো মনে থাকে?'

গোগোল খানিকটা জেদ ধরে বললো, 'না মা, আমি কোনো কথা শুনবো না, আমি ঘোড়ায় চাপবো।'

মা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কলকাতায় এখন কোথায় তোমাকে ঘোড়ায় চাপাতে নিয়ে যাবো? যা বলবার তোমার বাবাকে বলো।'

গোগোল তারপরেই জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা মা, লামা কাদের বলে?'

মা একটু ভেবে বললেন, 'তিব্বতের সন্ন্যাসীদের লামা বলে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আর খাম্‌পা?'

মা এবার একটু থমকে গেলেন। খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, 'খাম্‌পারাও তিব্বতের লোক শুনেছি, কিন্তু তারা যে কী করে, আমি ঠিক জানি না।'

গোগোল অমনি হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, 'হেরে গেলে, হেরে গেলে। আমি জানি খাম্‌পারা কী করে। খাম্‌পারা বেশির ভাগই তিব্বতের পাহাড়ে পাহাড়ে ডাকাতি করে বেড়ায়, কেউ কেউ রাজার সৈন্যও হয়।'

মা বললেন, 'জানো তো তা হলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি খবরের কাগজে পড়েছি, খাম্‌পারা তিব্বতের লোক। তিব্বত যখন চীনারা দখল করে, তখন অনেক খাম্‌পা আমাদের ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিল। এতে যদি তুমি মনে করো আমি হেরে গেছি, তা হলে হেরে গেছি।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'তিব্বত দেশটা কেমন মা?'

মা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আমি কী করে বলবো? তুমি খামপাদের কথা জানো, আর তাদের দেশের কথা জানো না?'

গোগোল বললো, 'আমি তো ছোট একটা লেখা পড়েছি। যেখানে কাঞ্চনজংঘা আছে, সেটাই নাকি তিব্বত। কিন্তু কাঞ্চনজংঘা তো বরফে ঢাকা পাহাড়, সেটা আবার একটা দেশ হয় কেমন করে?'

মা বললেন, 'কেন হবে না? পাহাড়ের দেশ বলে ওগুলোকে। পাহাড়ের ওপর ঘর বাড়ি, পাহাড় কেটে রাস্তাঘাট করা হয়। পাহাড়ের গায়ে চাষ আবাদও হয়। কাশ্মীরে তুমি দেখনি? ওটাও পাহাড়ি দেশ।'

গোগোল বললো, 'দেখেছি তো, কিন্তু আমার ভালো মনে নেই। জানো মা, আমার কাঞ্চনজংঘায় যেতে ইচ্ছে করছে।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'সেখানে তুমি যাবে কী করে? কাঞ্চনজংঘা তো তিব্বতে। সে-দেশ এখন চীনারা দখল করে নিয়েছে। তারা আমাদের যেতে দেবে না। তা ছাড়া, ও দেশে যাওয়া অনেক কষ্টের। তবে হ্যাঁ, আমাদের দেশে থেকে কাঞ্চনজংঘা দেখা যায়।'

গোগোল চোখ বড় বড় করে বললো, 'সত্যি? কখনো দেখিনি তো?'

মা হেসে বললেন, 'কলকাতা থেকে কি আর দেখা যায়? দার্জিলিং থেকে দেখা যায়। সেটাও একটা পাহাড়ি দেশ। হিমালয়ের ওপরে। কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশের মধ্যেই।'

গোগোল অমনি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তাহলে আমি দার্জিলিং যাবো।'

মা বললেন, 'তোমার বাবাকে বলো।'

গোগোলের বাবা, গোগোলের মুখে তিব্বতের কথা শুনে বললেন, 'তুমি যে-লেখাটা পড়ে তিব্বতের বিষয় জেনেছো, ওটা খুবই ছোট লেখা। সামান্য ভূগোল বোঝাবার জন্য ওটা লেখা হয়েছে।'

গোগোল বললো, 'কিন্তু লামা সন্ন্যাসীদের কথা, খাম্‌পাদের কথা আর ইয়াক্ ছাগলদের কথা ওতে লিখেছে। আচ্ছা বাবা, ইয়াক্ ছাগল নাকি আমাদের গরুর থেকেও বড় হয়? তাহলে ওগুলোকে ছাগল বলে কেন?'

বাবা হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই সেরকম তফাত আছে। ছাগলের ল্যাজ, পায়ের খুর, মাথার শিং সবই আলাদা। তাছাড়া, ছাগলের দাড়ি হয়, গরু মোষের কখনো তা হয় না। ভেড়ার মতো পাকানো না হলেও, ইয়াকের

গায়ে বড় বড় লোম হয়। ইয়াকের মুখও মোটেই গরু বা মোষের মতো নয়, ছাগলের মতোই। তবে হ্যাঁ, ওদের চেহারাগুলো হয় বিরাট, আমাদের এ দেশের গরুর থেকেও বড়। পাহাড়ের রাস্তায় ওরা খুব ভালো চলতে পারে। আর তেমনি বোঝাও বইতে পারে। আবার দুধও দেয় তেমনি। এমন কি, তিব্বতের লোকেরা ইয়াকের মাংসও খায়।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সে কি! ওদেশের লোকেরা ইয়াকের দুধ খায়, আবার মাংসও খায়?'

বাবা বললেন, 'এতে অবাক হবার কী আছে? আমাদের দেশে লোকে ছাগলের দুধ খায়। আবার ছাগলই যখন পাঁঠা আর খাসী হয়, তখন তার মাংসও খাওয়া হয়। ব্যাপারটা সেইরকমই? তবে ইয়াক ওদের দেশে খুবই উপকারী। বরফে আর ভীষণ শীতে, ইয়াক ছাড়া উপায় নেই। কোথাও যেতে হলে ইয়াকের পিঠে মাল চাপিয়ে দেয়। পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওরা খুব তাড়াতাড়ি চলতে পারে। যা ঘোড়া বা গাধা পারে না। তুমি যদি তিব্বত সম্পর্কে জানতে চাও, আমি তোমাকে কিছু কিছু বলতে পারি। তবে এখন নয়। সন্ধ্যেবেলা। এখন তোমার মাস্টারমশায় পড়াতে আসবেন। পড়া করার পরেও যদি তোমার জানতে ইচ্ছে করে, তখন বলবো।'

গোগোল তাতেই রাজী। ওর মাথায় এখন তিব্বত, লামা, খাম্‌পা, ইয়াক, সব গিজ্‌ গিজ্‌ করছে। মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসেও, তিব্বতের কথা না বলে পারলো না। কিন্তু মাস্টারমশাই ইস্কুলের আন্টিদের থেকেও কড়া। তিব্বত বাদ দিয়ে তিনি ক্লাসের পড়াতেই মনোযোগ দিতে বললেন। ফলে সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত গোগোল আর অন্য কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে পারলো না, ইস্কুলের পড়া, পরের দিনের হোম টাস্ক শেষ করে নিল। পড়া শেষ হতেই, এক ছুটে বাবার কাছে।

বাবা আর মা তখন নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলছিলেন। গোগোল বাবার পাশের চেয়ারটিতে বসে বললো, 'বলো বাবা, তিব্বতের কথা বলো।'

মা বলে উঠলেন, 'না না, এখন অন্য কথাবার্তা হচ্ছে। তাছাড়া তুমি একটু পরেই খেয়ে নিয়ে শুতে যাবে।'

গোগোল অমনি মুখ ভার করে বাবার দিকে তাকালো। বাবা হেসে মাকে বললেন, 'আমি গোগোলকে কথা দিয়েছি, পড়া হয়ে গেলে, ওকে আমি তিব্বতের বিষয়ে বলবো।'

গোগোলের মা সংসারের বিষয়ে কিছু বলছিলেন। তিনি একটু বিরক্ত হলেন। বাবা যেন মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ক্ষমা চেয়ে নিলেন,

বললেন, 'তুমি আর আমি পরে কথা বলবো, এখন গোগোলকে তিব্বতের কথা একটু বলে নিই।'

গোগোল খুশি হয়ে বললো, 'মা, তুমিও শোনো না।'

মাও হাসলেন, বললেন, 'তাই শুনি। এখন তো আমার আর কোনো কাজ নেই।'

বাবা বলতে আরম্ভ করলেন, 'পৃথিবীতে অনেক পাহাড়ি দেশ আছে, কিন্তু তিব্বত তার থেকে একেবারে আলাদা। এখন তিব্বত চীনারা দখল করে নিয়েছে, এখনকার কথা আলাদা। কিন্তু আগে নিয়ম ছিল, সন্ন্যাসী, মানে লামারাই ওদেশের সব থেকে বড়। তিব্বতীরা সকলেই বৌদ্ধ—অর্থাৎ বুদ্ধদেবই তাদের একমাত্র ঈশ্বর। তুমি নিশ্চয়ই দলাই লামাব নাম শুনেছো? চীন যখন তিব্বত আক্রমণ করলো, দলাই লামা আমাদের দেশে চলে এলেন। কিন্তু কে এই দলাই লামা? কেন তিনি তিব্বতেব সব থেকে বড় মানুষ ছিলেন?

'দলাই লামা হচ্ছেন একজন সাধারণ পরিবারের ছেলে। উনি যখন খুব ছোট ছিলেন, ওঁর বাবা মা ওঁকে বৌদ্ধ মঠে দিয়ে দেন। ওদেশে এটা একটা নিয়ম, বাড়ির একটি ছেলেকে, মঠে দান করা হয়, যাতে ছেলেটি সত্যিকারের একজন জ্ঞানী নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হতে পারে। সে কখনো আর বাবা মায়ের কাছে বাড়ি যেতে পারবে না। জীবনে কখনো বিয়ে করতে পারবে না। অর্থাৎ সে তার সারা জীবন মঠেই কাটিয়ে দেয়।

এঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁকে দেশের লোক 'জীবিত ঈশ্বব' মনে করে। যেমন দলাই লামা। উনি যখন লামা হয়েছিলেন, তখন ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে 'জীবিত ইশ্বর' মনে করা হতো। ইংরেজিতে বলে 'লিভিং গড।' কিন্তু তিনি শুধু গড নন, তাঁকে 'গড কিং'ও বলা হয়। যাঁকে বলা যায় 'ভগবান রাজা।' তিনি সত্যি সত্যি রাজাও বটে। বাজপ্রাসাদে তিনিই থাকেন, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেপাই, পুলিশ, সব তাঁব হুকুমেই চলে। তিব্বতের রাজধানীর নাম তুমি জানো?'

বাবার প্রশ্নে, গোগোল উৎসাহিত হয়ে বললো, 'হ্যাঁ। তিব্বতেব রাজধানীর নাম লাসা।'

বাবা বললেন, 'ঠিক। লাসাতে পোতালা নামে বিরাট এক রাজপ্রাসাদ আছে। চৌদ্দতলা রাজপ্রাসাদ। তার মধ্যে বাগান, জলের ফোয়ারা, নাচগানের জায়গা, সবই আছে। সব থেকে উঁচু ঘরের ছাদটা সবই সোনা দিয়ে তৈরী। দলাই লামা, আরো অনেক লামা সন্ন্যাসীদের নিয়ে সেই

পোতালা প্রাসাদে থাকতেন। সৈন্যসামন্তরা সেই প্রাসাদ পাহারা দিত। আমাদের গভর্নর যেমন গরমের সময় তাঁর দার্জিলিং-এর বাড়িতে গিয়ে থাকেন, দলাই লামারও সেইরকম আলাদা বাড়ি আছে।

'আমাদের গভর্নর যেমন গরমের সময় দার্জিলিং-এর ঠাণ্ডায় চলে যান, দলাই লামা অতিরিক্ত শীতের সময় তাঁর প্রাসাদ থেকে নেমে একটু গরম জায়গায় যান। যে-বাড়িতে তখন থাকতেন, তার নাম 'সামার গার্ডেন।' বুঝতেই পারছো, সামার মানে গরমকাল, গার্ডেন মানে বাগান। তার মানে গরমকালের বাগান বাড়িতে গিয়ে থাকতেন। তা বলে যেন ভেবো না, আমাদের এখানে সামার বলতে যেরকম গরম বোঝায়, তিব্বতেও সেইরকম গরম লাগে। আমাদের এখানে মাঘ মাসে যেরকম শীত, ওদেশের গরমের সময়, তার থেকেও বেশি শীত। কাঞ্চনজংঘার ছবি দেখেই বুঝেছ, ওখানে বারো মাস বরফ থাকে। মোটের ওপর জেনে রাখো, ওখানকার লোকেরা খুবই ধর্মভীরু। আর দলাই লামাকে ওরা একজন জীবিত বুদ্ধদেব মনে করে। তুমি আর কি জানতে চাও বলো?'

গোগোল বললো, 'আর খাম্পা? খাম্পাদের কথা বললে না?'

বাবা হেসে বললেন, 'তাও তো বটে। তবে তুমি তোমার বইয়ে যা পড়েছ, তা ঠিকই। খাম্পারা অনেকেই ডাকাত। খাম্পারা হলো তিব্বতেরই একটা উপজাতি। তুমি বেদুইনদের কথা শুনেছো?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ, বইয়ে পড়েছি। মরুভূমিতে তারা ডাকাতি করে।'

বাবা বললেন, 'খাম্পারাও অনেকে সেইরকম। তারা তিব্বতের পাহাড়ে পাহাড়ে ডাকাতি করে বেড়ায়। বেদুইনদের মতো তারাও ঘোড়ায় চেপে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। লাসা বৌদ্ধদের কাছে একটা বিশেষ তীর্থস্থান। নেপাল, সিকিম, ভুটান আর আমাদের এই দেশ থেকে, অনেকেই লাসায় তীর্থ করতে যেতো। খুব কষ্ট করে যেতে হতো পাহাড়ের বরফের ওপর দিয়ে, ভীষণ বিপদের মধ্যে, অনেকদিন ধরে তাদের যেতে হতো। খাম্পারা সুযোগ পেলেই এদের সব কিছু লুঠতরাজ করে নিত। তবে এটাও মনে রেখো, খাম্পারা দেখতে শুনতে যেমন তিব্বতের অন্যান্য লোকের থেকে লম্বা চওড়া, তেমনি সাহসী। সেইজন্য খাম্পারা অনেকে আবার সৈন্যও ছিল। তারা ডাকাতি করতো না, দলাই লামার সৈন্য ছিল। তারা ভালো যুদ্ধ করতে পারে।'

গোগোল অবাক হয়ে বললো, 'তবে ওরা সবাই সৈন্য হয়ে যেত না কেন?

ডাকাতি করতে যেত কেন?'

বাবা বললেন, 'সেইখানেই তো মুসকিল। ডাকাতি যারা করে, তাদের তুমি কী করে বোঝাবে? আমাদের দেশে যারা ডাকাতি করে, তারা কেন দশজনের মতো চাকরি করে না, ভালোভাবে জীবন কাটায় না? ডাকাত কেন হয়, তার যেমন অনেক কারণ আছে, তেমনি ডাকাতি ছেড়ে দিতে বললেই তারা ছেড়ে দেয় না, তারাও অনেক কারণ দেখায়। কিন্তু আসলে তো কাজটা খারাপই। তবে খাম্‌পারা ছাড়াও, তিব্বতের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, এরকম অনেক যাযাবর আছে। ইংরেজিতে তাদের নোম্যাডস্‌ বলে। এরা বহু ভেড়া আর ইয়াক ছাগলের দল নিয়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় এরা মানুষ ভালো। ইয়াকের চামড়ার জামা পরে, ইয়াকের চামড়া দিয়েই এরা তাবু তৈরি করে। এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে বাস করে। খাম্‌পারা অনেক সময় এদের ওপরেও দৌরাত্ম্য করে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কী করে? মারধোর করে?'

বাবা বললেন, 'তা করে বৈকি। যাযাবরদের ভেড়া, খাবার দাবার জোর করে নিয়ে যায় বাধা দিলে মারধোর করে। যাযাবররা ভেড়ার লোম, ইয়াকের চামড়া বিক্রী করে যা টাকা পয়সা পায়, সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'দলাই লামা আর ওদেশের অনেক লোক তো আমাদের দেশে পালিয়ে এসেছে। খাম্‌পারা আসে নি?'

বাবা বললেন, 'তা এসেছে বৈকি। কিছু পালিয়ে এসেছে। আমাদের গভর্নমেন্ট ওদের সব সময়ে চোখে চোখে রাখে।'

গোগোল অমনি বায়না ধরলো, 'বাবা, আমি খামপা দেখবো।'

বাবা আর মা দুজনেই হেসে উঠলেন। বাবা বললেন, 'খামপা কোথায় দেখবে? তারা কালিম্পং আর তার আশেপাশে কিছু আছে।'

গোগোল বললো, 'তা হলে আমরা কালিম্পং-এ যাবো।'

বাবা বললেন, 'কালিম্পং-এ গেলে তুমি কিন্তু ঘোড়ায় চাপতে পারবে না। ঘোড়া আছে দার্জিলিং-এ।'

গোগোলও ছাড়বার পাত্র নয়, বললো, 'দার্জিলিং থেকে কালিম্পং যাওয়া যায় না?'

বাবা যেন একটু মুসকিলে পড়ে গেলেন, বললেন, 'তা যাওয়া যায়।'

গোগোল বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তা হলে আমরা তাই যাবো।'

মা বললেন, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তোমার গরমের ছুটি হোক, তখন ভাবা যাবে। এখন খেতে চলো।'

গোগোল বললো, 'কিন্তু আমি বলে রাখছি, দার্জিলিং-এ ঘোড়ায় চাপবো, আর কালিম্পং-এ যাবো।'

গোগোলের কথাই শেষ পর্যন্ত থাকলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে, ইংরেজি মে মাসের প্রথম দিকে, গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে এলো। এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই, গোগোল ঘোড়ায় চাপবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। কিন্তু হলে কি হবে। প্রথম দিন হোটেলে পৌঁছে, জামা কাপড় ছেড়ে একটু সুস্থির হতে না হতেই সন্ধ্যা নেমে এলো। কলকাতায় কী গরম! আর দার্জিলিং-এ কী শীত! গোগোলকে রীতিমতো গরম মোজা, গরম কোট প্যান্ট পরতে হলো। ওদের হোটেল থেকে বেরিয়ে, সামনেই ম্যাল্। একটু চা জলখাবার খেয়ে, গোগোল যখন বাবা মা'র সঙ্গে ম্যালে এলো, তখন রীতিমতো অন্ধকার। তার ওপরে কুয়াশা, ফগ যাকে বলে। অবিশ্যি অনেকগুলো আলো জ্বলছিল চার দিকে। বড় বড় দোকানেও আলো জ্বলছে। কিন্তু কারোকেই স্পষ্ট দেখা যায় না। সব যেন কেমন ছায়া ছায়া।

ম্যালের যেখানে ঘোড়ার আস্তাবল, সেখানে তখন একটিও ঘোড়া নেই। সব চলে গিয়েছে। সন্ধে হলে আর ঘোড়ায় চাপার নিয়ম নেই। গোগোলের নাকে কেবল ঘোড়ার গন্ধই লাগলো। রাত না পোহালে আর ঘোড়ায় চাপা যাবে না।

বাবা বললেন, 'সকালে অনেক ঘোড়া আসবে।'

গোগোল সেই আশাতেই রইলো। কিন্তু গোগোল যে কোনো ভুটিয়া বা নেপালী দেখলেই, বাবাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'বাবা, এ লোকটা কি খাম্পা?'

বাবা বারে বারেই হেসে বললেন, 'দার্জিলিং-এ খাম্পা কেউ নেই বলেই জানি। এরা তো সব এখানকার লোক। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ তিব্বতের লোক আছে।'

গোগোল যে-কোনো পাহাড়ি লোক দেখলেই, তার মুখের দিকে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কুয়াশাও কেটে গেল একটু বাদেই। তখন কোনো কোনো পাহাড়ি লোক গোগোলকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে, হেসে মাথা নাড়িয়ে কী সব বললো। গোগোল ওদের কোনো কথাই বুঝতে পারলো না। আর ওর মনে হলো, এখানকার সব লোকের

চেহারাই যেন এক রকম। হাসলে কারোরই চোখ দেখা যায় না। গালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ে, আর চোখের কোণেও। তবু কেন যেন গোগোলের ভয় লাগছিল।

কুয়াশা সরে যেতে, দেখা গেল ম্যাল-এ লোকজনের ভিড় বাড়ছে। গোগোল ভেবেছিল, রাত হয়ে গিয়েছে, এখন সবাই বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু উল্টোটাই ঘটতে দেখলো। নানারকম পোশাকে সেজে অনেক মহিলা পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গোগোলের লক্ষ্য অবশ্য পাহাড়ের লোকদের ওপরেই বেশি। সমতলের লোকদের প্রতি ওর তেমন কৌতূহল নেই। কলকাতায় সারা ভারতবর্ষের লোক বারোমাসই দেখা যায়। তা ছাড়া, ও যে-ইস্কুলে পড়ে, সেখানে পাঞ্জাবী মাদ্রাজী গুজরাটি মারাঠী ওড়িয়া, প্রায় সব প্রদেশের ছেলেরাই আছে। আবার জর্জের মতো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধুও ওর সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়ে। দু একজন নেপালী ছেলেও আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যেন এখানকার পাহাড়ি মানুষদের বিশেষ মিল নেই।

গোগোল অদ্ভুত পোশাক পরা একজনকে দেখছিল। মেরুন রঙের পোশাক, তার কিছু অংশ বুকের কাছ থেকে নামিয়ে, কোমরে বেল্টের মতো জড়ানো। বেল্টের মতোও ঠিক নয়, যেন জামার লম্বা হাতা দুটো কোমরে জড়িয়ে গিঠ্ দিয়ে রেখেছে। ভিতরে গলাবন্ধ একটা গরমের জামা রয়েছে। আর নিচে গাউনের মতো পোশাক ঝুলছে।

গোগোল ম্যাল-এর আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল, লোকটি টকটকে ফরসা, গাল দুটো লাল। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাটা, যেন গোটা মাথা কামিয়ে ফেলার পরে নতুন গজাবার মতো। চুলের রঙ কুচকুচে কালো। গালের হনু দুটো একটু বেশি উঁচু। নাকটা খুব বোঁচা নয়, কিন্তু মোটা। লোকটিকে মনে হলো বাবার থেকেও বয়স কম। পায়ে হাঁটু অবধি ঢাকা চকচকে কালো জুতো আর মোজা পরা। সে আর একজনের সঙ্গে কী ভাষায় যেন কথা বলছিল। গোগোল যার একবর্ণও বুঝতে পারছে না। আর একটি লোকের পোশাকও একরকমই, তবে তার বয়স একটু বেশি। তার হাতে একটা নীল পাথরের মালা। কথা বলতে বলতেও, যেন জপ করার মতো, মালার পাথরে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে।

অল্প বয়স যার, সে কয়েকবারই গোগোলের দিকে তাকিয়ে দেখলো। চোখাচোখি হলেই, গোগোল চোখ ফিরিয়ে বাবা মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল। ও এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন মোটেই লোকটাকে দেখছে না। বাবা মাও একটু দূরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে গোগোলকে এক একবার দেখে

নিচ্ছিলেন। আর গোগোলের মনে হলো, লোক দুটির যে-রকম পোশাক আব চেহারা, ও যেন কোনো বইয়ে এরকম ছবি দেখেছে।

অল্প বয়সী লোকটি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকা, তোমার নাম কী?'

গোগোল জানে, 'ইয়েস বয়, হোয়াট ইজ য়োর নেম?' মানে তাই হয়। গোগোল প্রথমটা থতিয়ে গেলেও উচ্চারণ করলো, 'গোগোল'। কিন্তু ডাক নামটা বলেই, ওর খুব লজ্জা লাগলো। তাই আবার তাড়াতাড়ি বললো, 'ওই নামেই বাড়িতে ডাকে।'

লোকটি হাসলেন। গালে আর চোখের কোলে ভাঁজ পড়লেও, চোখ দুটি একেবারে ঢেকে গেল না। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'বেশ ভালো তোমার নাম। তুমি বাঙালী, না?'

গোগোল খুব অবাক হয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে ইংরেজিতে বললো, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?' (বাট হাউ ডু ইউ নো?)

অপরিচিত পাহাড়ি লোকটি যেন খুবই মজা পেলেন। তাঁর মোটা ভুরু দুটো নাচিয়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আই নো। বসু—বসু ইজ বেঙ্গলী।'

গোগোল হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কলকাতা থেকে আসছো?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ।'

পাহাড়ি লোকটি বললেন, 'আমি কলকাতা দেখেছি, তোমাদের কলকাতা।' বলে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে গোগোলকে দেখালেন, আবার বললেন, 'বাট ইয়োরস ক্যালকাটা ভেরি হট।'

গোগোল বুঝলো, কলকাতা ওঁর কাছে খুব গরম লেগেছে। ও এখন মোটামুটি ইংরেজিতে কথা বলতে পাবে। ওদের ইস্কুলে ট্রানজিশন থেকেই এসব শেখানো হয়েছে। ও একটু লজ্জা পেলেও, জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি জানতে পারি মহাশয়, আপনার দেশ কোথায়?'

পাহাড়ি লোকটি খুব খুশি হয়ে হেসে, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়? আমার দেশ তিব্বত।' বলে তিনি হাত তুলে উত্তর-পূর্ব দিকে দেখালেন।

গোগোলের মনটা যেন অবাক খুশিতে শিউরে উঠলো। উনি একজন তিব্বতী? সেইজন্যেই ওর বারে বারে মনে হচ্ছিল এরকম পোশাক পরা মানুষের ছবি, ও বইয়ে কোথাও দেখেছে।

ও উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তিব্বত থেকে এখানে এসেছেন ?'

তিব্বতী লোকটি বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু অনেক দিন আগে। আমি এখন কালিম্পং-এ থাকি।'

গোগোল আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বাবার কথাগুলো ওর মনে পড়লো। কিন্তু সে সব কথা সবই বাঙলায় হয়েছিল। যেমন চীনারা তিব্বত দখল করে নিয়েছে বলে, দলাই লামা এবং আরো অনেকে এদেশে চলে এসেছে। তারা অনেকেই দার্জিলিং কালিম্পং-এ এখন থাকে। ও বললো, 'আমরা তো দার্জিলিং থেকে কালিম্পং-এ যাবো।'

তিব্বতী ভদ্রলোক বললেন, 'সত্যি ? কবে ?'

গোগোল বললো, 'কয়েক দিন পরেই।'

তিনি বললেন, 'তা হলে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করছি। তুমি আমাদের মনস্টারিতে এসো।'

গোগোল এক মুহূর্ত ভাবলো, মনস্টারি মানে কী ? তারপরেই মনে পড়ে গেল, মনস্টারি মানে মঠ, যেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা থাকেন। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি মনস্টারিতে থাকেন ?'

তিনি বললেন, 'হ্যা, আমি কাইরং মনস্টারিতে থাকি।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কাইরংটা কী ?'

তিব্বতী হেসে বললেন, 'তিব্বতে কাইরং নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমাদের একটা মঠ ছিল কালিম্পং মঠের নাম তাই কাইর' মঠ রাখা হয়েছে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু আপনি সেই মঠে থাকেন কেন ? আপনি কি একজন লামা ?'

তিব্বতী ভদ্রলোক এবার আরো খুশি হয়ে, ঝুঁকে পড়ে গোগোলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ, আমি একজন লামা।'

গোগোল অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি দলাই লামা ?'

ভদ্রলোক দু হাত তুলে, হাসতে হাসতে কী যেন বলে উঠলেন। এবার তাঁর বয়স্ক সঙ্গীও মাথা নেড়ে নেড়ে কী যেন বললেন। তারপরে অল্পবয়সী তিব্বতী ভদ্রলোক বললেন, 'না না, আমি দলাই লামা নই। তিনি একজন গ্রেট গড।'

গোগোলের মনে পড়ে গেল বাবার কথা। দলাই লামাকে বলা হয়

লিভিং গড। গড কিং। ও বলল, 'আমি জানি, দলাই লামা লিভিং গড।'

তিব্বতী ভদ্রলোক অবাক খুশিতে বললেন, 'খুব ভালো। তুমি ঠিকই জানো। কী করে জানলে?'

গোগোল মুখ ফিরিয়ে, আঙুল দিয়ে ওর বাবাকে দেখিয়ে বললো, 'আমার বাবা বলেছেন।'

তিব্বতী গোগোলের বাবা মায়ের দিকে একবার দেখলেন এবং ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন।'

গোগোল আবার ওর সেই ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলো 'আমি কি জানতে পারি মহাশয়, আপনার নাম কী?'

তিব্বতী ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়? আমার নাম লাংড়ুলা।'

গোগোল থেমে থেমে উচ্চারণ করলো, 'লাং—ড়ু—লা?'

লাংড়ুলা বললেন, 'হ্যাঁ, লাং—ড়ুলা।'

অদ্ভুত নাম। গোগোল ওর জীবনে কখনো এরকম নাম শোনে নি। এই সময়ে ওর বাবা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে বললেন, 'চলো, এবার হোটেলে ফিরে যাই। কাল সকালে আসা যাবে।' বলে তিনি লাংড়ুলা এবং তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'বালক নিশ্চয়ই আপনাদের বিরক্ত করছিল?'

গোগোল অবিশ্যি বাবার মতো ইংরেজি জানে না। এখনো অনেক শব্দের মানে ও জানে না। তবে কিছু কিছু বুঝতে পারে। যেমন এখন অনেকটা বুঝতে পারলো। লাংড়ুলা বারে বারে মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'না না, একেবারেই না। আপনার ছেলে উদয়কুমার খুবই মিষ্টি ছেলে।'

'সুইট বয়' কথাটা শুনেই, গোগোল খুব লজ্জা পেয়ে গেল। লাংড়ুলা নিচু হয়ে গোগোলের গাল টিপে আদর করে দিলেন, এবং তারপরে বাবাকে খুব দ্রুত ইংরেজিতে কিছু বললেন। গোগোল কেবল বুঝতে পারলো, কালিম্পং আর কাইরং মনস্টারি। তারপরে দুজনের মধ্যেই কিছু কথাবার্তা হলো। বাবা মায়ের সঙ্গেও লাংড়ুলার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মা হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর শুভরাত্রি (গুড নাইট) জানিয়ে বিদায় নেবার সময়ে গোগোলের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ও লাংড়ুলাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের মনস্টারিতে খাম্‌পা আছে?'

গোগোলের মুখে খাম্‌পা শব্দটা শুনে, লাংড়ুলা যেন খুবই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'না, আমাদের মনস্টারিতে কোনো খাম্‌পা নেই। তুমি

তাদের কথা জানলে কী করে?'

গোগোল বললো, 'আমি বইয়ে পড়েছি। ওরা তো ডাকাত (রবার), না?'

লাংডুলা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা খুব খারাপ লোক। তবে এদেশে তারা রবারি করে না। পুলিশকে তারা খুব ভয় পায়। কালিম্পং-এ কিছু খাম্‌পা আছে, তারা একটা ডেয়ারি চালায়। দুধ আর মাখন বিক্রী করে. ভেড়ার লোম আর চামড়াও বিক্রী করে। তারা মাঝে মাঝে মনস্টারিতে আসে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে।'

গোগোল জিজ্ঞেস কবলো, 'কালিম্পং-এ গেলে আমি তাদের দেখতে পাবো?'

লাংডুলা বললেন, 'হ্যাঁ পাবে।'

বাবা গোগোলের হাত টেনে ধরে বললেন, 'এখন আর এসব কথা নয়, হোটেলে চলো। তোমার না হয় কষ্ট নেই, আমাদের কষ্ট হচ্ছে। কাল সারা বাত, আজ প্রায় সারাদিন পাহাড়েব রেলে এসেছি। এবার চলো।'

বলে বাবা আবার লাংডুলা আব তাঁর সঙ্গীকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন। হোটেলে ফিরতে ফিরতে, গোগোল বাবাকে জিজ্ঞেস কবলো, 'তোমার সঙ্গে ওঁদের কী কথা হলো?'

বাবা বললেন, 'এইসব জিজ্ঞেস করছিলাম, ওঁরা তিব্বত থেকে কীভাবে এসেছেন, কোথায় আছেন।'

গোগোল বললো, 'লাংডুলা লোকটি খুব ভালো, তাই না?'

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'লাংডুলা? সে আবার কে?'

গোগোল হেসে বললে, 'বারে, তুমি যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলে, ওঁর নাম তো লাংডুলা। আমি জেনে নিয়েছি। নামটা খুব অদ্ভুত, তাই না?'

বাবা বললেন. 'তুমিও কম অদ্ভুত নও। এর মধ্যেই ওঁর নামটাও জেনে নিয়েছ?'

গোগোল বললো, 'আর ওঁদের মনস্টারির নাম কাইরং মনস্টারি।'

বাবা বললেন, 'সেটা আমিও শুনেছি।'

কথা বলতে বলতে, গোগোল হোটেলে পৌছে গেল। ঘরে ঢুকে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে আগেই ডাইনিং রুমে গেল বাবা মায়ের সঙ্গে। গরম স্যুপ্‌টা মাখন রুটির সঙ্গে বেশ ভালোই লাগলো। আর শীতে বেশ আরামও হলো। তারপরেই এলো চিকেন স্টুর নতুন ডিশ আর গরম গরম নান্‌। তার সঙ্গে স্যালাড। সব শেষে পুডিং।

গোগোলের পেটটা বেশ বেশিই ভরে গেল। ফলে ঘুমোতে বেশি সময় লাগলো না। বিশেষ করে শীতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুতে খুবই আরাম লাগলো। ঘরটাতে ডবল খাট থাকলেও, গোগোলের জন্য একটা আলাদা ডিভান দেওয়া হয়েছিল। সেটা বাবার খাটের কাছাকাছি পাতা হয়েছিল। কিন্তু ঘুমোলে কী হবে? গোগোল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সারা রাতই লাংড়ুলাকে স্বপ্নে দেখলো, আর ওর কল্পনার দেশ তিব্বত এবং কাঞ্চনজংঘা।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে, মুখ ধুয়ে ব্রেক ফাস্ট খেয়ে, গরম পোশাক পরে বাবা মায়ের সঙ্গে যখন ম্যাল্-এ এলো, তখন লাংড়ুলা আর তিব্বতের কথা একেবারে ভুলে গেল। ম্যাল-এ এসেই দেখলো, ওর মত ছেলে মেয়েরা অনেকেই ঘোড়ায় চেপে চলেছে। এমন কি বাবা মার মতো বয়স্ক মহিলা পুরুষরাও ঘোড়ায় চেপে হাসাহাসি করছে। ঘোড়া দেখে গোগোল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বাবার হাত টেনে ধরে বললো, 'বাবা আমি ঘোড়ায় চাপবো।'

বাবা বললেন, 'চাপবেই তো। ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমার ঘোড়ায় চাপার জন্যই তো এবার দার্জিলিং-এ আসা।'

গোগোল মন খারাপ করে বললো, 'কিন্তু সব ঘোড়া তো অন্যেরা নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার জন্য ঘোড়া কোথায় পাবে?'

বাবা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'গোগোল, তুমি মাঝে মাঝে সত্যি বড় বোকার মতো কথা বলো। চলো দেখবে, এখনো কতো ঘোড়া আছে।'

বাবা ওকে হাত ধরে ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে নিয়ে গেলেন। গোগোলের চোখে বিস্ময় আর ধরে না। দেখলো, সত্যি অনেক ঘোড়া সেখানে রয়েছে। হঠাৎ একজন পাহাড়ি মহিলা এসে গোগোলের হাত চেপে ধরলেন। তাঁর গলা থেকে পা পর্যন্ত গাউনের মতো পোশাক। তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'ঘোড়া চাই ঘোড়া?' বলে তিনি বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, আর ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, 'গুড হর্স ফর ইওর সান, আই গিভ হিম।'

বলেই তিনি তাঁর হাতের ছপ্‌টি তুলে, চিৎকার করে কাকে যেন কী বললেন। একটি তেরো চোদ্দ বছরের ছেলে তখনই একটি ছোটখাটো পনি ঘোড়ার লাগাম টেনে নিয়ে এলো। মহিলা গোগোলের হাত টেনে ধরে বললেন, 'গুড হর্স, ভালো ঘোড়া।'

গোগোলের কিন্তু ছোটখাটো পনিটাকে মোটেই ভালো লাগলো না।

যেখানে অনেকগুলো ঘোড়া পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল, ওর নজর সেদিকে। বেশ খানিকটা বড় আব লাল বঙের একটি ঘোড়াকে ওব ভালো লেগেছে। ও মাথা নেড়ে বললো, 'দিস ইজ নট এ গুড হর্স। আই ওয়াণ্ট ছ্যাট বিগ হর্স।'

বলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সেই ঘোড়াটা দেখিয়ে দিল। বাবা মা-ও ওব সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। মা আঁচল দিয়ে নাক চেপে বেখেছেন। জায়গাটাতে সত্যি বেশ দুর্গন্ধ। একটু নিচেই বয়েছে পাবলিক ইউবিনাল—অর্থাৎ মূত্রাগার। তাছাড়া ঘোড়াব মলমূত্রেব গন্ধ তো আছেই। ঘোড়াব গাযেবও একটা বিশেষ গন্ধ আছে। কিন্তু বাবা নাকে রুমাল চাপেন নি। তিনি বললেন, 'গোগোল, এ ঘোড়াটা তোমাব পক্ষে বেশ বড়। এত বড় ঘোড়ায় তুমি চেপো না। পড়ে টড়ে গেলে খুব লাগবে।'

গোগোল ঘোড়ার মতোই মাটিতে পা ঠুকে বললো, 'মোটেই পড়বো না। আমি এই ঘোড়াব পিঠেই চাপবো।'

সেই পাহাড়ি মহিলা বাবাব দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'ভেবি বিগ হর্স। ইওব সান লিটল্ চাইল্ড।'

গোগোল মহিলাব কথাগুলো বুঝতে পেবে বললো, 'আমি বিগ হর্সেই চাপবো। বাবা, তুমি এই ঘোড়াটা আমাকে দিতে বলো।'

বাবা মহিলাকে বাংলায জিজ্ঞেস কবলেন, 'ঘোড়াব সঙ্গে কেউ থাকবে তো?'

মহিলা সেই তেব চৌদ্দ বছবেব ছেলেটাকে দেখিয়ে বললেন, 'হা হ', ওই লেড়কা সাথ্ সাথ্ যাবে।'

বাবা বললেন, 'তা হলে এ ঘোড়াটাই দিন।'

মহিলা হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে, দু হাত বাড়িযে গোগোলকে তুলে নিলেন। ওব এক পা রেকাবে ঠেকিয়ে, ওকে ঘোড়াব পিঠে চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু বড় আব উঁচু বেকাবে গোগোলেব পা নাগাল পেল না। মহিলা বেকাব দুটোকে উঁচুতে তুলে, পিঠেব আসনেব দড়িব সঙ্গে এমন ভাবে বেঁধে দিলেন, গোগোলের পা বাখতে আব কোনো অসুবিধা হলো না। গোগোল খুশি হয়ে হাসলো। বড় ঘোড়াটাব পিঠে, ওকে এত ছোট দেখালো, যেন, একটা পুতুল বসে আছে। ও লাগাম ধবে টান দিতেই ঘোড়াটা চলতে আবম্ভ করলো। সঙ্গে সেই তের চৌদ্দ বছবের ছেলেটাও চলতে আবম্ভ করলো।

গোগোলেব চোখে মুখে উত্তেজনা। হেসে বাবা মাকে হাত তুলে টা টা করার ভঙ্গি কবলো। বাবাও হাত তুলে দেখালেন। ঘোড়াটা এবার অল্প

লাফিয়ে লাফিয়ে আস্তে আস্তে যেন দৌড়ে চললো। আর গোগোলের সমস্ত শরীরটা নাচতে লাগলো। ওর একটুও ভয় করছে না। বরং বেশ মজাই লাগছে। 'ম্যাল' শব্দের অর্থটা গোগোল আগেই জেনে নিয়েছিল। ছায়া ঢাকা বেড়াবার জায়গা।

গোগোলের ঘোড়াটা চললো অবজারভেটারি হিলের বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে। অবজারভেটারি হিলের ওপরে নাকি একটা শিব মন্দির আছে। গোগোলের ঘোড়া যে পথ দিয়ে চলেছে, তার দু পাশ দিয়েই নানা রকমের লোকজন মহিলা পুরুষ চলাচল করছে। ওর বয়সী অনেক ছেলে মেয়েও চলেছে। তারা যখন ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে, তখন ও মনে মনে বেশ গর্ব বোধ করলো। ওর কিছু আগে আগেই তিনটি ঘোড়ার পিঠে, তিনজন ছেলে মেয়ে চলেছে। তারা ওরই বয়সী হবে। কিন্তু সবাই ঘোড়ার পিঠে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে। সেই তুলনায় গোগোলের ভয় তো করছেই না। বরং ওর ঘোড়াটা যে ওর পক্ষে বেশ বড়, সেটা অনেকেই তাকিয়ে দেখছে। একটা বাঙালী পরিবার ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় তো, একজন মহিলা বলেই উঠলেন, 'ওমা, কতোটুকু ছেলে, কতো বড় ঘোড়ায় চেপেছে।'

গোগোলের একটা বিষয় মোটেই ভালো লাগলো না। ও দুহাতে ঘোড়ার লাগামটা ধরে রেখেছে, তবু তের চৌদ্দ বছরের পাহাড়ি ছেলেটাও এক হাতে লাগামের একটা দিক ধরে হাঁটছে। যেন এই ছেলেটাই ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে চলেছে, গোগোল কেউ নয়। যেমন সামনের তিনটে ঘোড়াকে দুজন পাহাড়ি মেয়ে পুরুষ ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কেবল তা-ই না। যে-ছেলে মেয়েগুলো ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছে, তাদেরও কোমর চেপে ধরে চলেছে। ওরা যা খুশি তা-ই করুক, কিন্তু গোগোলের ঘোড়ার লাগামটা কেন ধরে চলেছে। ও নিজেই কি ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে না? ওর আত্মসম্মানে খুবই লাগলো। ছেলেটাকে বললো, 'এই তুমি লাগামটা ছেড়ে দাও, আমি নিজেই ওকে চালিয়ে নিয়ে যাবো।'

ছেলেটা গোগোলের কথা মোটামুটি বুঝতে পারলো। ও হিন্দীতে বললো, 'তুম বহুত্ বাচ্চা আছে। হাম লাগাম ছোড় দেগা তো ঘোড়া বহুত জোর দৌড় লাগাবে, ভাগ যায়ে গা।'

গোগোলও ছেলেটার কথা বুঝলো, কিন্তু জোর দিয়ে বললো, দৌড়োক, তুমি ছেড়ে দাও। আমার ঘোড়া আমিই চালিয়ে নিয়ে যাবো।'

ছেলেটা তবু ছাড়তে চায় না। গোগোল বেশ রেগে গিয়ে বললো, 'কেন

তুমি ছাড়ছো না ? আমি বলছি তুমি ছেড়ে দাও।'

ঠিক এ সময়েই গোগোলের থেকে বড় একটি ছেলে, একটা ঘোড়াকে ছুটিয়ে নিয়ে, ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেখে তো গোগোলের মন আরোই খারাপ হয়ে গেল। ঘোড়ায় চেপে যদি ওরকম ছুটে না যাওয়া যায়, তা হলে আর ঘোড়ায় চাপা কেন ? ও ছেলেটাকে বললো, 'এই যে ছেলেটা গেল ঘোড়া ছুটিয়ে ? আমাকে কেন তুমি ছেড়ে দিচ্ছ না ?'

পাহাড়ি ছেলেটা বললো, 'খোকাবাবু তুম নেই জানতা। ও খোকা তো দার্জিলিং মে বহতা। ও বোজ রোজ ঘোড়া'পব চড়তা। ও ঘোড়া কো আদত জানতা।'

গোগোল জানে না, ঘোড়ার আদত কাকে বলে। কিন্তু ও মনে মনে খুব রেগে গেল, আর জেদও বেড়ে গেল। ও ঝুঁকে পড়ে, লাগাম থেকে ছেলেটার হাত ছাড়িয়ে দিল, আব ঘোড়াব পিঠেব ওপব কয়েকবাব লাফিয়ে উঠলো। ওর ধাবনা, তা হলেই বুঝি ওর ঘোড়াও ছুটবে। কিন্তু তা ছুটলো না. তবে আগের থেকে যেন ঘোড়াটা একটু চনমনিয়ে উঠলো। আসলে গোগোল তো ঘোড়াকে ছোটাবাব কায়দা কানুন জানে না। ঘোড়াকে ছোটবার সংকেত কবলে, তবেই ঘোড়া ছোটে। ওর কাণ্ড দেখে, তেরো চৌদ্দ বছরেব ছেলেটা হেসে উঠলো। বললো, 'এ্যায়সা কবনে সে ঘোড়া ছুটতা নেহি।'

গোগোল বললো, 'তবে কেমন করলে ছুটবে ?'

ছেলেটা তখন গোগোলের রেকাবে বাখা পা, নিজের হাতে ধরে, ঘোড়াটাব পেটের কাছে দুবাব চেপে চেপে মারলো। আব গোগোলেব লাগাম ধরা হাত ধরে লাগামটা ঢিলে কবে দিয়ে বললো, এ্যায়সা করনে সে ঘোড়া ছুটতা। মগব খোকাবাবু তুম এ্যায়সা মত্‌ কব। ঘোড়া জোরে দৌড়েগা তো, তুম নিচে গিব যায়েগা।'

ছেলেটা ভেবেছিল গোগোল ওব কথা শুনে ভয় পাবে। ঘোড়াকে দৌড় কবাবে না। ও তো গোগোলকে চেনে না! মেয়েদের কলেজ আব জিমখানা ক্লাবটা পেরিয়েই গোগোল ছেলেটার শিখিয়ে দেওয়া কায়দাটা কাজে লাগালো। ঘোড়াটা তৎক্ষণাৎ আগের থেকে জোবে ছুটভে লাগলো। গোগোলের মন তাতেও ভবলো না। ও ঘন ঘন ঘোড়ার পেটে মেরে, ঝুঁকে পড়ে লাগামে ঢিল দিল। ঘোড়াটা তখন রীতিমতো জোরে ছুটতে লাগালো। পাহাড়ি ছেলেটা ভয়ে পিছন থেকে চিৎকার করে উঠলো, 'খোকাবাবু মত্‌ দৌড়ো।'

গোগোল সে-কথায় কান দিল না। ওর ঘোড়া ছোটানো দেখে, আশেপাশে যাবা চলছিল, তারা ছিটকে পাশে চলে যেতে লাগলো। গোগোল মনে মনে হেসেই বাঁচে না। অবশ্য ওর একটু ভয়ও লাগছিল। যে কারণে ও এখন পা দুটো ঘোড়ার গায়ের কাছে শক্ত করে এঁটে আছে।

ঘোড়াটা কিছুটা ছোটার পবে হঠাৎ একটা রাস্তার মোড়ে এসে, নিজেই থেমে গেল। আবার ডাইনে মোড় নিল। আবার সামনের দিকে ফিরলো। গোগোল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না। ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে ঠুকে, লাগামে হ্যাচকা টান দিতে লাগলো। কিন্তু ঘোড়া তবু চললো না। সামনেই একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে বন্দুক হাতে দুজন পাহারাওয়ালা, দেখে পুলিশ বলেই মনে হয়। আরো কিছু লোকজন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল।

পাহাড়ি ছেলেটা এ সময়ে ছুটে ঘোড়াব কাছে এলো। হাসতে হাসতে বললো 'কেয়া হুয়া খোকাবাবু?'

গোগোলের মুখ বীতিমতো লাল হয়ে ঘেমে উঠেছে। বললো, 'ঘোড়াটা কোথাও যেতে চাইছে না।'

পাহাড়ি ছেলেটা হাসতে হাসতে বললো, 'ক্যায়সে যায়েগা। ইস্‌কো ট্রেনিং হ্যায়, ইধাব আ-কে খাড়া হো যায়েগা।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবলো 'কেন?'

ছেলেটা হাত তুলে দেখিয়ে বললো, 'এই সিধা বাস্তা জু গার্ডেন কো তবফ গিয়া। অর ডাইনে ঘুমকে ওই রাস্তা ম্যাল্‌ গিয়া। আভি ঘোড়াকো হাম যিধার যানে বোলেগা, ঘোড়া উধারই যায়েগা।

গোগোল জু গার্ডেনেব মানে জানে। শুনেছে আগেই, এখানে চিড়িয়াখানা আছে। চিড়িয়াখানায় নীল বাঘ আছে। ও বন্দুকধারীদের সামনের গেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস কবলো, 'এই গেটটা চিড়িয়াখানায় গেছে?'

ছেলেটা হো হো করে হেসে বললো, 'না না, উ তো লাটসাহেবের মোকাম, গভরণর হাউস। উস্‌কো পাস্‌মে যো রাস্তাঠো গিয়া, উ জু গার্ডেন কা রাস্তা।'

গোগোল বললো, 'তবে আমি জু গার্ডেনেই যাবো। তুমি ঘোড়াটাকে ওদিকে যেতে বলো।'

ছেলেটা বললো, 'উ নেহি হোগা। হাম্‌কো বোল্‌ দিয়া, তুমকো ইধারসে ঘুমাকে ম্যাল্‌ লে যায়েগা। তুমকো ফাদার বোল্‌ দিয়া।'

গোগোল বাবার কথা শুনে দমে গেল। ওকে বাধ্য হয়েই, ডান দিকের

রাস্তায় ঘুরতে হলো।

কিন্তু ঘোড়াটাকে ও মোটেই হাঁটালো না। বেশ দুল্‌কি চালে ছুটিয়ে নিয়ে চললো। অবজারভেটারি হিলের এপাশটা বেশ আঁকাবাঁকা। তবে বাঁ দিকের নিচের দৃশ্য খুবই সুন্দর। ওর চোখের সামনে একবার কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের পাইন বন আর মাঠ ভেসে উঠলো। তার তুলনায় এখন ওর এ জায়গাটাই ভালো লাগছে।

পাহাড়ি ছেলেটা এখন ওর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ছুটেই চলেছে। উঁচু ঘোড়াটার পিঠে, গোগোল যেন একটা পুতুলের মতো নাচছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটা বললো, 'জগ্‌গু।'

গোগোল বাঁ দিকের নিচে, একটা গোল জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'জগ্‌গু, ওটা কোন্‌ জায়গা?'

জগ্‌গু বললো, 'উ তো লের' হ্যায়। ওই গোল জায়গামে ঘোড়দৌড় হোতা হ্যায়।'

গোগোল শুনে মনে মনে খুব খুশি আর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, 'আমি গেলে আমাকে দেখতে দেবে?'

জগ্‌গু এবার তার নিজের মতো করে বাংলায় বললো, 'কিনে দেখতে দিবে না? তুমি তোমার ফাদার কে সাথ্‌ যাবে তো দেখতে পাবে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কখনো ঘোড়দৌড় দেখেছো?'

জগ্‌গু বললো, 'বহুত দফে দেখেছি। বহুত মজা লাগে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'ঘোড়াগুলো খুব জোরে দৌড়োয়?'

জগ্‌গু চোখ বড় করে বললো, 'আরে বাপ্‌ রে বাপ্‌। ইততো জোরে দৌড়ায় কি, তুমি নজর ঠিক রাখতে পারবে না। মালুম হবে কি, একটার উপর দিয়ে আর একটা সাঁ করে চলে যায়। আসমানে যেমন বিজলি চমকায় না, উইরকম দৌড়ায়।'

গোগোল জগ্‌গুর কথা শুনতে শুনতে এমনিই উত্তেজিত হয়ে পড়লো, নিজের ঘোড়াটা ছোটাতেই ভুলে গেল। জিজ্ঞেস করলো 'ওদের পিঠে তখন কেউ চাপে?'

জগ্‌গু অবাক হয়ে হেসে বললো, 'চাপে তো। নেহি তো কে দৌড় করাবে। জকি আছে, তারা ঘোড়া দৌড় করায়।'

গোগোলের মনে হলো, 'জকি' কথাটা ওর শোনা। জগ্‌গু আবার বললো, 'জকি যেত্‌না আচ্ছা বালা হবে, ঘোড়া ওত্‌না জোরে দৌড়বে।'

গোগোল বলে উঠলো, জগ্‌গু, আমার জকি হতে ইচ্ছা করে। তা হলে আমি খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারবো।'

জগ্‌গু মাথা দুলিয়ে বললো, 'হ্যাঁ তা পারবে। তোমার বাবা তোমাকে জকি বনতে দেবে ?'

গোগোল অবাক হয়ে বললো, 'কেন দেবে না ? এ তো খুব সাহসের কাজ। বীর না হলে কি কেউ জকি হতে পারে ?'

জগ্‌গু গোগোলের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। যেন ওর কথা ঠিক বুঝলো না। বললো, 'তো তোমার ফাদাব কো বলো।'

গোগোল বললো, 'বলবো। আমি জকি হতে চাই। জকি হয়ে খুব জোব ঘোড়া ছোটাবো।'

এইসব কথা হতে হতেই ওরা ম্যাল্‌-এ পৌঁছে গেল। সেই পাহাড়ি মহিলাটি এসে গোগোলের ঘোড়াব লাগাম ধরলেন। হেসে বললেন, 'ঘোড়া আচ্ছা হ্যায় ?'

গোগোল বললে, 'ভেরী গুড।'

মহিলাটি বললেন, 'ইস ঘোড়ার নম্বর ফরটিফোর আছে।'

এই সময়ে গোগোলের বাবা এগিয়ে এসে বললেন, 'হয়েছে তো ঘোড়ায় চাপা ? এবার নেমে এসো।'

গোগোল মাথা নেড়ে আবদারের ভঙ্গিতে বললো, 'না আমি নামবো না। আর একবার ঘুরে আসবো।'

বাবা বললেন, 'আবার ওবেলা ঘোড়ায় চেপো।'

গোগোল কিছুতেই ঘোড়া থেকে নামবে না। বললো, 'আমি এখন ঘোড়ায় চেপে জু গার্ডেন যাবো।'

বাবা এবাব একটু ধমক দিয়ে বললেন, 'না না, এখন তুমি জু-তে যাবে না। আমি আর তোমার মা যখন যাবো, তখন জু-তে যাবে।'

গোগোল এবাব বিশেষ আবদারের ভঙ্গিতে বললো, 'তা হলে এখন আমি এবাবেব মতো আর একবার ঘুবে আসি। তুমি বলে দাও বাবা।'

বাবা আর সেই ঘোড়ার মালিক মহিলা নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপরে বাবা বললেন, 'যাও, আর একবার ঘুরে এসো।'

গোগোল তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ নিজেই ঘুরিয়ে দিল।

গোগোলের ঘোড়ায় চড়া যেন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়ায় চেপে জু, জলা পাহাড় সবখানে কয়েকদিন বেড়াতে লাগলো। এমন কি

গোগোল সাবাদিন প্রায় ঘোডায চেপে বেডালো। গোগোলেব মা ত খুব বিরক্ত। তিনি হোটেলেব ঘবে এসেই নাক মুখ কুঁচকে বলেন, 'ইস্, গোগোলটাব গাযে ঘোড়াব গন্ধ। আব সেই গন্ধ সাবা ঘবে। এমন কি বিছানায় পর্যন্ত ঘোড়াব গন্ধ হযে গেছে।'

একদিন তো এমন হলো, গোগোল ফবটিফোব ঘোডায চেপে যে কোথায বেড়াতে চলে গেল, তা জগ্‌গু পর্যন্ত বুঝতে পাবলো না। বাবা মা ভীষণ চিন্তিত হযে পডলেন। এমন কি, যে মহিলা ঘোডাব মালিক, তাঁবও মুখ শুকিযে গেল। তিনি তো জগ্‌গুকে বকে ধমকে এই মাবেন তো সেই মাবেন। তিনি জগ্‌গু আব অন্য একটি ছেলেকে, জলা-পাহাড আব জু-গার্ডেনেব দিকে খুঁজতে পাঠিযে দিলেন।

এদিকে ফগ্ এতো ঘন হযে এলো, যে দু হাত দূবেব মানুষ দেখা যায না। গোগোলেব মা তো ভযে সিটিযে উঠলেন। পাহাডেব পথে গোগোলেব ঘোডা যদি ফগেব মধ্যে দেখতে না পেযে, খাদে পডে যায? ভাবতেই তাঁব গা শিউবে উঠলো। তিনি গোগোলেব বাবাব ওপবেই বেগে গিযে বললেন, 'তুমি ছেলেটাকে আসকাবা দিযে দিযে এবকম কবেছো। তাব ভয ডব বলে কিছু নেই। এখন যদি একটা বিপদ আপদ কিছু হয?'

গোগোলেব বাবাও যে মনে মনে ভয পান নি, তা নয। তবু তিনি বললেন, 'কোথায আব যাবে? ফগ্ হযেছে বটে, কিন্তু এখন তো বেলা এগাবোটা দার্জিলি'-এব সব বাস্তাতেই লোকজন আছে।'

কিন্তু ফগ্ কাটতে না কাটতেই মুষলধাবে বৃষ্টি নামলো। ম্যাল্-এব লোকজন সবাই ছাদ ঢাকা দোকানেব বাবান্দায গিযে উঠলো। যাবা ঘোডায চেপে বেডাতে গিযেছিল, সবাই ভিজে ন্যাতা হযে ফিবে এলো কিন্তু ওদেব মধ্যে গোগোল নেই। গোগোলেব ফবটিফোব ঘোডাও নেই। গোগোলেব মায়েব তো চোখ ফেটে জল আসাব অবস্থা। গোগোলকে যারা খুঁজতে গিযেছিল, তাদেবও ফেববাব নাম নেই। গোগোলেব বাবাও মনে মনে অস্থিব হযে উঠলেন। পুলিশকে খবব দেবেন কী না, তাও একবাব ভাবলেন।

এদিকে বৃষ্টি থেমে খটখটে বোদ উঠে গেল। পাহাডে প্রাযই এবকম ভুতুড়ে বৃষ্টি হয। হঠাৎ হঠাৎ কুযাশা—মানে, যাকে বলে ফগ্। আবাব হঠাৎ ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি। তাবপবেই খটখটে বোদ।

তাবপব বেলা যখন একটা বাজে, আব কিছুতেই চুপ কবে বসে থাকা যায় না, তখন দেখা গেল, গোগোল অবজাবভেটারি হিলের বাঁ দিক থেকে,

ফরটিফোরের পিঠে চেপে আসছে। ও মোটেই ভেজে নি। মাথার টুপি থেকে, পায়ের জুতো পর্যন্ত সবই শুকনো। কিন্তু মুখটা বেশ শুকনো দেখাচ্ছে।

দেখাবেই। কারণ সেই সকালের জলখাবারের পর ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছিল আর এখন ফিরছে। এই সময়ের মধ্যে পেটে কিছুই পড়ে নি। ওকে দেখেই ঘোড়ার মালিক সেই মহিলা ছুটে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। ওর বাবাও বেশ শক্ত মুখে কাছে এগিয়ে এলেন। মা এতো রেগে গিয়েছেন, যে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর তখন গোগোলের গালে একটি থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছিল।

গোগোল বাবাব শক্ত মুখের দিকে তাকিয়েই ভয় পেয়ে গেল, আর অপরাধী ভাবে একটু হাসলো।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায় গেছিলে?'

গোগোল বললো, 'আমি জু-র দিকে যেতে যেতে, বাঁ দিকে নেমে গেছলাম। সেখানে চায়ের বাগান আছে।'

মহিলা চোখ গোল করে, অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি হ্যাপি ভ্যালি চা বাগানে চলে গেছলে? ওখানে তো ঘোড়া যাওয়া মানা আছে।'

বাবা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস কবলেন, 'কেন তুমি চা বাগানের দিকে গেছলে?'

গোগোল মিথ্যা কথা বলতে পারে না। বললো, 'রোজ রোজ আমার এক রাস্তায় ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে ভাল লাগছিল না, তাই আমি বাঁ দিকে নেমে গেছলাম।'

মহিলা এমন খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বাবা রাগ করেও, ধমক দিয়ে কিছু বলতে পারলেন না। মহিলা হাত তুলে গোগোলের গাল টিপে দিয়ে, কোলে করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে বললেন, 'কী মিষ্টি ছেলে, খুব সাহস আছে।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি বৃষ্টির সময় কোথায় ছিলে?'

গোগোল বললো, 'পথের ধারে একটা বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি থেকে একজন বুড়ো মানুষ আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে গেছলেন। ঘোড়াটাকেও বারান্দার ছাদের নিচে রেখেছিলেন।'

মহিলা আর বাবা দুজনের দিকে তাকালেন। মহিলা খুব হেসে উঠলেন। বাবা পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মহিলা খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না না,

আমি এ টাকা নেবো না। গোগোলের ঘোড়া চাপা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি আপনার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছি। এবারের টাকাটা কিছুতেই নেবো না।'

বাবা তবু কয়েকবার অনুরোধ করলেন। মহিলা কিছুতেই টাকা নিলেন না। অতএব বাবা গোগোলের হাত ধরে মায়ের সামনে এগিয়ে গেলেন। মা গোগোলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। একটি কথাও বললেন না। বাবা বললেন, 'যাও, মাকে বলো, এরকম অন্যায় আর করবে না। জানো, আমরা কী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছলাম? তুমি যদি ঘোড়া নিয়ে কোনো খাদে টাদে পড়ে যেতে, আমরা তো কিছু জানতেই পারতাম না। তোমাকে খুঁজে বের করতেই আমাদের কয়েকদিন লেগে যেতো। তার মধ্যে কী সর্বনাশ ঘটে যেতো, কে বলতে পারে?'

গোগোল বাবার কথা শুনে, মায়ের দিকে একবার দেখে, মাথা নিচু করে রইলো। বুঝতে পারলো, ও সত্যি অন্যায় করেছে। ওরকম একলা একলা নতুন পথে যাওয়াটা ওর উচিত হয় নি। ও দু পা এগিয়ে মাকে ডাকলো, 'মা।'

মা কোনো সাড়া দিলেন না। গোগোল মায়ের হাত টেনে ধরলো। মা হ্যাঁচকা দিয়ে হাত টেনে নিলেন, বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলবে না।'

গোগোলের মনে হলো, মা অনেকদিন এরকম আড়ি করে দেয় নি। ও বাবার দিকে করুণ চোখে তাকালো। মা চলতে শুরু করে, বাবার উদ্দেশে বললেন, 'আমি আর দেরি করতে পারছি না, হোটেলে যাচ্ছি।'

মা এগিয়ে চলতে লাগলেন। বাবা গোগোলের হাত ধরে যেতে যেতে বললেন, 'দেখেছ তো মা কী রকম রেগে গেছেন।'

গোগোল বললো, 'আমি আর কখনো এরকম করবো না।'

বাবা বললেন, 'আমি তা বুঝতে পেরেছি, তুমি আর এরকম করবে না। তোমার মাকে তুমি নিজেই সে কথা বলো, সেটাই ভালো হবে। আসলে মা তো তোমার জন্যই ভয় পেয়েছেন।'

হোটেলে যেতে যেতে বাবা গোগোলকে আরো কয়েকটি কথা বললেন। এসব অচেনা পাহাড়ের দেশে, না বলে কয়ে হঠাৎ কোথাও বেড়াতে গেলে, বিশেষ করে ঘোড়ার পিঠে চেপে, নানারকম বিপদ হতে পারে। পাহাড় অনেক জায়গায় দেখতে একরকম, পথ চেনা মুসকিল হতে পারে। তা ছাড়া খাদের ভয় তো আছেই। বৃষ্টি বাদলা হলে পাহাড়ে ধসও নামে। সামান্য

একটা ছোট ধস্‌ যদি গোগোলের গায়ে পড়ে, তা হলে কোথায় তলিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার কোনো ঠিক নেই। গোগোল কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলো।

হোটেলে ঘরে ফিরেও মা গোগোলের সঙ্গে কথা বললেন না। অনেক দেরি হওয়ায় ডাইনিং রুমের টেবিলে খাবার খাওয়া হলো না। ঘরেই খাবার খেতে দিল। খাবার খাওয়া হয়ে যাবার পরে মা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বাবাও শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলেন। গোগোল বাধ্য হয়েই ওর নিজের আলাদা ডিভানে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

গোগোল দিনের বেলা ঘুমোয় না। আজ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে উঠে দেখলো, মা খাটে বসে আছেন। বাবা ঘরে নেই। গোগোল মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এখন ওর মনটা টনটন করছে। মা ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। গোগোল দেখলো মায়ের চোখে জল টলটল করছে। অমনি গোগোলের চোখেও জল এসে পড়লো। ও মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে, বুকে মুখ লুকালো। মাও ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, কান্না ভরা গলায় বললেন, 'ভয়ে আমার বুকটা শুকিয়ে গেছলো, তা জানিস? তোকে যদি হারাই, তবে কি আমি আর বাঁচবো?'

মায়ের কথায় গোগোলের কান্না আরো বেড়ে গেল। বললো, 'মা, আমি আর কখনো এরকম করবো না।'

মা গোগোলের মাথায় কপালে চুমো খেলেন। বাবা এসময়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘটনা দেখে বললেন, 'যাক, মা আর ছেলের আড়ি শেষটায় কেঁদে মিটলো।'

বাবা হেসে উঠলেন।

কালিম্পং যাবার আগেই, দার্জিলিং-এ গোগোলের বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাবার বন্ধু কলকাতার একজন বড় সরকারি কর্মচারি। তাঁর বয়সও বাবার মতোই হবে। বাবা গোগোলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি তোমার একজন আঙ্কল্‌, নাম অতীন দত্ত। তুমি দত্ত কাকা বলেই ওঁকে ডেকো।'

দত্তকাকার সঙ্গে পরিচয়ের পরে, কাকীমার সঙ্গেও পরিচয় হলো। দত্তকাকার দুই মেয়ে, বেলা আর ইলা। বেলা গোগোলের থেকে বড়, তাই তাকে ও বেলাদি বলে ডাকলো, আর ইলা ওরই সমবয়সী। তাই ইলাকে নাম ধরেই ডাকলো। দত্তকাকাও কালিম্পং যাচ্ছিলেন। একটা জীপ

গাড়িতেই সবাই মিলে কালিম্পং যাওয়া হলো। গোগোল বেশ মজা পেলো। একলা একলা ঘুরে বেড়ানো বা খেলার থেকেও বেলাদি আর ইলাকে পেয়ে ওর আরো আনন্দ হলো। দত্তকাকা আর কাকীমাকেও ওর খুব ভালো লাগলো। ওরা যে জীপ গাড়িতে কালিম্পং এসে পৌঁছুলো, তাতে বসবাব ব্যবস্থা এমন, যে কোনো অসুবিধাই হলো না। মালপত্রও পিছনে বেঁধে নেওয়া হলো।

দার্জিলিং থেকে কালিম্পং যাবার বাস্তাটা খুবই সুন্দর। তিস্তা নদীকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখা না গেলেও, দূর থেকে দু একবার দেখা গেল। ড্রাইভারও দেখিয়ে দিল। কালিম্পং-এর যে-হোটেলে গোগোলবা উঠলো, সেটা বেশ নিরিবিলি জায়গায়। দত্তকাকাও সেই হোটেলেই অন্য ঘবে উঠলেন। হোটেলের আশেপাশে নিরিবিলি হলেও, দোতলাব বাবান্দায় দাঁড়ালে, কালিম্পং-এব ভিড়ের বাস্তা, বাস আব জীপ গাড়ির টাবমিনাস, বড় বড় দোকান আব একেবাবে সমতল খেলার মাঠটা দেখা যায়। খেলাব মাঠটা যেন শহরেব ঠিক মাঝখানে।

গোগোলের মনে অন্য চিন্তা। কালিম্পং-এ পৌঁছেই ওব প্রথম মনে পড়লো তিব্বতিদের কাইবং বৌদ্ধ মঠেব কথা। আর সেই লামা লাংডুলাব কথা। ইলাকে ও দার্জিলিং থেকে আসবাব পথেই সে-কথা বলেছে। খাম্‌পাদের কথাও বলেছে। ইলা গোগোলের সমবয়সী হলেও, অনেক কিছুই জানে না। ও খাম্‌পাদের কথা নাকি কখনো শোনে নি। লামাদেব আর ইয়াক ছাগলের ছবি দেখেছে।

কালিম্পং-এ ঘোড়ায় চড়ার কোনো ব্যাপাব নেই। জায়গাটাও দার্জিলিং-এব থেকে ছোট। বাজাবেব সামনে বা যেখান থেকে গ্যাংটক যাবার বাস ছাড়ে, সে জায়গা ছাড়া ভিড়ও বিশেষ নেই। দার্জিলিং-এব মতো হৈ চৈ হল্লা এখানে নেই।

বিকালবেলা সকলের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে, গোগোল আব একটা বিষয় লক্ষ্য করলো, এখানে নানাবকমের লোক, নানান রকম তাদেব চেহাবা। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানলো, ভোটিয়া আব লেপচা আর তিব্বতিরা দেখতে অন্য রকম। দার্জিলিং-এর থেকে কালিম্পং-এ তারা বেশি থাকে। 'ভূটান রাজার 'ভোটান হাউস' এখানে আছে। তিব্বতিদের সঙ্গে তাদেব মেলামেশা বেশি। তিব্বত যখন চীনারা দখল কবে নেয়নি, তখন কালিম্পং থেকেই, সিকিমের গ্যাংটক বা ভূটান থেকে তিব্বত যাতায়াত করা হতো।

গোগোল প্রথম দিন বিকালে বেড়াতে বেরিয়েই কাইবং মঠে যেতে

চাইলো। বাবা বললেন, 'তিনি কাইরং মঠ কোথায় জানেন না। কাল খবর নিয়ে, এক সময়ে গিয়ে দেখে এলেই হবে।' গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। বারবার ও বাবাকে বললো, খাম্‌পারা যেখানে দুধ আর মাখনের ডেয়ারি করেছে, সেখানে বেড়াতে যাবে। বাবা তাতেও বললেন, 'তিনি খাম্‌পাদের আস্তানাও চেনেন না। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কালিম্পং-এ কয়েক দিন থাকা হবে। তার মধ্যে একদিন গেলেই হবে।

গোগোলের আর কিছু বলার রইলো না। ও ইলার কানে কানে বললো, 'বাবাবা খালি বাবাদেব মতন বেড়াতে চায়। এরকম বেড়াতে আমার একটুও ভালো লাগে না।'

ইলা বললো, 'আমারও না।'

পরের দিন সকালবেলা হোটেলে জলখাবারের পরে, গোগোলরা সবাই দল বেঁধে বের হলো। বাবা দত্তকাকা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। মা আর কাকীমাও তাই। বেলাদি নিজের মনেই চারদিক তাকিয়ে দেখছে। ঘুরতে ঘুরতে গোগোলরা বাজারের মধ্যে এসে পড়লো। সেখানে ভোটিয়া লেপচা তিব্বতি নানান রকম লোকের ভিড়। সোনা-রূপো পাথরের নানা জিনিস বিক্রী করছে। তাদের মধ্যে কেউ খাম্‌পা আছে কী না গোগোল বুঝতে পারলো না।

গোগোল হঠাৎ ইংরেজিতে ওর নাম ধরে একজন ডেকে উঠতেই চমকে উঠলো, 'হ্যালো উদয়কুমার, তুমি কালিম্পং-এ এসে গেছ ?'

গোগোল দেখলো, সেই লাংডুলা। সেই রকম পোশাক পরা, কিন্তু আজ তাঁর মাথায় একটা টুপি রয়েছে। কিন্তু টুপিটা দেখতে অন্যরকম। তিনি গোগোলের দিকে হাত বাড়িয়ে, ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। গোগোল ইংরেজিতে বললো, 'আমরা, গতকাল কালিম্পং-এ এসেছি।'

গোগোল লক্ষ্য করলো, একজন তিব্বতির সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখে ইলা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছে। বেলাদিও কম অবাক হয় নি। লাংডুলা তখন বাবার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে কথা বললেন। বাবা দত্তকাকা আর কাকীমার সঙ্গে লাংডুলার পরিচয় করিয়ে দিলেন। লাংডুলা মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন।

গোগোল লাংডুলাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি মাথায় ওটা কী পরেছেন।'

লাংডুলা বললেন, 'আমরা এটাকে বলি ডেরনিয়ে ক্রি, মানে টুপি। এটা আমাদের দেশের টুপি। আর এই যে আমার গায়ে দেখছো, এর নাম

হলো নামবু।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

লাংডুলা বললেন, 'আমি এখন মঠে যাচ্ছি।'

গোগোল অমনি বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাবা, আমি কাইবং মঠ দেখতে যাবো।'

বাবা লাংডুলাকে ইংরেজিতে তাড়াতাড়ি কী যেন জিজ্ঞেস করলেন। লাংডুলাও কিছু বলে, ঘন ঘন মাথা দোলালেন। বাবা গোগোলের দিকে ফিরে বললেন, 'চলো কাইরং মঠে আমরা সবাই যাচ্ছি। তোমার লামা বন্ধু আমাদের নিয়ে যাবেন।'

লাংডুলা গোগোলের একটি হাত ধরলেন। গোগোল খুশি হয়ে লাংডুলার হাত চেপে ধরলো। আর এক হাতে ইলার একটা হাত টেনে ধরলো। সবাই মিলে আস্তে আস্তে বাজার অঞ্চল পেরিয়ে, একটু নিরিবিলি পথে চলে এলো। একটু এগিয়ে রাস্তার বাঁ দিকে, কুড়ি পঁচিশ ফুট নিচে কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের ঘর দেখিয়ে লাংডুলা বললেন, 'ওইটা হলো গিয়াক বোংরা। গিয়াক বোংরা মানে হলো, খামপাদের ক্যাম্প। এটা ঠিক ক্যাম্প না হলেও, ওদের এই আস্তানাটাকে আমরা গিয়াক বোংরাই বলি।'

গোগোল অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিচের দিকে তাকালো। ছোট ছোট দোতালার মতো ঘর, দেখতে অনেকটা তাঁবুর মতো। মাটিতে পোতা খুঁটির সঙ্গে ঘরের চালে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঘরগুলো প্রায় সমতল জায়গায়। কোথাও কোথাও গরু মোষ বাঁধা রয়েছে। বাঁকানো শিং পুরু লোমে জড়ানো অনেকগুলো ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। মুরগী চরে বেড়াতেও দেখা যাচ্ছে। দু তিনটি ছোট ছেলে মেয়ে, আর বড় মেয়েদের কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। পুরুষ একজনও নেই। লাংডুলা যাকে গিয়াক বোংরা বললেন, তার আশেপাশে কয়েকটা গাছ রয়েছে। তারপরেই নিচের দিকে খাদ নেমেছে।

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'খাম্পারা কেউ নেই?'

লাংডুলা বললেন, 'এখন সবাই মাখন দুধ বিক্রী করতে বেরিয়ে গেছে।'

গোগোল আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ওদের ঘরের চালগুলো ওরকম দেখাচ্ছে কেন? যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে? আর রং কালো কেন?'

লাংডুলা বললেন, 'ওগুলো আসলে চাল নয়, ইয়াক ছাগলের চামড়া। ইয়াকের চামড়া দিয়ে তাঁবু খাটিয়েছে। ওগুলো খুব শক্ত, বৃষ্টিতে কিছু করতে পারে না। ওরা ওইরকম তাঁবু খাটিয়েই বারো মাস থাকে।'

গোগোল খুবই অবাক হয়ে গেল। লাংডুলা আবার ওর হাত ধরে চলতে চলতে বললেন, 'তিব্বতের পূর্ব দিকে খাম্ নামে একটা প্রদেশ আছে। সেই দেশের লোকেদের খাম্পা বলে। খাম্পারা খাম্ দেশের লোক। ওদের অনেকেই বিশেষ কোনো ধর্ম মানে না। এখন আস্তে আস্তে, অন্যান্য তিব্বতিদের মতো, তাবাও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে। খাম্পাদের কথা ছাড়াও, তিব্বতের অন্যান্য অনেক কথা তিনি বললেন। যেমন তিব্বতের রাজধানী লাসায় সব থেকে বড় নদীর নাম সাংপো। সাংপো আসলে ব্রহ্মপুত্র নদ। সমতলে নেমে, আসামের ভিতর দিয়ে সেই নদ গিয়েছে। কিংবা, দলাই লামা বিশেষ একজন কারোর নাম নয়। দলাই লামা একটি পদবা। তিনি হলেন গড কিং। একজন দলাইলামা মারা গেলে, বা কোনো কাবণে তিনি সরে গেলে তখন আর একজন দলাই লামা হন। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, এইভাবে বোঝানো হয়। যেমন এখন যিনি দলাই লামা আছেন, তিনি হলেন পঞ্চদশ দলাই লামা অর্থাৎ ফিফ্‌টিনথ্।

গোগোলের সঙ্গে ইলাও লাংডুলার কথাগুলো শুনছিল আর বোঝবার চেষ্টা করছিল। এসব কথার মধ্যেই ওরা কাইরং মঠের কাছে এসে পৌঁছুলো। মঠেব গেটের আগেই, ডান দিকে এক জায়গায় অনেকগুলো ধ্বজা রয়েছে, অনেকটা নিশানের মতন দেখতে। লাংডুলা বললেন, 'এই সব ধ্বজা খাড়া কবে বাখাব কারণ, আবহাওয়াকে পবিত্র বাখা।'

মঠের গেটটা বিরাট। কাঠের চওড়া থামের গায়ে নানা রঙের অনেক কিছু আঁকা। তাব মধ্যে ড্রাগনের ছবিটা খুবই চেনা। আরো নানারকম ভয়ংকর সব মুখেব ছবি। গেটের ওপরে তোরণের মাঝখানে তথাগতের (বুদ্ধের) মূর্তি। লাংডুলা পিছন ফিবে বাবা মা দত্তকাকা কাকীমা সবাইকেই ডেকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরটা সবই কাঠের তৈবি। ছবিতে দেখা প্যাগোডার মতো। কাঠের সিঁড়ি বাবান্দা মেঝে যে এতো ঝকঝকে আর মোলায়েম হতে পাবে, গোগোলেব কোনো ধাবণা ছিল না। মোজাইকের থেকেও যেন বেশি পিছল। মন্দিবেব চার পাশে বাগান। লাংডুলার মতো, আবো কয়েকজনকে দেখা গেল, চলাফেরা করছেন। ভিতরে কোথায় যেন অনেক পুরুষদের গলায় গান শোনা যাচ্ছে।

সিঁড়ির ওপরে বারান্দায় জুতো খুলে রেখে ভিতরে ঢুকতে হলো। মন্দিরের ভিতরে, চার পাশের দেওয়ালে নানা রঙের অদ্ভুত সব মূর্তির ছবি। পিতলের বড় বড় ড্রাগনের মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের শেষ দিকে, উঁচু বেদীর ওপরে বুদ্ধের বিরাট মূর্তি। গোগোলের মনে হলো মূর্তিটা সোনার, এতই

ঝকঝক করছে। মূর্তির দু পাশে প্রদীপ জ্বলছে। দেয়ালের চারদিকে আরো অনেক মূর্তির কাছেও প্রদীপ জ্বলছে। ভিতরে গন্ধটা অদ্ভুত। দুধারে দুটো দরজা রয়েছে। দুটো দরজাই খোলা, সেদিকেও বারান্দা রয়েছে।

গোগোল বুদ্ধ মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কি সোনার মূর্তি ?'

লাংডুলা বললেন, 'পুরোটা সোনার নয়, তবে সোনা আছে। সোনা রূপো পেতল তামা, এইসব দিয়ে মূর্তিটা তৈরি হয়েছে। তবে এই মঠে, ছোটোখাটো অনেক সোনার মূর্তি আছে। সে সব বাইরে রাখা হয় না। আমি তোমাকে অন্য একদিন সেসব দেখাবো। তবে দেওয়ালের গায়ে যে সব রঙ দিয়ে আঁকা দেখছো, তার মধ্যে সোনালী রঙ সবই খাঁটি সোনার জল দিয়ে আঁকা, মানে সোনা গলিয়ে রঙ কবা হয়েছে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, ভেতরে একটা কিসের গন্ধ লাগছে বলুন তো ?'

লাংডুলা হেসে বললেন, 'বোধ হয় প্রদীপের মাখনের। এই যে সব প্রদীপ দেখছো, এ সবই হলো বাটার ল্যাম্প। আর এ প্রদীপ কখনো নেভানো হয় না। বছরের পর বছব ধরে জ্বলছে। কখনো নেভাতে নেই।'

গোগোল খুব অবাক হয়ে প্রদীপগুলোর দিকে দেখলো। মাখনের প্রদীপের কথা ও এই প্রথম শুনলো। ও জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, গান কোথায় হচ্ছে ?'

লাংডুলা বললেন, 'আর একটা মন্দিব আছে। সেখানে সবাই মন্ত্রপাঠ করছে। চলো তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই।'

লাংডুলা অন্যদিকের একটা দবজা দিয়ে বাগানের এক পাশে আর একটি মন্দিবে গোগোল আর ইলাকে নিয়ে গেলেন। দেখা গেল, সেখানেও বুদ্ধমূর্তি প্রদীপ আর দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা রয়েছে। মেঝের ওপবে মুখোমুখি ছয় জন সামনে পুঁথি নিয়ে মন্ত্রপাঠ করছেন। অনেকটা গানের মতো সুব কবে, কিন্তু ঠিক গান নয়।

লাংডুলা বললেন, 'ওঁরা যে সব পুঁথি থেকে মন্ত্রপাঠ করছেন, পুঁথির সব লেখাগুলোই সোনার জল দিয়ে লেখা। 'তিব্বতের তৈরি কাগজে ওগুলো লেখা হয়েছে। গলানো সোনার লেখা নষ্ট হয় না।'

এই সময়ে একজন লামার মতো ন্যাড়া মাথা লোক এসে লাংডুলাকে নিচু গলায় কিছু বললেন। লাংডুলা তৎক্ষণাৎ মুখ গম্ভীর করে মন্দিরের বাইরে চলে গেলেন। গোগোল ইলাকে নিয়ে ওখানে একলা থাকতে পারলো না। বাবা মা সবাই অন্যদিকে মন্দির দেখে বেড়াচ্ছে। গোগোল ইলার হাত টেনে

ধরে বললো, 'চলে এসো।'

ও ইলার হাত ধরে, লাংড়ুলাকেই অনুসরণ করলো। লাংড়ুলা মন্দিরের পিছন দিকে কতগুলো সারি সারি ছোট ঘরের সামনে দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলেছেন। চারপাশে গাছের নিবিড় ছায়া। লাংড়ুলা খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে, কয়েক ধাপ নিচে নামলেন। তারপরেই বাঁ দিকে দেখা গেল, অনেকটা সমতল জায়গায় কয়েকটা ঘর। তার উঠোনে হুজন লামার মত লোক। আর একজন লম্বা চওড়া লোক তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গায়ে ভেড়ার লোমের জামা। মাথায় কপাল ঢাকা টুপি। কোমরের দিকে পোশাকটা অনেকটা নামবুর মতোই দেখতে।

লাংড়ুলা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই, লোকটা অদ্ভুতভাবে মাথা নিচু করে ঝুঁকে বারে বারে হাত তুললো। লাংড়ুলা তাকে কিছু বললেন। লোকটাও কিছু বললো। গোগোল দেখলো লাংড়ুলার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। তিনি অন্য হুজনের সঙ্গে কিছু কথা বলে, আবার সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। লোকটার চোখ দেখা যায় না, নরুণ দিয়ে চেরা হুটো দাগ যেন। কিন্তু তার নাক উঁচু আর মোটা, সে যেন বারে বারে অনুরোধ করে কিছু বলতে লাগলো।

লাংড়ুলা হঠাৎ লোকটার ভেড়ার লোমের জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে, কোমরের কাছ থেকে একটা বেশ বড় খাপে ঢাকা ছুরি বের করলেন। খাপ থেকে ছুরিটা খুলতেই সেটা ঝকঝক করে উঠলো। ছুরি না বলে সেটাকে হাফ-তলোয়ারই বলা যায়। লাংড়ুলা তখন গলা চড়িয়ে কিছু বললেন। লোকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করে কিছু বললো। লাংড়ুলা তাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে কিছু বললেন। লোকটা আর কিছু না বলে, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে মন্দিরের এদিকেই আসতে লাগলো। গোগোল ইলাকে নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, লোকটা তার নিচে এসে, একবার মুখ তুলে গোগোলের দিকে তাকালো। লোকটার চোয়াল চওড়া উঁচু গাল মুখটা কেমন শক্ত। চোখ হুটো এখন দেখা গেল, টকটকে লাল আর কালো হুটো মনি। সে ওপরের ধাপ বেয়ে গোগোলদের দিকে এলো না। নিচের দিকে বড় বড় গাছপালার বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

লাংড়ুলা সেই ছোরাটা খাপে ঢেকে, অন্য হুজনের একজনের হাতে দিয়ে; কিছু বলে, গোগোলদের কাছে উঠে এলেন। গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? ও লোকটা কে?'

লাংড়ুলা হেসে বললেন, 'তুমি যাদের দেখতে চেয়েছিলে, ও তাদেরই

একজন ! ও একজন খাম্‌পা ।'

গোগোলের হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ঠিক এইটাই ওর সন্দেহ হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলো 'ও কি ডাকাতি করতে এসেছিল ?'

লাংডুলা বললেন, 'ও কি তা স্বীকার করবে ? ও প্রায়ই মাঠে আসে। দুধ আব মাখন দিয়ে যায়। তাব জন্য কোনো পয়সা নেয় না। কিন্তু মঠের সব জায়গায় ওরা যেতে পারে না, আমবা বারণ করে দিয়েছি। কিন্তু আজ ওকে মন্দিরের আশেপাশে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেবা করতে দেখা যাচ্ছিল। তাই আমাকে মঠের সন্ন্যাসীরা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খাম্‌পারা মঠের আমাকে ছাড়া বিশেষ কারোকে ভয় পায় না। আমি ওকে ধমকে দিলাম। বললাম ফের যদি ওকে এভাবে ঘুরতে দেখা যায়, তা হলে পুলিশকে বলে ওকে আমি এ দেশ থেকে বের করে দেবো।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আর ছোরাটা ? ওটা আপনি টেনে বেব করলেন কেন ?'

লাংডুলা বললেন, 'খাম্‌পারা সব সময়ে অস্ত্র নিয়ে ঘোবে। কিন্তু মঠে আসবার সময় কোনো অস্ত্র সঙ্গে রাখা বারণ। এ খামপা সে বারণ মানে নি। আমি ওব বোতাম বন্ধ চামড়াব ক্লোকেব দিকে তাকিয়েই টেব পেয়েছিলাম, ওব পেট কোমরের কাছে একটা কিছু গোঁজা বয়েছে। বুঝতে পেরেই আমি ওটা টেনে বেব কবে বললাম, কেন তুমি এটা নিয়ে মঠের মধ্যে ঢুকেছো ? ও কোনো সদুত্তব দিতে পাবলো না। আমি বলে দিয়েছি, দুধ মাখন দিতে হলে অন্য কেউ আসবে, ও যেন আর মঠে কোনোদিন না আসে। আমি যেন ওকে আব কখনো মঠে দেখতে না পাই।'

লাংডুলাব কথা শেষ হতে না হতেই, বাবা মায়েবা দল বেধে সেখানে এলেন। বাবা বললেন, 'গোগোল তুমি আব ইলা এখানে কী কবছো ? আমরা তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

গোগোল বলে উঠলো, 'বাবা, এখুনি একটা খাম্‌পাকে আমবা দেখলাম। ওর কোমরেব মধ্যে মস্ত বড় একটা ছুরি লুকানো ছিল।'

বাবা অবাক চোখে লাংডুলাব দিকে তাকালেন। লাংডুলা খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে বাবাকে কিছু বললেন। তারপবে সকলেই মন্দিরেব সামনেব চত্বরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। গোগোলের চোখের সামনে ভাসছে সেই খাম্‌পাব মুখ। ফেরবার পথে বাবা বললেন, 'মঠে অনেক সোনাব জিনিস আছে। খাম্‌পারা তা জানে। লাংডুলা সেজন্য ভয় পান, ওরা কখন এসে সে সব চুরি কবে নিয়ে যাবে। ওদের নাকি কোন বিশ্বাস নেই।'

গোগোল বললো, 'লাংডুলা ওদের পুলিশে ধরিয়ে দেন না কেন?'

বাবা বললেন, 'কোনো প্রমাণ না পেলে কী করে ধরিয়ে দেবেন? তবে খাম্পাদের ওপরে পুলিশ নাকি সব সময় নজর রাখে।'

ফেরবার পথে গোগোল আবার গিয়াক বোংরা, অর্থাৎ খাম্পাদের আস্তানাটা দেখলো।

পরের দিন সকালে হোটেলে জলখাবার খেয়ে বেড়াতে বেরোবার কথা হলো। বড়দের কারোরই তেমন গরজ দেখা গেল না। বাবা মা দত্তকাকা আর কাকীমা তাস খেলতে বসলেন। বাবা গোগোলকে বললেন, 'হোটেলের আশেপাশে যেন সবাই বেড়ায় বা খেলা করে।'

বেলাদি হোটেলের কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে নতুন আলাপ করে গল্প করতে লাগলো। ইলা গোগোলের সঙ্গে হোটেলের বাইরে এলো। গোগোল বললো, 'ইলা, চলো আমরা সেই কাইরং মঠে যাই।'

ইলা ভয় পেয়ে বললো, 'কেউ কিছু বলবে না?'

গোগোল বললো, 'কী আবার বলবে? তা ছাড়া এখানে গাড়ি ঘোড়া তেমন নেই, চাপা পড়ার ভয় নেই। আমরা একটু বেরিয়ে চলে আসবো।'

ইলা রাজী হলো। গোগোলের রাস্তাটা মনে ছিল। আকাশটা বেশ পরিষ্কার। শীত বেশি নেই। রোদে চারদিক ঝলমল করছে। যাবার পথে সেই গিয়াক বোংরা দেখতে পেলো। গতকালের মতোই দেখাচ্ছে। দেখলেই মনে হয়, কালিম্পং-এর সব কিছু থেকে ও জায়গাটা যেন আলাদা। কেমন একটা রহস্যে ঘেরা।

গোগোলরা মঠে এসে পৌঁছুলো। আজ কোথাও মন্ত্রপাঠ হচ্ছে না। মঠ খুবই নিঝুম কারোকেই দেখা যাচ্ছে না। কেবল দেখা গেল, বড় মন্দিরের বারান্দায় একজন গুটিশুটি হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গোগোল আর ইলা জুতো খুলে ভিতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় বারান্দার বাঁ দিকে ওপরে যাবার সিঁড়ি থেকে লাংডুলা নামতে নামতে বললেন, 'আরে উদয়কুমার, তুমি? কী ব্যাপার?'

গোগোল খুব চমকে উঠেছিল লাংডুলাকে দেখে হেসে বললো, 'আজ আবার মঠ দেখতে এলাম।'

লাংডুলা বললেন, 'এসো, তোমাকে ওপরটা দেখিয়ে দিই। তোমার বন্ধুকেও নিয়ে এসো।'

গোগোল ইলাকে নিয়ে লাংডুলার সঙ্গে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে

উঠলো। ওপরটাও অনেকটা নিচের মতো দেখতে। নিচে যেখানে বুদ্ধের মস্তবড় মূর্তি আছে, ওপরেও ঠিক সেইখানে বুদ্ধের একটি মূর্তি রয়েছে, কিন্তু ছোট। প্রদীপ এখানেও জ্বলছে, আর গন্ধ সেই রকম। ওপরে অনেকগুলো আলমারি রয়েছে। তবে দেওয়ালের গায়ে ছবি নেই।

লাংডুলা বললেন, 'এই যে বুদ্ধ মূর্তি দেখছো, এটা সবটাই রূপো দিয়ে তৈরি।'

গোগোলের মনে পড়ে গেল, বললো, 'আপনি যে আমাকে সোনার মূর্তি দেখাবেন বলেছিলেন?'

লাংডুলা বললেন, 'হ্যাঁ, দেখাবো, আমার সঙ্গে এসো।'

লাংডুলা রূপোর বুদ্ধ মূর্তির ডান দিকেব কোণে গোগোলকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি লোহার সিন্দুক বয়েছে। লাংডুলা তাঁর কোমর থেকে ড্রাগনেব মুখওয়ালা রূপোর চাবির গোছা থেকে বিশেষ একটি চাবি বের করে. সিন্দুকের ছিদ্রে গলিয়ে, ভারি পাল্লা খুললেন। তার মধ্যে আর একটা বন্ধ পাল্লা দেখা গেল। তার গায়েও ছিদ্র। অন্য একটা চাবি দিয়ে সেই পাল্লাটাও খুললেন। ভিতর থেকে টেনে বের কবলেন সোনার বুদ্ধ মূর্তি, রাক্ষসের মতো মুখোস, নানা কারুকাজ করা ড্রাগন। সবগুলোরই চোখ নানারকমের পাথব দিয়ে তৈরি, কেবল বুদ্ধ মূর্তি ছাড়া। গোগোল হাতে নিয়ে দেখলো। এক একটার ওজন এক কে. জি. দেড় কে. জি.-র কম নয়। তা ছাড়াও দেখালেন সোনার কিছু মুদ্রা। সোনার জিনিস বলে নয়, গোগোলের চোখে সবই কেমন অদ্ভুত লাগলো। এসবই যেন অন্য পৃথিবীর জিনিস।

লাংডুলা বললেন, 'আবো আছে, লুকানো সিন্দুকে। আবার আব একদিন দেখাবো।'

তিনি সিন্দুকেব পাল্লাগুলো চাবি এঁটে বন্ধ কবলেন। গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আজ মন্ত্রপাঠ হচ্ছে না?'

লাংডুলা বললেন, 'রোজ রোজ একই সময়ে হয় না। আজ সন্ধ্যে বেলায় হবে। তোমার কি মন্ত্রপাঠ শুনতে ভালো লেগেছে?'

গোগোল বললো, 'আমার সব কিছুই এখানে অদ্ভুত লাগছে। একেবারে নতুন।'

লাংডুলা হেসে বললেন, 'বুঝেছি। নতুন নতুন ব্যাপাব স্যাপার দেখে তুমি খুবই মজা পাচ্ছো। ঠিক আছে, তোমবা ঘুরে ঘুরে সব দেখ। আমি ওপরে বসে একটু কাজ করবো। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও,

তোমাদের আমি ভগবানের প্রসাদ দেবো।'

গোগোল ইলাকে নিয়ে নিচে নেমে এলো। দেখলো বারান্দায় সেই লোকটি তখনো ঘুমোচ্ছে। ওরা দুজনে নিচের মন্দিরে ঢুকলো। কেউ নেই, প্রকাণ্ড হল ঘরটা একেবারে ফাঁকা। এতো নিঝুম আর নিরিবিলি, কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করে। গোগোল ইলার হাত ধরে বড় বুদ্ধ মূর্তির সামনে গেল। ইলা একটা বিকট রাক্ষসের মতো মুখের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কিসের ছবি?'

গোগোল ঠিক জানে না, তবু বললো, 'আমার মনে হয়, এটা শয়তানের ছবি।'

ওরা সেদিক থেকে ফিরতেই গোগোলের মনে হলো, কেউ যেন বাঁ দিকের দবজার কাছ থেকে হঠাৎ সরে গেল। লোকটাকে ও ঠিক দেখতে পেলো না। বললো, 'বাঁ দিকের দরজার কাছ থেকে কেউ যেন সরে গেল না?'

ইলা কিছুই দেখতে পায়নি, বললো, 'দেখলাম না তো?'

গোগোল তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গেল। লম্বা কাঠের বারান্দা, পূবে আর পশ্চিমে ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ইলাও গোগোলের পিছনে পিছনে তাড়াতাড়ি এসে বললো, 'তুমি আমাকে ছেড়ে এলে কেন? আমার ভয় লাগে।'

গোগোল বললো, 'ভয়ের কী আছে? আমি দেখতে এলাম, সত্যি সত্যি কেউ ছিল কী না। কারোকেই দেখছি না। কিন্তু আমি যেন কারোকে সবে যেতে দেখলাম।'

ইলা বললো, 'তার চেয়ে বাইবের বাগানে চলো, ওখানে অনেক ফুল আছে।'

গোগোল ইলাকে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বাগানের চারপাশে বেড়াতে লাগলো। একজনের সঙ্গে ওদের দেখা হলো, অনেকটা লামার মতো পোশাক পরা মাথা ন্যাড়া। তিনি গোগোল আর ইলার দিকে তাকিয়ে হেসে চলে গেলেন। গোগোল ইলাকে বললো, 'ইনি একজন লামা মনে হয়।'

গোগোল এ কথা বলবার সময়েই, হঠাৎ পশ্চিম দিকের বাগানের বাইবে ঝোপ নড়ে উঠতে দেখলো। মনে হলো, কেউ যেন ঝোপের আড়াল দিয়ে চলে যাচ্ছে। গরু ছাগলও হতে পাবে। তবু গোগোল ছুটে গেল ঝোপের কাছে। পিছন থেকে ইলা চীৎকার করে উঠলো, 'গোগোল, তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

গোগোল সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঝোপের মধ্যে উঁকি দিল। আশ্চর্য, কারোকেই দেখা গেল না। গরু ছাগলও না। ইলা ততক্ষণে ওর কাছে ছুটে এসেছে। বললো, 'কী দেখছো?'

গোগোল বললো, 'আমার মনে হলো, এই ঝোপের আড়াল দিয়ে কেউ যাচ্ছিল।'

ইলা বললো, 'আর আমি দেখলাম, আমার বাঁ দিকের ঢালু দিয়ে কে যেন গড়িয়ে চলে গেল। লোকটাকে ঠিক দেখতে পেলাম না, তার গায়ে একটা কালো রঙের জামা ছিল।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন দেখলে?'

ইলা বললো, 'তুমি যখন এদিকে ছুট লাগালে, ঠিক তখনই।'

গোগোল অবাক হয়ে বললো, 'তা কী করে হয়? আমি দেখলাম ওদিকের ঝোপে। আর তুমি দেখলে তোমার বাঁ দিকে? এত তাড়াতাড়ি কেউ এখান থেকে ওখানে যেতে পারে?'

ইলা বললে, 'তা আমি কী করে জানবো। কালো জামা পরা ছিল, মনে হলো মানুষই।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, মুখ দেখতে পেয়েছিলে?'

ইলা বললো, 'না। মুখ হাত মাথা কিছুই দেখতে পাইনি। এখন আমার মনে হচ্ছে, ওটা বোধহয় মানুষ নয়, কোনো জানোয়ার। এখানে ভল্লুক আসতে পারে?'

গোগোল খুব ভাবনায় পড়ে গেল। ওর কোনো ধারণা নেই, এখানে ভল্লুক আসতে পারে কী না। তবে পাহাড়ে ভল্লুক থাকে। কিন্তু এখানে দিনের বেলা আসবে কী? ও বললো, 'তা তো আমি জানি না। কিন্তু আমি যেন কারোকে এই ঝোপের মধ্যে দেখলাম। তুমি বলছো, তোমার বাঁ দিক দিয়ে কালো মতো একটা কিছুকে ঢালুতে নেমে যেতে দেখেছো। আবার একটু আগে মনে হলো, মন্দিরের বারান্দার দরজায় যেন কারোকে সরে যেতে দেখলাম। খুব অদ্ভুত, তাই না?'

ইলা বললো, 'হ্যাঁ। এখানে ভূতটুত নেই তো?'

গোগোল একটু চমকে উঠে বললো, 'ভূত? ভগবানের মন্দিরে আবার ভূত থাকে নাকি?'

ইলা বললো, 'ভগবানের মূর্তির ঠিক কাছেই, যদি ভয়ংকর ড্রাগনের আর সেই শয়তানের ছবি থাকতে পারে, তাহলে ভূত থাকবে না কেন?'

গোগোল একটু থমকে গেল। ইলা কথাটা নেহাত মিথ্যা বলে নি।

এখন যেন ব্যাপারটাকে ভৌতিক বলেই মনে হচ্ছে। এ সময়ে হঠাৎ ওরা পিছনে হাত তালির মতো শব্দ শুনতে পেয়ে, মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। কারোকেই দেখতে পেলো না। গোগোল বললো, 'হাততালির শব্দ না?'

ইলা বললো, 'হ্যাঁ।'

গোগোল বললো, 'চলো তো দেখি, ওখানে নিশ্চয়ই কেউ আছে।'

ইলা গোগোলের সঙ্গে যেতে যেতে বললো, 'গোগোল, আমার কেমন ভয় করছে। তার চেয়ে চলো আমরা হোটেলে ফিরে যাই।'

গোগোল বললো, 'ভয়ের কী আছে? চলো আগে ওখানে দেখি। তারপরে আমরা পেছনে লামা সন্ন্যাসীদের ঘরের দিকে যাবো। তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের ঘরে আছেন।'

গোগোলেরা পূব দিকে এসে এক জায়গায় দাঁড়ালো। মঠটা একটা উঁচু টিলার ওপরে তৈরী। চারপাশেই ঢালু পাহাড় নেমে গিয়েছে। তবে খাদ খুব খাড়াই না। ওরা দেখলো নিচের দিকে পাইন বনের ঘন ছায়া, ঢালুতে নেমে গিয়েছে। কিন্তু লোকজন কেউ নেই। অথচ হাততালির শব্দটা এখান থেকেই বেজে উঠেছিল। ওরা আরো এগিয়ে, ঢালুর খুব ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলো পাইন বনের ঘাসে কয়েকটা গরু চরে বেড়াচ্ছে। গরুগুলোর চেহারা বাঙলাদেশের সমতলের মতো নয়। গোগোল বললো, 'ওখানে নিশ্চয়ই কেউ গরু চরাচ্ছে। তারাই কেউ হাততালি দিয়ে কারোকে ডেকেছে। চলো, আমরা লামা সন্ন্যাসীদের ঘরের দিকে যাই।'

গোগোল ইলার হাত ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চললো। মন্দিরের এটা পিছন দিক। সারি সারি ঘরের সামনে দেখা গেল কয়েকজন লামা রয়েছেন। কেউ ঘরে, কেউ বাইরে। তাঁরা কেউ নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। গোগোলদের দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ হাসলেন। গোগোল ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, 'ইউ অল্ লামাজ?'

কেউ কেউ মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন। গোগোল আরো এগিয়ে গেল। গতকাল যেখানে উঁচু থেকে, নিচের কয়েকটা ঘরের সামনে, থাম্‌পাকে লাংডুলা বকেছিলেন, সেই জায়গাটা দেখা গেল। গোগোলের চোখের সামনে থাম্‌পার সেই মুখটা ভেসে উঠলো, কিন্তু অস্পষ্ট। লোকটার কি পাতলা গোঁফ ছিল? গোগোল এখন মনে করতে পারলো না।

ইলা বললো, 'গোগোল বেশি দেরি করো না, হোটেলে সবাই ভাববে।'

গোগোল তা মানলো, বললো, 'চলো লাংডুলার কাছ থেকে প্রসাদ নিয়ে এবার চলে যাবো।'

এই কথা বলার সময়েই, কাছাকাছি কোথায় ধুপ্‌ করে একটা শব্দ হলো। শব্দটা বেশ জোরেই হলো। গোগোলের মনে হলো, যেন ওর পায়ের কাছে মাটি কেঁপে উঠলো। ও পশ্চিম দিকে তাকালো। বললো, 'মনে হলো, ভারি কিছু একটা পড়লো।'

ইলা বললো, 'আমিও টেব পেয়েছি। কাছেই শব্দটা হলো।'

গোগোল চারপাশে তাকালো। লামা সন্ন্যাসীদের দেখা যাচ্ছে তাঁদের ঘরের সামনে। তাঁরা যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। গোগোল উত্তর দিক ঘেঁষে, পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেল। খানিকটা যেতেই মনে হলো, ওদের ডান দিকে, অর্থাৎ উত্তরের ঢালুতে হুড়মুড় করে ঝোপ ঝাড় ভেঙে পড়ে গেল। ঝোপঝাড় এত ঘন, তাকিয়ে কিছুই দেখা যায় না। ইলা ভয় পেয়ে, গোগোলের একটা হাত চেপে ধরলো। গোগোল বললো, 'কিছু একটা গড়িয়ে পড়লো যেন, না?'

ইলা বললো, 'হ্যাঁ।'



গোগোল ঘন ঝোপের মধ্যে ঝুঁকে, মাথা ভিতরে গলিয়ে দিল। দেখলো, বেশ খানিকটা নিচে, একটা কালো মতো কিছু, বড় বড় পাথরের খাদে গুড়ি মেরে মেরে চলে যাচ্ছে। কী ওটা? দেখে মনে হচ্ছে, কোনো জন্তু জানোয়ারের পিঠ। মাথা মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওটা কি ইয়াক ছাগল?

ইলা বললো, 'গোগোল, কী দেখছো?'

গোগোল বললো, 'তুমি আমার মাথার কাছে তোমার মাথাটা নিয়ে এসে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখো তো! একটা কালো মতো কী যেন পাথরের খাঁজে খাঁজে পালিয়ে চলে যাচ্ছে।'

ইলা ঝোপের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে, নিচের দিকে দেখলো। বলে উঠলো, 'আরে, তখন তো এই রকম কালো মূর্তিই দেখেছিলাম, আমার বাঁ দিক দিয়ে ঢালুতে ঝপ্ করে নেমে গেছলো।'

গোগোল বললো, 'কিন্তু সেটা তো দৌড়াচ্ছিল, তুমি বললে না?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ। মানুষের মতো সোজা দেখাচ্ছিল। এটা তো হামা দিচ্ছে।'

গোগোল হঠাৎ দেখলো, কালো জানোয়ারটা একবার ওপরের দিকে ফিরে তাকালো। ওর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো, মুখটা যে অবিকল মানুষের মতো। গোগোল বলে উঠলো, 'ইলা, ওটা কোনো জানোয়ার না, মানুষ। মুখটা দেখলে?'

কিন্তু মুখটা ততক্ষণে ঘুরে গিয়েছে। ইলা বললো, 'কই দেখতে পেলাম না তো?'

হামাগুড়ি দেওয়া কালো মূর্তিটা তখন বড় বড় পাথরের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। গোগোল বললো, 'আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, ওটা একটা মানুষের মুখ। আসলে ওটা একটা মানুষই। কিন্তু ওরকম করে যাচ্ছে কেন? হামাগুড়ি দিয়ে? আর ওরকম ইয়াকের চামড়া দিয়ে নিজেকে ঢেকেছেই বা কেন?'

ইলা গোগোলের হাত ধরে ঝোপ থেকে টেনে সরিয়ে এনে বললো, 'যাই হোক গে, চলো এখন, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওপর থেকে প্রসাদ নিয়ে এক ছুটে হোটেলে চলে যাবো।'

গোগোলের চোখের সামনে মূর্তিটা ভাসতে লাগলো। ওর মনটা কেমন খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। কী হতে পারে, ভাবতে ভাবতে ওরা মন্দিরের সামনে গিয়ে বারান্দায় উঠে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেল। সামনে কোথাও

লাংডুলাকে দেখতে পেলো না। উনি কি নিচে নেমে গিয়েছেন? তা তো যাবেন না। তিনি নিজেই গোগোলদেব ভগবানেব প্রসাদ নিয়ে যেতে বলেছেন।

গোগোল বুদ্ধ মূর্তির দিকে তাকাতে গিয়েই, হঠাৎ ওর চোখে পড়লো ডান দিকে দেওয়ালেব সঙ্গে গাঁথা সেই লোহার সিন্দুকেব পাল্লা খোলা। দেখেই ওর বুকটা কেমন ধক্ করে উঠলো। লাংডুলা লামা ঘরে নেই, অথচ সিন্দুকেব পাল্লা খোলা কেন? ও ইলাকে বললো, 'দেখেছো ইলা, সেই সোনাব মূর্তিগুলোব সিন্দুক খোলা। চলো তো ওখানে গিয়ে দেখি।'

গোগোল আর ইলা সিন্দুকেব কাছে গিয়ে দেখলো, কেবল প্রথম পাল্লাটা না, ভিতবের পাল্লাটাও খোলা। গোগোল যেই সিন্দুকের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে যাবে, অমনি ইলা বলে উঠলো, 'গোগোল বাবান্দায় ওটা কি?'

গোগোল দক্ষিণ দিকের খোলা দরজা দিয়ে কাঠেব বারান্দার দিকে তাকালো। দেখলো, কেউ যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পোশাকটা দেখে মনে হচ্ছে লাংডুলা। গোগোল ছুটে গেল। সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো, ওব চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো। দেখলো লাংডুলাই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তাঁর পিঠে একটা ছুরি বেঁধানো, কেবল ছুরিব বাঁট দেখা যাচ্ছে। তাঁর মুখটা একদিকে কাত্ হয়ে বয়েছে। গোগোল চিৎকাব কবে উঠলো, 'লাংডুলা লামা, লাংডুলা লামা।'

লাংডুলা কোনো সাড়া দিলেন না। গোগোল বলে উঠলো, 'ইলা শীগ্গির নিচে চলো, লামাদেব গিয়ে খবব দিই। নিশ্চয়ই কেউ লাংডুলাকে ছুবি মেবেছে।' বলেই ইলার হাত ধবে, হল পেবিয়ে, পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলো। লামাদেব ঘবেব দিকে যেতে যেতে বললো, 'তখন যে আমরা এ পাশটায় ধুপ্ কবে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, নিশ্চয় সেটা ওপর থেকে কাবোর লাফিয়ে পড়াব শব্দ। এখন আমার মনে হচ্ছে, সেই ঝোপের মধ্যে কারোব ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ শুনেছিলাম, সেই লোকটাই নিশ্চয় লাফিয়ে পড়ে ঝোপেব মধ্যে ঢুকেছিল।'

ইলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবলো, 'কী কবে বুঝলে?'

গোগোল বললো, 'তাছাড়া ওই শব্দগুলো আর কিসেব হতে পাবে? আমার তো মনে হচ্ছে, কোনো মানুষের লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পালাবার শব্দ ওগুলো। আমার মনে হচ্ছে, লাংডুলাকে যে ছুরি মেরেছে, সে-ই লাফিয়ে পালিয়েছে।'

বলতে বলতে গোগোলের চোখ দুটো ঝলসিয়ে উঠলো। উত্তেজিত হয়ে

বললো, 'ওহ! ইলা, এখন আমি বুঝেছি, পাহাড়ের নিচে সেই যে ইয়াকের চামড়া মুড়ে হামাগুড়ি দিয়ে লোকটা যাচ্ছিল, সেই আসলে পালাচ্ছিল।'

বলতে বলতে ওরা লামাদের ঘরগুলোর সামনে এলো। লামারা তখনো সেখানেই যে যার মতো ছিল। মালা জপ করছিল, কেউ কেউ কথা বলছিল, কেউ বা ঘরের মধ্যে কিছু করছিল। গোগোল যাকে সামনে পেলো, তাকেই ইংরেজিতে বলবার চেষ্টা করলো, 'লাংডুলা মার্ডার। নাইফ—বিগ নাইফ অন দ্য ব্যাক। আয়রনচেষ্ট ইজ্ ওপেন, নো গোল্ডন ডলস।' বলে ও মন্দিরের ওপরের দিকে হাত দিয়ে দেখালো।

কয়েকজন লামার মুখে ভয় ফুটে উঠলো। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করলেন। একজন গোগোলের কাছে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'লাংডুলা কোথায়?'

গোগোল বললো, 'আপ স্টেয়ার অন বারাণ্ডা। নাইফ অন দ্য ব্যাক।' বলে ছুরি পিঠে বসানো হাতের ভঙ্গিতে দেখিয়ে আবার উত্তর দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললো, 'এ ম্যান ওয়াজ রানিং দ্যাট সাইড। হি ওয়াজ কভারড বাই দ্য ইয়াক স্কীন।'

দুজন লামা ছুটলেন পশ্চিম দিকে। অন্যান্যরা তাঁদের নিজের ভাষায় উত্তেজিত হয়ে কী বলাবলি করলেন। অমনি আর একজনও পশ্চিম দিকে ছুটলেন। আর একজন লামা গোগোলের হাত ধরে বললেন, 'শো মী, বাই হুইচ ওয়ে দ্য ম্যান ওয়াজ রানিং।'

গোগোল লামার সঙ্গে উত্তর দিকে ছুটে গেল। ইলাও তাঁদের সঙ্গে গেল। উত্তর দিকে যেখানে, ঝোপের ফাঁক দিয়ে, পাহাড়ের নিচে লোকটাকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে দেখেছিল, গোগোল লামাকে সেই জায়গাটা দেখালো।

ইলা হঠাৎ বলে উঠলো, 'এই দেখ গোগোল, একটা সোনার পুতুল এখানে পড়ে আছে।'

গোগোল ফিরে তাকিয়ে দেখেই সেটা তুলে নিয়ে লামাকে দেখালো, 'লুক স্যার, গোল্ডেন ডল!'

লামা সেটা দেখেই চমকে উঠলো। গোগোলের হাত থেকে ছোট্ট সোনার মূর্তিটা নিয়ে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, নিজের ভাষায় কী সব বলতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ দুজন লামা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। নিচের লামা সোনার মূর্তিটা তাঁদের দেখালেন। আর নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করলেন। নিচের লামা সোনার ছোট্ট

মূর্তিটা ওপরে ছুঁড়ে দিলেন। একজন লামা সেটা পাকা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো লুফে নিলেন। নিচের লামা আরো কিছু বলে, ঝোপের মধ্যে ঢুকে, পাহাড়ের নিচের দিকে নামতে লাগলেন।

গোগোল বললো, 'স্যার, মে আই গো উইথ ইউ?'

লামা ফিরে একবার গোগোলের দিকে দেখলেন, কিন্তু কিছু না বলেই সাবধানে নামতে লাগলেন। গোগোল বললো, 'ইলা তুমি মন্দিরের সামনের দিকে চলে যাও। আমি নিচে যাচ্ছি।'

ইলা বলে উঠলো, 'গোগোল তুমি যেতে পারবে না। তা ছাড়া, আমার একলা ভয় করবে।'

গোগোল বললো, 'ভয় করবে কেন। তুমি তো সত্যি একলা নও, সামনে যাও, অনেকে আছে।'

গোগোল লামার পিছনে পিছনে নামতে লাগলো। ইলা বেচারি সেখানেই মুখ চূণ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে চলে গেল। কিন্তু গোগোল এতোই উত্তেজিত, ভেবে দেখলো না, লামার মতো পাহাড়ি পথে নামা ওর পক্ষে কতো কঠিন। পিছন ফিরে লামা যখন দেখলেন, গোগোল আসছে, তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, 'ডোণ্ট কাম, ব্যাড গর্জ।'

গোগোল জানে, গর্জ মানে গভীর খাদ। ও বললো, 'আই উইল গো স্লোলি। দেয়ার আই স্য, দ্য ম্যান।' বলে নিচের বড় বড় পাথরের চাংড়াগুলো হাত তুলে দেখালো।

লামা তখন নিজেই গোগোলের এক হাত শক্ত করে ধরে বললেন, 'অল্‌রাইট, ইউ শো দ্য ওয়ে।'

এদিকে গোগোল আর ইলার আসতে দেরি দেখে, ওদের বাবা মা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাস খেলা রেখে, ঘরের বাইরে এলেন। দেখলেন দুজন বেয়ারা, নিজেদের মধ্যে খুব উত্তেজিত হয়ে কিছু বলাবলি করছে। তাদের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ।

গোগোলের বাবা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী বলাবলি করছো?'

একজন বেয়ারা হিন্দীতে জবাব দিল, 'বাবুজী, কাইরং মঠের বড় লামাকে ছুরি মেরে খুন করে, সিন্দুক থেকে অনেক সোনা লুটে নিয়ে গেছে।'

গোগোলের বাবা বলে উঠলেন, 'কাইরং মঠ? কারা খুন করেছে?'

বেয়ারা বললো, 'তা এখনো জানা যায় নি। সারা কালিম্পং-এ পুলিশ ছোটাছুটি করছে।'

গোগোলের মা বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ! গোগোল ইলাকে নিয়ে কাইরং মঠে যায় নি তো?'

ইলার মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'তাহলে কী হবে?'

গোগোলের বাবা বললেন, 'ভাববেন না, আমি আর ইলার বাবা দুজনে কাইরং মঠে যাচ্ছি। এর মধ্যে যদি গোগোলরা ফিরে আসে, আমাদের একটা খবর দেবেন।'

গোগোলের বাবা দত্তকাকাকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন শহরটা যেন থমথম করছে। মোড়ে মোড়ে পাহাড়ি লোকেরা জটলা করছে। সকলেই যেন সকলের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

গোগোলের বাবা ইলার বাবাকে নিয়ে যখন কাইরং মঠে এলেন, তখন সেখানে পুলিশ আর জনতার বেশ ভিড়। পুলিশ জনতাকে সরিয়ে দিচ্ছে। লাংডুলার মৃতদেহ তখন নিচের বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে। তাঁর চোখ বোজা, সমস্ত পোশাক রক্ত মাখা। আর দেখা গেল, মঠের বাগানের এক পাশে ইলা কাঁদছে। তাকে একজন লামা মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ইলার বাবা সেখানে ছুটে যেতেই, ইলা বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গোগোলের বাবাও সেখানে গেলেন। ইলা সব কথাই বললো।

গোগোলের বাবা সব শুনে, ইলাকে নিয়ে উত্তরের দিকে গেলেন। সেখানে দু তিনজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইলা পাহাড়ের নিচে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'গোগোল লামার সঙ্গে এখান দিয়ে নেমে গেছে।'

কিন্তু নিচের দিকে গোগোল বা লামা, কারোকেই দেখা গেল না। একজন পাহাড়ি পুলিশ বললো, 'এদিকে আমাদের অফিসার কয়েকজন পুলিশ নিয়ে নেমে গেছে।'

গোগোল তখন লামার সঙ্গে নিচে নেমে, একটা পাহাড়ি গ্রামের মধ্যে এসে পড়লো। লামা কী ভাষায় গ্রামের লোককে কী সব বললেন। গ্রামের লোকেরা অবাক চোখে তাকিয়ে সবাই মাথা নাড়লো। তার মানে তারা কোনো অচেনা লোককে গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে দেখে নি। একজন গ্রামবাসী হাত তুলে একদিকে দেখিয়ে কী যেন বললো। লামা তৎক্ষণাৎ গোগোলের হাত ধরে সেই দিকে যেতে যেতে ইংরেজিতে বললেন, 'গ্রামের

পেছন দিয়ে লোকটা পালিয়েছে।'

গোগোল রীতিমতো ঘামছে। ওর মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওর কষ্ট বলে এখন কিছু নেই। ও সমানে লামার সঙ্গে ছুটতে লাগলো। গ্রামের বাইরে রাস্তাটা তেমন খাড়াই নিচু না। এখন গোগোল লামার সঙ্গে পায়ে হাঁটা রাস্তা দিয়েই চলেছে। গ্রামের বাইরে মাইল খানেক নেমে আসার পরে, গোগোলের হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ পড়লো। ও দেখলো রাস্তার বাইরে, বাঁ দিকের বড় বড় ঘাস জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কী যেন একটা যাচ্ছে। ইয়াকের কালো চামড়া ঢাকা দেখেই বুঝতে পারলো, সেই লোকটা।

গোগোল থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই লামাও থেমে গেলেন। গোগোল আঙুল দিয়ে সেই মাথা নিচু করে যাওয়া মূর্তিটাকে দেখালো। লামার চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠলো। তিনি তৎক্ষণাৎ গোগোলের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটলেন। গোগোলও ছুটলো। ইয়াকের চামড়া ঢাকা লোকটার একেবারে কাছাকাছি হতেই, সে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকালো। গোগোলের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। দেখলো, গতকাল মঠের নিচে দেখা সেই খাম্‌পা!

খাম্‌পা লামাকে দেখেই দৌড় দিতে গেল। লামা একটা কী বলে চিৎকার করে, খাম্‌পার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপরেই দুজনের মধ্যে লেগে গেল ধস্তাধস্তি কুস্তি খাম্‌পাব সঙ্গে লামাও মাটিতে পড়ে গেলেন। জায়গাটা এমন বিপজ্জনক, একটু বাঁয়ে গেলেই কয়েক শো ফুট নিচেব খাদে পড়ে যাবার ভয়। এদিকে কুস্তি লড়তে গিয়ে খাম্‌পার গা থেকে ইয়াকের চামড়াটা খুলে পড়েছে। গোগোল দেখলো, চামড়াটার ভিতর দিকে একটা অন্যবকম চামড়ার বড় ব্যাগ, চামড়ারই ফিতে দিয়ে বাঁধা। কিন্তু লড়াইটা ক্রমেই খারাপেব দিকে যাচ্ছে। খাম্‌পার চেহারা অনেক বড়, তাব গায়ে শক্তিও বেশি। লাম ওর সঙ্গে কিছুতেই লড়ে উঠতে পারছেন না। গোগোল আরো দেখলো, খাম্‌পাব কোমরের বেল্টে, বাঁ দিকে একটা খাপে ঢাকা ছুরি ঝুলছে। লামাকে ঘুষি মেরে সরিয়ে দিয়ে, সে কেবলই ছুরিটা বের করবার চেষ্টা করছে কিন্তু লামা ওকে সেই সুযোগ না দিয়ে, বারে-বারেই ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। অথচ তাঁর নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

গোগোল কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না। খামপাটাকে কী করে কাবু করা যায়, তা-ই ওর ভাবনা। একটা পাথর তুলে যে ছুঁড়বে, তাও পারছে না। লামার গায়ে লেগে যেতে পারে। নিজের লোককেই আঘাত করা হবে। কিন্তু খাম্‌পাটা যে-ভাবে লামাকে মারছে, হয় তো উনি মরেই যাবেন। খাম্‌পা বারেবারেই লামাকে খাদের ধারে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা

করছে। তার মানে ওঁকে নিচে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতে চায়। আশ্চর্য, এসব পাহাড়ি জায়গায়, পথে লোকও যেন চলে না।

গোগোলের এই সব উত্তেজিত ভাবনার মধ্যেই, আবার ওর চোখে পড়লো ইয়াকের বড় চামড়াটা। ভাবলো ব্যাগটার মধ্যে কী থাকতে পারে? ও যদি লাংডুলাকে মেরে সোনার মূর্তিগুলো চুরি করে থাকে, তা হলে বোধহয় ওই ব্যাগের মধ্যেই রেখেছে! কথাটা মনে হতেই ও ইয়াকের কালো চামড়াটা তুলতে গেল। বেশ ভারী আর মোটা চামড়া। এটাকে গায়ে চাপিয়ে চলাই তো মুশকিল। গোগোল ভিতরের দিকে ফিতে দিয়ে বাঁধা ব্যাগটার মধ্যে হাত ঢোকাবার চেষ্টা করলো।

খাম্পা হঠাৎ পশুর মতো গর্জন করে, লামাকে ছেড়ে গোগোলের দিকে ছুটে এলো। গোগোল ভয়ে ব্যাগ ছেড়ে সরে গেল। আর ঠিক তখনই লামা চিৎকার ক'রে গোগোলকে বললেন, 'বয়, টেক দ্যাট ব্যাগ্ এ্যাণ্ড রান্।'

বলেই তিনি ঠিক চিতা বাঘের মতো, পিছন থেকে খাম্পার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গোগোল পরিষ্কার দেখতে পেলো, লামা খাম্পার ঘাড়ের মাংস কামড়ে ধরলেন। খাম্পা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। খাম্পা পিছনে হাত দিয়ে লামাকে মারবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে-মার তেমন জোর হলো না। বরং তার যন্ত্রণার চিৎকার বেড়ে উঠলো। গোগোল এই ফাঁকে লামার কথা মতো ইয়াকের চামড়া থেকে ব্যাগের ফিতেটা তাড়াতাড়ি খুলতে লাগলো। চামড়ার ফিতে হলেও বাঁধনটা বেশ শক্ত। গোগোল তবু চেষ্টা করতে লাগলো।

খাম্পা গোগোলকে ব্যাগ খোলবার চেষ্টা করতে দেখে, লামাকে ঘাড়ে নিয়েই ওর দিকে তেড়ে আসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু যন্ত্রণায় তার বীভৎস মুখটা আরো বিকৃত দেখাচ্ছে। ওর মুখের দিকে তাকালেই গোগোলের বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। খাম্পাকে এগোতে দেখে, ও ইয়াকের চামড়াটা দু হাতে ধরে টেনে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। ওর শক্তির পক্ষে বেশ ভারি। তবু গোগোল চেষ্টা করতে লাগলো। আর চেষ্টা করতে গিয়েই গোগোলের চোখে পড়লো, খাম্পা এবার কোমরের খাপ থেকে ছুরিটা খুলে নিয়েছে। ছুরিটার ডগা ধরে মাথার ওপরে তুলে, গোগোলকেই তাক্ করছে ছুঁড়ে মারবার জন্য। গোগোল ভয়ে ছুটে পালাবে ভাবতেই, দেখলো, খাম্পার ঘাড় কামড়ে পড়ে থাকা চিতা বাঘের মতো লামা হঠাৎ এক হাত তুলে, খাম্পার ছুরি ধরা হাতে ঘুষি মারলেন। ছুরিটা খাম্পার হাত থেকে পড়ে গেল।

খাম্পা তখন মরিয়া হয়ে গায়ে নানাভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো, যাতে

লামা তার ঘাড় থেকে ছিটকে পড়েন। কিন্তু আশ্চর্য লামার কামড়ের জোর, কিছুতেই তাঁকে ফেলতে পারলো না। এদিকে খাম্‌পার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, যতই সে বলশালী হোক, ঘাড়ের কামড়ের যন্ত্রণা সে আর সহ্য করতে পারছে না। তার লাল টকটকে মুখটা যেন আস্তে আস্তে সাদা হয়ে আসছে।

গোগোল এই ফাঁকে ছুরিটা হাতে তুলে নিল। ছুরিটা যে এরকম ভারি হবে, ও তা ভাবেনি। কম করে পাঁচশো গ্রাম ওজন হবে। ছুরির বাঁটটা হাতীর দাঁতের। গোগোল সেই ছুরি দিয়ে যখন ব্যাগের ফিতেটা কাটতে লাগলো, খাম্‌পা তখন মরিয়া হয়ে, লামাকে শুদ্ধ মাটিতে শুয়ে পড়লো। চেষ্টা করলো, যাতে চিত হয়ে শুয়ে লামাকে তার শরীরের ওজনের চাপে পেষাই কবতে পারে। কিন্তু লামা ঘাড় কামড়ে রেখেই, নিজের শরীরটাকে এমন ভাবে সরিয়ে রাখলেন, খাম্‌পা কিছুতেই তাঁকে কাবু করতে পারলো না।

গোগোল ব্যাগেব ফিতে কেটে সেটা হাতে তুলতে গিয়ে দেখলো বেশ ভাবি। ব্যাগটা ভেড়ার চামড়ার তৈরি, নরম কিন্তু মুখটা ছোট। তার মধ্যে হাত গলিয়ে পুতুলের মতো ঠেকলো। তুলে বের করে দেখলো, সোনার মূর্তি। লাংডুলা যা দেখিয়েছিলেন। ও আবার খাম্‌পা আব লামার দিকে তাকালো। দেখলো, খাম্‌পা হাত পা ছুঁড়ছে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করছে কিন্তু লামা যেন হাত নেড়ে কী ইশারা করলেন। তাঁব মুখ দেখা যাচ্ছে না! মুখটা যেন খাম্‌পার ঘাড়ে সেঁটে বসেছে। তবে লামা কিছু ইশাব৷ করছেন, তা বুঝতে পারলো। ও কাছে যেতে যেতেই বুঝতে পারলো, লামা ছুরি মাবার ভঙ্গি করে দেখাচ্ছেন, আর হাত নাড়ছেন। গোগোল ছুরিটা নিয়ে ওঁর কাছে যেতেই, উনি এক লহমায় ছুরিটা গোগোলেব হাত থেকে নিয়ে নিলেন।

এই সময়েই কয়েকজনের গলার স্বর আব জুতো পায়ে ছুটে আসাব শব্দ শোনা গেল। গোগোল মুখ তুলে দেখলো, পুলিশের পোশাক পবা কয়েকজন গ্রামবাসীদের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে। গোগোল তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠলো, 'পুলিশ! পুলিশ, এখানে!'

পুলিশ অফিসাব দাঁড়িয়ে পড়লেন, গোগোলকে দেখতে পেয়ে সদলবলে সেখানে ছুটে এলেন। এসেই ঘটনা দেখে, অফিসার তার কোমরের খাপ থেকে রিভলবার বের করে চিৎকার করে উঠলেন, হ্যাণ্ডস্ আপ!'

খাম্‌পার বোধহয় তখন আর হাত তোলবার ক্ষমতা ছিল না। লামাকে আর ছুরি মারতে হয়নি। পুলিশ দেখেই তিনি খাম্‌পার ঘাড় থেকে দাঁত ছাড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা সরে গেলেন। তাঁর মুখে তখন রক্ত।

বোঝবার উপায় নেই, তাঁর আঘাতের আব খাম্‌পার ঘাড়ের রক্ত কোনটা। তাঁর সারা মুখটাই রক্তে লাল। গোগোল তাড়াতাড়ি লামার কাছে ব্যাগ হাতে ছুটে গেল। লামা কথা বলতে পারছেন না, কেবল গোগোলের দিকে ছু হাত বাড়িয়ে দিলেন। গোগোল তাঁর সামনে নিচু হয়ে বসতেই, তিনি ছু হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধবে বুকেব কাছে টেনে নিলেন। এখন তাঁর মুখের বক্তেব সঙ্গে চোখেব জলও মিশে গেল।

পুলিশ অফিসার হিন্দীতে চিৎকার কবে হুকুম দিলেন, 'এই খাম্‌পাকে এখুনি হাতে পায়ে আব কোমবে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফ্যালো।'

সেপাইবা তৎক্ষণাৎ খাম্‌পাকে বেঁধে তুলে দাঁড় কবালো। খাম্‌পার ঘাড়ে বক্ত, সে তখন টলছে। পুলিশ অফিসাব লামার কাছে এসে দাঁড়ালেন। লামা বললেন, 'দিস্ বয় সেভড্ এভ্রিথিং। মাই লাইফ এ্যাণ্ড গোল্ডস্।'

পুলিশ অফিসাব ইংবাজিতেই বললেন, 'আমি শুনেছি, আপনি একটি বাঙালী বালকের সঙ্গে এই খামপাব পিছনে ছুটেছিলেন '

তিনি গোগোলকে পবিষ্কাব বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সত্যি বাঙালী?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ।'

পুলিশ অফিসাব গোগোলেব হাত ধবে তুলে কবমর্দনের মতো ঝাঁকিয়ে দিযে বললেন, 'শুনে আমি খুবই সুখী হলাম। তোমাব হাতের ব্যাগে কী আছে?'

গোগোল বললো, 'সোনাব মূর্তি। ঐ ইয়াকেব চামড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে খাম্‌পা পালাচ্ছিল।'

পুলিশ অফিসাব অবাক যেমন হলেন, তেমনি খুশি। তিনি গোগোলকে কোলেব কাছে টেনে নিয়ে কথায় কথায় সব জেনে নিলেন, গোগোলের বাবার নাম কী, তাঁবা কোন্ হোটেলে আছেন ইত্যাদি। লামাও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁব দাঁড়াবাব ক্ষমতাও নেই।

পুলিশ অফিসাব তাঁব সেপাইদেব বললেন, 'শোনো, আমরা আর উপরে উঠবো না। একটু নিচেই মোটর বোডে নেমে যাবো, সেখান থেকে গাড়ি কবে কালিম্পং ফিববো। তোমবা একজন এই লামা সাধুকে ধবে নিয়ে চলো, উনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কালিম্পং গিয়েই ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। আর ছুজন খাম্‌পাব কোমবের দড়ি ধবে নিয়ে চলো। আমি এই ব্যাগ আর গোগোলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

বলে তিনি গোগোলকে বললেন, 'চলো গোগোল।'

এর পরের ঘটনা তোমরা বুঝতেই পারছো। গোগোলরা যে হোটেলে ছিল সেখানে ওকে দেখবার জন্য তিব্বতি ভোটিয়া, লেপ্‌চা আর নেপালীরা ভেঙে পড়লো। সবাই ওকে মাথায় হাত দিয়ে, গাল টিপে আদর করলো। কাইরং মঠের লামাদের তো কথাই নেই। তাঁরা ওকে আশীর্বাদ করলেন, 'ভগবান তোমাকে মানুষের সেবায় লাগান।'

গোগোল নানারকম উপহারও পেলো। কিন্তু পুলিস অফিসার যখন জিজ্ঞেস করলেন, গোগোল কী চায়, ও বললে, খাম্‌পার সেই ছুরিটা ওর পেতে খুব ইচ্ছা করে। পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, 'এখন তো ওটা দেওয়া যাবে না, কারণ অনেক তদন্ত হবে, তখন ছুরিটার দরকার হবে। তোমাকে আমি অন্য একটা জিনিস দিচ্ছি। ওটা কাইরং মঠের লাংডুলার নিজের জিনিস।'

বলে তিনি পাথরের ড্রাগনমুখো, একটি সোনার আংটি গোগোলকে দিলেন।

এসব আনন্দের মধ্যেও গোগোলের বাবা মায়ের মন খারাপ। তাঁরা ওকে বকুনি দিলেন, এমন দুঃসাহসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। আসলে তাঁরাও মনে মনে খুশি হয়েছিল তবু ছেলের জন্য ভয় তো সব বাবা মায়েরই হয়।

ইলা তো যেন গোগোলকে ভগবানের মতো মনে করলো। গোগোল ওর পাওয়া উপহার থেকে একটি তিব্বতি কাগজের মুখোস ইলাকে দিল।

কিন্তু গোগোল রাত্রে শুয়ে শুয়ে সেই খাম্‌পার মুখটাই ভাবতে লাগলো। ভাবলো কলকাতার বাড়িতে খাম্‌পাদের কথা যখন বইয়ে পড়েছিল, আর বাবার মুখে তিব্বতের নানা গল্প শুনেছিল, তখন এমন একটা ঘটনার কথা ভাবতেই পারে নি। রক্ত-মাংসের খাম্‌পা বা লামাই শুধু দেখলো না, একটা সাংঘাতিক ঘটনার মধ্যে দেখলো।

রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো লাংডুলা ওকে কোলের কাছে নিয়ে আদর করছেন। তাঁর চোখে বড় বড় জলের ফোঁটা। তা দেখে ঘুমন্ত গোগোলের চোখও জলে ভরে উঠলো।



গোগোলকে আগে যে-রকম দেখা যেতো, সেই তুলনায় এখন ও কিছুটা বদলিয়ে গিয়েছে। বদলিয়ে যাওয়াটাই নিয়ম। তার কারণ আর কিছু না। সব ছেলেরাই একটু একটু করে বড় হতে থাকে। একটা করে বছর পেরিয়ে যায়। আর তার সঙ্গেই বয়স বাড়ে। যেমন ইস্কুলের পড়া বাড়ে, পরীক্ষা হয়, পাস করে, লেখাপড়াব সঙ্গে মনটাও অনেক কিছু জানতে শেখে।

গোগোল আগে যেমন ওর বাবাকে নকল কবতেই ভালবাসতো। এমন একটা ভাব কবতো, যেন ও কত বড় হয়ে গিয়েছে। বাবাব মতো ভাব করে কথা বলতো। বাবাব অ্যাটাচি কেসটা হাতে ঝুলিয়ে, বাবার মতো অফিস যাওয়ার ভঙ্গী করতো। আর মুখে একটা দেশলাইয়ের কাঠি এমনভাবে গুঁজে দিতো, যেন ও বাবার মতো সিগারেট খাচ্ছে। ওর মা ওসব পাকামো দেখলে চটে যেতেন। অথচ ওর বাবা মুখ টিপে হাসতেন, আর ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস কবতেন, 'গোগোলবাবু কোথায় চললেন?'

গোগোল বাবার থেকেও গম্ভীরভাবে জবাব দিতো, 'অফিসে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাবেন?'

বাবা বলতেন, 'আমিও অফিসেই যাবো ভাবছি।'

গোগোল মিছিমিছি হাতের কবজি দেখতো, যেন ঘড়ি দেখছে। তারপরে ঠিক বাবার মতোই বলতো, 'ইস্, আমার খুব দেরি হয়ে গেছে, এখুনি অফিসে

যেতে হবে। চললাম, পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

বাবা তাড়াতাড়ি বলতেন, 'আরে গোগোলবাবু, শুনুন, আপনি আমার অ্যাটাচি কেসটা দিন। ওটা আমাব।'

গোগোল একটু বেকায়দায় পড়ে যেতো। অ্যাটাচি কেস্‌টা বাবার হাতে দিয়ে বলতো, 'নিন।'

বাবা বলতেন, 'এবাব আপনি মুখেব থেকে ওই কাঠিটা ফেলে দিন। আপনি এত বড় হলেন, আব জানেন না, ওসব মুখে দিতে নেই? ওই কাঠিতে অনেক কিছু লাগানো থাকে, যা পেটে গেলে অসুখ করে। ওটা ফেলে দিন।'

গোগোল আবো বেকায়দায় পড়ে যেতো। ও জানে, বাবা কখনো এসব বিষয়ে ভুল বলেন না। মুখ থেকে কাঠিটা নিয়ে বাইবে ফেলে দিতো। আব দুধেব দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসতো।

বাইবেব কোনো ভদ্রলোক, বাবাব পবিচিত কাজেব লোক বা বন্ধু এলেও, গোগোল তাঁদেব সঙ্গে গম্ভীব চালে কথা বলতো। এ ভাবে যতোই দিন যেতে লাগলো, গোগোল একটু একটু কবে বড় হতে লাগলো, আব দু একটা কবে দাঁত পড়তে লাগলো, তখন গোগোল নিজেই বুঝলো, তাব ব্যাপাব-স্যাপাব দেখে, বড়োবা সবাই হাসাহাসি কবেন।

আসলে গোগোল এখন সত্যিকাবেব বড় হয়েছে। এখন বাবাকে নকল কবাব থেকে, গাভাসকাব কেমন কবে খেলে, তাব চেহাবা কেমন, সে-সব দিকেই নজব বেশী। ফুটবল খেলাব মবসুমে, ওব এখন দারুণ উত্তেজনা। ও এখনো মাঠে খেলা দেখতে যায় না। বাবা বলেছেন, 'আব একটু বড হও, তাবপবে মাঠে গিয়ে খেলা দেখবে।'

খেলা ছাড়াও, মানুষেব চাঁদে পাড়ি দেওয়া, মঙ্গল গ্রহেব বঙ কেমন, সেখানে পাহাড় নদনদী এবং কোনো জীবন্ত প্রাণী আছে কী না, এ সব বিষয়ে আজকাল ওব খুবই কৌতূহল। পৃথিবী যেমন একটা গ্রহ, মঙ্গলও যে তেমনি একটি গ্রহ, এ খববটা ও জেনে নিয়েছে। তবে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী থেকে বেশ ছোট। আব আশ্চর্য এই, পৃথিবীর আকাশে যেমন একটা চাঁদ আছে, মঙ্গলেব আকাশে নাকি আছে দুটো চাঁদ।

গোগোল আজকাল এসব নিয়ে যতোই ভাবে, ততোই ওব কল্পনা যেন পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। এবারের কালীপূজোর পবে, ওদের আটতলা ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে উঠে, ওর বাবা মঙ্গলগ্রহটা চিনিয়ে দিয়েছেন। ওটা বাঁতি-মতো ঘোবে। এক পিঠে লাল, আর এক পিঠে নীল মতো দেখা যায়।

বাবা দেখাবার আগেও, গোগোল ওটা ওদের পাঁচতলার জানালা থেকে অনেকবার দেখেছে। ওর ধারণা ছিল, ওটা এত স্পষ্ট ঘুরতে দেখা যায়, আর লাল নীল রঙটাও এত স্পষ্ট, ওটা নিশ্চয়ই কোনো ফানুষ-টানুস হবে। আসলে ওটা যে বহু দূরে, আর মঙ্গলগ্রহ, বাবা চিনিয়ে না দিলে, ও কখনো জানতেই পারতো না।

গোগোল এখন নিজের ধারণা থেকেই বুঝতে পারে, মঙ্গলগ্রহটা যদি পৃথিবীর আকাশের আরো অনেক কাছাকাছি হতো, তবে ওটাকেও, পৃথিবীরই আর একটা, আর এক রকমের চাঁদের মতো দেখাতো। ওর কল্পনার দৌড়টা কেমন, শুনলে অনেকেরই হয় তো হাসি পাবে। যেমন ওর ধারণা, চাঁদে আর মঙ্গলগ্রহে নির্ঘাত কোনো প্রাণী আছে। চাঁদে যাঁরা নেমেছিলেন, তাঁরা টের পান নি, চাঁদের প্রাণীরা লুকিয়ে তাঁদের দেখেছে। গোগোল অবশ্য ভাবে না, সেই সব প্রাণীরা মানুষের মতো। তবে কুমির বা ওইরকম জাতীয় কোনো প্রাণী আছে, যারা চাঁদের অভিযাত্রীদের অক্সিজেনের মুখোশ আর বিকট পোশাক দেখে, কাছে আসতে সাহস পায় নি। চাঁদের বুকে যে সব পাহাড়ের খাদ, বিশাল সব গহ্বর রয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কুমীর বা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী লুকিয়ে আছে, আর তারা খুবই নিরীহ আর ভীতু। চাঁদে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের বিকট পোশাক আর মুখোশ দেখে, চাঁদের প্রাণী বেচারীরা কাছে আসতেই সাহস পায় নি।

আর মঙ্গলগ্রহ? গোগোলের কেমন একটা বিশ্বাস, সেখানে নির্ঘাত মানুষ আছে। আর সেই সব মানুষরা সবাই বুড়োআঙলার মতো ছোট। গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সূর্য অস্ত গেলে, মঙ্গলের আকাশে যখন দুটো চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্নার ফিনিক ফোটে, তখন তারা গর্তের থেকে বেরোয়। বুড়োআঙলাদের ব্যাপারটা গোগোল অবনঠাকুরের লেখা পড়ে জানতে পেরেছে। তার মানে, মঙ্গলের মানুষগুলো, পৃথিবীর মানুষের বুড়ো আঙুলের মতো ছোটখাটো। গোগোল ওর এই সব কল্পনার পিছনে কতকগুলো যুক্তিও খাড়া করে নিয়েছে। আমেরিকার ভুয়োজ আর রাশিয়ার লুনার, যে-যন্ত্র দুটি মঙ্গলকে পরীক্ষা করতে আর ফটো তুলতে গিয়েছিল, তারা বুড়ো-আঙলাদের দেখতেই পায় নি।

না পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ মঙ্গলগ্রহের বুড়োআঙলারা, গোগোলের মতে, মোটেই বোকা নয়। হতে পারে তারা বুড়োআঙলের মতো ছোট, কিন্তু তারা দেখতে খুব সুন্দর আর ফুটফুটে। অবশ্য তাদের মধ্যে বুড়োবুড়ীও আছে। যেমন আমাদের আছে মা ঠাকুমা বা বাবা ঠাকুর্দা। বুড়ো-

আঙলাদের বয়স হলে, তাদেরও বুড়ো দেখায়, মাথার চুল পেকে যায়। গোগোলের ধারণা, বুড়োবুড়ীদের ভুরুগুলোও পেকে যায়। মঙ্গলগ্রহের মাটির অনেক নীচে তাদের ঘরবাড়ি শহর, ইস্কুল কলেজ সবই আছে, আর সেখানে তাই দিনের বেলাও আলো জ্বালাতে হয়। তবে তাদের ভাষাটা কি, গোগোল এখনও সেটা মন থেকে ঠিক করে উঠতে পারে নি।

গোগোলের এই কল্পনার পিছনে যুক্তি হলো এই, মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী থেকে সূর্যের অনেকটা কাছে, সেখানে গরম প্রচণ্ড। এত গরম যে, কারোর পক্ষে সেখানে মাটির ওপরে থাকাই সম্ভব নয়। আর মাটির নীচে থাকে বলেই, মঙ্গলগ্রহের মানুষরা বুড়ো আঙলের মতো ছোট। ওপরের জল বাতাসে থাকতে পারলে হয় তো তাদের চেহারা পৃথিবীর মানুষের মতোই বড় সড় হতে পারতো।

গোগোল ওর বাবা মায়ের সঙ্গে, গত বছর শীতের ছুটিতে, আগ্রা থেকে ফতেপুরসিক্রি বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে ও দেখেছিল দুর্গের নীচেই মস্ত বড় একটা কুয়ো। সেই কুয়োর নীচে যাবার জন্য একটা সুড়ং পথ আছে, আর আছে নীচে জলের ধারে ঠাণ্ডায় বসবার জায়গা। প্রচণ্ড গরমে, বাদশা বেগমরা নাকি ওখানে নেমে গিয়ে বসে থাকতেন। বিশেষ করে যখন লু বইতো। ফতেপুরসিক্রির কুয়োর ব্যাপারটা দেখেই, মঙ্গলগ্রহের মানুষদের মাটির নীচে বাস করার ভাবনাটা ওর মাথায় এসেছে।

আমেরিকার সুয়োজ বা রাশিয়ার লুনাকে মঙ্গলগ্রহের বুড়োআঙলারা লুকিয়ে দেখেছে ঠিকই। কিন্তু সেই বিশাল আর বিকট আকাশযান দুটোকে দেখে, তারা কাছে আসতে ভরসা পায় নি। ও-দুটো যে ক্যামেরা টেলিভিশনের যন্ত্রপাতি ঠাসা, মঙ্গলগ্রহের মাটি তুলে নেওয়া হাতওয়ালা দুটো মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানো যান মাত্র, বুড়োআঙলারা সেটাও ঠিক বুঝতে পারে নি। তারা সুয়োজ আর লুনাকে দুটো বিকটাকার ভয়ংকর প্রাণী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে নি। যন্ত্রগুলোর যে চোখ আছে, মঙ্গলগ্রহের বুড়োআঙলাদের তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না। সেই জন্য তারা ছোট ছোট পাথরের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়েছিল, যন্ত্রগুলোর কোনো উপায় ছিল না, তাদের দেখতে পায়।

গোগোল ওর এই সব ভাবনা আর ধারণার কথা বাবা মাকেও বলেছে। মা ওর কথাগুলো শুনে হাসলেও, একটু যেন বিরক্ত হয়েই বলেছেন, 'যতো আজেবাজে চিন্তা করতে গিয়ে, তোমার লেখাপড়া না মাটি হয়, সেটাই আমার ভয়।'

বাবা কিন্তু তা বলেন নি। বাবা ওর সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। শুনে বলেছেন, 'তোমার কথা একেবারে মিথ্যে নাও হতে পারে। গ্রহ নক্ষত্রের কোথায় যে কী আছে, এখনো সে-কথা কেউ ঠিক করে বলতে পারেন নি। মঙ্গলগ্রহে বীজাণু জাতীয় প্রাণী থাকতে পারে, বিজ্ঞানীরা এটা অনুমান করেছেন। মাটির নীচে বুড়োআঙলাবা আছে কী না, সেটা তাঁরা বলেন নি। কথাটা তুমিই প্রথম বললে। তবে মাটির নীচে মানুষ জাতীয় প্রাণী থাকার কল্পনা আর একজনের মাথায়ও এসেছিল। তাঁর নাম, এইচ্. জি. ওয়েলস্। টাইম মেসিন নামে একটা বইয়ে তিনি সেই কাহিনী লিখে গেছেন।'

গোগোল বাবার কাছ থেকে টাইম মেসিনের গল্পটা মোটামুটি শুনেছে, ওর খুব ভালো লেগেছে। তবে এইচ্. জি. ওয়েলস্ নাকি বলেছেন, আট হাজার বছর বাদে এই পৃথিবীতেই এরকম ঘটনা ঘটবে। এক বিজ্ঞানী এমন এক টাইম মেসিন আবিষ্কার করেছেন, আট হাজার বছর বাদে পৃথিবীতে কী ঘটছে, তিনি সবই সেই মেসিনে বসে দেখে এসেছেন। দেখা গিয়েছে, পৃথিবীব মাটির ওপরে থাকে এক শ্রেণীর মানুষ আর মাটির নীচে থাকে আর এক শ্রেণীর মানুষ। মাটির নীচে যাবার পথ ম্যানহোল দিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকে। কিন্তু ভয়ের বিষয় হলো এই, সেই মাটির নীচের মানুষগুলো দেখতে কুৎসিত আব কদর্য, মাটিব ওপরের মানুষদের পেলেই তারা ম্যানহোলের ঢাকনার ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে, গপগপ করে খেয়ে ফ্যালে।

এরকম একটা ঘটনা শুনেও, গোগোলের গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল: ওর মঙ্গলগ্রহের বুড়োআঙলাদের সম্পর্কে, ওরকম ভয়ংকর ব্যাপার ও ভাবতেই পাবে নি। ওর কল্পনায়, মঙ্গলগ্রহের পাতালবাসী বুড়োআঙলাবা খুবই হাসিখুশি আর নিরীহ। বাবার কাছে টাইম মেসিনের গল্পটা শুনে, গোগোল মনে মনে খুব উৎসাহও পেয়েছে। ও ছাড়াও, একজন বিখ্যাত ব্যক্তি মাটির নীচে মানুষেব থাকার কথা কল্পনা করেছেন। যদিও সেই মানুষেরা এক রকমের জানোয়ারই বলতে হবে।

বাবা অবশ্য গোগোলকে এ কথাও বলেছেন, "তোমার মাথায় যখন যা আসবে, তা তুমি লিখে রাখতে পারো। তবে যা করবে, তা লেখাপড়া বজায় রেখেই কবতে হবে।"

গোগোল এখন প্রেপ্-থি্রতে পড়ে। লেখাপড়া না করলে যে কিছুই শেখা বা জানা যায় না, এটা ও বুঝে নিয়েছে। আগে ও বাঙলাটা মোটেই ভালো পড়তে বা লিখতে পারতো না। এখন ও বাঙলাটা বেশ ভালোই

শিখে নিয়েছে। বাঙলা খবরের কাগজও পড়তে পারে। ওদের বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটে আর পাড়ায় যে সব বন্ধুরা আছে, যেমন সুমিত, টুকাই, পাঞ্জাবী ছেলে গোগে, মুসলমান বন্ধু পারভেজ্, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বন্ধু জর্জ, সবাইকেই ও মঙ্গলগ্রহের মাটির নীচে বুড়োআঙলাদের ব্যাপারটা বলেছে।

সুমিত আর জর্জ ছাড়া, আর সব বন্ধুরা ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। শুধু হাসি নয়, গোগোলকে রীতিমতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলেছে, গোগোল নাকি নিজেকে আমেরিকান আর রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের থেকেও বড় ভেবেছে। অথচ গোগোল মোটেই তা ভাবে নি। এরকম একটা কল্পনা ওর মাথায় এসেছে। সুমিত আর জর্জ বলেছে, পৃথিবী আর তার বাইরেব গ্রহ জগতে অনেক কিছুই সম্ভব। কল্পনা করতে কোনো দোষই নেই। সুমিত আর জর্জ অনেক বই পড়ে, ওরা জানেও অনেক বেশী। সেই জন্যই ওরা গোগোলের কল্পনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয় নি।

গোগোলের গ্রহ জগৎ নিয়ে, কল্পনার অনেক গল্পই বলার আছে। সে-সব গল্প পরে এক সময়ে বলা যাবে। এবারে গোগোলের অন্য এক কীর্তির কথা বলা যাক। ধরেই নেওয়া যায়, গোগোল এখন আব একটু বড় হয়েছে। প্রেপ্ থি্রতে পড়ে। এখন ওর দুধের দাঁত কিছু পড়তে শুরু করেছে, আর নতুন কিছু দাঁত গজাতে আরম্ভ করেছে। ফলে ওর হাসিটা আজকাল একটু বদলে গিয়েছে। ব্যাপারটা সত্যি মজার! আব ভীষণ উত্তেজনারও।

গোগোলের প্রথম দাঁতটা পড়েছিল ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেবাব সময়। কয়েকদিন ধরেই দাঁতটা নড়ছিল, কেমন একটু সুড়সুড়ও করছিল। ইস্কুলের বাসে করে বাড়ি ফেরার সময়েই টুক কবে ওর মাড়ি থেকে দাঁতটা জিভেব ওপর খসে পড়েছিল। গোগোল তো প্রথমটায় রীতিমতো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। মুখের ভিতর থেকে দাঁতটা হাতে নিয়েছিল. আর হাতে খানিকটা রক্তের দাগ লেগেছিল। ওর ভয় দেখে, বাসের ভিতরে বন্ধুবা খুব হেসেছিল। বিশেষ করে, ওর আগেই যাদের দাঁত পড়েছিল, তারা ব্যাপারটা জানতো। বন্ধুদের হাসতে দেখে, গোগোলের ভয় কেটেছিল, আর মায়ের কথা মনে পড়েছিল। মা বলেছিলেন, প্রথম দুধের দাঁত পড়লে নাকি, সেটা ইঁদুরের গর্তে ফেলতে হয়। তা হলে ভালো আর সুন্দর নতুন দাঁত ওঠে।

গোগোল ওর প্রথম-পড়া দাঁতটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে মাকে গিয়ে

দোথয়েছিল, আর জানতে চেয়েছিল, কোথায় ইঁদুরের গর্ত, এখুনি খুঁজে বের করতে হবে। মা তো হেসেই বাঁচেন নি। তিনি আগে গোগোলকে ভালো করে মুখ ধুতে বলেছিলেন। কিন্তু মধ্য কলকাতার উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ির কোথায় ইঁদুরের গর্ত পাওয়া যেতে পারে? সে যে কী এক মহা সমস্যা!

গোগোলের মায়ের পক্ষে সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল না। সমাধান অবিশ্যি একজনই করতে পেরেছিল। গোগোলের বাড়িতে কাজ করে একটি ছেলে, তার নাম বঙ্কিম। তার বয়স কুড়ি বাইশ হবে। গোগোলদের বাড়িতে সে ছ' সাত বছর কাজ করছে। গোগোল তাকে বঙ্কিমদা বলে ডাকে। বঙ্কিমদাকে বাবা মাও ভালবাসেন।

গোগোলদের ফ্ল্যাট বাড়ির নীচের তলায়, বঙ্কিমদের থাকবার আলাদা ঘর আছে। তাদের ঘরে ইঁদুরেরা উৎপাত করে, আর ঘরের আশেপাশে নাকি ইঁদুরের গর্তও দেখা যায়। গোগোল নিজে বঙ্কিমদার সঙ্গে তাদের ঘরের সামনে গিয়ে দেখেছিল, এক পাশে একটা ম্যানহোলের সামনে কিছু কাঁচা মাটি রয়েছে, তার আশেপাশে দু তিনটে গর্ত। গোগোল মহা খুশী। ও নিজের হাতেই একটা গর্তে, ওর প্রথম-পড়া দাঁতটা ফেলে দিয়েছিল। তারপরে যে-কয়টা দাঁত পড়েছে, গোগোল সব কয়টাই সেই গর্তে ফেলে এসেছে।

কিন্তু ইঁদুরেরা দাঁতগুলো নিয়ে কী করে? কথাটা ভেবে, গোগোল মহা ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। এর জবাব একমাত্র বঙ্কিমদারই জানা ছিল। সে বলেছিল, মানুষের দুধের দাঁতগুলো ইঁদুরেরা কুট কুট করে খেয়ে নেয়। আসলে ইঁদুরের দাঁত তো খুব শক্ত আর ধারালো, আর ঝকঝকে। ছেলে মেয়েরাও চায়, তাদের দাঁত যেন বেশ শক্ত আর ঝকঝকে হয়। সেইজন্যই ইঁদুরের গর্তে দাঁত ফেলতে হয়, আর ওরা সেই দাঁতগুলো, ওদের শক্ত দাঁতে কুটকুট করে খেয়ে নেয়। যাদের দাঁত ইঁদুরেরা গর্তে বসে খায়, তাদেরই ভালো দাঁত ওঠে।

গোগোলের মনে একটু সন্দেহ ছিল। বঙ্কিমদার কথাটা ও ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। কারণ ও জানে, ইঁদুরেরা মানুষের কেবল ক্ষতিই করে। দাঁত দিয়ে কাপড় কেটে দেওয়া থেকে শুরু করে, শক্ত আর নরম খাবার যা পায়, সবই খেয়ে ফ্যালে। তাই গোগোল মাকেও না জিজ্ঞেস করে পারে নি। মা বলেছিলেন, 'ইঁদুরেরা তোমাদের দুধের দাঁতগুলো কুট কুট করে খেয়ে ফ্যালে কী না, আমি জানি না। তবে ইঁদুর যতো ক্ষতিকারক প্রাণীই হোক, ওদের দাঁতগুলো সত্যি খুব শক্ত আর

ঝকঝকে। কেউ কখনো শোনে নি, ইঁদুরেরা দাঁতের রোগে কষ্ট পাচ্ছে, কিংবা তাদের দাঁত পড়েছে। যেমন কুকুর বেড়ালের বয়স হয়ে গেলে, তাদেব দাঁত পড়ে যায়, অবিকল মানুষের মতোই। সে জন্যই বোধহয় মানুষও ভাবে, ছেলেদের দাঁত যেন ইঁদুরের মতো ঝকঝকে ও শক্ত হয়। মানুষ তো আর দাঁত দিয়ে কিছু ক্ষতি করে না।'

গোগোল মায়েব কথা অনেকটাই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কুকুর বেড়ালদের বয়স হলে তাদেরও দাঁত পড়ে যায়, কথাটা শোনার পরেই, আবাব একটা নতুন কৌতূহল ওকে পেয়ে বসেছে। এখন ও কুকুর বেড়াল দেখলেই তাদের দাঁতের দিকে আগে তাকায়। তবে বুঝতে পারে না কিছুই।

সামারের ছুটি পড়ে গেল। আর ছুটি পড়ে গেলেই গোগোলের মন খুশীতে নেচে ওঠে। কারণ ছুটি পড়লেই, বাবা মা কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান। কিন্তু এবারে, সামারের ছুটির মুখেই, জানা গেল, বাবার অফিসে বিশেষ কাজ পড়েছে, তাই তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। খবরটা জেনে, গোগোলের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

গোগোলের ইস্কুলে গরমের ছুটিটা বেশ লম্বা। কলকাতায় থাকতে মোটেই ইচ্ছা করে না। অবিশ্যি কলকাতার বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে, গ্রামের দিকে অনেক আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া যায়। গরমের ছুটিতে বিশেষ করে আম খাওয়ার নিমন্ত্রণ থাকে সেই সব বাড়িতে। গোগোল যে বেশ কয়েকবার সেই সব আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায় নি, তা নয়। তবে ছোটখাটো দু এক দিনের ছুটিতে, সেখানে বাগানে বাঁশঝাড়ে পুকুরের ধারে ঘুরে বেড়াতে খারাপ লাগে না। সব থেকে মজা লাগে কলা গাছের ভেলায় পুকুরের জলে সাঁতার শিখতে। গোগোল কয়েকবার গিয়ে কলার ভেলায় ভেসে সাঁতারটা মোটামুটি শিখে নিয়েছে।

সামারের ছুটিটা এরকম মন খারাপ অবস্থায় পাঁচ দিন কেটে যাবার পরেই, গোগোল পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মায়ের কাছে শুনলো আগামীকাল ভোরবেলাই ওরা বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে। শুনেই গোগোলের মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। বিষ্ণুপুরে গোগোলের সেজো মাসীমা থাকেন। অর্থাৎ ওর মায়ের সেজদি। সেজো মাসীর বিয়ে হয়েছে বিষ্ণুপুরে, মেসোমশাই একজন ডাক্তার। বিষ্ণুপুর শহরেই তাঁদের বাড়ি। সেজো মাসীর একমাত্র ছেলে নাড়ুদা কলকাতা থেকেই এম. এ. পাস করেছে। এখন বিষ্ণুপুর

কলেজে শিক্ষকতা করে।

গোগোল বিষ্ণুপুরে কখনো যায় নি। কিন্তু সেজো মাসী, মেসোমশাই বেশ কয়েকবার ওদের কলকাতার বাড়িতে এসেছেন। নাড়ুদার তো কথাই নেই। এম. এ. পড়বার সময় সে কলকাতার হস্টেলে থাকতো। গোগোলদের বাড়িতে প্রায় দিনই বেড়াতে আসতো। বিষ্ণুপুর থেকে শুধু যে সেজো মাসীই এসেছেন, তা নয়, মেসোমশাইয়ের দাদা এবং ভাইয়ের স্ত্রীরা আর তাঁদেব ছেলেমেয়েরাও গোগোলদের বাড়িতে বেড়িয়ে গেছেন। মেসোমশাইয়ের দাদা এবং ভাইয়ের বউয়েরাও সম্পর্কে গোগোলের মাসীমাই হন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা, মাসতুতো ভাই বোন। সেই ভাই বোনদের মধ্যে. ছোট মাসীমার ছোট ছেলে মাধব গোগোলেরই সমবয়সী। কিন্তু মাধবকে সবাই 'মেদা' বলে ডাকে। মাধবকে 'মেদা' ডাকা বোধহয় একমাত্র বিষ্ণুপুরেই সম্ভব। বিষ্ণুপুর শহরে থাকলেও, সেখানকার বড় ছোট, সকলের কথার মধ্যেই কেমন একটা অদ্ভুত টান, আর অনেক কথার উচ্চারণই অন্যরকম গোগোলের শুনতে খুব ভালো লাগে, ইচ্ছা করে ও নিজেও ওরকম করে কথা বলবে। কিন্তু ঠিক মতো পারে না।

গোগোলের মেদাকে খুব পছন্দ। যদিও মেদা মোটেই কলকাতার হালচাল কিছুই বোঝে না, এখানকার মতো কথাও বলতে পারে না, সেই কারণেই মেদাকে ওর আরো বেশী ভালো লাগে।

গোগোলের বাবা অফিসে যাবার আগে খাবার টেবিলে বসে, খেতে খেতে গোগোলকে ডেকে বললেন, 'কাল ভোরেই তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে সেজো মাসীর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছো।'

গোগোল খুশী হয়ে হেসে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'জানি, মা বলেছে। কিন্তু তুমি না গেলে, আমরা কার সঙ্গে যাবো?'

বাবা বললেন, 'বিষ্ণুপুর তো কাছেই, তোমার মা-ই তোমাকে নিয়ে যেতে পারবেন।' কথাটা বলেই বাবা একটু হেসে আবার বললেন, 'তুমি তো এখন নিজেই বড় হয়ে গেছ। মাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না?'

গোগোল তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে, প্রায় বুক ফুলিয়ে বললো, 'খুব পারবো।'

গোগোল দেখলো, বাবা মা দুজনেই হাসলেন। গোগোল হঠাৎ একটু ভাবনায় পড়ে গেল, জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু 'কী ভাবে মাকে নিয়ে যাবো? ট্রেনে করে? টিকেট আমি ঠিক কাটতে পারবো?'

বাবা বললেন, 'বিষ্ণুপুর ট্রেনে যাওয়াটা ভারী ভজোকটো ব্যাপার, সময়ও লেগে যায় অনেকক্ষণ। আজকাল কলকাতার ময়দানে, মনুমেণ্টের কাছ থেকে বাস যায় বিষ্ণুপুরে, মাত্র চার ঘণ্টায় পৌঁছে দেয়।'

গোগোল খুশী হয়ে বললো, 'তা হলে তো কোনো কথাই নেই। মাকে নিয়ে আমি—।'

বাবা বাধা দিয়ে বললেন, 'কথা একটু আছে গোগোল, আর সেটা তোমার জেনে রাখা দরকার। এই সব দূরপাল্লার বাসে কোথাও যেতে হলে আগে থেকেই সীট রিজার্ভ করতে হয়। তোমার মায়েব আব তোমাব তা কব নেই, তাই কাল ভোরে তোমরা বাসে যেতে পাবছো না।'

গোগোল হতাশ হয়ে মায়েব মুখেব দিকে একবার দেখলো। বাবাব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তা হলে আমবা কী কবে কাল ভোবে যাবো?'

বাবা খাবাবের শেষে জল খেয়ে বললেন, 'ব্যবস্থা একটা হয়েছে। কাল ভোরে ঠিক সাড়ে ছটায়, আমাব এক বন্ধুব গাড়ি আসবে। সেই গাড়ি তোমাকে আব তোমার মাকে বিষ্ণুপুবে পৌঁছে দিয়ে, আবাব কলকাতায় ফিবে আসবে।'

গোগোল মনে মনে বুঝতে পারলো, বাবা আগে থাকতেই সব ব্যবস্থা কবেছেন। বাবা মা-তে নিশ্চয়ই আগে থাকতে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ও অবাক্ খুশীতে প্রায় হাততালি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। আব বাবা তখনই খাবাব ঘবেব বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বললেন, 'কিন্তু আসল কথাটাই তোমাকে এখনো বলা হয়নি। মনে বাখবে, আমি সঙ্গে থাকছি না। বিষ্ণুপুবে গিয়ে মায়েব সব কথা মেনে চলবে, মাকে না বলে, একলা কোথাও যাবে না। মাসীমা মেসোমশাইয়েব কথা সব সময়ে শুনবে, কেমন? আর বেড়াতে যখন যাবে, নাড়ুদার সঙ্গে যাবে। বিষ্ণুপুরে দেখবার অনেক জিনিস আছে, অনেক ঐতিহাসিক জিনিস সেখানে আছে। নাড়ুদাই তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে, আব বুঝিয়ে দেবে।'

গোগোল নাড়ুদার মুখে আগেই শুনেছে, বিষ্ণুপুবে দেখবার জিনিস অনেক আছে। দলমাদল কামানেব কথা তো ওব এখনই মনে পড়ে যাচ্ছে। গোগোল দলমাদল কামানের ছবিও দেখেছে। কিন্তু বাবার প্রত্যেকটি কথাতেই ও ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। মনে মনে ভাবলো, নতুন জায়গায় গিয়ে গোগোল একলা কোথায়ই বা যেতে পারে? ছেলেধরাদের ভয় অবিশ্যি আজকাল ও আর করে না। আগে করতো। আসলে সেজো

মাসীর বাড়ি বেড়াতে যাওয়াটাই একটা মজার ব্যাপার।

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাবার পরে, গোগোল মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, আমরা সেজো মাসীর বাড়ি পুরো ছুটিটা কাটিয়ে আসবো ?'

মা বললেন, 'তাই আবার কখনো হয় নাকি ? এখনো তোমার এক মাস ছুটি বাকী। কারোর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে, এতদিন কখনো থাকা চলে ? বাইরে কোথাও গেলে, আলাদা কথা। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতেই দিন কেটে যায়। এ তো আমরা কেবল বিষ্ণুপুরে সেজদির বাড়ি যাচ্ছি। তোমার সেজো মাসীরা আমাদের এখানে এসে যেমন দু' চার দিন থেকে চলে যান, আমরাও সেরকমই থাকবো।'

গোগোল খুবই হতাশ হয়ে বললো, 'মাত্র দু' চার দিন !'

মা হেসে বললেন, 'দু' চারদিন মানে, সাত দিন কি দশদিন থাকবো। তার বেশী নয়। তবে হ্যাঁ, তুমি কিন্তু তোমার বই খাতা নিয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলা রোজ পড়তে বসতে হবে, গরমের ছুটির হোম টাস্কগুলো করতে হবে। ওসব পড়ে থাকলে তো চলবে না।'

মায়ের কথা অবিশ্যি ঠিকই, তা নইলে হোম টাস্ক পড়ে থাকবে। সাত বা দশদিন পরে ফিরে, সারা দিন হোম টাস্ক নিয়ে পড়ে থাকতে হবে না।

মা জামাকাপড় স্যুটকেশে গোছাতে লেগে গেলেন। গোগোল নীচে নেমে গেল, বন্ধুদের খবরটা দিতে।

পরের দিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় যখন গোগোলকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো, মায়ের তখন চান হয়ে গিয়েছে। বাবা চা খাচ্ছেন। খবরের কাগজ এসে তখনো পৌঁছায় নি। কিন্তু রান্নাঘর থেকে লুচি তরকারি আর ডিম ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে। মা বললেন, 'যাও গোগোল, বাথরুমে গিয়ে দাঁত মেজে, চানটান সব সেরে নাও। এসে ধোয়া জামা প্যান্ট জুতো পরে নাও, সময় বিশেষ হাতে নেই।'

গোগোলের ঘুম ভেঙে প্রথমে কিছু মনেই পড়ছিল না, হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপরে বিষ্ণুপুরের কথা মনে পড়তেই, ও এক লাফে খাট থেকে নেমে বাথরুমের দিকে দৌড় দিল। মায়ের কথা মতো দাঁত মেজে, চান করে, জামা প্যান্ট পরে তৈরী হয়ে নিল। মাও তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন। বাবারই আজ সব কিছু ধীরে সুস্থে।

মা গোগোলকে খেতে দিলেন। বঙ্কিমদাই সকলের খাবার তৈরি করেছে। গোগোলের পরে মাও একটু খেয়ে নিলেন। বাবা মা নিজেদের মধ্যে কথা-

বার্তা বলছিলেন। ঠিক সাড়ে ছটায় কলিংবেল বেজে উঠলো। বাবা নিজেই বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিলেন, বললেন, 'এই যে দিবাকর, তুমি গাড়ি নিয়ে এসে গেছ?'

দিবাকব? গোগোল নামটা শুনে দরজার কাছে ছুটে গেল। দেখেই ও দিবাকরকে চিনতে পারলো। আগেও দেখেছে। দিবাকর হলো বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফণিকাকার ড্রাইভার। গোগোল এর আগেও ফণিকাকার গাড়িতে কয়েকবার চেপেছে, আর এই দিবাকর তখন গাড়ি চালিয়েছে। গোগোল তাকে দিবাকরদাদা বলে ডাকে। যেমন বাড়িতে বঙ্কিমকে বঙ্কিমদা বলে ডাকে। গোগোলের মায়ের এইটাই শিক্ষা। যে যা-ই কাজ করুক বড়দের বড়র মতোই ডাকতে হবে।

দিবাকর বাবাকে বললো, 'হ্যাঁ স্যাব, গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

দিবাকর গোগোলের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তৈবী হয়ে গেছ?'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, মাও রেডি।'

বাবা বললেন, 'দিবাকর, তুমি নীচে গাড়িতে গিয়ে বসো, গোগোলকে নিয়ে ওর মা এখুনি যাচ্ছেন।'

মা তৈরিই ছিলেন। বঙ্কিমদা একটা স্যুটকেশ, আব একটা ফোমেব ব্যাগ নিয়ে আগেই নীচে নেমে গেল। গোগোল গতকাল রাত্রেই ওব বই খাতা স্যুটকেশে গুছিয়ে বেখেছিল। মায়ের সঙ্গে বেরুবার আগে, বাবাব গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে ভুললো না। বাবাও ওকে আদব কবলেন। তাবপরে মায়েব সঙ্গে লিফ্‌টে করে নীচে নেমেই গাড়িতে ওঠা। গোগোল প্রথমেই বললো, 'মা, আমি দিবাকরদাদার সঙ্গে সামনে বসব।'

মা বললেন, 'বসো, কিন্তু দিবাকবদাদাকে জ্বালাতন করো না যেন'

দিবাকর নিজেই গোগোলকে সামনের দবজা খুলে ভিতবে বসিয়ে দিল। মায়ের জন্য পিছনের দবজা খুলে দিল। গোগোলেব মনটা একটু খাবাপ হলো। মা একলা পিছনে বসবেন? মায়ের মনটা খাবাপ হবে না তো? সে কথাই ও বললো. 'মা পেছনে একলা একলা তোমার খাবাপ লাগবে না তো?'

মা বললেন, 'না, তুমি ভালো হয়ে বসো তো। দরজাটা ভেতর থেকে লক্‌ করে দাও, বাইরে ঝুঁকো না।'

গোগোল গাড়ির দরজা লক্‌ করতে জানে। মা গাড়িতে ওঠার পরেই দিবাকর দরজা বন্ধ করে গাড়ি ছেড়ে দিল। গোগোল হাত নেড়ে বঙ্কিমদাকে টা-টা করলো।

ভোরবেলার রাস্তা বেশ ফাঁকা। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় পেরিয়ে বি. টি. রোডের ওপর দিয়ে, গাড়ি দেখতে দেখতে দক্ষিণেশ্বর চলে এলো। তারপরেই বিবেকানন্দ সেতু, গঙ্গার ওপরে। সেতু পার হলেই, নতুন দিল্লী রোডটা যেমন চওড়া, তেমনি ধূ ধূ করে। পূব দিকের আকাশে ইতিমধ্যে রোদ উঠেছে। কিন্তু গরম একটুও লাগছে না। হাওয়ায় যেন উড়িয়ে নিচ্ছে।

দিবাকরই গোগোলকে রাস্তা চিনিয়ে দিচ্ছিল। দিল্লী রোডের ওপর দিয়ে কয়েক মাইল যাবার পরে, গাড়ি বাঁ দিকে বেঁকে গেল, দিবাকর বললো, এবার আমরা ডানকুনির ওপর দিয়ে যাবো।'

গোগোলের এসব নাম শোনা, কিন্তু কলকাতার এত কাছাকাছি, এসব জায়গায় কখনো আসে নি। ডানকুনি জায়গাটাও ওর মোটেই ভালো লাগলো না। ঘিঞ্জি আর ছোট রাস্তা। রাস্তাও এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা। তার ওপরে রেলওয়ে লেবেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ। ট্রেন পাস না করা পর্যন্ত গেট খুলবে না। আর লেবেল ক্রসিং-এর এপারে ওপারে, যাত্রীঠাসা বাসগুলো তার সঙ্গে বিরাট বড় বড় মালবোঝাই লরীগুলোর হর্ন এত জোরে বাজছে, যেন লেবেল ক্রসিং-এর গেট ভেঙেই ঢুকে পড়বে। গোগোলের মনে হলো, একটা বিরাট জায়গা জুড়ে, হর্নের আর সাইকেল রিকশার ভেঁপু আর মানুষের চিৎকারে রীতিমতো তাণ্ডব চলছে।

গোগোল দেখলো, এ অবস্থায় একটা মস্ত লম্বা কেন্নোর মতো মালগাড়ি ধীরে ধীরে আপ লাইনে চলে গেল। তখনো গেট খুললো না। দিবাকর বললো, 'একটা ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাস করলে, তবে গেট খুলবে।'

গোগোল গাড়ির জানালা দিয়ে দেখতে পেলো, সত্যি একটা আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন, একটু দূরে ডানকুনি ইস্টিশনে এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রেনটা হুইসল দিয়ে দু' মিনিটের মধ্যেই ছাড়লো। গেট উঠলো, তারপরেই গেটের এপারে ওপারে যতো গাড়ি ছিল, সব কে কার আগে পার হবে, তা নিয়ে যেন একটা কমপিটিশন্ লেগে গেল। গোগোলও অবশ্য মনে মনে খুবই অধৈর্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু লরী আর বাসগুলো এমনভাবে রাস্তা আটকাতে লাগলো, রেললাইনের মাঝখানেই জ্যাম হয়ে গেল।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ডানকুনির ডাণ্ডাবেড়ির মতো লেবেল ক্রসিং পার হওয়া গেল। তারপরেই, রাস্তা খুব একটা চওড়া না হলেও, দু' পাশে গাছ-পালা, বাগান পুকুর ইত্যাদি দেখে, গোগোলের ভালো লাগলো। মনে হলো, এতক্ষণে সত্যি, কলকাতার বাইরে বেড়াতে আসা হয়েছে।

চাঁপাডাঙার পরেই অনেকগুলো ছোট সেতু পার হতে হলো। গোগোল দেখলো, প্রত্যেকটা সেতুর সামনেই বোর্ডে লেখা রয়েছে, 'সংকীর্ণ সেতু। আস্তে চালান।' আর প্রত্যেকটা সেতুরই নম্বর দেওয়া রয়েছে। গোগোল গুনে দেখলো, এরকম সংকীর্ণ সেতু সব সুদ্ধ আঠারোটি রয়েছে। মাঝখানে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপরে বড় সেতু। সেখানে গাড়ি থামিয়ে, দু' টাকা টোল চার্জ দিয়ে টিকেট নিতে হলো। টাকা দুটো মা দিলেন দিবাকরদাদার হাতে। সেতুর ওপবে, টোল টিকিটের আধখানা আবার ছিঁড়ে নিল, সেখানকার অফিসেব একজন লোক। তারপবেই এসে গেল আরামবাগ।

আবামবাগ জায়গাটার নাম শোনা থাকলেও গোগোল কখনো দেখে নি। প্রায় একটা ছোটখাটো শহবেব মতোই। গাড়িব চলাব রাস্তাটা চওড়া, ডানকুনির মতো ছোট আর নোংরা নয়। অনেক দোকানপাট, তার মধ্যে খাবারেব দোকান অনেক। মা দিবাকবকে গাড়ি থামিয়ে টাকা দিয়ে বললেন, 'তুমি একটু খাবার আর চা খেয়ে এসো।'

দিবাকবদাদা প্রথমটা লজ্জা পেয়ে টাকা নিতে চাইলো না, কিন্তু মায়েব কথা অমান্য করতে পারলো না। গোগোলও দিবাকরদাদার সঙ্গে নামলো, খাবারের দোকানে গেল। দিবাকবদাদা ওকেও খেতে বললো। ওর মোটেই খিদে ছিল না। ও আশেপাশে তাকিয়ে আবামবাগেব দোকানপাট লোকজন আব ট্রাফিক পুলিশের অন্যরকম পোশাক দেখলো।

পনেরো মিনিট পরেই গাড়িখানা যখন আবার ছাড়লো, গ্রামের মাঠঘাট বাগান দেখে, গোগোলের আবো ভালো লাগলো। মাইলপোস্টের গায়ে প্রথমেই চোখে পড়লো 'বেঙ্গাই' বলে একটা জায়গার নাম। তারপরে 'কোতুলপুব'। কোতুলপুরের কাছেই একটা রাস্তা বাঁ দিকে চলে গিয়েছে। দিবাকরদাদা সেই বাস্তাটা দেখিয়ে বললো, 'ওই রাস্তা চলে গেছে জয়রামবাটি আব কামাবপুকুবেব দিকে।'

গোগোলেব জায়গাগুলোর নাম জানা ছিল। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেব বাড়ি, আর জয়বামবাটি সারদাদেবীর বাড়ি। সেখানে অনেকেই তাঁদেব প্রাচীন বাড়িঘর মন্দিব স্মৃতিচিহ্ন দেখতে যান। গোগোল বললো, 'মা, আমবা কি কামারপুকুব জয়রামবাটি দেখতে যাবো না?'

মা বললেন, আগে বিষ্ণুপুরে চলো, তোমার মেসোমশাই যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পাবেন, একদিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়বো।'

কোতুলপুরের পবেই জয়পুর। জয়পুর মানেই জঙ্গলের সীমানা শুরু। টানা প্রায় দশকিলোমিটার জঙ্গল। বড় গাছ খুব বেশী নেই। বেশ উঁচুতে

মাথা চাড়া উঠছে, এরকম শালের চারাই বেশী। গোগোল দিবাকরের কাছে জানতে চাইলো, জয়পুরের জঙ্গলে বাঘ হরিণ আছে কী না। দিবাকরদাদা হেসে বললো, 'শুনতে তো পাই না। তবে জয়পুরের জঙ্গলে এখন অনেক ডাকাত থাকে শুনেছি।'

গোগোলের চোখে তৎক্ষণাৎ জয়পুরের জঙ্গলের চেহারা বদলিয়ে গেল। ডাকাত! ও জঙ্গলের গভীরে বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগলো। কিন্তু ডাকাতের কোনো চিহ্নই দেখতে পেলো না। বরং দেখলো, অনেক গরিব মেয়েরা জঙ্গলের ভিতর থেকে শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করে নিয়ে বেরোচ্ছে। সেগুলোকে ঠিক কাঠ বলা যায় না, সরু সরু শুকনো ডালপালা।

গোগোল জিজ্ঞেস কবলো 'ডাকাতরা এখন কোথায় আছে? বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে?'

দিবাকরদাদা বললো, 'তাই হয় তো আছে। ডাকাতির সময় ছাড়া তাদের দেখা যায় না।'

গোগোল বললো, 'তা হলে আমাদের গাড়িতেও ডাকাতি করতে পারে?'

দিবাকরদাদা মাথা নেড়ে বললো, 'না, দিনের বেলা এখানে ডাকাতি হয় না। রাত্রেই বেশী হয়। আর দিনের বেলা কেউ যদি টাকা পয়সা নিয়ে হেঁটে যায়, তা হলে তাব আর রক্ষে নেই। ডাকাতরা যা পাবে, ছিনিয়ে নেবে।'

গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার চেয়ে বিরাট বিরাট বাঘ হাতি হরিণ থাকলেও ভাল লাগতো। ডাকাতদের থেকে তারাই ভালো। কারণ বনজঙ্গল তো তাদেরই বাড়ি।

দেখতে দেখতেই জয়পুরের জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। লাল মাটির উই ঢিবি আর খোয়াইয়ের মাঠ দেখা গেল। দিবাকরদাদা ঘোষণা করলো, 'আমরা এবার বিষ্ণুপুরে ঢুকতে যাচ্ছি।'

গোগোল বাঁ দিকে দেখলো বিরাট একটা দীঘি, আর তার পাড় বিরাট উঁচু। গোগোল চিৎকার করে উঠলো, 'মা, ছাখো ছাখো, কত বড় একটা দীঘি।'

মা বললেন, 'ওটাকে দীঘি বলে না, বিষ্ণুপুরের লোকেরা বলে বাঁধ। বিষ্ণুপুর শহরের আশেপাশে তুমি এরকম বেশ কয়েকটা বাঁধ দেখতে পাবে, নাড়ুদা তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে। এসব বাঁধ বিষ্ণুপুরের রাজারা কাটিয়েছিলেন, আর সবগুলো বাঁধেরই একটা করে নাম আছে। এই বাঁধটার

নাম হচ্ছে কৃষ্ণবাঁধ।'

গোগোলের কাছে কৃষ্ণবাঁধ নামটা বেশ সুন্দর লাগলো। দিবাকরদাদা মায়ের কাছ থেকে সেজো মাসীব বাড়ির ঠিকানা জেনে, দশ মিনিটের মধ্যেই, গাড়ি ঢোকে এরকম একটা সরু গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। দাঁড়ালো একটা বাড়ির সামনে। গোগোল দেখলো, সেই বাড়ির সামনেই নাড়ুদাদা ট্রাউজার আর শার্ট পরে, আরো কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সে গাড়িটার দিকে অবাক্ হয়ে তাকালো। গোগোল আর তার মাকে যেন চিনতেই পারলো না। আসলে কোনো খবর দেওয়া ছিল না, নাড়ুদা ভাবতেই পারে নি, গোগোলরা আসতে পারে। ভেবেছে, কারা না কারা এসেছে। গোগোলই গাড়ির ভিতব থেকে চিৎকার করে উঠলো, 'নাড়ুদা, আমরা এসেছি।'

নাড়ুদা অমনি লাফিয়ে গাড়ির কাছে চলে এলো। গোগোল দরজা খুলে বেরোতেই ওকে জড়িয়ে ধবে বললো, 'আরে, ভাই তুই এয়েচু?'

নাড়ুদা যতোই কলকাতায় এম. এ. পাশ করুক, আর কলেজে পড়াক, কথাবার্তা এইরকম। সে গাড়িব ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে মাকে নমস্কাব করে বললো, 'মাসী আপনি আইচেন? আমরা কোন খবর পাই নাই যে?'

গাড়ি গলির মধ্যে ঢুকতেই, এক গাদা ছোট ছেলেমেয়ে এসে ভিড় করেছিল। নাড়ুদা চিৎকার করে বললো, 'ও মা, দ্যাখ কে আইচেন।'

নাড়ুদার ডাকের আগেই সেজো মাসী, তাঁর ছোট বড় জায়েরা ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। ছুটে বেরিয়ে এলো ছেলেমেয়েরা। গোগোল দেখলো মাধব মানে মেদা খালি গায়ে একটা হাফ প্যান্ট পরে এসে দাঁড়িয়েছে। গোগোলের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ও হাসছে, কিন্তু যেন লজ্জায় গোগোলেব কাছে আসতে পারছে না। গোগোল নিজেই ছুটে গিয়ে মেদার হাত টেনে ধরে কাছে টানলো, 'কী রে মেদা, কেমন আছিস? দ্যাখ্ আমি আর মা কেমন তোদের বাড়ি চলে এলাম।'

মেদা আনন্দে গোগোলকে জড়িয়ে ধবে বললো, 'আমার খুব মজা লাগছে। তুই সত্যি এয়েচু?'

এয়েচু মানে এসেছিস। ওদিকে তখন মা আব মাসীমাদের নানান কথায়, দিবাকরদাদার সঙ্গে নাড়ুদাদা, গাড়ির পিছনের কেরিয়ার থেকে মাল নামানো, সব মিলিয়ে যেন হইচই মেলা লেগে গিয়েছে। সেজো মাসী চিৎকার করে বললেন, 'ওরে নাড়ু, ডাক্তারখানায় তোর বাবাকে গিয়ে তাড়াতাড়ি খবর দে, ছোট মাসী এসেছে।'

নাড়ুদা বললো, 'যাচ্ছি গো যাচ্ছি, আগে মালপত্রগুলান সব তোলাপাড়া করি।'

মা বললেন, 'সেজদি তুমি তাড়াহুড়ো কোরো না, এখন মাত্র বেলা পৌনে এগারোটা বেজেছে।'

গোগোলের এসব কথা শোনবার সময় ছিল না। অন্যান্য মাসীরা মেসোরা দিদি দাদারা কে ওকে কাছে টেনে আদর করলো, সে-সব ওর খেয়ালই নেই। ও মেদার সঙ্গে চলে গেল বাড়ির ভিতরে। সে এক অদ্ভুতরকমের বাড়ি। শহুরে দোতলা বাড়ি বলতে যেমন বোঝায়, সেরকম বাড়ির সঙ্গেই বাঁধানো রকের ওপর, পাকা দেওয়াল ঘেরা খড়ের চাল দেওয়া ঘরও আছে। মস্ত বড় উঠোনের এক পাশে, কাঁচা মাটির রক, মাথায় খড়ের চাল, সেখানেই রান্না হচ্ছে। ঘর বললে, সেটা বেশ বড়ই। তার এক পাশে ইঁদারা। যাকে বলে কুয়ো। গোগোল সেই ইঁদারার কাছে গিয়ে উঁকি দিতেই ওর যেন মাথা ঘুরে গেল। মনে হলো, সেই পাতালের গভীর নীচের অন্ধকারে জল চিকচিক করছে।

মেদাদের বাড়িটা তার পাশেই। সবই প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। আসলে নাড়ুদাদের কাকা জ্যাঠাদের সকলেরই আলাদা আলাদা বাড়ি। নাড়ুদার ঠাকুর্দা বেঁচে থাকতে সকলে এক বাড়িতে ছিল। সেই পুরনো বাড়িটা সব থেকে অদ্ভুত। দোতলা, কিন্তু দোতলার চালটা খড়ের, অথচ দেওয়াল পাকা। আর সেই বাড়ির লম্বা দালানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধানের স্তূপ। তার ওপরে চড়ুইয়ের ঝাঁক রীতিমতো চড়ুইভাতি জুড়ে দিয়েছে। দালানে লোকজন ঢুকতে দেখলেই উড়ে পালাচ্ছে। মেদাদের বাড়িটার সামনে বারান্দা, অনেকটা আজকালকার পাকা বাড়ির মতোই একতলা। কিন্তু উঠোনের সামনের দিকে বসবার ঘরটা মাটির, আর সেটা দোতলা। দোতলার মেঝে কাঠের, আর ওঠবার জন্যে মই লাগানো রয়েছে এক কোণে। ওদেরও রান্নাঘর আর গোয়ালঘর খড়ের চাল দিয়ে ছাওয়া। একটা ইঁদারাও আছে।

শহরের মাঝখানেই এরকম সব বাড়ি-ঘর, গোগোল এর আগে কখনো দেখে নি। আশেপাশে গাছপালাও কম নেই। বিরাট বড় বড় তালগাছে ছোট ছোট তাল ফলেছে প্রচুর। মেদা জানিয়ে দিল, গোগোলকে গাছ থেকে পেড়ে তালশাঁস খাওয়ানো হবে।

ডাক্তারখানা থেকে সেজো মেসোমশাই আসার পরে হইচই আরো জমে গেল। একটা বেলা সকলের সঙ্গে পরিচয় করে, খাওয়া-দাওয়া করতেই

কেটে গেল। দুপুরবেলা গোগোল খানিকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠতেই, সেজো মাসী তালশাঁস আর মিষ্টি খেতে দিলেন। তারপরেই নাড়ুদার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে অবশ্য মেদা চললো।

কলকাতার বাইরে এলেই সাইকেল রিক্‌শায় চাপা যায়। কলকাতায় সবরকমের যানবাহন আছে, সাইকেল রিক্‌শা নেই। মানুষে টানা রিক্‌শা থেকে সাইকেল রিক্‌শা চাপতে গোগোলের ভালো লাগে। মনে হয়, এতে রিক্‌শা চালকের কম কষ্ট হয়। নাড়ুদা তাদের বাড়ির গলি রাস্তা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে একটা রিক্‌শা ডেকে নিল। গোগোলকে নাড়ুদা তার কোলে নিল। আর মেদা বসলো পাশে।

নাড়ুদা জিজ্ঞেস করলো, 'গোগোল, আগে কী দেখবি? দলমাদল কামান, না পাথর দরজা, না কি মন্দির?'

গোগোলের মন্দির দেখবার তেমন উৎসাহ হলো না। ও প্রথমেই কামান দেখতে চাইলো। নাড়ুদা রিক্‌শাওয়ালাকে ঠিকানা বলে দিল। রিক্‌শাওয়ালা তার আগেই রিক্‌শা চালিয়ে দিল। গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'মেদা, তুই কামান দেখেছিস?'

মেদা জ্বলজ্বলে চোখে আর বোগড়া দাঁতে হেসে বললো, 'কতোবার একবার কি?'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'একলা একলা?'

মেদা বললো, 'একলা গেছি, বন্ধুদের সঙ্গেও গেছি।'

নাড়ুদা মুখ টিপে হেসে বললো, 'মেদার কথা ছেড়ে দে গোগোল লেখাপড়ার নামে নেই, ও সারাদিন শহরে শহরে ঘুরে বেড়ায়।'

মেদা অমনি প্রতিবাদ করে বললো, 'ইস্, দ্যাখো ছোড়দা, মিথ্যা কথা বলবেক্ নাই।'

নাড়ুদা হাসলো। মেদার কথা শুনে গোগোলের খুব মজা লাগলো। মেদা কলকাতার কথা একেবারেই বলতে পারে না। কিন্তু গোগোলের শুনতে ভালো লাগে। ইচ্ছা করে, ও মেদার মতো কথা বলবে। মেদার কথার মতো, ওর চেহারাটাও যেন আলাদা। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে, আর চুলের রঙ যেন বাদামী ধাঁচের। জামার বোতাম খোলা। পায়ে জুতো স্যাণ্ডেল কিছুই নেই। এতেই যেন ওকে মানিয়েছে বেশী। অথচ ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ও খুব বুদ্ধিমান। আসলে যে যেখানে, যে-রকম পরিবেশে বাস করে, তার হাব-ভাব চাল-চলন সেই রকম হয়। কিন্তু গোগোল জানে, মেদা লেখাপড়ায় খুব ভালো।

রিক্‌শা চলেছে শহরের ভিতর দিয়ে। গোগোলের দেখে মনে হচ্ছে, শহরের পুরনো বাড়িগুলো কেমন যেন চাপা আর শ্যাওলা ধরা। তার মাঝখানে নতুন বাড়িগুলোকে বেমানান লাগছে। গোটা শহরটাই ভারী ঘিঞ্জি, রাস্তাগুলো সরু। আর কোনো জায়গায়, গোগোল এত তেলেভাজা আব জিলিপির দোকান দেখে নি।

কিন্তু ঘিঞ্জি শহরটা ছাড়িয়ে, রিক্‌শা ক্রমেই বেশ খোলামেলা জায়গায় এসে পড়লো। আশেপাশে সব বাড়িগুলোই নতুন। গোগোল একটা খাঁজকাটা পাহাড়ের ঢিবির মতো বাড়ি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নাড়ুদা, ওটা কাদের বাড়ি?'

নাড়ুদা বললো, 'ওটা হলো রাসমঞ্চ। কামান দেখে ফেরবার সময়, ওটা তোকে দেখিয়ে নিয়ে যাবো।'

রিক্‌শা ডান দিকে ঘোরার সময়, পাঁচিল ঘেরা একতলা লম্বা বাড়ি আর বাগান দেখিয়ে নাড়ুদা বললো, 'এটা হলো বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ। দেখবি নাকি?'

গোগোল ট্যুরিস্ট লজ দেখবার কোনো উৎসাহ বোধ করলো না, যদিও বাড়িটা দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কলকাতায় বা অন্যান্য অনেক জায়গায়, গোগোল ওরকম বাড়ি অনেক দেখেছে। রিক্‌শাটা এসে পড়লো কামানের কাছে। গোগোল নাড়ুদার কোল থেকে লাফিয়ে নেমে, দৌড়ে কামানের কাছে গেল। মেদাও ছুট দিল ওর সঙ্গে।

ইট বাঁধানো রকের ওপরে, দু দিকে দুটো স্তম্ভের ওপরে কামানটা যেন গেঁথে রাখা হয়েছে। গোগোল রকের ওপর উঠে কামানে হাত দিল। মেদা লাফিয়ে কামানের ওপরে চড়ে বসবার চেষ্টা করলো। নাড়ুদা ধমক দিল, 'এই মেদা কি হচ্ছে? পড়ে যাবি।'

গোগোলেরও সেই রকম ইচ্ছা। কিন্তু দেখে যতোটা নীচু মনে হয়, কামানটা মোটেই তা নয়। আর গোগোলের ধারণা ছিল, কামানটার রং হবে ইস্পাতের মতো। মোটেই তা নয়, অনেকটা এমনি লোহার মতোই দেখতে, একটু যেন লালচে ভাব, আর বেশ মসৃণ। আগে যুদ্ধের জন্য ট্যাংক ছিল না, এত বড় বিশাল কামান সৈন্যরা বয়ে নিয়ে যেতো কী করে? গোগোল অবশ্য জানে, যারা কামান চালিয়ে যুদ্ধ করে, তাদের গোলন্দাজ বাহিনী বলে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা নাড়ুদা, সৈন্যরা এ কামানটা টেনে নিয়ে যেতো কী করে?'

নাড়ুদা বললো, 'কী করে আবার? দুটো চাকার মাঝখানে ডাণ্ডার ওপর

বসিয়ে লোহার শেকলে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতো। অনেকটা ঠেলা গাড়ির মতো।'

'আর এই কামানটার নাম দলমাদল হলো কেন?' গোগোল জিজ্ঞেস করলো।

নাড়ুদা বললো, 'কামানটার নাম আসলে দলমাদল নয়। অনেকে ভুল করে বলে, দল আর মাদল নামে দুটো কামান ছিল। একটা কামানের নাকি কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। ওসব একদম বাজে কথা। এই কামানটার আসল নাম দলমর্দন। মানে শত্রুদলকে যে কামান মর্দন করে। মর্দন করে, মানে মেরে ফ্যালে। দলমর্দন কথাটাই লোকের মুখে মুখে দলমাদল হয়ে গেছে।'

গোগোলের সঙ্গে মেদাও কথাগুলো শুনছিল। বললো, 'ছোড়দা, ই কথা তো তুমি আমাকে কখনো বল নাই।'

নাড়ুদা হেসে বললো, 'তুই তো কখনো জানতে চাস নি। তা হলে শোন্, এই কামানের ইতিহাসটা তোদের দুজনকেই একটু জানিয়ে রাখি। কামানটা দেখেই তোরা বুঝতে পারছিস, এখনো এর গায়ে মরচে পড়ে নি। তার মানে, ইংরেজরা আমাদের দেশে আসবার অনেক অনেককাল আগেই, আমাদের দেশের লোহার আর কামাররা এ-ধরনের কাজ জানতেন। আজকাল যাকে গ্যালভানাইজিং করা বলে। এই যে দেখছিস কামানের গায়ে এক জায়গায় ফারসী অক্ষরে লেখা রয়েছে, এই লেখাতে বলা আছে, কামানটা তৈরি করতে সেই আমলে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। তোরা কি বর্গীর হাঙ্গামার কথা বইয়ে পড়েছিস?'

গোগোল আর মেদা দুজনেই মাথা নেড়ে জানালো, পড়ে নি। নাড়ুদা বললো, 'সেই ঘুমপাড়ানি ছড়াটা শুনেছিস তো? ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?'

গোগোল মেদা দুজনেই মাথা নেড়ে জানালো, ছড়াটা ওরা শুনেছে। নাড়ুদা বললো, "বর্গী বলা হতো মারাঠা দস্যুদের। দেশের যখন খুব খারাপ অবস্থা, নবাব বাদশা রাজারা নিজেদের মধ্যে দলাদলি ঝগড়া করছিল, প্রজাদের রক্ষা করতে পারছিল না, তখন মারাঠা দস্যুরা দেশের চারদিকে ডাকাতি করে বেড়াতো। সেই মারাঠা দস্যুদের সর্দারের নাম ছিল ভাস্কর পণ্ডিত। ইংরাজের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধের পনের বছর আগে, ভাস্কর পণ্ডিত তার দলবল নিয়ে এই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেছিল। তখন বিষ্ণুপুরের রাজার নাম ছিল মদনমোহন দেব। উনি এই দলমাদল কামান দেগে,

মারাঠা দস্যুদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আরো জেনে রাখো, এই কামানটা লম্বায় বারো ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি, আর চওড়ায় সাড়ে এগারো ইঞ্চি।"

গোগোল আর মেদা দুজনেই খুব মনোযোগ দিয়ে নাড়ুদার কথা শুনলো। আর কামানটা যেন ওদের নতুন করে অবাক্ আর মুগ্ধ করলো। গোগোল কামানের সামনের মুখে হাত ঢোকাতেই, মেদা তাড়াতাড়ি ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললো, 'হাত দিস নাই। উয়ার ভিতরে একটা কুমীরের মতন জন্তু আছে, হাত কেটে লিবেক।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি নাড়ুদা ?'

নাড়ুদা বললো, 'কুমীর ওর মধ্যে থাকবে না। তবে বলা তো যায় না, সাপখোপ থাকতে পারে। হাত না ঢোকানোই ভালো।'

গোগোল আর মেদা কামানটার তলা দিয়ে গলে, কয়েকবার হুটোপাটি করলো। তারপরে নাড়ুদা বললো, 'চল্ এবার ছিন্নমস্তার মন্দির দেখে আসি।'

দলমাদল কামানের কাছেই ছিন্নমস্তার মন্দির। কিন্তু মন্দিরটা মোটেই পুরনো নয়, একেবারে হাল আমলের তৈরী। গোগোলের মোটেই ভালো লাগলো না, তার চেয়ে, আরো দূরে, উঁচু জায়গায় কয়েকটা পুরনো মন্দির দেখতে ভালো লাগছিল। গোগোল বললো, 'নাড়ুদা, চলো রাসমঞ্চ দেখতে যাই।'

নাড়ুদা বললো, 'তাই চল।'

রাসমঞ্চের পাশেই মাঠের ওপর বিষ্ণুপুরের পুরনো কে. জি. ইস্কুল। গোগোলের চোখে ইস্কুল বাড়িটা দেখতে ভালো লাগলো। রাসমঞ্চের কাছে গিয়ে, মেদা এক লাফে ওপরে উঠে, রাসমঞ্চের খাঁজ কাটা ধাপ বেয়ে বেয়ে একেবারে ওপরে উঠে গেল। দেখাদেখি গোগোলও উঠতে গেল। খানিকটা উঠতেই গোগোলের জুতো সুদ্ধ পা পিছলে গেল, আর একটু হলেই নীচে গড়িয়ে পড়ে যেতো।

নাড়ুদা চিৎকার করে বললো, 'গোগোল, জুতো পরে ওপরে ওঠা যায় না, তাড়াতাড়ি নেমে আয়।' মেদাকে রেগে বললো, 'মেদা শীগ্গির নেমে আয়, তোকে আমি পিটবো। কে তোকে মন্দিরের মাথায় উঠতে বলেছে ?'

মেদার কাণ্ড দেখে গোগোলের বেশ মজাই লাগছিল। ওরও উঠতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু জুতো পায়ে ওঠা সম্ভব না। তা ছাড়া মেদার যা অভ্যাস আছে, গোগোলের তা নেই। মেদা নাড়ুদার ধমক খেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে

এলো। তারপরে তুজনে রাসমঞ্চের ভিতরে ঢুকলো। ভিতরটা পরিষ্কার হলেও কিছুটা স্যাঁতসেঁতে আর পুরনো গন্ধ। মন্দিরটার অনেকগুলো দরজা। গোগোল আর মেদা রীতিমতো লুকোচুরি খেলা জুড়ে দিল। কিন্তু রাসমঞ্চের লুকোচুরি খেলায়, গোগোল মেদার সঙ্গে পারলো না। এক একবাব ও এমন লুকলো, গোগোল ওকে খুঁজেই পেলো না।

নাড়ুদা ডেকে বললো, 'চল্ এবার কেল্লার গড়খাই আব পাথর দরজা দেখতে যাবো।'

যাবার পথে নাড়ুদা যে-কলেজে পড়ায়, সেই কলেজটা গোগোলকে দেখালো, আর তার পাশেই লালবাঁধ। বিষ্ণুপুরে ঢোকবার মুখে যেমন কৃষ্ণবাঁধ নামে বিরাট দীঘি দেখা গিয়েছিল, লালবাঁধও সেইরকম একটা বিরাট দীঘি। বাঁধের পাড় বেশ উঁচু, আর দূরের তীরে শালবন দেখা যায়।

পাথর দরজাটা বিরাট। তার ভিতর দিয়ে অনায়াসে গাড়ি চলে যায়। নাড়ুদা দেখিয়ে দিল, পাথর দরজার কোথায় কোথায় বড় বড় শালবল্লার হুড়কো লাগানো থাকতো, আর মাথার ওপরে কোথায় সৈন্যবা পাহারা দিত। পাথর দরজার পরেই আর একটু ছোট দরজা, তার নাম বীর দবজা। আসলে তুটোই অনেকটা তুর্গেব মতো দেখতে। পাথর দরজার পাশে, উঁচু টিলায় উঠে, পুরনো তুর্গেব গড়খাই দেখা গেল। অন্য পাশে ইট দিয়ে বাঁধানো একটা বিরাট চৌকো ঘেরাও। নাড়ুদা বললো, 'ওখানে শত্রুদের মেরে ফেলে দেওয়া হতো। কাছে পিঠেই লালজীর মন্দির। জোড়বাংলো মন্দির।'

গোগোল নাড়ুদার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে, বাজবাড়িতে গেল। রাজবাড়ি বলে আস্ত আর কিছু নেই, সবই ভেঙেচুরে পড়েছে। চারদিকে আগাছা আর জঙ্গল গজিয়েছে। তুর্গের গড়খাইয়ের নীচে, অনেক দূব পর্যন্ত পাহাড়ের ঢালুর মতো জঙ্গল দেখা যায়।

নাড়ুদা বললো, 'এই জায়গার আসল নাম মল্লভূমগড়। রাজাদের বলা হতো মল্লরাজ। সব থেকে নাম করা রাজা ছিলেন বীর হাম্বীর। তাঁর আমলে রাজ্যের সব থেকে উন্নতি হয়েছিল।'

গোগোল নাড়ুদার কথা শুনতে শুনতে পুরনো দিনগুলো কেমন ছিল, রাজবাড়ি, তুর্গ, সৈন্য, এসবের কল্পনায় ডুবে গেল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এলো। নাড়ুদা বললো, 'আজ আর নয়, আবার কাল বেড়াতে বেরনো যাবে। এখন বাড়ি ফিরতে হবে।'

আগের রিক্শাটা দলমাদল কামানের কাছেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু দূর এসে আবার একটা রিক্শা ভাড়া করে সবাই বাড়ির দিকে ফিরে

চললো।

তিন চার দিন নাড়ুদার সঙ্গে এবেলা ওবেলা বেড়িয়েই কেটে গেল। সঙ্গে মেদা সব সময়েই ছিল। গোগোলের সঙ্গে মেদার এখন খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। আর গোগোল এই কদিনে বিষ্ণুপুরের নামকরা মিষ্টি কলাকাঁদ আর বসমালাই খুব করে খেয়ে নিল। খেয়ে যে ভয়ও না হল, তা নয়। ওর এত মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস নেই। পেট খারাপ হবার ভয় ছিল। হয় নি, সেটাই রক্ষে.। হলেই মা জানতে পারতেন, তারপরে নাড়ুদার সঙ্গেও আর বাইরে বেড়াতে বেরোতে দিতেন না।

বিষ্ণুপুরে আসার ঠিক পাঁচ দিনের দিন ঘটনাটা ঘটলো। অবিশ্যি কিছু ঘটতে পারে, গোগোলেরও তা জানা ছিল না। যেমন জানা ছিল না, এই দিনটিতেই, সকালবেলাই নাড়ুদাকে তার কলেজের প্রিন্সিপাল একবার ডেকে পাঠিয়েছেন। তার মানেই সকালবেলার বেড়ানোটা মাটি।

নাড়ুদা অবিশ্যি বলে গেছে, প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা মিটে গেলেই সে চলে আসবে। তারপরে বেড়াতে যাবে। কিন্তু নাড়ুদার আসবার কিছু ঠিক নেই। আর বেড়াতে এসে বাড়িতে বসে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না। অথচ একলা কোথাও যাবার উপায় নেই। অচেনা জায়গা। গোগোল রাস্তা-ঘাট চেনে না। মা বেশ ভালোই আছেন। সেজো মাসী, তাঁব জা আর বাড়ির অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে গল্প করেই কেটে যায়। মেসোমশাই সন্ধ্যের পরে, ডাক্তারখানা থেকে ফিরলে, মায়েদের গল্পের আসর আরো জমে। সেখানে ছোটদের জায়গা নেই।

গোগোল বড়দের আড্ডায় থাকতেও চায না। সেটা উচিত নয়, ও জানে। মেসোমশাই নিজে মা আর সেজো মাসীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বিকালের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন। গোগোলকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। গোগোল যায় নি। ও নাড়ুদার সঙ্গে বেড়াতে যেতেই ভালবাসে।

গোগোল এই সব ভেবে যখন মন খারাপ করছে, তখনই এলো মেদা, মানে মাধব। মেদাকে দেখেই গোগোলের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। মেদা এ শহরের সব পথঘাট চেনে। ওর সঙ্গে বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু মা জানতে পারলে কি যেতে দেবেন? কখনোই না।

মেদা এসে গোগোলকে জিজ্ঞেস করল, 'জলখাবাব খেয়েচু?'

মানে, 'জলখাবার খেয়েছিস?' গোগোল ঘাড় কাত করে বলল, খেয়েছি।'

মেদা জিজ্ঞেস করল, নাড়ুদাদা কোথাক্ গেছে? বেড়াতে যাবি নাই?'

গোগোল মেদাকে জানাল, 'নাড়ুদাকে কলেজের প্রিন্সিপাল ডেকে পাঠিয়েছেন, সেখানে গিয়েছে। কখন ফিরবে, কোন ঠিক নেই। মেদা বলল, 'তা হলে আমাদিগের বাড়ি চল্।'

মেদাদের বাড়িটা এক দেওয়ালের ওপাশেই। গোগোলের সেখানে যাবার কোন উৎসাহ হলো না। এদের বাড়ির গোয়ালের পাশেই মস্ত বড় একটা পেয়ারা গাছ আছে। কিন্তু এখনো গাছের পেয়ারাগুলো ছোট আর একদম কষুটে। একমাত্র মেদাদের বাড়ির ছাদটাই যা একটু ভালো। শহরেব খানিকটা দেখা যায়।

মেদা বলল, 'কিরে গোগোল, কিছু বলছিস নাই যে? চল্ আমাদিগের বাড়িতে যেয়ে গুলি খেলব।'

গোগোলের গুলি খেলাটা তেমন আসে না, এখন ইচ্ছেও করছে না। ও বলল, 'আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে।'

মেদা জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকে যাবি?'

গোগোল বলল, 'আমি তো এখানকার কোন জায়গা চিনি না, কী কবে বলব?'

মেদা একটু সময় ভাবল, তাবপরে বলল, 'মদনগোপালেব মন্দিরে যাবি? বাড়ির কাছকেই আছে।'

মদনগোপালেব মন্দিরটা বাড়ির কাছেই। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দিরই অবিশ্যি সব থেকে বিখ্যাত। গোগোল নাড়ুদার সঙ্গে গিয়ে মদন-মোহনের মন্দির দেখে এসেছে। কিন্তু মন্দিরের ভিতরে মদনমোহনের যে মূর্তি আছে, তা নাকি আসল নয়। বাড়ির কাছে মদনগোপালের মন্দিরও গোগোলের দেখা। তবু, মন্দিরের উঁচু চূড়াটা দেখতে বেশ ভালোই লাগে। নাটমন্দিরটাও বেশ বড়। কিন্তু মাকে না বলে, সেখানেও যাওয়া যাবে না।

মেদাকে সে কথা বলতে, ও নিজেই গিয়ে গোগোলের মাকে বলল। সেজো মাসী শুনে বললেন, 'মদনগোপালের মন্দির তো বাড়ির পেছনেই। কিন্তু সেখান থেকেই দুজনে ঘুরে চলে আসবি, আব কোথাও যাবি না।'

সেজো মাসীর কথা শুনে গোগোলের মা আর আপত্তি করতে পারলেন না। তবু গোগোলকে সাবধান করে বললেন, 'মনে রেখো গোগোল, সেজো মাসী আর কোথাও যেতে বারণ করেছেন। ওখানে বেশী দেরি করবে না।'

মেদা বলল, 'আমরা মদনগোপালের লাটমন্দিরে খেলা করব।'

মা হেসে বললেন, 'লাটমন্দির কী রে মেদা। নাটমন্দির বলতে পারিস না?'

মেদা লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে হাসল। মা মেদাকে কাছে টেনে নিলেন। আসলে, গোগোলের মা মেদাকে বেশ ভালবাসেন। মা মেদার জামার বুকের খোলা বোতামগুলো এঁটে দিতে দিতে বললেন, 'জামার বোতামগুলো লাগাস নি কেন?'

মেদা হেসে বলল, 'ভুলে গেইচি।'

মা মেদার গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'ওরকম ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু তোর খালি পা কেন? জুতো স্যাণ্ডেল, কিছু নেই?'

গোগোল এই ক'দিনে, মেদাকে কখনো জুতো স্যাণ্ডেল কিছুই পরতে দেখে নি। সেজো মাসী বললেন, 'থাকবে না কেন। জোড়া জোড়া জুতো স্যাণ্ডেল আছে। মেদা ওই রকম ছেলে, পুরো গাঁইয়া। ওর বাবা মা কতো বকে, ও জুতো ট্যতো পরবে না।'

মা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন রে মেদা?'

মেদা গোগোলের মায়ের সামনে খুবই লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু সরল ভাবে বলল, 'আমার ওসব ভালো লাগে না।'

গোগোলের মা মেদার জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ইস্কুলও খালি পায়ে যাস?'

মেদা ঘাড় কাত করে বলল, 'হুঁ।'

মা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি, ইস্কুলে মাস্টারমশাইরা কিছু বলেন না?'

জবাব দিলেন সেজো মাসী, 'বলেন না আবার! ওর বাবাকে পর্যন্ত মাস্টারমশাইরা বলেছেন। তবুও পায়ে কিছু পরবে না।'

মা বললেন, 'তুই তো বেশ মজার ছেলে রে মেদা। এদিকে শুনি তুই লেখাপড়ায় খুব ভালো, অথচ পায়ে জুতো পরতে চাস না? তোর অসুবিধেটা কী?'

মেদা বলল, 'আমার মনে হয়, আমার পা দুটো যেন কেউ বেন্ধা বেখেছে।'

মা হেসে উঠলেন। গোগোলেরও হাসি পেলো, আর মেদাকে ওর আরো ভালো লাগলো। মা বললেন, 'তুই এক সত্যি কথা বলছিস, তোকে কিছু বলার নেই। অবিশ্যি শান্তিনিকেতনে বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী খালি পায়ে চলাফেরা করে। রবীন্দ্রনাথ সেটা পছন্দ করতেন। কিন্তু তোদের এই শহর যা ঘিঞ্জি আর ময়লা, এখানে খালি পায়ে চলাফেরা করা যায় না। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের এলাকা খুব পরিষ্কার, ওখানে আমারও খালি

পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে।'

মেদা বলল, 'আমি স্কুলে যেয়ে, ক্লাসে ঢুকবার আগে পা ধুয়ে লিই। আবার বাড়ি এসে ঘরে ঢুকবার আগেও পা ধুয়ে ঢুকি।'

মা হেসে বললেন, 'বাঃ, সেটা ভালো।'

সেজো মাসী বললেন, 'যা, তোরা মদনগোপালের মন্দির থেকে বেড়িয়ে আয়। আর কোথাও যাস্ নি যেন।'

গোগোল খুশী হয়ে মেদার হাত ধরে, বাড়িব পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাড়ার ভিতর দিয়ে গোগোল আর মেদা হাত ধরাধরি কবে চললো। গোগোল পকেট থেকে চুয়িংগাম বের কবে একটা মেদাকে দিল, আর একটা নিজের মুখে পুরল। মদনগোপালের মন্দিরে যেতে, পাড়ার মধ্যে বেশির ভাগ বাড়িতেই, চরকায় সুতো গোটানো, আর তাঁত চলতে দেখা যায়। মদনগোপালের মন্দিবের নাট মন্দিবে আরো কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। সকলেই গোগোলদের বয়সী। ওরা সবাই অচেনা গোগোলকে দেখতে লাগল। দু-একজন মেদাকে গোগোলের কথা জিজ্ঞেস করল। মেদা বলল, 'ও আমার মাসতুতো ভাই, কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে।'

গোগোলের মদনগোপালের মন্দিরে ভালো লাগলো না। বলল, 'চল মেদা, অন্য কোথাও যাই।'

মেদা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবি? দলমাদল কামান দেখতে যাবি?'

গোগোল অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই চিনে যেতে পারবি?'

মেদা ওর জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে দেখে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি সব জায়গায় চিনে যেতে পারি। বাসে উঠে, সোনামুখীতে মামাবাড়ি চলে যেতে পারি। কামারপুকুব জয়রামবাটি চলে যেতে পারি। বাঁকুড়ায় মামাব দোকানেও চলে যেতে পারি।'

গোগোল অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একলা একলা কখনো গেছিস?'

মেদা ঘাড় নেড়ে বলল, 'একলা কখনো যাই নাই, বাবার সঙ্গে গেইচি। কিন্তু এখন আমি একলাও যেতে পারি।'

গোগোল বলল, 'দলমাদল কামান তো নাড়ুদার সঙ্গে আবার দেখতে যাবার কথা আছে। তার চেয়ে চল্, পাথর দরজাটা আর একবার দেখে আসি। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব তো?'

মেদার চোখ দুটো আর বড় বড় দাঁতগুলো আরো জ্বলজ্বল কবে উঠল।

খুশী উপছে পড়ল ওর গলায়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব। আমি শর্টকাট রাস্তা জানি। একটুও দেরি হবে না।'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুট দিল। গোগোল বুঝতে পারল না, মেদা কোন্ পথ দিয়ে চলেছে। নাড়ুদার সঙ্গে যে-পথ দিয়ে পাথর দরজা দেখতে গিয়েছিল, সে-পথ যে নয়, তা বুঝতে পারল। নানান অলিগলি আদাড়-বাঁদাড়ের ভিতর দিয়ে, বলতে গেলে, এক ছুটেই যেন দুজনে পাথর দরজার সামনে এসে পড়ল। গোগোল একেবারে হতবাক্! মেদার সত্যিই বুদ্ধি আছে। তা নইলে এত তাড়াতাড়ি পাথর দরজার সামনে আসতে পারে না।

পাথর দরজার সামনে রাস্তাটা এখন প্রায় ফাঁকা। দু-একটা লোক, একটা কি দুটো সাইকেল রিক্শা চলছে। গোগোলের দৃষ্টি পড়ল, পাহাড়ের টিলার মতো উঁচুতে সেই চারদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো চৌকো জায়গাটা। এখানে নাকি শত্রুদের মেরে ফেলে দেওয়া হতো। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মেদা, ওখানে ওঠা যায়?'

মেদা বলল, 'না, পাথরের দেয়াল বেয়ে ওঠা যায় না। তার চেয়ে চল্, পুরনো রাজবাড়িটা দেখে আসি।'

গোগোল বলল, 'ওটা তো নাড়ুদার সঙ্গে দেখেছি।'

মেদা বলল, 'কিন্তু ওখানকে যে সাততলা পুকুরটা আছে, সেটা ত দেখিস্ নাই।'

'সাততলা পুকুর?' গোগোল অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মেদা বলল, 'হ্যাঁ, সাততলা পুকুর, রাজবাড়ির ভিত্রে। ওখানকে রানীরা সিনান করত।'

গোগোল অবাক্ হয়ে বলল, 'তুই কি করে জানলি? নাড়ুদা তো বলে নি?'

মেদা বলল, 'আমি জানি, আমি দেখেছি। ওখানকে হাওয়া মহল আছে। অনেক জঙ্গল আছে, তাই নাড়ুদা তোকে লিয়ে যায় নি।'

পাথর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওরা যখন এই সব কথা বলাবলি করছিল, তখন একটা লোক, একটি আট ন'বছরের মেয়ের হাত ধরে, দুর্গের গড়খাইয়ের উঁচু ঢিবির দিকে উঠছিল। লোকটার খালি গা, ধুতিটা হাঁটুর ওপরে তোলা, কালো কুচকুচে রং। মাথার চুলগুলো পাঁশুটে আর ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ানো। মেয়েটার গায়ে একটা লাল সাদা ফুল ছাপা ফ্রক। লোকটা মেয়েটার একটা হাত ধরেছিল।

গোগোল আর মেদা সেদিকে তাকাতোই না। মেয়েটাব কথা শুনে ওবা ফিবে তাকাল।

মেয়েটা বলছিল, 'না না, আমি ওখানকে যাব নাই, আমাকে ছেড়ে দাও।'

লোকটা মোটেই মেয়েটিকে ছেড়ে দিল না, ববং গডখাইযেব উঁচুতে উঠতে উঠতে বলল, 'হা ছাখ্‌ কি বোকা বিটি। বলছি যে তোব বাবা উই নীচেব জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেযে পা কেটে ফেলেছে। আমিও কাঠ কাটছিলাম, আমাকে তোব বাবা বললে, তোকে ডেকে লিয়ে যেতে।' বলতে বলতে লোকটা মেয়েটাকে নিযে, দুর্গেব গড়খাইয়েব নীচেব দিকে নামতে লাগল।

গোগোলেব সব দিকেই নজব। লোকটাকে কেন যেন ওব মোটেই ভালো লাগলো না। মেযেটাকে ও-ভাবে নিযে যাওযাব ব্যাপাবটাও কেমন কেমন ঠেকল। এবকম কিছু দেখলেই, ওব মনটা কেমন খচখচ কবে ওঠে, আব সব কিছু ওব দেখতে ও জানতে ইচ্ছে কবে। ও মেদাকে বলল, 'লোকটাকে আমাব একটুও ভালো লাগছে না।'

ঠিক এ সময়ে পাথব দবজাব আশেপাশে একটাও লোক নেই। চাবদিক যেন খা খা কবছে মেদা বলল, 'ও কিছু লয। লোকটাকে দেখে মনে লিচ্ছে, বাউবি হবেক। ওসব ওদেব ব্যাপাব। চল্‌ আমবা বাজবাডিব হাওয়া মহল দেখে আসি।'

লোকটা তখন গডখাইযেব পাহাড়ের ঢালুতে মেয়েটাকে নিয়ে অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে। আব দেখা যাচ্ছে না। আসলে পাথব দবজা, বাঁব দবজা, দুর্গ, সবই একটা পাহাড়েব ওপব। পাহাডেব ঢালুতে অনেক জঙ্গল। দুর্গেব চাবপাশে যেমন পবিখা খনন কবা হয়, তাব বদলে পাহাডেব খাদই দুর্গটাকে ঘিবে আছে। সেইজন্যই পাহাড়েব ঢালুকে গড়খাই বলা হযেছে।

মেদা গোগোলেব হাত ধবে টেনে বলল, 'চল্‌ যাই।'

গোগোল মেদাব সঙ্গে বাজবাড়িব দিকে গেল। কিন্তু লোকটা আব মেয়েটাব কথা ও ভুলতে পাবছে না। ও ঠিকই দেখেছে, মেয়েটার চোখে মুখে কেমন একটা অবিশ্বাসেব ভাব। তাব মানে ও যেন ঠিক বিশ্বাস কবতে পাবছিল না।

গোগোল আর মেদা ডান দিকে একটা মন্দিব ছাড়িয়ে, বাঁ দিকে জঙ্গল আর পোড়ো জমির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। গোগোল দেখল, ডান দিকে একটা একতলা ছোট নতুন বাবান্দায় বসে, সাধাবণ জামা-কাপড় পবা একটি লোক সিগাবেট খাচ্ছে।

মেদা বলল, 'গোগোল, ওই লোকটাকে দেখছিস, উনিই এখন বিষ্ণুপুরের রাজা।'

গোগোল ওরকম একটা লোককে দেখে, রাজা বলে ভাবতেই পারল না। বলল, 'যাঃ, রাজা আবার ওরকম হয় নাকি? ওঁকে তো একজন এমনি লোক মনে হচ্ছে।'

মেদা বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো। রাজা তো আগের মতন বড়লোক নাই। তাহলে আর এই রাজবাড়ি দুর্গ, সব ভেঙে পড়বে ক্যানে? তা হলে তো হাতী ঘোড়া সেপাই লস্কর সব থাকতো।'

গোগোল মেদার কথাটা মেনে নিল। কিন্তু রাজারা কেমন করে গরিব হয়, ওর কোনো ধারণা নেই। যিনি একতলা নতুন বাড়ির বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন, তাঁর দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখল। ভাবতে অবাক্ লাগে, এর পূর্বপুরুষেরা বিষ্ণুপুরে এত সব কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ওরা দুজনে ভাঙা রাজবাড়ির চত্বরে ঢুকল।

চারপাশ নিঝুম, দুপাশ থেকে ঘন জঙ্গল যেন গোগোল আর মেদাকে ঘিরে ধরছে। আশেপাশে ভেঙে পড়া বাড়ির ইঁটের স্তূপ। ওরা দুজনে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হাওয়া মহলের দিকটা একটু উঁচুতে। ওরা দুপাশে জঙ্গলের মাঝখানে, পায়ে চলা সরু দাগের ওপর দিয়ে চলেছে, আর সেই মুহূর্তেই ফোঁস করে শব্দ হলো।

মেদা গোগোলের হাত চেপে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনেই তাকিয়ে দেখল, ওদের কয়েক হাত দূরেই, ডান দিকে একটা পাঁশুটে রঙের সাপ, ওদেব দিকেই ফণা তুলে আছে। সাপের মাথাটা একটু বাঁ দিকে হেলানো, ফণাটা পিছন দিকে অল্প অল্প দুলছে। সাপটার চেরা জিভ দু-একবার দেখা যাচ্ছে, আর নাক থেকে টানা ফোঁসানি বেরোচ্ছে। মেদা এত জোরে গোগোলের হাত চেপে ধরেছে যে ওর হাত ব্যথা করে উঠল। আসলে ওরা এত ভয় পেয়েছে, দুজনেই দুজনের হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। গোগোল পিছন ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টা করতেই, মেদা ফিসফিস করে বলল, 'গোগোল, একটুও নড়িস না। এ হল খরিশ সাপ।'

সাপটা তেমনি ফণা তুলে যেন ওদের পথ আটকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেদা আস্তে আস্তে গোগোলের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপরে জামার বোতাম খুলতে আরম্ভ করল। গোগোল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। মেদা ফিসফিস করে বলল, 'চুপ, কথা বলিস না, নড়িস না, ওর দিকে তাকিয়ে থাক।'

মেদার নিজের চোখও সাপটার দিকে। সাপটা মেদার হাতের নড়াচড়া দেখেই, আবার ফণা ফুলিয়ে ফোঁস করে উঠল, আর ফণাটা আরো পিছন দিকে নিয়ে ছোবল মারার উদ্যোগ করল। মেদা চোখের পলকে জামাটা খুলেই, সাপটার ফণার ওপর ছুঁড়ে দিল। দিতেই সাপটার ফণা ঢাকা পড়ে গেল, আর ফণাটা গুটিয়ে যেন নীচু হয়ে গেল।

মেদা আর এক সেকেণ্ড দেরি না করে, গোগোলের হাত ধরে, সাপটার দু হাত দূব দিয়ে হাওয়া-মহলের দিকে দৌড় দিল। হাওয়া মহলের বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে মেদা দাঁড়াল। দুজনেই হাঁপাচ্ছে, আব দবদর কবে ঘামছে। গোগোল ভেবেছিল, মেদা পিছন ফিরে দৌড় দেবে। ও বলল, 'মেদা, আবার ভিতরে ঢুকে এলি কেন ? সাপটা যদি আমাদের এদিকে তাড়া কবে আসে ?'

মেদা বলল, 'খরিশটার এখন জামাব ভেতর থেকে মাথাটা বেব করতেই সময় লেগে যাবে। ও সাপ একেবারে যম, একবার কামড়ালে আব দেখতে হতো না।'

'খরিশ কী সাপ ?'

'জানিস নাই ? তোরা যাকে গোখরো বলিস, এখানে তাকেই খরিশ বলে।'

গোগোলের কেমন খটকা লাগল। ও সাপুড়েদের কাছে গোখরো সাপ দেখেছে। তাদের রং অনেকটা ইস্পাতেব মতো, এবকম পাঁশুটে নয়। অবিশ্যি নাড়ুদার কাছে শুনেছে, এখানে গোখরোকে খবিশ বলে। কিন্তু রঙটা ওরকম কেন ? গোগোল বলল, 'কিন্তু ওই সাপটার রং তো কেমন পাঁশুটে।'

মেদা বলল, 'আমাদের এখানে ওই রকম বং হয়। তুই দুধ গোখবো দেখেছিস ?'

গোগোল বলল, 'না তো।'

'দুধ গোখরো সাদা মতন দেখতে হয়।'

গোগোল অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু জামাটা ছুঁড়ে দেবাব কথা তোর মাথায় এল কী করে ?'

মেদা বলল, 'একবাব একটা সাপুড়েকে এইভাবে ফণার ওপর কাপড় ছুঁড়ে সাপ ধরতে দেখেছিলাম।'

'সাপ ধরা ?'

'হ্যাঁ। সেটা ধরেছিল এক তাঁত বাড়ি থেকে, ঠিক এই রকম খরিশ।

ফণার ওপরে কাপড়টা ছুঁড়ে দিতেই, ফণাটা নেমে গেছিল, আর সাপুড়ে অমনি সাপটার ল্যাজ টেনে ধরে ঝাপটা মেরেছিল।

'সাপটা কামড়াল না ?'

'কী করে কামড়াবে ? একবার ল্যাজ ধরে ঝাপটা মারলে, সাপ আর মাথা তুলতেও পারে না, কাটতেও পারে না। নতুন মাটির হাঁড়ি আর সরা আগেই এনে রেখেছিল। সাপুড়ে হাঁড়ির মধ্যে সাপটাকে ঢুকিয়েই সরা চাপা দিয়েছিল।'

গোগোল মেদার দিকে অবাক্ মুগ্ধ চোখে তাকাল। মেদা কতো কী জানে, কতো কী দেখেছে। কলকাতায় থাকলে এসব কিছুই দেখা যায় না। ও মেদার খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু জামার কী হবে ?'

'কী আবার হবে। সাপটা হয় তো ইয়াব ভিত্‌রেই পালাইছে, জামাটা তুলে লিয়ে যাব।' মেদা হাসতে হাসতে বলল, 'এখন এই হাওয়া মহলটা ছ্যাখ। এটাই সাততলা পুকুর। ওই যে দেখতে পাইচিস কি, ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি, পুকুরের জল।'

গোগোল সেদিকে তাকিয়ে, মেদার হাত ধরে, ভাঙা ইঁটের স্তূপের আরো ওপরে উঠল, আর মনে মনে অবাক্ হয়ে ভাবল, এখানে রানীরা স্নান করতেন ? আর এখনকার রাজা, একটা সামান্য একতলা বাড়ির বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছেন ! এই সব ভাবতে ভাবতে, দেখতে দেখতে সাপটার কথা ও ভুলেই গেল।

হাওয়া মহলের কাছ থেকে, দুর্গের গড়খাইয়ের নীচের জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে। গোগোল সেদিকে তাকাল। পাহাড়ের ঢালুতে অনেক গাছপালা, অনেক দূরে বনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ওর মনে পড়ে গেল, নাড়ুদা বলেছিল, বিষ্ণুপুরের আর এক নাম বনবিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরটা নাকি গোটাটাই বন ছিল। বন কেটে কেটে বিষ্ণুপুর তৈরী হয়েছে। গড়খাইয়ের সুদূর বন দেখলে সেইরকমই মনে হয়।

গড়াখাইয়ের দিকে দেখতে দেখতে গোগোলের দৃষ্টি হঠাৎ এক জায়গায় আটকিয়ে গেল। দেখল, অনেকটা নীচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে, দুটো মানুষের মধ্যে যেন জাপটা-জাপটি লড়াই হচ্ছে।

গোগোল মাথাটা তুলে ভালো করে দেখল, আর লাল সাদা ফুল ছাপা ফ্রকটা দেখেই চিনতে পারল, সেই মেয়েটাকে। এত নীচুতে, মানুষ বলে

বোঝাই যায় না। খালি গা, হাঁটুর কাছে ময়লা কাপড় তোলা লোকটাকে তো দূর থেকে মানুষ বলে চেনবারই উপায় নেই। মেয়েটার জামা দেখেই গোগোল চিনতে পারল, আর তার জন্যই চোখে পড়ল। নইলে হয় তো চোখেই পড়ত না।

কিন্তু লোকটা মেয়েটাকে কি মারছে? মেয়েটা যেন ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে, আর লোকটা লাফিয়ে তাকে ধরে ফেলছে। গোগোল মেদাকে ডেকে, হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'মেদা, ওখানে, ওই নীচে একবার তাকিয়ে ছাখ্। সেই মেয়েটা আর লোকটা না?'

মেদা ওর জ্বলজ্বলে চোখ ছুটো কুঁচকে তাকাল, অবাক্ হয়ে বলল, 'হিঁ, তাই তো বটে! সেই মেয়েটা আর লোকটাই। মনে হচ্ছে, লোকটা



যেন মেয়েটাকে ধরে পেটাচ্ছে।'

গোগোল বলল, 'তোকে তখনই বলেছিলাম, লোকটাকে আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

মেদা বলল, 'ঠিক বলেছিলি তুই। ওখানে কী একটা হচ্ছে।'

গোগোল বলল, 'চল্ যাই দেখি, কী হচ্ছে।'

মেদা গোগোলের হাত ধরে বলল, 'চল্।'

দুজনে যেতে গিয়েই, গোগোল থমকিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'কিন্তু সাপটা যে পথের ওপর রয়েছে!'

মেদা ভাঙা ইঁটের স্তূপ আর জঙ্গলের আশেপাশে দেখে বলল, 'আচ্ছা, পা টিপে টিপে আয়, দূর থেকে দেখব, জামাটার ভিতরে সাপটা এখনো আছে কী না। মনে হয় পালিয়ে গেইচে।'

দুজনেই খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল জামাটা পড়ে আছে, সাপটাকে দেখা যাচ্ছে না। যেন পাছে সাপটা শুনতে পায়, মেদা সেই রকম ভাবে চুপিচুপি বলল, 'এক দৌড়ে একেবারে রাস্তার ওপরে চলে যাব, কোথাও দাঁড়াব না। খুব জোরে দৌড়াবি।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'আর তোর জামাটা?'

মেদা বলল, 'জামাটা ওখানেই পড়ে থাক। ওটা তো এক বছরের পুরনো জামা। খালি গায়েই চলে যাব। লে—ওয়ান-টু-থ্রি-দৌড়!'

দুজনেই দম বন্ধ করে ছুট দিল, আর একেবারে রাস্তার ধারে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। দুজনেই পিছন ফিরে দেখল, সাপটা তাড়া করছে কী না। কিন্তু সাপটার কোনো কিছুই দেখা গেল না। গোগোল বলল, 'আগে চল্ গড়খাইয়ে কী হচ্ছে, তাই দেখি। সাপটা আর আসবে না।'

খালি গা মেদা গোগোলের হাত ধরে, পাথর দরজার দিকে দৌড় দিল। আশ্চর্য, এদিকটা একদম ফাঁকা, লোকজন নেই। আসলে বেলা বাড়ছে, রোদের তেজ খুব, সেইজন্যই এদিকে এখন লোকজনের আনাগোনা নেই। এখানে মন্দির দুর্গ রাজবাড়ি এসব দেখা ছাড়া, লোকের আসার কোনো দরকার হয় না।

গোগোল মেদার সঙ্গে, পাথর দরজার এক মুখ দিয়ে ঢুকে, অন্য মুখে বেরিয়ে, সামনের উঁচু ঢিবির দিকে উঠতে যাচ্ছিল। মেদা ওর হাত ধরে টেনে বলল, 'আমরা ওদিক দিয়ে যাব না, এই সাঁকোর পাশ দিয়ে নেমে যাব।'

সাঁকো বলতে একটা লম্বা কালভার্ট। রাস্তার দুপাশেই কালভার্ট,

তলা দিয়ে গড়খাইয়ের বর্ষার জল যায়। গোগোলকে মেদাই হাত ধরে গড়খাইয়ের নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করল। রাস্তা বলতে কিছু নেই। লাল কাঁকর পাথরের ঢিবি, আর এবড়োখেবড়ো। চারপাশে ঘন বাবলা গাছের ঝাড়। বাবলা কাঁটায় জামা আটকে যায়। মেদার গায়ে দু-এক জায়গায় আঁচড় লেগে গেল। তার ওপরে ওর আবার খালি পা।

বেশ খানিকটা নীচে নামার পরে, ওরা দুজনেই সেই লোকটাকে দেখতে পেল। লোকটা ওদের দিকে পিছন ফিরেছিল, তাই দেখতে পেল না। ওরা দেখল, লোকটা একটা বড় পাথরের টুকবো দিয়ে, নীচু হয়ে কিসের ওপর মারছে। কিন্তু মেয়েটা কোথায়? গোগোল আর মেদা মেয়েটাকে দেখতে পেল না। ওরা অবাক্ হয়ে দুজনে, দুজনের দিকে তাকাল।

গোগোল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'লোকটা কি করছে?'

মেদাও ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'মেয়েটাকে বোধ হয় মারছে।'

গোগোল যেন বিশ্বাস করতেই পারল না। ওই পাথব দিয়ে, ছোট মেয়েটাকে ওভাবে মারলে তো মরেই যাবে। দুজনেই আব একটু নীচে পা বাড়াল দেখবার জন্য। হঠাৎ নুড়ি পাথরে শব্দ হতেই লোকটা পিছন ফিরে গোগোলদের দিকে তাকাল। গোগোলের বুকটা কেঁপে উঠল। লোকটাকে কী ভীষণ দেখাচ্ছে। তার সেই ভেড়ার লোমের মতো পাঁশুটে চুলগুলো উস্কখুস্ক, সারা মুখ ঘামে ভেজা। চোখ দুটো টকটকে লাল। গর্জন করে বললো, 'কে রে তোবা?'

গোগোল মেদা কোনো জবাব দিল না। ওরা তখন দেখবার চেষ্টা করছিল, মেয়েটা কোথায়? কিন্তু মেদার সাহস বেশী। ও হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি ওখানকে কী করছ? তোমার সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল, ও কোথাকে গেল?'

লোকটা ঠিক গরিলাব মতো লাফ দিয়ে ওদের দিকে ফিরল, গাঁক গাঁক করে বলল, 'কী বললি? সেই মেয়েটা? আমার পিছনে লাগতে এয়েচু? আজ তোদের দুটোকেই যমের বাড়িতে পাঠাব।' বলেই ওপরের দিকে উঠে আসতে লাগল।

মেদা তৎক্ষণাৎ গোগোলের হাত ধরে, ওপরের দিকে উঠতে উঠতে বলল, 'শীগগির চলে আয় গোগোল। ও আমাদের যমের বাড়ি পাঠাবে বলছে।'

গোগোল ছুটে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, 'তার মানে, আমাদের মেরে ফেলবে?'

মেদা বলল, হ্যাঁ।'

ছুজনে উঠতে উঠতে একবার পিছন ফিরে দেখল। লোকটা তার কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে সত্যি উঠে আসছে। গোগোল আর মেদা আরো তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল। বাবলা কাঁটায় গোগোলের জামা ছিঁড়ে গেল, গালে আর পায়ে আঁচড়ে রক্ত বেরিয়ে গেল। মেদার তো কোনো কথাই নেই। ওর গালে পায়ে তো বটেই, বুকে পিঠেও কাঁটার আঁচড় লেগে রক্ত ফুটে উঠেছে। তবু ওরা প্রাণপণে ওপরে উঠে, কালভার্টের সামনে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল।

সর্বনাশ! লোকটা মাথা নীচু করে ঠিক বাঘের মতো ছুটে আসছে। মেদা গোগোলের হাত ধরে বীর দবজার দিকে দৌড় দিল। বীর দরজা পেরিয়ে আবার পিছন ফিরে দেখল। লোকটা তখন কালভার্টের কাছে উঠে এসেছে। কিন্তু দাঁড়াল না, গোগোলদের দিকেই ছুটে আসতে লাগল।

মেদা গোগোলের হাত ধরে এঁকেবেঁকে নানা রাস্তা দিয়ে ছুটে একটা বড় রাস্তার ওপরে উঠে এল। আশেপাশে ছু একটা দোকান, কিছু লোকজনও রয়েছে। সামনেই একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। মোটর গাড়ির এঞ্জিনটা চালু রয়েছে। যাত্রীরা নামছে আর কনডাকটর চিৎকার করে কী বলছে। গোগোলরা শুনতে বা বুঝতে পারল না, কারণ ওরা পিছন ফিরে দেখল, লোকটা তখনো তেমনি ছুটে আসছে। লোকজন থাকলেও, তার ভয় ডর ভ্রূক্ষেপ নেই।

মেদা বলল, 'গোগোল, বাসে উঠে পড়, লোকটার ভাবগতিক আমার ভাল লাগছে না।'

গোগোলও বুঝল, কথাটা মিথ্যা নয়। লোকটা অনেকখানি কাছে এসে পড়েছে। কনডাকটর ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। গোগোল আর মেদা ছুজনেই বাসে উঠে পড়ল। বাসের ভিতরে বেশ ভিড়। মেদা আর গোগোল পিছনের দরজা দিয়ে উঠে, ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। বাসটাও ছেড়ে দিল। ছু একজন বিরক্ত হলেও ছেলেমানুষ দেখেই, গোগোল আর মেদাকে ঠেলাঠেলি করে সামনের দিকে যেতে কেউ বাধা দিল না। একেবারে সামনের দিকে গিয়ে, ওরা ছুজনে পিছন ফিরে দেখল। যাত্রীর ভিড় ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

গোগোল আর মেদা এতক্ষণ পরে যেন একটু নিশ্বাস ফেলতে পারল। বাসটা গোঁ গোঁ করে বেশ জোরে চলেছে। বাসটা কোথায় চলেছে, সেটা এখন ওরা ভাববার সময় পেল না। লোকটার হাত থেকে যে রক্ষা পেয়েছে, তাই ভেবেই ওরা খুশী।

গোগোল নীচু গলায় বলল, 'লোকটা নিশ্চয় বাসে ওঠে নি।'

মেদা বলল, 'বাসে ওঠবার সাহস হবে নাই। আর উঠলেও এত লোকের ভিতরে আমাদের কিছু বলতে পারবে নাই।'

মেদার কথা শেষ হতে না হতেই, বাসের মাঝামাঝি জায়গায় যাত্রীদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি লেগে গেল। তার সঙ্গে হইচই চিৎকার আর ঝগড়াঝাঁটি।

মেদা গোগোলকে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, 'গোগোল, সেই লোকটা রে! বাসে উঠে এসেছে।'

গোগোলের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। দেখল, কুচকুচে খালি গা লোকটা বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করছে। লোকটা ওদের দেখছে না, এখন ঝগড়া করছে। পিছনের দরজার কনডাক্টর, লোকটার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আরে বাবা চোটপাট করছ কেন। কোথায় যাবে বল, প্যাসেঞ্জারদের ঘাড়ের ওপর পড়ছ কেন? দাও, পয়সা দাও, টিকেট দিচ্ছি।'

লোকটা বলল, 'আমি কোথাও যাব নাই।'

লোকটার কথা শুনে অনেকে হাসল, নানা জনে নানা কথা বলল। কিন্তু লোকটা লাল চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঁতিপাতি করে ভিড়ের মধ্যে যেন কিছু খুঁজছে। গোগোল আর মেদার মুখ শুকিয়ে গেল। ওরা লোকজনের পিছনে নিজেদের লুকিয়ে রাখল। লোকটা ওদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছে না। ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে আসবার চেষ্টা করছে। আর ঘটনা দেখে, বাসের সামনে পিছনের ভিড় সবাই লোকটার দিকে দেখছে।

কনডাক্টর লোকটাকে বলল, 'কোথাও যাবে নাই তো বাসে উঠেছ কেন? মিনি মাগনা চড়বার জন্য?'

লোকটা বলল, 'আমি দুটো ছেলেকে খুঁজছি।'

কথাটা শুনেই গোগোল আর মেদার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল।

কনডাক্টর বলল, 'বাসের মধ্যে আবার কেউ ছেলে খুঁজতে আসে নাকি? কার ছেলে? তোমার ছেলে?'

লোকটা কোনো জবাব না দিয়ে, ভিড় ঠেলে সামনে আসবার চেষ্টা করল। কনডাক্টর আবার বলল, 'ছেলেই খোঁজ আর যাই কর, যতদূর পর্যন্ত যাবে, ভাড়া তোমাকে দিতেই হবে।'

এই সময়েই বাসের গতি কমে এল। সামনের দরজার কনডাক্টর চেঁচিয়ে

উঠল, 'বোম্বাই রোডের মোড়, বোম্বাই রোডের মোড়।'

ঘণ্টি বেজে উঠল। বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। মেদা আর একটুও সময় অপেক্ষা না করে, গোগোলের হাত টেনে ধরে দরজার কাছে হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে গেল। কনডাক্টর চেঁচিয়ে বলল, 'এই ছেলে ছুটো, তোমরা কোথায় যাবে? টিকেট কোথায়?'

মেদা কনডাক্টরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে, গোগোলের হাত ধরে, দরজার বাইরে লাফিয়ে পড়ল। বাইরের থেকে যাত্রীরা যারা বাসে উঠতে যাচ্ছিল, ছুজনে তাদের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। সবাই হইচই করে উঠল। কিন্তু মেদা কোনো কথায় কান না দিয়ে, গোগোলের হাত ধরে দৌড়াতে লাগল। বললো, বাসটা সোনামুখী যাচ্ছে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কি তা হলে সোনামুখী যাবে?'

মেদা বলল, 'ও আমাদের পেছনে তাড়া করবে।'

গোগোল পিছন ফিরে দেখল। বাসের সামনের দরজায় একটা ঠেলাঠেলি হইচই লেগে গিয়েছে। দেখা গেল, সেই লোকটা নামবার চেষ্টা করছে। কনডাক্টর তাকে জাপটে ধরেছে।

মেদা বলল, 'এই তালে পালাতে হবে। লোকটার কাছ থেকে ওরা পয়সা আদায় করছে।'

গোগোল দেখল একটা লম্বা চওড়া ফাঁকা রাস্তা অনেক দূর সোজা চলে গিয়েছে। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে অন্যদিকে মুখ করে। ও মেদাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওইটা বম্বে রোড?'

মেদা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা এখন শহরের দিকে যাচ্ছি। বোম্বে রোডটা খড়্গপুরের দিকে চলে গেছে।'

গোগোল দেখল, বাসটা দাঁড়িয়ে আছে, বোম্বে রোড আর অন্য একটা রাস্তার মোড়ে। মেদা আবার বলল, 'বাসটা সোনামুখী যাচ্ছে। সোনামুখীতে আমার মামাবাড়ী।'

গোগোল বলল, 'তা হলে তো আমরা সোনামুখীতে চলে যেতে পারতাম।'

মেদা বলল, 'সোনামুখী তো অনেক দূর, কুড়ি পঁচিশ মাইল হবেক। কনডাক্টর ভাড়া চাইলে কী করে দিতাম?'

ছুজনেই ছুটছে, ছুটতে ছুটতেই কথা হচ্ছে। গোগোল বলল, 'এই তো আমরা নেমে এলাম, কনডাক্টর পয়সা চাইল না তো?'

মেদা বলল, 'এ তো একটুখানি রাস্তা। কনডাক্টর বুঝতেই পারে নি,

আমরা কাদের সঙ্গে এসেছি। ও তো ভেবেছে, আমাদের সঙ্গে বড় কেউ আছে।'

ওরা দুজনেই হেসে উঠল। এই সময়েই বাসটা ছেড়ে যাবার শব্দ পেয়ে, ওরা পিছন ফিরে তাকাল। তাকিয়েই ওদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখল লোকটা ওদের দিকে ছুটে আসছে। গোগোলের মনে হলো, খালি গা কালো কুচকুচে লোকটাকে অবিকল ক্ষ্যাপা ভাল্লুকের মতো দেখাচ্ছে।

এখন রাস্তা একেবারে ফাঁকা। নিরালা ভুতুড়ে দুপুর, রোদে যেন আগুন ঝরছে। রাস্তার পীচ গলছে। সামনেই রাস্তার ধারে কয়েকটা মাটির ঘর দেখা যাচ্ছে। অথচ লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

গোগোল বলল, 'মেদা কী করবি? এই মাটিব ঘবগুলোর কোনটায় ঢুকে পড়লে কেমন হয়?'

মেদা বলল, 'খবরদার। ওখানে ঢুকলে, ও আমাদের ধরে ফেলবে, আর ঠিক যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

'যমের বাড়ি' কথাটা মেদা ঠিক মনে রেখেছে। তার মানেই লোকটা ধরতে পাবলে, দুজনকে মেরে ফেলবে। কিন্তু গোগোল একলা নয়, মেদাও হাঁপিয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড রোদে আব গরমে, দুজনেই দরদব ধারায় ঘামছে। ওদের দম ফুরিয়ে আসছে।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'শহরটা আর কতো দূর?'

মেদা বলল, 'বেশী দূর নাই, সোজা গেলেই শহর মিলবেক। কিন্তু আমবা বাঁ দিকের বাঁদাড়টার পাশ দিয়ে, পাড়াব মধ্যে ঢুকে পড়ব। শহবকে ঢুকতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

গোগোল বাঁ দিকে কোনো বাঁদাড় দেখতে পেল না। একটু দূবে বাঁ দিকে ছোট-খাটো জঙ্গল তার ময়লা জলের কয়েকটা ছোট ছোট ডোবা। ঠিক এ সময়েই ওদের পায়ের কাছে, পাথরের টুকবো ছিটকে এসে পড়ল। গোগোল পিছন ফিবে দেখল। লোকটা ছুটতে ছুটতে বাস্তাব ধার থেকে পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ছে। একটা পাথর যদি মাথায় লাগে, তা হলে আর দেখতে হবে না, খুলি ফাঁক হয়ে যাবে।

এ সময়েই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। রাস্তাব পীচ গলে এত নরম হয়ে গিয়েছে, গোগোলের স্যাণ্ডেল আটকে গিয়ে, রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মেদা দাঁড়িয়ে পড়ল, গোগোলকে দু হাতে টেনে তোলবার চেষ্টা কবল। গোগোল একটু বোকামি করল। ও গলানো পীচে দেবে যাওয়া স্যাণ্ডেলটা টেনে তুলতে গেল। এদিকে লোকটা ওদের একেবারে কাছে এসে পড়ল।

মেদা চিৎকার করে উঠল, 'গোগোল, স্যাণ্ডেল থেকে পাটা খুলে নিয়ে দৌড় দে। স্যাণ্ডেল পড়ে থাক, শয়তানটা এসে গেছে।'

কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। গোগোল স্যাণ্ডেল থেকে পা খুলে নিয়ে, অন্য পায়ের স্যাণ্ডেলটাও ছেড়ে দিয়ে খালি পায়ে দৌড় দিতে গেল। তখনই লোকটা ছোঁ মেরে মেদাকে এক হাতে ধরে ফেলল। মেদা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। লোকটা মেদাকে মাথার ওপর তুলে, আছাড় মারতে গেল। মেদা তৎক্ষণাৎ লোকটার ভেড়ার লোমের মতো চুল, দু হাতের মুঠি দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল।

গোগোলের নিজের এয়ারগানটার কথা মনে পড়ে গেল। এখন এয়ার-গানটা থাকলে, ছররা দিয়ে লোকটার চোখে মুখে মারা যেতো। একটা দুটো ছররা চোখে লাগলে, বাছাধনকে আর দেখতে হতো না। কিন্তু এখন কী করা যায়। লোকটা মেদাকে মাথার ওপরে দু হাতে পিষে মারার চেষ্টা করছে। অথচ হাতের কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে গোগোল লোকটাকে মারতে পারে।

গোগোল অস্থির হয়ে উঠল। এভাবে মেদার কষ্ট দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত ও নিজের কাজ ঠিক করে ফেলল। সাঁ করে দৌড়ে গিয়ে, লোকটার বাঁ পায়ের ডিমে সজোরে দাঁত বসিয়ে কামড়ে দিল। দিতেই লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, আর তার হাত আলগা হতেই, মেদা রাস্তার ওপর পড়ল।

লোকটা 'ওরে রে!' বলে, খপ্ করে গোগোলের চুলের মুঠি টেনে ধরল।

যেমনি ধরা, গোগোল অমনি আর এক কামড় বসিয়ে দিল। যা ও জীবনে কখনো করে নি, এখন প্রাণের দায়ে তাই করছে। ওর দেখাদেখি, মেদাও লোকটার পেট কোমরের পাশে, ওর বড় বড় দাঁতে কামড় বসাল। লোকটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল, 'উঃ, এই খুদেগুলান পাগলা কুকুরের থেকেও সাংঘাতিক!' বলে সে দু হাত দিয়ে মেদাকে ধরতে গেল।

গোগোল সুযোগ বুঝে, দাঁড়িয়ে পড়ে, লোকটার পিঠের শক্ত চামড়ায় কামড় বসিয়ে, নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। পিঠে নতুন কামড়ের যন্ত্রণায়, লোকটা মেদাকে দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে, পিছনে হাত বাড়িয়ে গোগোলকে ধরবার চেষ্টা করল।

এ সময়েই একটা জীপ গাড়িকে শহরের দিক থেকে আসতে দেখা গেল। পড়ে গিয়ে মেদার খুব লেগেছিল, তবু ও চীৎকার করে উঠল, 'পুলিসের গাড়ি আসছে।'

'অ্যাঁ! এই মরেছে!' বলেই লোকটা একটা লাফ মারল। গোগোল ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। লোকটা এগিয়ে আসা জীপটার দিকে তাকিয়েই ডান দিকের জঙ্গলে চোঁ চোঁ দৌড় দিল।

জীপটা হর্ন দিতে দিতে সামনে এসে পড়ল। গোগোল আর মেদা হাত তুলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। জীপটাও দাঁড়াল। দেখা গেল, জীপটা পুলিসের নয়। ভিতরে ড্রাইভারের পাশে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তিনি মুখ বাড়িয়ে গোগোল আর মেদাকে দেখলেন। মেদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই খোকা, তুমি বোল্‌তলায় থাকো না?'

মেদা বলল, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক আবার বললেন, 'তুমি তো আমাদের ডাক্তারবাবু গিরীন চ্যাটার্জির ভাইপো। আমি তোমাকে চিনি।'

মেদা বলল, 'আমিও আপনাকে চিনি। আপনি তো গঙ্গাধরবাবু, আপনাদের রেশমের গদি আছে।'

গোগোল অবাক্ হয়ে ওসব কথাবার্তা শুনছিল। গঙ্গাধরবাবু বললেন, 'ঠিকই বলেছ। কিন্তু তোমরা এই ভর দুপুরে এখানে কী করছ? ওই লোকটাই বা কে? ওই যে ওদিকে ছুটে পালিয়ে গেল?' বলতে বলতে দশাসই চেহারার ভদ্রলোক জীপ গাড়ি থেকে নেমে মেদা আর গোগোলের কাছে এগিয়ে গেলেন।

গোগোল ডান দিকে তাকিয়ে দেখল। দূরের গাছপালা জঙ্গলে লোকটাকে আর দেখা গেল না।

মেদা বলল, 'লোকটা আমাদের ধরে পিটাই করছিল।'

গঙ্গাধরবাবুর কপালে অনেকগুলো রেখা ফুটে উঠল। তিনি যেন রেগে অবাক চোখে ডান দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, 'তোমাদের পিটাই করছিল? কে লোকটা? কেন তোমাদের মারছিল?···আরে, এ কি! তোমাদের দুজনের ঠোঁটের কষেই যে রক্ত লেগে আছে।'

মেদা বলল, 'ওই লোকটা আমাদের মুখে মারছিল।'

আসলে লোকটার গায়ে খুব জোরে কামড়াতে গিয়েই, দুজনের মাড়ি থেকে রক্ত বেরিয়েছে।

গঙ্গাধরবাবু গোগোলকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে?'

মেদা বলল, 'এ আমার মাসতুতো ভাই গোগোল, কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে।'

গোগোল দেখল, গঙ্গাধরবাবুর ফিনফিনে সাদা ধুতিটা যেন ঠিক

বাঙালীদের মতো কোঁচা দিয়ে পরা নয়। এক ধরনের মালকোঁচা দিয়ে পরা। গায়ে দুধ গরদের পাঞ্জাবি, বোতাম পটিতে বোতামের ঝিলিক দেখে, ওগুলোকে হীরে বলেই মনে হয়। তাঁর বাঙলা কথায়ও কেমন একটা টান, ঠিক বিষ্ণুপুরী নয়। তিনি বললেন, 'এসো, তোমরা আগে গাড়িতে ওঠ, তোমাদের আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। এত বেলায় ডাক্তারবাবু এখন আর ডিসপেন-সারিতে নেই। যেতে যেতে লোকটার কথা শুনবো।'

গঙ্গাধরবাবু গোগোল আর মেদার হাত ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে, ঠেলে পিছনে ঢুকিয়ে দিলেন। পিছনেও গদি আঁটা আসন ছিল। পিছনটা ঢাকাও ছিল, ধুলো ঢোকবার কোনো উপায় ছিল না। গঙ্গাধরবাবু ড্রাইভারের পাশের আসনে বসে, আগেই ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললেন। তারপরে পিছন ফিরে মেদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটা কে, তুমি চেন?'

মেদা বলল, 'না আমি চিনি নাই।'

গঙ্গাধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী ঘটেছিল?'

গাড়ি তখন শহরের দিকে চলতে আরম্ভ করেছে। মেদা সংক্ষেপে, দুর্গের গড়খাইয়ের ঘটনাটা বলল। সেই মেয়েটার কথাও বলতে ভুলল না। শুনতে শুনতে গঙ্গাধরবাবুর মুখটা কেমন গম্ভীর আর থমথমিয়ে উঠল। আপন মনেই বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগলেন।

জীপ গাড়িটা বাড়ির গলির মধ্যে ঢুকল। গোগোল আর মেদা পিছন থেকেই দেখতে পেল, বাড়ির সামনে রীতিমতো জটলা। মা মাসীমারা সবাই বাড়ির বাইরে। সকলের চোখে মুখেই দুশ্চিন্তা। আশেপাশের বাড়ির অনেকেও বেরিয়ে এসেছেন।

গোগোলের বুঝতে বাকী রইল না, ব্যাপারটা কী? ও গঙ্গাধরবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা বেজেছে?'

গঙ্গাধরবাবু পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে, কবজির ঘড়ি দেখে বললেন, 'দুটো বেজেছে।'

দুটো! মেদা আর গোগোল বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বেলা ন'টায়। এতক্ষণ সময় কী করে, কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে, ওরা কিছুই বুঝতে পারে নি! জীপটা বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই, গোগোলের মা ছাড়া, আর সব মহিলারাই মাথার ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিলেন। এখানকার নিয়মকানুন এইরকমই।

নাড়ুদা কোথায় ছিল। ছুটতে ছুটতে এসে, জীপের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'গঙ্গাধরবাবু আপনি? আপনি কি বাবার কাছে এসেছেন?'

গঙ্গাধরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার বাবা কোথায় ?'

নাড়ুদার চেহারাটা ঘামে আর ধূলোয় ছন্নছাড়া কাহিল দেখাচ্ছে। উত্তেজনায় আর ভয়ে যেন নাড়ুদার গলায় কান্না ফুটে উঠল। বলল, 'গঙ্গাধরবাবু, আমাদের খুবই বিপদ ! বাবা এখন কোনো রোগী দেখতে যেতে পারবেন না।'

গঙ্গাধরবাবু ব্যাপাবটা খানিক আঁচ করতে পেরে জিজ্ঞেস কবলেন, 'কেন, তোমার বাবা কোথায় গেছেন ? কী বিপদ তোমাদের ?'

নাড়ুদা বলল, 'আমার এক মাসতুতো ভাই কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে। সে আমার খুড়তুতো ভাই মেদার সঙ্গে কোথায় গেছে সেই সকাল ন'টায়। এখনো ফেরে নি। বাবা গেছেন থানায়, এতক্ষণ বোধ হয় সাবা বিষ্ণুপুর শহর তোলপাড় করে ফেলছেন।

মেদা গোগোলকে ফিসফিস কবে বলল, 'আজ কপালে পিটুনি আছে।'

গঙ্গধরবাবু গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, 'আর শহর তোলপাড় কবতে হবে না। তুমি থানায় গিয়ে, তোমার বাবা আব দারোগাবাবুকে খবব দাও, আমি তোমার ভাইদের নিয়ে এসেছি।'

গঙ্গাধরবাবুর বিরাট শরীরটা সরে যেতেই, তাঁর আড়াল থেকে গোগোল আর মেদাকে দেখা গেল। নাড়ুদাই প্রথম চিৎকাব করে উঠল, 'ওই তো গোগোল আর মেদা।'

গোগোল আব মেদা গাড়ি থেকে নেমে আসতেই মেদাব মা তাকে ছো মেরে টেনে নিয়ে দু চাব ঘা বসিয়ে দিলেন। ঘোমটার আড়াল থেকে বললেন, 'পাজী ছুঁচো ছেলে, গোগোলকে নিয়ে কোথাকে গিয়েছিলি তুই ?'

মা গম্ভীব স্বরে ডাকলেন, 'গোগোল এদিকে এসো।'

গোগোল মায়ের দিকে এগিয়ে গেল। গঙ্গাধববাবু হাত জোড় কবে বললেন, 'দেখুন মা, আপনাদের আমি হাত জোড় করে বলছি, ওদের গায়ে আপনারা আর হাত তুলবেন না। ওদের একটা লোক এত মেবেছে, আমি না গিয়ে পড়লে বোধ হয় বাচ্ছা দুটোকে মেবেই ফেলতো। দেখুন, ওদেব ঠোঁটের কষে এখনো রক্ত লেগে আছে।'

সকলেরই চোখ পড়ল গোগোল আর মেদার ঠোঁটেব দিকে। সত্যি সেখানে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। ভয়ে আর রোদে পুড়ে, ওদের দুজনেব চেহাবাই বদলিয়ে গিয়েছে। মা গোগোলের দিকে তাকিয়ে, ওর চিবুক তুলে দেখলেন। তাঁর চোখমুখের রাগে থমথমানো ভাব অনেকটা নরম হয়ে গেল। মেদার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'মেদা, তোর গায়ের জামা কোথাকে গেল ?'

মেদা ঢোঁক গিলে বলল, 'সেই লোকটা আমার জামা টেনে ছিঁড়ে খুলে নিয়েছে!'

গোগোল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল, মেদা সাপের ব্যাপারটা চেপে গেল। তার মানে, ওকেও চাপতে হবে। তা ছাড়া এখন উপায় নেই। এই ঘটনার পরে এখন যদি সেই গোখরো সাপের ঘটনা সবাই শোনে, তা হলে ওদের দুজনের ওপরেই সবাই রেগে যাবে।

মা গোগোলের জামা প্যান্টের দিকে তাকালেন। নাড়ুদার জ্যাঠামশাই বললেন, 'তোমরা ছেলে দুটোকে নিয়ে বাড়ির ভিত্রে চল। ব্যাপার কী ঘটেছে সব শোনা যাক।'

গঙ্গাধরবাবু বললেন, 'নাড়ু, তুমি আমার সঙ্গে থানায় চল, তোমাকে থানায় নামিয়ে দিয়ে আমি সোনামুখীতে যাব।'

গঙ্গাধরবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল, আর একটা জীপ গাড়ি গলির মধ্যে ঢুকছে। আর তার আগে আগে, নাড়ুদার জ্যাঠতুতো দাদা কুড়োদা ছুটতে ছুটতে আসছে। চিৎকার করে বলছে, 'দারোগাবাবু আর কাকা এসে পড়েছেন।'

গোগোল দেখল, সেজো মেসোমশাই আগে জীপ থেকে নামলেন। তাঁর পিছনে পিছনে থানার অফিসার ইন-চার্জ। সেজো মেসোমশাই প্রথমেই এসে গোগোলের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারা ঘামে ভেজা উস্কখুস্ক। গোগোলের মাকে বললেন, 'আমি থানার অফিসারের সঙ্গে বোম্বে-রোডের দিকে যাচ্ছিলাম। বাজাবের কাছে খবর পেলাম, ছেলেরা নাকি বাড়ি ফিরেছে।'

নাড়ুদা বলল, 'বাবা, গঙ্গাধরবাবু ওদের বোম্বে রোডের কাছ থেকেই তুলে নিয়ে এসেছেন।'

সেজো মেসোমশাই ছুটে গঙ্গাধরবাবুর কাছে এলেন। গঙ্গাধরবাবু বললেন, কিছু ভাববেন না ডাক্তারবাবু। থানার বড়বাবুও এসেছেন। আপনারা বাড়ির ভেতরে গিয়ে ছেলেদের কাছ থেকে সব শুনুন, তা হলেই সব বুঝতে পারবেন। আমার মনে হচ্ছে, কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটেছে।'

সেজো মেসোমশাই সামনের ভিড় সরিয়ে দিয়ে, সবাইকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন। সেজো মাসীদের লম্বা দালানেই কয়েকটা চেয়ার আর টুল ছিল। সেখানে এসে সবাই বসলেন। নাড়ুদার জ্যাঠামশাই, সেজো মেসোমশাই, মেদার বাবা, থানার অফিসার-ইন-চার্জ। তার মধ্যেই সেজো মাসী বলে উঠলেন, 'ছেলে দুটোকে এবার ছেড়ে না দিলে, ওরা কখন স্নান

খাওয়া দাওয়া করবে ?'

থানার অফিসার-ইন-চার্জ, মানে বড়বাবু সেজো মাসীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ছেলেরা এখুনিই স্নান করে খেতে যাবে। তার আগে ওদের মুখ থেকে আমি ঘটনাটা একটু শুনে নিতে চাই। কারণ শুনলাম, কে একটা লোক নাকি ওদের মারধোব করছিল। ওদের কাছ থেকে কিছু শুনলে, আমার এখনই তদন্ত করাব সুবিধা হবে।'

সেজো মেসোমশাই বললেন, 'বড়বাবু ঠিকই বলেছেন। ঘটনা যখন একটা ঘটেই গেছে, তখন আজ না হয় ওদের খেতে একটু বেলাই হবে।'

তবু সেজো মাসী গোগোলকে আর মেদাকে দুটো কলাকাঁদ আব জল খাইয়ে দিলেন। তারপরে বড়বাবুর কথার জবাবে, দুজনেই গড়খাইয়েব ঘটনাটা সব বলল। কেবল সাপের ঘটনাটা ছাড়া।

ঘটনা শুনতে শুনতে বড়বাবু এবং সকলের মুখই গম্ভীর হয়ে উঠল। বড়বাবু জিজ্ঞেস কবলেন, 'গড়খাইয়ে নেমে, তোমরা আব সেই মেয়েটিকে দেখতে পাও নি ?'

দুজনেই মাথা নাড়ল। গোগোল বলল, 'তবে সেই লোকটা পাথব দিয়ে নীচে মাবছিল। সেখানটা আমবা দেখতে পাই নি।'

বড়বাবু বললেন, 'আমি এখুনি লোকজন নিয়ে গড়খাইয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, সেই লোকটাকে দেখতে কেমন ?

মেদা বলল, 'কালো কুচকুচে যণ্ডাদেব মতন।'

গোগোল বলল, 'আব তাব মাথাব চুলগুলো ভেড়াব লোমেব মতো, বও পাঁশুটে।'

বড়বাবু বললেন, 'গুড। লোকটাকে চেনবাব মতো আব কিছু তোমাদেব মনে আছে ?'

গোগোল আব মেদা হঠাৎ কিছু বলতে পাবল না। একটু পবেই গোগোল বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, লোকটার পায়ের ডিমে, আব পেট কোমবেব কাছে কামড়ের দাগ আছে।'

বড়বাবু অবাক্ হয়ে বললেন, 'কামড়ের দাগ ? কে কামড়ালে ?'

মেদা ওর বড় বড় দাঁতে হেসে বলল, 'আমি আর গোগোল। না কামড়ালে লোকটা আমাদের মেরেই ফেলতো।'

বড়বাবু অবাক্ হতে গিয়ে হেসে ফেললেন। হেসে ফেললেন, বড়দের প্রায় সকলেই। সেজো মেসোমশাই বললেন, 'যাক, আসামীকে ওরা দাগী করে দিয়েছে, সে আর পালাতে পারবে না।'

বড়বাবু বললেন, 'ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু, এটা আমাদের পক্ষে একটা খুব বড় প্রমাণ। এতে হয় তো লোকটাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে। আমি এখন যাচ্ছি, ঘটনাটার কতদূর কী জানা যায় দেখি।' তিনি উঠে বিদায় নিলেন।

বিকাল হয়ে গেলেও গোগোলের আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবার অনুমতি ছিল না। বাড়ির উঠোনে, বাঁধানো দাওয়ার ওপর, নাড়ুদার কাছে বসে, গোগোল আর মেদা ও-বেলার ঘটনাই বলছিল। সেজো মেসোমশাই তাঁর ডিসপেনসারিতে চলে গিয়েছেন। মা আর মাসীমায়েরা ঘরের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন।

এই সময়েই বাইরের গলিতে একটা জীপ গাড়ির গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে, অনেকের হইচই শোনা গেল। মনে হলো জীপটা এ বাড়ির সামনেই দাঁড়ালো। তারপরেই সেজো মেসোমশাই ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। বললেন, 'এই যে গোগোল, তুমি এখানে রয়েছো? মেদাও আছিস? তোরা একবার থানায় চল। সেই লোকটাকে বোধহয় পাওয়া গেছে। তোরা দুজনে একবার চল, চিনতে পারিস কী না দেখবি।'

সেজো মেসোমশাইয়ের গলা শুনে, মা সেজো মাসী, সবাই বেরিয়ে এলেন। সেজো মেসোমশাই তাঁদের কথাটা বুঝিয়ে বললেন, 'কিছু ভেবো না, ওদের আমি নিয়ে যাচ্ছি, আমিই আবার নিয়ে আসব।' বলে তিনি নাড়ুদাকে বললেন, 'নাড়ু, ভাইদের সঙ্গে তুইও চল।'

সেজো মেসোমশাই থানার জীপগাড়িতে চেপেই এসেছেন। সবাইকে নিয়ে থানায় চললেন। জীপের পিছনে পিছনে অনেক ছেলে বুড়ো ছুটল। থানার সামনে এসে দেখা গেল, সেখানে বিরাট ভিড়। সেপাইরা ভিড় হটাতে ব্যস্ত। সেজো মেসোমশাই সেই ভিড়ের মধ্য দিয়েই, সেপাইদের সাহায্যে গোগোল আর মেদাকে নিয়ে থানার অফিসে ঢুকল। অফিসে ঢুকতেই দেখা গেল, চারজন লোকের কোমরে মোটা দড়ি বাঁধা, এক পাশে বসে আছে। সেই চারজনের মধ্যে একজনকে দেখেই গোগোল আর মেদা চিৎকার করে উঠল, 'ওই তো সেই লোকটা, ওই তো?'

লোকটাও তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠে, হাত বাড়িয়ে গোগোল আর মেদাকে ধরতে এল। তার আগেই বড়বাবু লোকটার চোয়ালে একটা ঘুষি কষিয়ে দিলেন, গর্জন করে বললেন, 'খবরদার, গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব আমি।' বলেই তিনি কোমরে খাপে ঢাকা রিভলবারে হাত দিলেন।

তাঁর চিৎকারে দু তিনজন সেপাই ছুটে এসে, লোকটাকে কাবু করে,

আলাদা এক পাশে সরিয়ে বসিয়ে দিল। বড়বাবু সেজো মেসোমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আমিও অনুমান করেছিলাম, এই হলো আসল কালপ্রিট। দেখলাম ওর তিন জায়গায় দাঁত বসানো কামড়ের দাগ। বাঁ পায়ের ডিমে, পেট কোমরের পাশে, আর পিঠের পেছন দিকে। গোগোল আর মাধব (মেদা) খুবই মোক্ষম ভাবে শয়তানটাকে কামড়েছে।'

সেজো মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে ধরলেন ?'

বড়বাবু বললেন, 'আমাদের একজন গুপ্তচরের মুখে শুনলাম, শ্মশানের পেছনের জঙ্গলে একটা লোক শুয়ে আছে। গিয়ে দেখি, ওই শ্রীমান। মনে করেছিল, আমরা ওকে খুঁজে পাবো না।' বলে তিনি গোগোল আর মেদার দিকে ফিরে বললেন, 'আর একটা কাজ বাকী আছে। সেটা মিলে গেলেই বুঝতে হবে, তোমরা দুজনে একটা সাংঘাতিক খুনীর সন্ধান আমাদের দিয়েছ। এসো, পাশের ঘরে এসো।'

বড়বাবু গোগোল আর মেদাকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। দরজায় একজন সেপাই। একটি মাঝবয়সী বউ ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদছে। ঘরের এক পাশে কাপড় ঢাকা দেওয়া কী যেন রয়েছে। বড়বাবু সেদিকে এগিয়ে গিয়ে, কাপড়ের ঢাকনাটা খুলে ফেলে বললেন, দেখ তো, একে তোমরা চিনতে পাবো কী না ?'

গোগোল আর মেদা দেখল, সেই লাল সাদা ফুল ছাপা ফ্রক গায়ে মেয়েটা চোখ বুজে শুয়ে আছে। কিন্তু ওর মুখের নানা জায়গায় রক্ত লেগে আছে। গোগোল আর মেদা একই সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এই তো সেই মেয়েটা, 'ওই লোকটা একে নিয়েই গড়খাইয়ে নেমেছিল।'

বড়বাবু বললেন, 'যাক, আর কোন সন্দেহ নেই।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'ওর কী হয়েছে ?'

বড়বাবু বললেন, 'ওই লোকটা এই মেয়েটাকে গড়খাইয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে।'

সবাই শিউরে উঠল। গোগোল মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। বড়বাবু কাপড় দিয়ে মেয়েটাকে ঢাকা দিয়ে দিলেন, বললেন, 'আর তোমাদের জন্যই ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেল। হয় তো আমরা কোনদিন কিছু জানতেই পারতাম না, গড়খাইয়ে শকুন নেমে মেয়েটাকে খেয়েই ফেলতো।'

গোগোল আর মেদার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মেদা বলল, 'বড়বাবু, গোগোলই প্রথম বলেছিল, লোকটাকে ওর মোটেই ভালো লাগছে না। ওই

প্রথম দেখেছিল, লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে গড়খাইয়ে নামছে। আমি বুঝতেই পারি নাই।'

বড়বাবু গোগোলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সত্যি!'

গোগোলের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, জিজ্ঞেস করল, 'কেন লোকটা মেয়েটাকে মেরেছে?'

বড়বাবু কিছু বলবার আগেই, সেই মাঝবয়সী বউটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'অ গ, আমার বড় সাধ হইছিল, মেয়েকে সোনার কানের ফুল গড়িয়ে দেব। তাই দিইছিলাম। আর ওই সব্বোনেশে রাক্ষসটা সেই কানের সোনার ফুলের জন্য আমার মেয়েটাকে গড়খাইয়ে লিয়ে যেয়ে মেরে ফেলছে গ!'

সেজো মেসোমশাই গোগোলকে আর মেদাকে নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বড়বাবু বললেন, 'খবরটা আমরা ওপরওয়ালাদেব পাঠাবো, হয় তো সরকার থেকে তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। তার চেয়েও ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করবেন বেশী।'

গোগোল আর মেদার খবরটা গোটা শহরে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই ওদের দেখবার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠল। উঁচু থানার বারান্দায় ওরা দাঁড়াল, আর সবাই ওদের হাততালি দিয়ে সংবর্ধনা জানাল।

গোগোল আর মেদার ভারী লজ্জাই করছিল। ওরা তো আসলে কোনো অপরাধের ঘটনা দেখতে যায় নি, অপরাধীকে ধরতেও যায় নি। ঘটনাটা আপনি আপনি ঘটে গিয়েছে, সেটাই ওদের ভাগ্য।

কিন্তু গোগোলের মা মনে মনে কী বলছেন, বলো তো? তিনি তখন মনে মনে বলছেন, 'এমন ছেলেকে নিয়ে আর কোথাও কখনো বেড়াতে যাবে না।'

গোগোলও কিন্তু মনে মনে জানে, মা খুবই রেগে গিয়েছেন। অথচ, ওরই বা কী করার ছিল, তোমরাই বলো।

পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে



গোগোল কয়েক দিন জ্বরে বিছানায় শুয়েছিল। জ্বর সেরে যাবার পরেও, ও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখন ওর স্কুল যাওয়া বন্ধ। গ্রীষ্মের ছুটির পরে, মাত্র দশ দিন আগে স্কুল খুলেছে। চার দিন যেতে না যেতেই জ্বর।

এ সময়টা গোগোলকে সাবধানে থাকতে হয়। খেলাধুলো করতে গিয়ে, গায়ে ঘাম বসে, অল্পেতেই ওর ঠাণ্ডা লেগে যায়। আজকাল ওকে একটি ক্লাবের 'সি' গ্রুপে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের মাঠেও নিয়মিত খেলা হয়। কিন্তু গোগোলের বাবা স্কুলের খেলার শিক্ষার থেকে, একটি নাম করা ক্লাবেই ওকে ভর্তি করে দিয়েছেন। বাবা যে ঠিক কাজই করেছেন, গোগোল তা ক্লাবে খেলা শিখতে গিয়েই বুঝেছে। ক্লাবের নানা খেলার জন্য আছেন আলাদা শিক্ষক। খেলার ব্যাপারে যাঁদের বলা হয় 'কোচ'। গোগোলের অবশ্য ক্রিকেটের দিকেই ঝোঁক বেশী। টেনিসের দিকেও ওর টান কম নেই। আর ফুটবলে আছে একটা উত্তেজনা।

গোগোলকে বয়স অনুযায়ী 'সি' গ্রুপে ভর্তি করা হয়েছে। সাধারণতঃ ও শনিবার আর রবিবার ক্লাবে যায়। অন্যান্য ছুটির দিনেও যায়। বাকি দিনগুলো ও সুমিত, পারভেজ, জর্জ, এদের সঙ্গেই নীচে খেলা করে। গ্রীষ্মের

সময় ক্লাবে যখন খেলা শিখতে যায়, তখন একাধিক জামা বদলানর ব্যবস্থা আছে। আর তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে দেবার লোকও আছে। কিন্তু বাড়িতে-ফ্ল্যাট বাড়ির নীচে যখন খেলতে যায়, তখন জামা বদলান, ঘাম মোছা তো হয়ই না। উপরন্তু গোগোল, জলতেষ্টা পেলেই, তাড়াতাড়ি লিফ্‌টে উঠে, খাবার ঘরে ঢুকে, রেফ্রিজারেটর থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে গলায় ঢালে। রেফ্রিজারেটরের জল খাওয়া ওর এমনিতেই বারণ। তার ওপর খেলতে খেলতে ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা জল খাওয়া ওর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। জ্বরও হয়েছিল ওর সেই কারণেই। মা বা কাজের লোক বঙ্কিমদার সামনে ও রেফ্রিজারেটর থেকে জল বের করে খায় না। জানে খেতে গেলেই বকুনি খাবে, বাধাও পাবে। তাই ওকে লুকিয়েই ঠাণ্ডা জল খেতে হয়। আসলে ও ঠাণ্ডা জল খেতে ভালবাসে।

জ্বরে ভুগে ওঠার পর, দুর্বল শরীর নিয়ে গোগোল এখনও লেখাপড়া নিয়ে তেমন বসতে পারছে না। ডাক্তার বলেছেন, সাত দিন ওকে বিশ্রাম নিতেই হবে। খেলাধুলোও বারণ। অবশ্য দুর্বল শরীর নিয়ে গোগোলের পক্ষে খেলা সম্ভবও নয় তবে সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকা অসম্ভব। ওদের পাঁচতলা ফ্ল্যাটে, দুটো ব্যালকনি আছে। বড় ব্যালকনিটা দক্ষিণ দিকে। সেখানে বসলে, নীচের খেলাধুলো দেখা যায়। আর পশ্চিম দিকেও একটা ছোট ব্যালকনি আছে। গোগোল সকালের দিকে পশ্চিমের ব্যালকনিতে বসে বই পড়ে। বই পড়তে যখন ভাল না লাগে, তখন বাইরের বাড়িঘর রাস্তাঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকে বিকেলে, পশ্চিমের ব্যালকনিতে রোদ থাকে। তখন ওখানে বসা যায় না। ও বসতেও চায় না। বিকেলে দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসে বন্ধুদের খেলা দেখে।

গোগোলদের দশতলা ফ্ল্যাট বাড়ির পশ্চিমে, কাছে পিঠে কোন উঁচু বাড়ি নেই। বেশির ভাগ বাড়িই দোতলা, তিনতলা। চারতলাও আছে। বাড়িগুলো একটু ছাড়া ছাড়া। আর সব বাড়ির সামনেই ছোট বড় বাগান আছে। বেশির ভাগ বাড়িগুলোকেই কেমন নির্জন লাগে। জানালা দরজা বিশেষ খোলা দেখা যায় না। যে দু-একটা রাস্তা দেখা যায়, তার কোনটাই বিশেষ চওড়া নয়। লোকজনের ভিড়ও নেই। মাঝে মাঝে রকমারি গাড়ি চলতে দেখা যায়। তবে সব বাড়ির ছাদেই ছোট বড় নানা আকারের টেলিভিশনের এ্যাণ্টেনা আছে। গোগোল অনেকদিনই পশ্চিমের এ অঞ্চলটা দেখেছে। এখন অসুখ করে, চেয়ারে বসে বসে আরও বেশী করে দেখছে। পাড়াটা যে বড়লোকদের, বাড়িগুলোর চেহারা দেখলেই

বোঝা যায়।

গোগোল পাঁচতলা থেকে পশ্চিমের খুব সামনের কয়েকটা বাড়ির একতলা দোতলার সবই প্রায় দেখতে পায়। সকালের দিকে বাড়িগুলোর লোকজনকে একটু ব্যস্ত মনে হয়। ছু চারটি ছোট ছেলে মেয়েকেও দেখা যায়। তাদের নিয়ে মহিলারা গাড়ি চেপে স্কুলে নিয়ে যান। ভদ্রলোকেরাও সব কাজে বেরিয়ে যান। তারপরে মহিলারা কেউ ফেরেন। কেউ ফেরেন না। সবই কেমন ফাঁকা হয়ে যায়। কেবল বাগানের মালীদের একটু বেলা অবধি কাজ করতে দেখা যায়। কখনো সখনো হয় তো ছু একজন কাজের মেয়ে পুরুষকে দেখা যায়, বাড়ির ভেতর থেকে বেরোতে বা ঢুকতে।

ছু-দিন বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে, পশ্চিমের নিরিবিলি পাড়াটার দিকে দেখতে দেখতে, উত্তর দিকের একটা বাড়ির দিকে গোগোলেব নজরটা কেমন আটকে গেল। দোতলা বাড়িটা, উত্তর দিকেব একটেরেতে। অথচ বাড়িটার উত্তর দিকটা মোটে দেখাই যায় না। পূব দিকের সবটাই প্রায় দেখা যায়। পূবে পশ্চিমে লম্বা বাড়িটার, দক্ষিণ দিকের বারান্দা বেশ চওড়া। পূব দিকে দোতলায় ছুটো ছোট ছোট ব্যালকনি। কিন্তু ব্যাল-কনির দরজা ছুটো যেমন প্রায় কোন সময়েই খোলা দেখা যায় না, তেমনি চারটি জানালাও খোলা হয় না। ছুটো জানালায় এয়ারকুলার মেসিন বসানো আছে। সেগুলো চলে কি না, গোগোল তা বুঝতে পাবে না।

বাড়িটা যে'বড়লোকের বাড়ি, তা দেখলেই বোঝা যায়। দক্ষিণের লম্বা আর চওড়া বারান্দাটা খুব সুন্দর। মাঝামাঝি সামনের দিকটা অনেকখানি বেশী চওড়া। সেখানে রয়েছে রঙ করা মোটা বেতের বেশ কিছু চেয়ার। মাঝখানের নীচু টেবিলটা যে কাঁচের, গোগোল তাও স্পষ্ট দেখতে পায়। এমন কি, কাঁচের টেবিলের ওপরে কাট গ্লাসের ছুটো ঝকঝকে ছাইদানিও চোখে পড়ে। আর রেলিং যে কেবল চকচকে কাঠের, তা নয়। কাঠের রেলিংয়ের মাঝখানে প্রায় এক ফুট চওড়া কাঁচ দিয়ে ঘেরা। ওরকম রেলিং গোগোল আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। তাছাড়া বারান্দার সিলিংয়ে ঝুলছে বেশ কয়েকটা ফ্যান।

বাড়িটার দক্ষিণে বাগান। বাগানে বেশ কিছু বড় বড় গাছ রয়েছে। সেই বড় গাছগুলো থাকায়, বাগানটাকে কেমন ঝোপঝাড়ে ছায়ায় ঢাকা মনে হয়। গোগোল ওই বাগানে কোন মালীকে কাজ করতে দেখতে পায় না। বড় বড় ঘাসে ঢাকা বাগানে কোন ফুল গাছ চোখে পড়ে না।

বাগানের পুব দিকে, গোগোলের মুখোমুখি একটা বড় গেট আছে। গেটটা কোন সময়েই খোলে না। দেখলেই বোঝা যায়, বড় লোহার গেটে জং ধরেছে। তার মানে, গেটটা অনেককাল খোলা হয় নি। বাগানেও লোকজন চোখে পড়ে না। তবে উত্তর দিকে একটা বড় গেট আছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সেই গেটটা দেখা যায়। বেশীর ভাগ সময় সেই গেটের একটা পাল্লা খোলা থাকে। হঠাৎ হঠাৎ কোন গাড়ি এলে, আর একটা পাল্লা খুলে যায়। নিশ্চয়ই গেটে দারোয়ান আছে। নইলে কে গেট খুলে দেবে? কিন্তু গোগোল দারোয়ানকে দেখতে পায় না। না পাবার কারণ, গাছের আড়াল। অথচ গেটের ধারে, পাঁচিলের গায়ে শ্বেত পাথরের ওপর কালো রঙের ইংরেজিতে 'তু' নম্বরটা স্পষ্টই পড়া যায়। ওটা যে বাড়িটারই নম্বর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরো একটা ব্যাপার হল, সেই গেটের সামনে পাঁচিল এত উঁচু, ভেতরের চত্বরটা খুব অল্পই দেখা যায়। সেটুকুও দেখা যেত না, যদি না গোগোল পাঁচতলার ওপর থেকে দেখত। চত্বরের যে অংশটা ওর চোখে পড়ে, সেদিকে কয়েকটা গ্যারেজ ঘর আছে।

গোগোল সকালের দিকে জলখাবার আর ওষুধ খেয়ে, পশ্চিমের ব্যালকনিতে বসতে যায়। মা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। কারণ জ্বরটা ছাড়লেও, বাইরের হাওয়া লেগে আবার শরীর খারাপ করতে পারে। কিন্তু গোগোল সকালবেলা আবার ঘরের মধ্যে বিছানায় গিয়ে শুতে রাজি হয় নি। তা ছাড়া, ডাক্তারবাবুও বলেছেন, 'বৃষ্টি না হলে, বাইরের হাওয়াকে এখন ভয় নেই। তবে গোগোল যেন একটা মোটা ফুলহাতা জামা গায়ে দিয়ে বাইরে বসে। আর পা জোড়া যেন খালি না থাকে।'

ডাক্তারবাবুর কথা শোনার পরে মা ব্যালকনিতে বসতে দিতে রাজি হয়েছেন। বঙ্কিমদা খাবার ঘর থেকে একটা চেয়ার পেতে দিয়েছে রেলিং থেকে একটু দূরে সরিয়ে। গোগোল চেয়ারটা রেলিংয়ের কাছে টেনে নিয়ে যায়। তবে দেওয়াল ঘেঁষে, একটু কোণ নিয়ে বসে। গল্পের বই নিয়ে বসলেও, লোকজন গাড়ি দেখলেই, সেদিকেই ওর চোখ চলে যায়। পাঁচ নম্বর বাড়িটা ছাড়া অন্যান্য বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাবার সময় দেখা যায়। তবে তারা কেউ গোগোলের বয়সী নয়। সবাই ওর থেকে ছোট।

গোগোল মনে মনে অবাক হয়। কাছের বাড়িগুলোতে, একজনও ওর বয়সী ছেলে নেই কেন? তারা কি কেউ কলকাতায় পড়ে না? সব দার্জিলিং বা নৈনিতালে পড়ে? গোগোল জানে, অনেক বাড়ির ছেলে

মেয়েরাই, কলকাতার বাইরে থেকে পড়ে।

গোগোলের দু'দিন কেটে গেল, এইরকম বই পড়ে আর বাইরের দিকে তাকিয়ে। বিকেলে তো দক্ষিণের বড় ব্যালকনিতে বসে, নীচে বন্ধুদের খেলা দেখে। বন্ধুরা ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে। গোগোলও হেসে হাত নাড়ে। এরকম দুদিন কেটে যাবার পরে, তৃতীয় দিনের সকালে, পাঁচ নম্বর বাড়ির একটা ঘটনা ওকে কেমন অবাক করে দিল। ও বসে বসে বই পড়ছিল। অন্যান্য বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে, তাদের মায়েরা স্কুলে চলে গেছেন। ভদ্রলোকেরাও অনেকে বেরিয়ে গেছেন। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলার পুবের ব্যালকনির একটা দরজা খুলে গেল। আগের দুদিন ও বাড়ির পুবের দিকের ব্যালকনির দরজা খোলা দেখে নি। বিকেলের দিকে খোলে কি না, ও জানে না। সকালের দিকে কোন দিনই খুলতে দেখে নি। এমন কি, দক্ষিণের লম্বা সুন্দর বারান্দায়, একজন মানুষকেও দেখতে পায় নি।

গোগোল দেখল, পাঁচ নম্বর গেরুয়া রঙের বাড়ির দোতলার পুবের একটা ব্যালকনির দরজা খুলে গেল। একজন মহিলা ভেতর থেকে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনই এগিয়ে এলেন না। মহিলা গোগোলের মায়ের থেকে বয়সে বেশ ছোট। ওকে যে-দিদি পড়ান, অনেকটা তাঁর মতই মনে হল। সেই দিদি এখনও ইউনিভারসিটিতে পড়েন।

গোগোলের মনে হল, মহিলা যেন দরজা খুলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখতে তাঁকে বেশ সুন্দরী। বেশ একটু দূরে হলেও, গোগোল স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, মহিলা বেশ ফরসা। তাঁর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তিনি সুন্দরী। তাঁর মাথার চুল খোলা, তবে তাঁর জামা কাপড় যেন তেমন ঝকঝকে রঙচঙে পরিচ্ছন্ন নয়। তাঁর হাতে গলায় সামান্য চুড়ি হার আছে। থমকে দাঁড়িয়ে, তিনি বাইরের দিকে তাকালেন। প্রথমেই যেন তাঁর চোখ পড়ল গোগোলদের উঁচু বাড়িটার দিকে। তার দেখার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, গোগোলদের উঁচু বাড়িটা যেন তিনি এই প্রথম দেখছেন। তবে, গোগোলদের বাড়িটা দেখলেও, তিনি গোগোলকে মোটেই দেখছেন না। তাঁর নজর পাঁচ-তলা থেকে আরও উঁচুতে।

গোগোলের তখনও কিছুই মনে হয়নি। ও বইয়ের খোলা পাতার দিকে দেখতে গেল। কিন্তু চোখ নামাতে পারল না। মনে হল মহিলা যেন ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। প্রায় মিনিট খানেক পেছন দিকে দেখে, আবার সামনের দিকে ফিরলেন। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সামনে

এগিয়ে এসে ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। মুখ নামিয়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকালেন। গোগোল তুই সারি বাড়ির মাঝখানে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে না। বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রাস্তাটার ফালি ফালি টুকরো দেখা যায়। পাড়াটা নিরিবিলি, রাস্তায় লোকজন খুবই কম। মাঝে মাঝে হুস্ হাস্ করে এক একটা গাড়ি বেরিয়ে যায়।

গোগোল ভাবল ও ভুল দেখছে। শুধু শুধু মহিলা ভয় পাবেন কেন? ও আবার মুখ নামিয়ে বইয়ের দিকে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য, ও বইয়ের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিতে পারল না। পাঁচ নম্বর বাড়ির ব্যালকনির দিকে না তাকিয়েও মনে হল, সেখানে আরও একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। ও চোখ তুলে তাকাল। ঠিক তাই। এক ভদ্রলোক, খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও বেশ ফর্সা, আর শক্ত চওড়া চেহারার মানুষ। তাঁর মাথার সামনের দিকে খানিকটা টাক পড়ে, কপালটা চওড়া দেখাচ্ছে। চোখে তাঁর সোনালী ফ্রেমের চশমা। সাদা ফুল প্যান্টের কোমরে গুঁজে পরেছেন সাদা হাফ শার্ট। বাঁ হাতের মোটা কবজিতে চওড়া স্টিলের ব্যাণ্ড বাঁধা ঘড়ি চকচক করছে। খুব লম্বা তিনি নন। কিন্তু তাঁর চশমার কাঁচের আড়ালে চোখ তুটো, আর মুখটা কেমন শক্ত দেখাচ্ছে। তিনি মহিলার পেছন দিকেই তাকিয়ে আছেন। আর মহিলা যে ভদ্রলোকের আসাটা মোটেই টের পান নি, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

গোগোল দেখল, ভদ্রলোকের ঠোঁট তুটো নড়ে উঠল। ভদ্রমহিলা যেন আচমকা পেছন ফিরে তাকালেন। তারপরে আর একবারও সামনের দিকে না ফিরে, ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। যেই মাত্র তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, অমনি ভদ্রলোক তাঁর গালে একটা থাপ্পড় মারলেন। আর চুলের মুঠি ধরে ঘরের আরও ভেতরে ঠেলে দিলেন। তারপর বাইরের কোন দিকে না তাকিয়ে, দরজাটা এত জোরে ঠেলে বন্ধ করলেন, গোগোলের মনে হল, শব্দটা যেন ও শুনতে পেল।

গোগোল এত অবাক হয়ে গেছল, প্রথমে কিছু বুঝেই উঠতে পারল না। ওরকম বয়সের মহিলাকে ও কোন দিন ওভাবে মার খেতে দেখেনি। ভদ্রলোকের শক্ত চোখ মুখ দেখে ও একবারও ভাবেনি, উনি ভদ্রমহিলাকে হঠাৎ ওরকম গালে থাপ্পড় মেরে, চুল টেনে ভেতরে ঠেলে দেবেন। ওর মনের হকচকানিটা কেটে যাবার পরে, মনে হল ও যাঁকে ভদ্রমহিলা ভাবছে, তিনি হয় তো তা নন। আসলে সে বাড়ির ঝি পরিচারিকা গোছের কেউ হবে। আর গ্রাম্যও হতে পারে। এমনও হতে পারে ব্যালকনির দরজা খোলা তার

পক্ষে নিষেধ ছিল। তাই ভদ্রলোক রেগে গিয়ে ওরকম মারলেন।

গোগোলের মনে এরকম চিন্তা এলেও, ও নিজেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর খুব খারাপ লেগেছে। মনটা খারাপ করে দিয়েছে। মহিলা যদি ভদ্রমহিলা নাও হন, এত বড় বয়সের একজন মহিলাকে কোন ভদ্রলোক ওরকম মারেন? গোগোলের এত বড় ফ্ল্যাট বাড়ির অনেক কাজের মেয়েকেই অন্যায় কবলে বকুনি খেতে দেখেছে। খুব বেশী অন্যায় করলে, বাড়ি থেকে বের করে দিতেও দেখেছে। অবশ্য সব সময় কাজের মানুষরাই যে অন্যায় করে, গোগোল তা মোটেই বিশ্বাস করে না। কিছু কিছু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে ও দেখেছে, তারা কাজের মেয়ে পুরুষদের যেন মানুষ বলেই গণ্য কবেন না! কিন্তু এরকম বয়সের একজন মহিলার গায়ে হাত তুলতে ও আজ পর্যন্ত দেখেনি '

গোগোল নিজের মনে মাথা নাড়ল। না, ব্যাপারটা ওব মোটেই ভাল লাগেনি। তা ছাড়া, ওর আরও মনে হল, ভদ্রমহিলার জামা কাপড় হয় তো তেমন ঝকঝকে রঙচঙে পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখে বেশ ভদ্রমহিলাই মনে হচ্ছিল। একটু ভয় ভয় ভাব থাকলেও, মানুষকে দেখে কি একটুও চেনা যায় না? তা ছাড়া, ঝি পবিচারিকাদের হাতে গলায় কি সোনার চুড়ি হার থাকে? তাঁর খোলা চুল কেমন ঘাড় অবধি ছাটা ছিল, তাতেও তাঁকে অন্যরকমই দেখাচ্ছিল।

গোগোল যখন এরকম ভাবছে, তখনই বঙ্কিমদা এসে বলল, 'গোগোল, গবম জল হয়ে গেছে। মা বললেন, তোমাকে এবার গা স্পঞ্জ কবে নিতে হবে।'

গোগোল বলল, 'যাচ্ছি।'

বঙ্কিমদা চলে যাবার পর, গোগোল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গল্পেব বইটা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে ওকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দেখল, নীচের বাগানে একজন পুরুষ, আর একজন স্ত্রীলোক, খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পুরুষ লোকটির গায়ের জামা প্যান্ট, আর স্ত্রীলোকটির জামা কাপড় দেখে মনে হল, দুজনেই বাড়ির কাজের লোক। তাদের দুজনের চোখে মুখেই কেমন একটা ভয় আর উত্তেজনার ভাব। দুজনেই চোখ বড় বড় করে, হাত নেড়ে কিছু বলাবলি করছে। মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দার দিকে মুখ তুলে দেখছে। তাদের কথাবার্তা গোগোল কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তবে বুঝতে পারছে, গোগোল একটু আগেই দোতলা বাড়িটার পুবের ব্যালকনিতে যে ঘটনাটা দেখেছে, সেটা নিয়েই তারা

কথা বলছে। হয় তো এখনও বাড়ির ভেতরে কিছু ঘটছে। গোগোল দেখতে বা শুনতে পাচ্ছে না।

গোগোল দেখল, বাগানের পুরুষ আর স্ত্রীলোকটি হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। দুজনে দুদিকে ছিটকে গেল। তারপর স্ত্রীলোকটি বাড়ির দিকে ছুটে চলে গেল। পুরুষটি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, সেদিকে দেখতে লাগল।

'কী হল গোগোল ?' বঙ্কিমদা আবার এসে তাড়া লাগাল, 'তোমার গা স্পঞ্জ করার জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

গোগোল তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চল যাচ্ছি।'

বঙ্কিমদার পিছু পিছু গোগোলকে এবার ফিরতেই হল। ঘরে ঢোকবার আগে, ও আর একবার বাগানের দিকে তাকাল। লোকটা তখনও সেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল।

গোগোলকে এখন দুপুরে ভাত খেতে দেওয়া হচ্ছে। তবে দুপুরে ঘুমানো একদম বারণ। কারণ এখন ওর যা শরীরের অবস্থা দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুমোলে জ্বর আসতে পারে। তবে বসে থাকার দরকার নেই। শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পারে।

অন্যান্য দিন গোগোল দুপুরে খেয়ে উঠে খানিকক্ষণ পড়ার টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ে। বিশেষ করে খেলার পাতাটা খুঁটিয়ে পড়ে। তারপরে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ে। কিন্তু আজ গোগোলের মাথায় খবরের কাগজ বা গল্পের বই মোটেই নেই। পশ্চিম দিকের পাঁচ নম্বর বাড়িটাই ওকে কেবল টানছিল। খেয়ে উঠে ওকে আবার পশ্চিমের ব্যালকনির দিকে যেতে দেখে, মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খেয়ে উঠে এখন আবার তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

গোগোলের খেয়ালই ছিল না, মা ওকে লক্ষ্য করছেন। ধরা পড়ে বলল, 'আমি ওদিককার ব্যালকনিতে গিয়েই বসছি।'

মা বললেন, 'সকাল থেকেই তো ওই ব্যালকনিতে বসেছিলে। এখন আবার বসবার কী দরকার ? একটু বসে যেমন খবরের কাগজ পড়, তাই পড়গে। তারপর খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবে।'

'আজ আমার ঘরে বসতে ভাল লাগছে না।' গোগোল বলল, 'তার চেয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে আমি ওদিককার ব্যালকনিতে বসে পড়ব।' বলে ও ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল খবরের কাগজ আনতে।

মা অবাক চোখে গোগোলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। গোগোল খবরের কাগজ হাতে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে, মায়ের সামনে দিয়েই, অন্য ঘরে ঢুকে গেল। সেই ঘরের ভেতর দিয়েই পশ্চিমের ব্যালকনিতে যেতে হয়। মা একটু ভাবলেন। তারপর নিজের কাজে চলে গেলেন। তিনি নিশ্চিন্ত, গোগোল ফ্ল্যাটের মধ্যেই আছে।

গোগোল পশ্চিমের ব্যালকনিতে এল। চেয়ারটা বাখাই ছিল। খবরের কাগজে ওর মন ছিল না। চেয়ারে বসবাব আগেই, ও পশ্চিমেব পাঁচ নম্বর দোতলা বাড়ির দিকে তাকাল। কারোকে কোথাও দেখা গেল না। বাগানে গাছেব আড়ালে সেই লোকটাও এখন আর নেই। মিনিট খানেক দেখে, গোগোল চেয়ারে বসল। খবরের কাগজেব খেলাব পাতাটা খুলল। কিন্তু পড়ল না কিছুই। সেই বাড়িটার দিকেই ওর নজর আটকে রইল।

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। গোগোলেব ঝিমুনি ধবে গেল। ঘন ঘন হাই উঠতে আরম্ভ করল! কিন্তু ও যা আশা করেছিল, তাব কিছুই ঘটল না। ও ভেবেছিল বাড়িটার মধ্যে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কেন না, ভদ্রমহিলাকে ওভাবে মাবতে দেখে, ওর মোটেই ভাল লাগে নি। তাবপরে সেই পুরুষ আর স্ত্রীলোকটিকে ওভাবে বাগানে এসে কথা বলতে দেখে, ওর মনে নানা বকম সন্দেহ হয়েছিল। বাগানে তখন দুজনে হঠাৎ চমকে উঠে ছিটকে গেছল কেন? স্ত্রীলোকটিই বা কেন দৌড়ে বাড়ির ভেতর ছুটে গেছল? তাকে কি বাড়ির ভেতব থেকে কেউ ডেকেছিল?

গোগোল নানারকম ভাবলেও, আসল ঘটনার কিছুই বুঝতে পারল না। অথচ, একটা সামান্য ব্যাপার ভেবে, ঘটনাকে মন থেকে দূব করতেও পারছে না।

গোগোল খবরের কাগজের খেলার পাতায় মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। আর ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ল বাড়িটার ছাদের দিকে। ছাদটা বেশ বড়। লম্বা বারান্দাটা দেখলেই বোঝা যায়, বাড়িটা ছোট নয়। ও দেখল, সেই মহিলা ছাদে উঠে এসেছেন। সেই মহিলা মানে, যাঁকে ও সেই টাক মাথা ফরসা ভদ্রলোকেব হাতে মার খেতে দেখেছিল। চিলেকোঠার দরজাটা ছাদের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, দক্ষিণ দিকে। গোগোল দেখল, মহিলা দরজার বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ওবেলা যেমন প্রথমে, ব্যালকনির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেই রকম।

গোগোলের মনটা কেমন একটা দুশ্চিন্তায় ভরে উঠল। মহিলার সেই আগের শাড়িটা এখন নেই। একটা গোলাপী রঙের শাড়ি পরেছেন এখন।

মাথার চুল সেই আগের মতই খোলা। তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাদের ডাইনে বাঁয়ে আর সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। ছাদের আল্‌সে বেশ উঁচু। আর বাড়িটা সাধারণ বাড়ির মত নয়। দোতলা যেন চারতলার মত উঁচু।

মহিলা ডান দিকে—অর্থাৎ পুব দিকে ফিরে, এক পা এক পা করে এগোতে লাগলেন। ওবেলাও তিনি পুবের ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়েছিলেন। ওদিকটায় যে রাস্তা আছে, গোগোল তা জানে। ওর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ভদ্রমহিলা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বেন না তো? তিনি যতই এগিয়ে আসতে লাগলেন, গোগোল তাঁর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন কী একটা চিন্তায় ডুবে গেছেন। যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছেন। তিনি কাঁদছেন না। কোনো দুঃখ-কষ্টের ছাপও নেই তাঁর মুখে। তিনি যদি মুখ তুলে গোগোলদের বিল্ডিংয়ের দিকে তাকান, তা হলে নিশ্চয় গোগোলকে দেখতে পাবেন। কিন্তু কোন দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই।

ভদ্রমহিলা যতই এগোতে লাগলেন, গোগোলের বুকে ঢিপ ঢিপ শব্দ বাড়তে লাগল। ও কি চেঁচিয়ে উঠবে? কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

গোগোল চমকে উঠল। দেখল, আর একজন ভদ্রমহিলা ছাদে উঠে এলেন। তাঁব বয়স অনেকটা বেশী। তাঁর গায়ে সাদা জামা, আর সাদা শাড়ি। শাড়িটা পরেছেন অবাঙালীদের মত। মারোয়াড়ি বা গুজরাতি মহিলারা যেমন পরেন। তাঁর মাথার চুল সাদা পাকায় মেশানো। শরীরটা একটু মোটাসোটা মত। ছাদে উঠেই তিনি ডান দিকে তাকিয়ে সেই দিকে হন হন করে এগিয়ে এলেন। সেই আগের মহিলা তখন পুব দিকে আলসের অনেকটা কাছে এসে পড়েছেন। বয়স্কা মহিলা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে, অল্পবয়সী মহিলার একটা হাত চেপে ধরলেন। তাঁর কোমল মুখে দুঃখের ছায়া। তাঁর ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা গেল, তিনি কিছু বলছেন।

আগের সেই অল্পবয়সী মহিলা মাথা নীচু করে, বয়স্কা মহিলার কথা শুনলেন। তারপরে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। বয়স্কা মহিলা আরও কিছু বললেন। আগের মহিলা মুখ না তুলেই যেন কিছু বললেন। তাঁর অল্প ঠোঁট নাড়া দেখে তাই মনে হল। তারপরেও বয়স্কা মহিলা, মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত নেড়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে কথা বলতে লাগলেন।

গোগোল আবার চমকে উঠল! আর বুকটাও ধড়াস করে উঠল। দেখল, মাথায় টাক সেই ভদ্রলোক ছাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এই ভদ্রলোকই ওবেলা অল্পবয়সী মহিলাকে ব্যালকনি থেকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরেছিলেন। তিনি ছাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ডান দিকে ফিরে দুই মহিলার দিকে দেখলেন। মহিলারা তাঁকে দেখতে পেলেন না। ভদ্রলোক চট্ করে দরজার আড়ালে চলে গেলেন আব মুখটা একটু-খানি বের করে, উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন।

বয়স্কা ভদ্রমহিলা তখনও কথা বলছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল, তিনি যেন, অল্পবয়সী মহিলাকে কিছু বোঝাচ্ছেন। আর সেই মহিলা মাথা নীচু করে কথা শুনে যাচ্ছেন। তাঁরা টেরও পেলেন না, ভদ্রলোক তাঁদের দেখছেন। হয় তো তাঁদের কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

প্রায় সাত আট মিনিট পরে, বয়স্কা মহিলা, অল্পবয়স্কা মহিলার হাত ধরে চিলেকোঠার দরজার দিকে ফিরলেন। আর চোখের নিমেষে ভদ্রলোকের মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বয়স্কা মহিলা আগের মহিলার হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গোগোল তারপরেও বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আধ ঘণ্টাব মধ্যেও কিছু ঘটল না। ও খবরের কাগজটা তুলে ধরল। এমন সময় মা এসে বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেল। তুমি এখনো এখানে বসে কী করছ?'

'এমনি বসে আছি।' গোগোল মাকে সত্যি কথাটা বলতে পারল না।

মা বললেন, 'এই শরীর নিয়ে, সেই সকাল থেকে ঠায় বসে আছ। এখন তুমি বেশ দুর্বল। চল, ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়বে।'

গোগোল বলল, 'আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।'

মা তা মানতে চাইলেন না। বললেন, 'তোমার কষ্ট না হোক, আমি আর তোমাকে এ ভাবে বসে থাকতে দেব না। চল, ঘরে চল। বিকেলে ওদিকের ব্যালকনিতে বসে বন্ধুদের খেলা দেখবে।'

গোগোল মায়ের কথার অবাধ্য হতে পারল না। ওকে তখনকার মত ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে যেতেই হল। যাবাব আগে পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে একবার দেখে নিল। কারোকে কোথাও চোখে পড়ল না। কিন্তু ব্যাপারটা কী ঘটছে, তাই নিয়ে ওর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে ছাদের ঘটনাটা ওর মনে নতুন করে নাড়া দিয়েছে। দুই মহিলার মধ্যে কী সম্পর্ক? ভদ্রলোকই বা ওরকম চুরি করে তাঁদের দেখছিলেন কেন? এসব মিলিয়ে এক রাশ প্রশ্ন ওর মাথায় যেন খোঁচাতে লাগল। মায়ের সঙ্গে ঘরে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে

ধরল। কিন্তু পড়া হল না। অপেক্ষা করতে লাগল, কখন ও বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে যেতে পারবে।

মা বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়েছেন। তারপরে শুয়ে পড়েছিলেন। গোগোল ভেবেছিল, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটুখানি সময় অপেক্ষা করে, ও বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল। মাও সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। ভুরু কুঁচকে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখন তিনটেও বাজে নি। এর মধ্যেই উঠে কোথায় যাচ্ছ?'

গোগোল খুবই লজ্জায় পড়ে গেল। ও হঠাৎ তৈরী করে মা বাবাকে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তা নইলে হয় তো বলে দিত, ও বাথরুমে যাবে। কিন্তু ও মোটামুটি সত্যি কথাই বলল, 'আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

মা বললেন, 'আজই দেখছি, তুমি একটু বেশী ছটফট করছ। তার মানে, শরীরটা ভাল আছে। কিন্তু এখনো তোমার সাবধানে থাকার দরকার। আরও খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো। সাড়ে তিনটে নাগাদ তোমার দুধ আর ওষুধ খাবার সময়। সে-সময় উঠে, ব্যালকনিতে বসে বন্ধুদের খেলা দেখবে।'

গোগোল আর কী করবে? মায়ের কথার অবাধ্যতা করা চলবে না। বলল, 'ঠিক আছে। আমি চেয়ারে বসে গল্পের বই পড়ছি। আমার আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

মা বললেন, 'বেশ, তাই পড়। কিন্তু এখন বাইরে যেও না।'

গোগোল বিছানা থেকে নেমে, ঘরের একপাশে টেবিলের সামনে চেয়ারে গিয়ে বসল। টেবিলের ওপরেই ছিল গল্পের বই। যদিও ও গল্পের বই টেনে নিল, আর বইয়ের পাতাও ওল্টাল, পড়তে পারল না একটা লাইনও। ওর চোখের সামনে তখন ভাসছে পশ্চিমের সেই পাঁচ নম্বর বাড়ি, বাগান, ছাদ, আর সেই দুই মহিলা ও ভদ্রলোকের মুখ। এতক্ষণে হয় তো অনেক কিছু ঘটে গেছে। গোগোল কিছুই জানতে পারছে না।

গোগোলের মনে হঠাৎ কৌতূহল জাগল, পাঁচ নম্বর বাড়িটা কোন্ রাস্তায়? রাস্তাটা একেবারে অচেনা নয় ওর কাছে। ওদের এই ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে গেলে, সামনে পড়বে সার্কুলার রোড। সার্কুলার রোড গেছে পশ্চিম দিকে। সেদিকে খানিকটা গেলেই, বাঁ দিকে

বেঁকে গেছে পাঁচ নম্বর বাড়ির রাস্তা। হ্যাঁ এখন ওর চোখের সামনে রাস্তাটা ভাসছে। জর্জ, পারভেজ আর সুমিতের সঙ্গে একদিন ও এমনিই ওই রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। ওই রাস্তায় উঁচু বাড়ি একটাও নেই। একতলা, দোতলা বাড়িই বেশি। দু একটা তেতলা বাড়ি আছে। সব বাড়ির সামনে বা পেছনে আছে বাগান। রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি। দেখলেই বোঝা যায়, বড়লোকদের পাড়া। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির গেটেই দারোয়ান পাহারা দেয়। আরও একটা ব্যাপার হল, পাড়াটার অধিকাংশ বাসিন্দাই অবাঙালী।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই, গোগোলের মনে পড়ে গেল, রাস্তাটার নাম ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিট। রাস্তাটায় ঢোকবার মুখেই, বাঁ দিকের একটা দেওয়ালে, এনামেল প্লেটে স্পষ্ট করেই ও নামটা লেখা আছে। কিন্তু এতটা মনে করেই বা কী লাভ? ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়িতে কারা থাকে সেটা তো জানার কোন উপায় নেই। তবে মনে হয়, গোগোলদের টেলিফোনের সাতচল্লিশ এক্সচেঞ্জের এলাকার মধ্যে ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিট পড়বে। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? সাতচল্লিশ, আর সাতচল্লিশের ক্রস বার আটচল্লিশ। সেটা জানলেও, পাঁচ নম্বর বাড়ির টেলিফোনের নাম্বার জানার উপায় কী? টেলিফোন গাইডে সাতচল্লিশ আর আটচল্লিশ এক্সচেঞ্জে হাজার হাজার নাম্বার আছে। গোটা গাইড খুঁজে, ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়ির মালিকের নাম বের করা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

গোগোলের এই পাঁচ নম্বর বাড়ির ব্যাপারে এতই কৌতূহল যে টেলিফোন নাম্বারটা জানলেই বা ওর কী লাভ হবে, সেটা একবারও ভেবে দেখছে না। ও কি ও-বাড়িতে টেলিফোন করবে? কাকে? কেন? আর ও বাড়ির লোকেরা ওর সঙ্গে কথা বলবেই বা কেন?

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই, বঙ্কিমদা দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, 'গোগোল, তোমার দুধ রেখেছি খাবার টেবিলে।'

গোগোল লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। তা হলে সাড়ে তিনটে বেজেছে! মা জেগেই ছিলেন। বললেন, 'বঙ্কিম, আমাকে চা দিও। আমি খাবার টেবিলে যাচ্ছি।'

গোগোলকে বেরিয়ে যেতে দেখে মা বললেন, 'দুধ খেয়ে, ওষুধও খেয়ে নিও।'

'আচ্ছা।' বলে গোগোল শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বঙ্কিমদা ওষুধের শিশি, চামচ, কাপ আর জলের গেলাস, পাত্র আগেই

খাবার টেবিলে রেখে দিয়েছে। গোগোল খাবার ঘরে এসেই দুধের গেলাস হাতে তুলে নিল। খুব গরম নয়। তবে এক চুমুকে ঢক ঢক করে খাবার উপায় নেই। যতটা সম্ভব, তাড়াতাড়ি ও দুধটা শেষ করল। তারপর পাঁচ মিনিট দেরি করে ওষুধটা খাবার কথা। কিন্তু গোগোলের আর তব সইছে না। শিশির ঢাকনা খুলে, দু চামচ ওষুধ কাপে ঢালল। ঢক করে গিলে, গেলাসে জল ঢেলে দুচুমুক খেয়ে নিল। শিশির মুখ বন্ধ করে, আর কোন দিকে না তাকিয়ে আর একটা ঘরের মধ্য দিয়ে সোজা চলে গেল পশ্চিমের ব্যালকনিতে। ব্যালকনিতে তখন রোদ। কিন্তু ব্যালকনিতে চেয়ার ছিল না। নিশ্চয় বঙ্কিমদা তুলে নিয়ে গেছে। কারণ, এ সময়ে গোগোল এখানে বসে না। বিকেলে ও দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসে। তাই বঙ্কিমদা চেয়ারটা তুলে নিয়ে গেছে।

গোগোল ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, চেয়ারটা রাখা আছে খাটের একপাশে। হালকা বেতের চেয়ার। গোগোল ঘরে ঢুকে নিজেই চেয়ারটা তুলে নিয়ে এল। ওর পক্ষে এখন বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ও চেয়ারটাকে একটু কোণ ঘেঁষে পেতে বসে, সবে মাত্র পশ্চিমের পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়েছে। অমনি মা সেখানে এসে হাজির। তিনি ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার গোগোল? এখন তুমি এই রোদে এখানে এসে বসেছ কেন?'

গোগোল মাকে দেখেই তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল। ও যে-দিকের কোণ ঘেঁষে চেয়ারটা রেখেছিল, সেখানে পুরোপুরি রোদ নেই। কিছুটা ছায়া আছে। ও বলল, 'এই কোণে বসলে রোদ লাগবে না '

মা একটু ঝেঁজে বললেন, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি তো বিকেলে কোনো দিন এখানে এসে বস না? দক্ষিণের বারান্দায় বসে তুমি বন্ধুদের খেলা দেখ। আজ হঠাৎ এখানে কেন?'

গোগোল বাধ্য হয়েই বলল, 'আজ আমার এখানে বসতেই ভাল লাগছে।'

মা ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে গোগোলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে তিনিও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। চোখে পড়ার মত কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না। রেলিংয়ে ভর দিয়ে নীচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন। কিছু পুরনো একতলা দোতলা বাড়ি আর গাছপালা ছাড়া কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না। আবার তাকালেন গোগোলের দিকে। বললেন, 'কী যে তোমার ব্যাপার, কিছু বুঝতে পারি নে। ঠিক আছে,

তোমার যখন ভাল লাগছে, তখন এখানেই বস।'

গোগোল চেয়ারে বসল। মা চলে গেলেন। কিন্তু মা যে একটা কিছু সন্দেহ করেছেন, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। গোগোলই বা কী করবে? ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়ি ছাড়া ওর মাথায় এখন আর কিছু নেই। একবার যখন মনে নানা সন্দেহ আর প্রশ্ন জেগেছে, যতক্ষণ না তার একটা সুরাহা হচ্ছে, ও এখান থেকে কিছুতেই নড়তে পারছে না। অথচ পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হল, দরজা জানালা বন্ধ বাড়িটা একেবারে নিঝুম। দক্ষিণের বড় বড় গাছপালায় ভরা বাগানেও কেউ নেই।

ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের গাছতলার ফাঁকে ফাঁকে, রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝেই গাড়ি যাতায়াত করছে। কোনো কোনো বাড়ির লনে ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। আয়ারা প্যারামবুলেটারে শিশুদের নিয়ে ঘুরছে। পাঁচ নম্বর বাড়ির গেটের একটা পিলারই শুধু দেখা যায়। যেখানে পাঁচ নম্বরটা লেখা আছে। সামনের চত্বরের সবটা দেখা যায় না। একেবারে পশ্চিমের শেষে কিছুটা চত্বর আর পাশাপাশি কয়েকটা গ্যারেজ। সব ক'টা গ্যারেজই খালি। দেখে মনে হয়, বাড়ির সবাই বেরিয়ে গেছে।

গোগোল যখন এই রকম দেখছে আর ভাবছে, তখনই পর পর দুটো, সাদা আর নীল রঙের এ্যামব্যাসাডার গাড়ি ঢুকল। গ্যারেজের সামনে দাঁড়াল। দুটো গাড়ি থেকেই কিছু মহিলা পুরুষ নামলেন। গোগোল যাঁদের দেখেছে, তাঁরা কেউ দলের মধ্যে ছিলেন না। নতুন মহিলা পুরুষের দল সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর দক্ষিণ দিকে ফিরে, চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

বেশ খানিকক্ষণ সময় চলে গেল। কারোকেই কোথাও দেখা গেল না। যাঁরা এলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন? গোগোলের মনে হল, পাঁচ নম্বর সীমানার মধ্যে দুটো তিনটে আলাদা বাড়ি আছে। একটা বাড়ি, আর একটা পরিবার থাকলে কি চারটে গ্যারেজ থাকে?

গোগোল যখন এরকম ভাবছে, তখনই দোতলার দক্ষিণের দরজা দিয়ে, লম্বা সুন্দর বারান্দায় দুজন বেরিয়ে এলেন। দুজনেই অল্পবয়সী মহিলা। একজন সালোয়ার কামিজ পরেছেন। ছিপছিপে ফর্সা আর দেখতে বেশ সুন্দর। তাঁর মাথার কোঁকড়ানো চুল ইন্দিরা গান্ধীর মত ছোট করে কাটা। পায়ে হাই হিলের জুতো। বাঁ হাতে একটি ছোট ব্যাগ। একটু আগে যে গাড়ি দুটো এল, সেই গাড়ি থেকে এ মহিলা নামেন নি।

আর এক মহিলাকে দেখে গোগোল অবাক হয়ে গেল। ইনিই সেই মহিলা, বেলা এগারোটা নাগাদ যাঁকে দেখা গেছল দোতলার পূবের ব্যালকনিতে দাঁড়াতে আর ভদ্রলোকের হাতে মার খেতে। ইনিই দুপুরে ছাদে এসেছিলেন, বয়স্কা মহিলা যাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছলেন। কিন্তু তখন মহিলাকে যে রকম পোশাকে আর চেহারায় দেখা গেছল, এখন একেবারে অন্যরকম। এখন তিনি লাল টকটকে সিলকের শাড়ি পরেছেন। ঘাড় অবধি চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো। গোগোল ব্যালকনি থেকে দেখে বুঝতে পারছে, উনি মুখে কিছু মেখেছেন। সরু ভুরু দুটো আর চোখ কালো দেখাচ্ছে। কপালে লাল টিপ। তাঁর পায়েও হাই হিল জুতো। তিনি সালোয়াব কামিজ পর' মহিলাব সঙ্গে হাসতে হাসতে বারান্দায় এলেন। তাঁকে এখন খুবই খুশি দেখাচ্ছে। ইনিই যে ওবেলার সেই মহিলা, তা একটুও বোঝা যাচ্ছে না। দুজনকে দেখেই গোগোলের মনে হল, পত্রিকার রঙিন ছবির বিজ্ঞাপনের মত সুন্দর ঝকঝকে।

দুজনেই হেসে কথা বলতে বলতে, কাঠের আর কাঁচের রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। বারান্দার মাঝখানে চওড়া চৌকো জায়গায়, যেখানে বসবার জন্য চেয়ার আর নীচু কাঁচের টেবিল পাতা আছে, তাঁরা দুজনে সেখান দিয়ে গিয়ে, দক্ষিণে রেলিং ধরে ঝুঁকে হেসে হেসে কথা বলতে লাগলেন।

দু তিন মিনিট পরেই সেই ভদ্রলোকও বারান্দায় এলেন। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক। দুজনেরই গায়ে এখন দামী প্যান্ট শার্ট। তাঁরা দুজনেও হেসে কথা বলতে বলতে বারান্দায় এলেন। মহিলারা দুজন তাঁদের দিকে তাকালেন। কী কথা হচ্ছিল, শোনা না গেলেও, সালোয়ার কামিজ পরা মহিলার খিল খিল হাসির শব্দ গোগোল, খুব আস্তে হলেও স্পষ্ট শুনতে পেল। ওবেলার সেই ভদ্রলোক হাতের ভঙ্গি করে সবাইকে বসতে বললেন। আর ওবেলার মহিলা সালোয়ার কামিজ পরা মহিলার হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

সকলে বসবার আগেই, পরিষ্কার শাড়ি পরা, ওবেলা দেখা বাগানের সেই কাজের স্ত্রীলোকটি একটি ট্রলি চালিয়ে নিয়ে ঢুকল। ট্রলির ওপরে বড় পাটাতনে আর নীচের পাটাতনে অনেক ক'টা ট্রে ছিল। ট্রে-তে সাজানো ছিল নানা রকম খাবারের প্লেট। জলের জাগ, কাঁচের ঝকঝকে গেলাস, চায়ের কাপ ডিস টি-পট। সবই সে বড় কাঁচের টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল। রেখে ট্রলিটা বারান্দার একপাশে রেখে চলে গেল।

ভদ্রলোক আর মহিলারা সবাই বসে কথা বলতে বলতে একটু খাবার খেতে লাগলেন। গোগোল লক্ষ্য করে দেখল, সকালবেলার সেই মহিলা কিছুই খাচ্ছেন না। তবে হাসছেন আর কথা বলছেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে এলেন সেই বয়স্কা মহিলা, যাঁকে দুপুরে ছাদে দেখা গেছল। তিনি আসতে পুরুষ দুজন দাঁড়ালেন। বয়স্কা মহিলা হাত তুলে তাঁদের বসবার ইঙ্গিত করে নিজে বসলেন।

সকালের সেই ভদ্রলোক, সকালের সেই মহিলার পাশেই বসেছিলেন। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে এমন ভাবে কথা বলছিলেন, এখন দেখে বোঝাই যায় না, ভদ্রলোক মহিলাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে মেরেছিলেন। গোগোল ওই দুজনকেই বিশেষ ভাবে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হতে চলল। তখনও বারান্দায় খাওয়া আর গল্পগুজব হাসি চলছে। নতুন কিছুই ঘটছে না। গোগোলেরও ভাল লাগছিল না। ওর ঘরে ঢোকবার সময় হয়ে এল। পাঁচ নম্বর বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। গোগোল ভাবল, এতক্ষণে ওর বন্ধুদের খেলাও শেষ হয়ে এল। তবু ও দক্ষিণের ব্যালকনিতে যাবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য! পাঁচ নম্বর বাড়ির বারান্দায় সব মহিলা পুরুষরা উঠে দাঁড়ালেন। কথা বলতে বলতে সবাই ঘরে ঢুকে গেলেন। সেই কাজের স্ত্রীলোকটি এসে ট্রলি এগিয়ে নিয়ে এল টেবিলের কাছে। সব তুলে নিয়ে সে ট্রলি ঠেলে অন্য একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

গোগোল কী করবে, ভাবছে। ওর ধারণা, ওবেলা ভদ্রলোক অল্পবয়স্কা মহিলাকে মারলেও, এবেলা নিশ্চয় সব ঠিক হয়ে গেছে। তা নইলে দুজনকে পাশাপাশি বসে ওরকম হেসে কথা বলতে দেখা যেত না। গোগোল ঘরের মধ্যে ঢুকবে বলে, মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল। এমন সময় ওর নজর পড়ল নীচের চত্বরে। দেখা গেল, নতুন যে ভদ্রলোক বারান্দায় এসেছিলেন, তিনি একটি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। সেই সালোয়ার কামিজ পরা মহিলা আর বয়স্কা মহিলা এসে সেই গাড়িতে উঠলেন। ওঠবার আগে তাঁরা ওপরের দিকে তাকালেন। হাত তুলে বিদায় জানালেন। যাঁদের বিদায় জানাচ্ছেন, তাঁদের গোগোল দেখতে পাচ্ছে না। তবে তাঁরা যে ওবেলার সেই ভদ্রলোক আর মহিলা, সে-বিষয়ে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। ওদিকে হয়তো দোতলায় ব্যালকনি আছে। অথবা জানালা আছে। নীচের মহিলারা গাড়িতে উঠতেই, গাড়ি গেটের দিকে এগিয়ে এল।

গোগোল দেখল, সন্ধ্যা নামছে। আর ওর বাইরে থাকার উপায় নেই। নতুন আর কিছু ঘটবে না বলেই ওর মনে হল। কথাটা মনে হওয়া মাত্রই, ওর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। চমকে অবাক হয়ে দেখল, ওবেলার সেই মহিলা, যিনি লাল টকটকে সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন, তিনি ছুটে বারান্দায় এলেন। তাঁর শাড়ির আঁচল বারান্দার মেঝেতে লুটোচ্ছে। এখন আর তাঁর মুখে হাসি নেই। তিনি যেন ভয়ে আর আতঙ্কে বারান্দায় ছুটে এলেন। এসেই তিনি রেলিংয়ের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু তিনি রেলিংয়ের কাছে পৌঁছুবার আগেই সকালবেলার সেই একই ভদ্রলোক ছুটে এসে মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

গোগোলের মনে হল, ভদ্রলোক যেন একটা সিংহ। আর মহিলা যেন একটা সুন্দর হরিণ। ওর বুকের মধ্যে ধুক ধুক করতে লাগল। ও দেখল,



ভদ্রলোক মহিলাকে টানতে টানতে ঘরের দিকে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু মহিলা কিছুতেই যেতে চাইছেন না। মহিলাকে খানিকটা টেনে নিয়ে এসে ভদ্রলোক তাঁর মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে হাত দিয়ে আঘাত করলেন। মহিলা এত জোরে আর্তনাদ করে উঠলেন, গোগোল তা স্পষ্টই শুনতে পেল। ভদ্রলোক তখন মহিলাব শাড়ির আঁচল দিয়েই তাঁর মুখটা জড়িয়ে দিলেন, যাতে চিৎকার করলেও না শোনা যায়। তারপর ও-বেলার মতই চুলের মুঠি ধরে পেটে আব কোমরেব কাছে, তাঁব শক্ত হাত দিয়ে মারতে মারতে, টেনে নিয়ে চললেন ঘবের দিকে।

গোগোলের প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হল ভদ্রলোক বুঝি মহিলাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবেন। উনি কেন যে মহিলাকে পেটে আর কোমরের দিকে মারছেন, ও তা বুঝতে পারল না। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আচমকা, আব উল্টোপাল্টা ঘটে চলেছে, ঘটনাব কিছুই ও বুঝতে পারছে না। যাবা একটু আগেও পাশাপাশি বসে হাসছিলেন, তাঁদেব যে এমন সম্পর্ক হতে পারে, এটা বিশ্বাস কবাই কঠিন। নেহাৎ বাবান্দাব আলো জ্বলছিল বলেই, গোগোল সব ঘটনাটা দেখতে পেল। ভদ্রলোক একটা পিশাচের মত মহিলাকে ওই ভাবে মারতে মারতে ঘরে ঢুকে গেলেন। আর বারান্দার আলো টুক করে নিভে গেল।

গোগোলেব বুকে ঢিপ ঢিপ শব্দটা তখন যেন ঢাকের মত বাজছে। আব ভয়ে উত্তেজনায় ও নিজেরই আঙুল কামড়ে ধরেছে।

'কী ব্যাপার, গোগোল?' দরজার কাছ থেকে বাবাব গলা শোনা গেল।

গোগোল চমকে পেছন ফিবে তাকাল। দেখল, বাবার পেছনে মাও এসে দাঁড়িয়েছে। গোগোলেব মুখ থেকে একটা কথাও বেরোল না।

বাবার আর মায়ের, দুজনের মুখই গম্ভীর। আর দুজনেই যে বেশ অবাক হয়েছেন, মুখ দেখে তাও বোঝা যাচ্ছে। বাবা আবার বললেন, 'তুমি কি ব্যালকনিতে বসে রাত্রিটাও কাটিয়ে দিতে চাও নাকি? আমি বাড়ি ফিবে এসে শুনলাম, তুমি এখনো এদিকেব ব্যালকনিতে বসে আছ। ওদিকেব ব্যালকনিতে নাকি একবারও যাও নি।'

গোগোল কী বলবে ভেবে পেল না। মা বললেন, 'তাও সেই সাড়ে তিনটেয় কোন রকমে দুধ আর ওষুধ খেয়ে এসেই বসেছে। তারপর থেকে আর ওঠার নাম নেই। দুপুরে আমি ডেকে নিয়ে না গেলে, ঘরেও যেত না।'

গোগোলের মুখ থেকে তখনও কোন কথা বেরোল না। বাবা মায়ের কথা ওর কানে ঢুকছে। সে কথার জবাব দেওয়া দরকার। অথচ এখনও পাঁচ নম্বর বাড়ির ঘটনা ওর মাথায় ভোঁ ভোঁ করে পাক খাচ্ছে।

বাবা এবার ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কী হল, কোন জবাব দিচ্ছ না কেন? একেবারে বোবা হয়ে গেলে দেখছি? পশ্চিমের এ ব্যালকনিটা হঠাৎ তোমাকে আজ এরকম পেয়ে বসেছে কেন? তোমার মা আর বঙ্কিমদা এসে দেখে গেছে, তুমি কিছু টের পাও নি। তুমি ওদিকে তাকিয়ে বসেই রয়েছ।'

আশ্চর্য। মা আর বঙ্কিমদার চোখে কিছুই পড়ে নি? কী করেই বা পড়বে? পশ্চিম দিকে তো কেবল ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রীটের পাঁচ নম্বর বাড়িটাই নেই, আরও অনেক বাড়ি আছে। সে সব বাড়ির ভেতরের লন, একতলা, দোতলার খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। কেবল ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রীটটাই এখান থেকে দেখা যায় না। আর পশ্চিমে, গলি রাস্তাও চোখে পড়ে। সেদিকেও বেশ কিছু বাড়ি। গলিতেও গাড়ি যাতায়াত করতে দেখা যায়। এত সবের মধ্যে, শুধু একটি বাড়ির দিকে হঠাৎ কারোর নজর আটকে যাবার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে সে-বাড়ির পুবের দরজা জানালা যদি সব সময় বন্ধ থাকে, বারান্দায় একটাও লোক না দেখা যায়।

গোগোলকে বাবার ধমক খেয়ে এবার মুখ খুলতেই হল। কিন্তু একেবারে সত্যি কথা বলতে পারল না। বলল, 'এদিকটায় অনেক কিছু দেখা যায়। অনেক রকম মানুষ, অনেক ছেলেমেয়ে, অনেক মজার মজার ঘটনা। দক্ষিনের ব্যালকনিতে বসলে তো শুধু আমাদের বন্ধুদের আর ফ্ল্যাটের লোকদেরই দেখা যায়। আর রাস্তাটা। ওদিকটা পুরনো হয়ে গেছে।'

বাবা পেছন ফিরে মায়ের দিকে তাকালেন। মা হেসে ফেললেন। বললেন, 'আমি ওর কথার ছাতা মাথা কিছুই বুঝিনে। ওদিকটা পুরনো হয়ে গেছে, এদিকটা নতুন লাগছে। তাই ও সারাদিন এদিকে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছে। কী বলবে তুমি ওকে?'

বাবা কিন্তু হাসলেন না। তিনি গোগোলের মুখের দিকে একবার দেখে বললেন, 'তা তোমার কি এখনো এই অন্ধকারে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে? না ঘরের ভেতর যাবে?'

গোগোল বুঝল, আসলে বাবা ওকে ঘরের ভেতরে যেতেই বলছেন। ও বাবা মার পাশ দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। সেই ঘরের বাইরে

গিয়ে খাবার আর বসবার ঘর পেরিয়ে, অন্য শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে একেবারে চলে গেল দক্ষিণের ব্যালকনিতে। সেখানে একবার নীচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল, তখনও তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে সাইকেল চেপে চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে আবার ঘরে ফিরে এল। অন্ধকার ঘরেব ভেতব থেকেই গোগোল দবজা দিয়ে দেখল, বাবা মা পশ্চিমের সেই ঘব থেকে বেবিয়ে আসছেন, আর নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি কবছেন।

গোগোল ঘরেব আলো জ্বেলে, বাথরুমে ঢুকল। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে, বেরিয়ে এল। চেয়াবে গিয়ে বসে টেবিলের ওপবে সাজানো, ওর বাংলা পাঠ্যবইটা টেনে নিল। মা যে উঁকি দিয়ে দেখে গেছেন, তা ও দেখতে পেল না। ওর চোখে ভাসছে, সেই পাঁচ নম্বর বাড়ির বারান্দার পৈশাচিক ঘটনা। পৈশাচিক ঘটনা ছাড়া, ওটাকে আর কী বলা যায়? টাক মাথা ফরসা স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোককে আব ভদ্রলোক ভাবাই যাচ্ছে না। লোকটাকে পিশাচের মতই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। একজন মহিলাকে কেউ ওভাবে মারতে পারে? ওব সন্দেহ হচ্ছে, ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে যদি ওভাবে মারতেই থাকে, মহিলা এতক্ষণে বোধহয় মবেই গেছেন।

গোগোলের মাথায় মহিলার মরার চিন্তাটা আসতেই, ও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। খবরটা এখনই পুলিশকে দেওয়া উচিত। পুলিশ এসে পড়লে, হয় তো মহিলা বেঁচে যাবেন। পুলিশকে খবর দিতে হলে, টেলিফোনেই দিতে হবে। ঠিক যেমন খবরের কাগজে লেখে, 'কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির টেলিফোন পেয়ে' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোন থানায় টেলিফোন করবে?

গোগোল একটু চিন্তা করেই, ধরে নিল, ওদের এলাকার থানায় টেলিফোন করে, ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রীটের পাঁচ নম্বর বাড়ির নাম করলেই হবে। টেলিফোন গাইড দেখে, থানার নাম্বারটা বের করতে হবে। কিন্তু তিনটে ঘরেব মধ্যে, যেটা বাবার ঘব, টেলিফোনটা আছে সেই ঘরে। বাবা ওই ঘবে বসে পড়াশোনা করেন। বইয়ের আলমারি আছে ও-ঘরে। তা ছাড়া অনেক সময় অফিসের কাজও করেন। ছোট একটা ডিভান আর তাকিয়া আছে। কোন কোন দিন ওখানেই শুয়ে পড়েন। নইলে অন্য ঘরে যান। গোগোল আজকাল প্রায় একলাই এ ঘরে শোয়। আবার মাও এসে শোন। এখন রোজ মা এ ঘরে ওর কাছে রাত্রে ঘুমোন।

গোগোল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে গেল দরজার কাছে। বাবার স্নান হয়ে গিয়েছে। তিনি পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে খাবার টেবিলে বসেছেন। পাশের চেয়ারে বসে আছেন মা। বাবা এখন সামান্য একটু কিছু খাবার খেয়ে এক কাপ চা খাবেন। তারপরে কী করবেন, ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। হয় তো মায়ের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করতে করতে টি. ভি. দেখবেন। টি. ভি. দেখা ছেড়ে, বাইরেও বেরিয়ে যেতে পারেন। নয় তো ঘরে কাজ নিয়েও বসতে পারেন।

বাবা মা দুজনে টেলিভিশন দেখলে, টেলিফোন করার কোন অসুবিধে হবে না। বাবা বেরিয়ে গেলেও, টেলিফোন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কারণ মা তখন টেলিভিশন দেখবেন। গোগোলও টেলিভিশন দেখে। তবে বেশির ভাগ টি. ভি. প্রোগ্রামই দেখতে ওর ভাল লাগে না। খেলা দেখতে পেলে ছাড়ে না। তা সে যে-কোন খেলাই হোক। স্পাইডারম্যান বা দু একটা ইংরেজি সিরিয়াল খারাপ লাগে না। বাংলা প্রোগ্রাম সব থেকে খারাপ লাগে। একমাত্র কুইজ কনটেস্ট ছাড়া। হিন্দিরও তাই।

গোগোল বুঝতে পারছে না, বাবা কী করবেন। যদি টেলিভিশনটা চালান, তাহলে ও টেলিফোন করতে পারে। বাবা মা ওর টেলিফোনের কথাবার্তা শুনতে পাবেন না। কিন্তু বাবা মাকে কথা বলতে দেখে মনে হচ্ছে, এখন টেলিভিশন দেখবেন না। বঙ্কিমদা বাবার চা আর খাবার ট্রেতে করে নিয়ে এল। ওদিকে পাঁচ নম্বর বাড়িতে কী ঘটে যাচ্ছে, কিছুই অনুমানও করা যাচ্ছে না।

গোগোল ফিরে গেল টেবিলের কাছে। কিন্তু বসতে পারল না। একবার ভাবল, বাবা মাকে ঘটনাটা বলে দেওয়াই ভাল। তা হলে বাবাই থানায় টেলিফোন করে পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারেন। ঠিক এ সময়েই ডিংডিং শব্দে কলিং বেলটা বেজে উঠল।

গোগোল চেয়ারে বসে, পড়ার বইটা সামনে টেনে নিল। ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হোল। মিনিট খানেক পরেই, বাবার গলা শোনা গেল, 'ঘোষ এসে গেছ? চল, আমার ঘরে গিয়ে বসি। ফাইল টাইলগুলো সব ও-ঘরেই আছে।'

ঘোষ মানে, বাবার অফিসের একজন সহকর্মী, নাম দীনেশ ঘোষ। বাবা তাঁকে ঘোষ বলেই ডাকেন। গোগোল তাঁকে ঘোষ কাকা বলে ডাকে। ঘোষ কাকার গলা শোনা গেল, 'যেখানে বলবেন, আমি সেখানেই বসতে পারি।'

বাবার গলা শোনা গেল, 'ঘরেই চল। সুনীতি এখানে বসে টি. ভি. দেখুক।'

ঘোষ কাকুর গলা শোনা গেল, 'এই যে বউদি, নমস্কার। ভাল আছেন তো? গোগোলের শরীর খারাপ হয়েছিল। ও কেমন আছে?'

গোগোলের আর কোন কথাই কানে যাচ্ছিল না। কারণ ওর সমস্ত প্ল্যানটাই ঘোষ কাকা ভেস্তে দিলেন। তাঁর আসা মানে বাবা এখন কাজের ঘরে গিয়ে বসবেন। মা হয় তো টি. ভি. দেখবেন, আর ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে বঙ্কিমদার সঙ্গে একটু কাজ করে আসবেন। গোগোলেবই বা কতোটুকু সময় আর হাতে আছে? একটু বাদেই মা ওকে খেতে ডাকবেন। খাবার পনের মিনিট পরে ওষুধ দেবেন। তারপর সাড়ে আটটাব মধ্যেই বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবেন।

গোগোল হতাশ হয়ে চুপচাপ বসে রইল। ঘোষ কাকাব সামনে গিয়ে বাবাকে ঘটনাটা ও বলতে পারবে না।

পরের দিন সকালে গোগোলের ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হয়ে গেল। ওর শরীবটা যে এখনও বেশ দুর্বল তা বোঝা যায়। তা ছাড়া, গতকাল রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারে নি। খুবই ছটফট করেছে। তাবপরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মা কখন এসে শুয়েছিলেন, কিছুই জানতে পারে নি। ও বিছানা ছেড়ে উঠেই আগে বাথরুমে গেল। চোখে মুখে জল দিয়ে ব্রাশে পেস্ট নিয়ে দাঁত মাজল ঘস্ ঘস্ করে। তারপরে মুখ ধুয়ে সোজা একেবারে খাবার টেবিলে। দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

গোগোল জানে, বাবা এখন বাথরুমে দাড়ি কামাচ্ছেন। মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। এসে গোগোলের গালে গলায় একবার হাত দিয়ে দেখলেন। নিজেই বঙ্কিমদাকে ডেকে, ওর খাবার দিতে বললেন। তার আগেই মা একটা ট্যাবলেট এনে, খালি পেটে খেয়ে নিতে বললেন। গোগোল নিজেই ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বের করতে যাচ্ছিল। মা বললেন, 'ও কি করছ? তোমার ফ্রিজের জল খাওয়া একদম বারণ, জান না? আমি জল দিচ্ছি।'

গোগোলের কি ওসব মাথায় আছে? এখন ওর মন প্রাণ পড়ে আছে পশ্চিমের ব্যালকনিতে। মা জলের জাগ আর গেলাস নিয়ে এলেন। জাগ থেকে জল ঢেলে দিলেন গেলাসে। গোগোল ট্যাবলেট মুখে নিয়ে জল

দিয়ে গিলে ফেলল। টেবিলের ওপরে কাছেই ছিল, ইংরেজি আর বাংলা খবরের কাগজ। ও ইংরেজি কাগজটা টেনে নিল। খেলার খবরের পাতায় যাবার আগেই, ওর চোখ আটকে গেল একটি ছোট সংবাদের হেডিংয়ের ওপর 'ডেড উওম্যান'। ও ঝুঁকে পড়ে সংবাদটা পড়ল। ঘরের মধ্যে একজন স্ত্রীলোককে গতকাল সিলিংফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। ঠিকানাটা গ্রে স্ট্রিট দেখে ও নিশ্চিন্ত হল।

বঙ্কিমদা গোগোলের খাবার নিয়ে এল। মুসাম্বি লেবুর রস। কাটা আপেল। মাখন ছাড়া টোস্ট, হাফ বয়েল ডিম আর দুধ। ও খেতে আরম্ভ করল। মা নিয়ে এলেন ওষুধ। ভিটামিন বি-এর ক্যাপসুল ছাড়াও দুটো ট্যাবলেট আর একটি শিশি, চামচ, কাপ।

গোগোলের তাড়াতাড়ি খাওয়া দেখে মা বললেন, 'ওরকম গোগ্রাসে খাচ্ছ কেন? যাবে তো পশ্চিমের ব্যালকনিতে। তার জন্যে এত তাড়া কিসের? ব্যালকনিটা তো আর পালিয়ে যাবে না।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে হাসল। কিন্তু মাকে আসল কথা বলার উপায় নেই। কে জানে, গতকাল রাত্রেই কিছু ঘটে গেছে কি না। ওর খাবার আর ওষুধ খাওয়ার শেষে উঠে দাঁড়াল। এ সময়েই বাবা এলেন খাবার ঘরে। গোগোলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'পশ্চিম পাড়া আবিষ্কার করতে চললে?'

গোগোল হেসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে, খাবার ঘর থেকে অন্য ঘরে ঢুকে গেল। পশ্চিমের ব্যালকনির দরজা খোলাই ছিল। এ ঘরের দক্ষিণ দিকে দুটো বড় জানালা আছে। গোগোল ব্যালকনিতে পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক কাণ্ড! যে-মহিলা গতকাল সন্ধ্যায় ওই রকম মার খেয়েছেন, এখন তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন পুবের ব্যালকনিতে? অবশ্য এখন তাঁর লাল সিল্কের শাড়ি পরা নেই। সেরকম সাজগোজ নেই। মাথার চুল উসকো খুসকো। ভুরু আঁকেন নি। কাজল দেন নি চোখে। সামান্য একটা নীল পাড় সাদা শাড়ি পরে আছেন। ব্যালকনিতে দু হাত রেখে, মুখ নামিয়ে নীচের দিকে দেখছেন। ব্যালকনির পেছনে দরজা খোলা।

গোগোল গতকাল সকালের দিকেই মহিলাকে দেখেছিল ওই ব্যালকনিতে। তিনি দরজা খুলে, ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আর একটু পরেই সেই পিশাচের মত লোকটা ওঁকে চুলের মুঠি ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে গালে জোরে জোরে থাপ্পড় মেরেছিল। আজও আবার মহিলা পুবের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছেন? ভদ্রলোকের মত দেখতে, সেই লোকটা

এসে, গতকালের মত আবার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে মারবে না তো ?

ডোভস্ নেস্ট স্ট্রিট দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে। ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। আরও অনেক বাড়ির লন দেখা যাচ্ছে। লোকজনের চলা ফেবা, বাগানে মালীদের কাজ করা সবই চলছে। গোগোলের সে সব দিকে মোটেই নজর নেই। ওর মনে উত্তেজনা আর ভয়, কখন খোলা দরজা দিয়ে সেই লোকটা এসে মহিলার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। মহিলা যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। একবার গোগোলদের বিল্ডিংয়ের দিকেও চোখ তুলে দেখলেন। আবার কখনও ডাইনে বা বাঁয়ে। তাঁর ফর্সা মুখ যেন শুকনো দেখাচ্ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন হেসে হাত নাড়লেন। এ সময়েই দরজায় দেখা গেল কালো মত একটি মেয়েকে। লাল রঙের শাড়ি পড়া থাকলেও তার বয়স বেশ কম। সে কিছু বলল। মহিলা পিছন ফিবে তাকিয়ে দেখলেন। তিনিও কিছু বললেন। মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে আবাব কিছু বলল। মহিলা ঘবের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গোগোল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ও যা ভয় পেয়েছিল, তা ঘটে নি। এবার লক্ষ্য করে দেখল, একপাশে চেয়ার রয়েছে। নিশ্চয়ই বঙ্কিমদা চেয়াবটা বেখে গেছে। ও বসল। খববেব কাগজ বা গল্পের বই কিছুই নেই। গোগোল তা আনতে গেল না. এখন ওর কিছুই পড়তে ইচ্ছে করছে না।' ও এই প্রথম আবিষ্কার কবল, ওদেব বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে অনেক বাগান, গাছপালায় চারদিক সবুজ, আর নানারকম পাখির জটলা। আর সব কিছুই ও উঁচু থেকে দেখছে।

এক সময়ে বঙ্কিমদা এসে বলল, 'গোগোল, মা ডাকছেন, আজ তুমি চান করবে। জল গরম করা হয়ে গেছে।'

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কটা বেজেছে ?'

'সাড়ে এগারটা বেজে গেছে।' বঙ্কিমদা বলল, 'আর দেরী করো না। তাড়াতাড়ি চলে এস।'

বঙ্কিমদা চলে গেল। গোগোল পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে দেখল। চুপচাপ, নিঝুম বাড়ি। কেবল কয়েকবার কয়েকটি গাড়ি, বাড়ির ভেতরের চত্বরে যেতে আসতে দেখা গেছে। ওকে চেয়ার ছেড়ে উঠে, ঘরের ভেতর যেতেই হল। তবে ও বেশ স্বস্তি বোধ করছে। গতকাল সন্ধ্যায় লোকটা যে-ভাবে মহিলাকে মারছিল, তারপরেও তাঁকে আজ দোতলার পুবের

ব্যালকনিতে দেখা গেছে। ও ভয় পেয়েছিল, হয়তো মরেই যাবেন। তা যান নি। আজ এতখানি বেলা পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটতে দেখা গেল' না। অবশ্য ভেতরে কিছু ঘটে থাকলে, গোগোলের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাই মনে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই গেল।

বিকেল প্রায় পৌনে চারটের সময় গোগোল দুধ মিষ্টি আর ওষুধ খেয়ে, পশ্চিমের ব্যালকনিতে এল। আসবার আগে মা আজও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজও তুমি এবেলা ওদিককার ব্যালকনিতে যাচ্ছ? বন্ধুদের খেলা দেখবে না?'

গোগোল মাকে বলে এসেছে, 'আমার ওদিককার বারান্দায় বসতেই ভাল লাগে।'

মা আর কিছু বলেন নি। গোগোল পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে দেখল। কারোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পুবের দুটি ব্যালকনির দুই দরজা আর দুই জানালাই বন্ধ। দক্ষিণের মস্ত বারান্দাও ফাঁকা। সেই মহিলাকে একবার দেখতে পেলেই, গোগোল নিশ্চিন্ত। মহিলা তো ওর পিসতুতো বা খুড়তুতো দিদিদের থেকে বেশী বড় নন। লোকটার ওইরকম সাংঘাতিক মার দেখেই, ওর মনটা সব সময় একটা দুশ্চিন্তা ছেয়ে থাকে।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। গোগোলের চোখ পড়ল পাঁচ নম্বর বাড়ির বাগানে। দেখল, গতকালের দেখা সেই কাজের স্ত্রীলোকটি। তার সঙ্গে সেই প্যান্ট আর সাধারণ একটা জামা পরা লোকটিও। দুজনেই বাগানে গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে কী সব কথা বলছে। স্ত্রীলোকটিই বেশী কথা বলছে, আর হাত দিয়ে দোতলার দিকে দেখাচ্ছে। তাদের দুজনের হাবভাব দেখলেই মনে হয়, যেন কিছু একটা গোপন রহস্যময় ঘটনা নিয়ে কথা বলছে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দুজনেই বাগান থেকে বাড়ির দিকে চলে গেল

গোগোল অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর মাথায় কিছুই এল না। আরও প্রায় আধঘণ্টা পরে গোগোলের দৃষ্টি পড়ল দক্ষিণের বড় বারান্দার দিকে। ওদিকে তাকিয়েই, ও সজাগ হয়ে উঠল। দেখল সেই পিশাচ লোকটা, আর তার সঙ্গে গতকালের সেই সালোয়ার কামিজ পরা, ছোট করে কোঁকড়ানো চুল ছাঁটা মহিলা। তবে আজ মহিলা সালোয়ার কামিজ পরেন নি। ঘন নীল রঙের শাড়ি পরেছেন। দুজনের মধ্যেই কিছু কথা হচ্ছে। এ দুজনের ভাবভঙ্গিও কেমন যেন রহস্যময়। গোগোল দূরে থাকলেও, বুঝতে পারছে, দুজনের মধ্যেই চুপি চুপি কথা হচ্ছে। লোকটি

মহিলাকে ঘরে ঢোকবার দরজার দিকে দেখিয়ে কিছু বলল। মহিলা ঘাড় কাত করে জানিয়ে দিলেন, তিনি বুঝেছেন। লোকটা বাঁ হাত তুলে তার ঘড়ি দেখিয়ে কিছু বলল। মহিলাও তাঁর বাঁ হাত তুলে নিজের ঘড়ি দেখে, যেন কিছু জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে লোকটা কিছু বলল। আবার দরজার দিকে দেখিয়ে, হাত তুলে দরজা ধাক্কা দেবার ভঙ্গি করে দেখাল। মহিলা ঘাড় কাত করে আগের মতই জানিয়ে দিলেন, লোকটার কথা তিনি বুঝেছেন। লোকটি আরও কয়েকটি কথা বলে, বারে বারে আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিয়ে, ঘরের ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

গোগোল কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেল। মহিলা একলা বারান্দায় রইলেন। আর লোকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল? কেন? তারপরেই ওর চোখে পড়ল, মহিলা চেয়ারে বসলেন। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই আবার উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপরে একটা রঙীন পত্রিকা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পড়তে পারলেন না। টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি যেন কেমন ছটফট করছেন। পায়চারি করছেন, আর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেন কান খাড়া করে কিছু শোনবার চেষ্টা করছেন।

গোগোল আবার চমকে দোতলার পুবের ব্যালকনির দিকে তাকাল। দেখল, একটা ব্যালকনির দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। কিন্তু কে খুলল, তা দেখা গেল না। যেন বাতাসে খুলে গেল। অথচ বাইরে তেমন বাতাসও নেই। দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। নিশ্চয়ই কেউ এমনভাবে খুলে দিয়েছে যাতে তাকে দেখা না যায়। গোগোল আরও লক্ষ্য করল, ঘরের ভেতরটা অন্ধকার মত। খোলা দরজার সামনে অল্প একটুখানি মোজাইকের মেঝে দেখা যাচ্ছে। ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

দক্ষিণের বারান্দায় মহিলা ঘন ঘন তাঁর হাতের ঘড়ি দেখছেন। গোগোল আর স্থির থাকতে পারল না। ওর মনে হল, নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকল। জানে, মা এখন দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসে আছেন। বঙ্কিমদা হয়তো রান্নাঘরে। নয়তো বাইরে গেছে। ও বাবার ঘরে ঢুকে, আগেই টেলিফোন গাইডটা টেবিলে রেখে পাতা ওলটাল। তারপর একটা পাতায় নজর করে, দু সেকেণ্ড দেখল। সরে গিয়ে, টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল। ডায়াল করার সময় ওর হাত কাঁপছিল। দু-তিন সেকেণ্ড পরেই

টেলিফোনের ওপার থেকে গম্ভীর গলা ভেসে এল, 'হ্যালো ?'

গোগোলের গলার স্বরও যেন কেঁপে উঠল, বলল, 'হ্যালো, এটা কি পার্ক স্ট্রিট থানা ?'

জবাব এল, 'হ্যাঁ।'

গোগোল বলল, 'শুনুন, ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলায় ভয়ংকর কিছু ঘটছে। আপনারা শীগ্‌গির চলে আসুন। মনে হয় একজন মহিলা খুব বিপদে পড়বেন।'

টেলিফোনের ওপার থেকে সেই গম্ভীর গলা ভেসে এল, 'গলা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার নাম কী ?'

'আমার নাম গোগোল।' বলেই গোগোল জিভ কেটে, আবার বলল, 'না না আমার নাম গোগোল নয়। আমার নাম···হ্যালো হ্যালো···।'

টেলিফোনের ওপাব থেকে তখন লাইন কেটে দিয়েছে। গোগোল রিসিভার নামিয়ে রেখে ছুটে গেল পশ্চিমের বারান্দায়। অবস্থা তখনও একবকমই। দক্ষিণের বারান্দায় মহিলা ছটফট করে পায়চারি করছেন, আব ঘড়ি দেখছেন। পুবের ব্যালকনির দরজা তেমনি খোলা। ভেতরের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। গোগোল বারবার দেখছে বারান্দার মহিলার দিকে। আর একবার পুবের ব্যালকনির খোলা দরজার দিকে। মনে ওর জিজ্ঞাসা, পুলিশ আসবে তো ? হঠাৎ ওরকম লাইন কেটে দিল কেন ? ওকে বিশ্বাস করে নি ? পুলিশ যদি ওর টেলিফোন পেয়েই বেরিয়ে পড়ে, তা হলে ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটে পেঁছুতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী লাগা উচিত নয়।

গোগোল হঠাৎ চমকে উঠে দেখল, পুবের ব্যালকনির খোলা দরজার অনেকটা ভেতরে একটা যেন আগুনের ঝলক দেখা গেল। দেখা দিয়েই সেটা মিলিয়ে গেল আরও ভেতরে। ঠিক তখনই বারান্দার মহিলা ওঁর হাতের ঘড়ি দেখে, দরজায় দুহাত দিয়ে জোরে জোবে ধাক্কা মারতে লাগলেন। ওঁনার গলার স্বর গোগোল স্পষ্টই শুনতে পেল, 'দরোজা খোলো, মমতা ! দরোজা খোলো।'

গোগোলের নজর গেল সেই মুহূর্তেই নীচের দিকে। পাঁচ নম্বর বাড়ির নিচের চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে পুলিশের অয়ারলেস লাগানো জীপ। একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসারের সঙ্গে আরও কয়েকজন লাফিয়ে নামলেন। সকলেই বাড়ির নীচের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। গোগোল আর তাঁদের

দেখতে পেল না।

গোগোল রেলিংয়ের কাছ থেকে সরে এল। ও যে-ভাবে কাঁপছে, হয়তো নিচেই পড়ে যাবে। বারান্দার মহিলা তখনও দরজায় ধাক্কা দিয়ে মমতা নামে একজনকে ডেকে চলেছেন। বাগানে ছুটে এল সেই স্ত্রীলোকটি। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখেই আবাব ছুটে চলে গেল ভেতবে।

দক্ষিণেব বারান্দাব দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন কনেস্টবলকে। মহিলা কী যেন বললেন। কনেস্টবলও কিছু বললেন। শুনেই মহিলা ঘরের ভেতবে ছুটে গেলেন। গোগোল দেখল, বাড়িটাব নিচের চত্বরে অনেক মহিলা পুরুষ জড়ো হয়েছেন। তাঁদের সকলের দৃষ্টি দোতলাব দিকে। সকলেই উত্তেজিত ভাবে কিছু আলোচনা করছেন।

প্রায় দশ মিনিট পবে, গোগোল দেখল, কাপড় চোপড় দিয়ে সাবা গা ঢাকা দিয়ে পুলিশ একজনকে জীপের পেছনে তুলল। মুখটা ভাল কবে দেখা গেল না। জীপ বেবিয়ে গেল। আরও পনের মিনিট বাদে, ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে এল ফায়াবব্রিগেডেব গাড়ি। কিন্তু আগুন লাগাব কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

গোগোলের খেয়াল নেই, কখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাঁচ নম্বর বাড়িব চত্বরে লোকজনের ভিড় রয়েছে। ও সেদিকেই তাকিয়ে আছে। আজও বাবার ডাকেই গোগোল সম্বিত ফিবে পেল। তবে বাবা ওকে বকলেন না। খালি বললেন, 'অনেকক্ষণ তো এদিকটা দেখলে। এবার ঘবে এস।'

•

সাতদিন কেটে গেছে। গোগোল আবাব নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করছে। কিন্তু ডোভস নেস্ট্ স্ট্রীটের পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলায় কী ঘটেছে, কিছুই জানতে পারল না। খবরের কাগজেও কোন খবর ও খুঁজে পায় নি। কিন্তু ঠিক আটদিন পরে, সন্ধ্যেবেলা গোগোলদের ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল। গোগোল তখন নিচের থেকে খেলে এসে, পড়তে বসতে যাচ্ছিল। বাবাও একটু আগেই অফিস থেকে ফিবেছেন। গোগোল বাইবেব ঘবে মোটা আর গম্ভীর গলা শুনতে পেল, 'আপনার ছেলের নাম কি গোগোল?'

বাবার গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'সব বলব।' সেই মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'আমি পার্ক স্ট্রীট থানার অফিসার ইনচার্জ। আপনাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। গোগোলকে একটু ডেকে দিন।'

গোগোল তখন বাবা মা'র ভয়ে চুপসে গেছে। তবু ও নিজেই ঘর

থেকে, বাইরের ঘরে এল। বাবা ওকে দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার ছেলে গোগোল।'

থানার ও. সি. এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে গোগোলের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে গোগোলের ডান হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। বললেন, 'তোমাকে খুঁজে বের করতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি ডোভস্ নেস্ট্ স্ট্রিটের কোন বাড়ির ছেলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর তোমার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। প্রথমেই বলি সেদিন টেলিফোন করে, তুমি একজন মহিলার জীবন বাঁচিয়েছ। আর একটু দেরী হলে, তিনি এত বেশী পুড়ে যেতেন, বাঁচানো যেত না। আসলে মহিলা আত্মহত্যা করতে যাননি। তাঁর স্বামী আর বোন, দুজনে ষড়যন্ত্র করে, তাঁকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আর ভেবেছিল প্রমাণ করবে, মহিলা আত্মহত্যা করেছেন।'

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ ও. সি. কী ব্যাপার বলুন তো?'

ও. সি. বললেন, 'আমার যা বলার বললাম। এবার গোগোলই আমাদের সব কথা বলবে। এস গোগোল, আমরা বসি। আপনারাও বসুন।'

গোগোল তখনও বাবা মায়ের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছে। হয়তো তাঁরা রাগ করছেন। কিন্তু বাবা হঠাৎ হেসে বলে উঠলেন, 'হুঁ, এইবার বুঝেছি, গোগোল কেন পশ্চিমের ব্যালকনি ছেড়ে নড়তো না।'

মাও গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গোগোল বড় সোফায় ও. সি.-র পাশে বসে, ওর পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে দেখার ঘটনা বলতে লাগল। আর বাকীরা সবাই অবাক ও চমৎকৃত হয়ে শুনতে লাগলেন।

টেলিফোনে আড়ি পাতার বিপদ



গোগোল মুখে একটা চাব-পাঁচ ইঞ্চিব উড পেন্সিল চেপে ধবল ঠিক সিগাবেটেব মতো। বাবা যেমন করে সিগাবেট খান, ঠিক সেই ভাবে' মায়েব ঘবে ও দাঁড়িয়েছিল। মা যে ড্রেসিং টেবিলেব আয়নাব সামনে দাঁড়িযে জামা কাপড়-পবেন, সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। উড পেন্সিলটাকে সিগাবেটেব মতো কবে টানল। বাবা যেরকম ভাবে সিগাবেট খান। তাবপব ধোঁয়া ছাড়াব মত কবে ঠোঁট সরু কবল। গম্ভীব মুখে হেসে-হেসে বলল, 'শোনো গোগোল, এখন ডিউস বল নিয়ে ক্রিকেট খেলাব বয়স তোমার হয়নি। আব একটু বড় হও, হাত পা শক্ত হোক। প্যাড পবে খেলাব সময় আসুক। তখন ডিউস বল কিনে দেব। এখন ডিউস বলেব চোট লাগলে পা, হাঁটু ফেটে যেতে পারে। বুঝেছ? দেখছো তো, তোমাব বন্ধু সুজিতেব কি হয়েছিল। ডিউস বল চিবুকে লেগে, চিবুকটা এমন কেটে গেছল, স্টিচ দিতে হয়েছে তিনটে। আব আমি যদি কিনেও দিই, তোমাব মা—।'

গোগোল এই পর্যন্ত বলার পরই পিছনের দবজাব কাছ থেকে খিলখিল হাসি ভেসে এল। গোগোল চমকে পেছন ফিরে তাকাল। মা দরজার

কাছে দাঁড়িয়ে, মুখে কাপড় চেপে হাসছেন। গোগোলের সঙ্গে মায়ের চোখাচোখি হতেই, ও লজ্জা যেমন পেল, তেমনই রাগও হল। পেন্সিলটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে, বিছানাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ গুঁজল। পা দাপিয়ে বলল, 'কেন তুমি এসেছ ? কেন তুমি আমার কথা শুনলে ?'

কথাগুলো বলতে বলতে গোগোলের চোখে জল এসে পড়ল। গলার স্বরে কান্না। মা হাসতে হাসতে পেছন থেকে এসে খাটে বসলেন, 'তা আমি কি জানতুম নাকি এ সময়ে তুমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাবাকে নকল করছ ?'

গোগোলের ধরা পড়ার লজ্জা আরও বেড়ে গেল। ও আরও মুখ গুঁজে মাথা ঝাঁকিয়ে কেবল বলতে লাগল, 'না, না, না।'

মা গোগোলের মুখ ফেরাবার চেষ্টা করে বললেন, 'আচ্ছা, আমি বাবাকে কিছু বলব না কিন্তু বাবা তো তোমাকে ভাল কথাই বলেছেন। যে বয়সের যা। সুজিতের কথা সে জন্যই তিনি বলেছেন। তবু ডিউস বল সোজা এসে সুজিতের চিবুকে লাগেনি। ব্যাটে লেগে বল ছিটকে ওপরে উঠে চিবুকে লাগতেই ওরকম ফেটে গেছে। তা হলেই বোঝো। ঐ বল যদি সোজা এসে ওর পায়ে বা হাঁটুতে লাগত, কি হত ? তুমি যে রাতারাতি বড় হতে চাও। এমনিতেই রবারের হার্ড বলগুলো দিয়ে যখন খেল, আমার ভয় লাগে' ওগুলো কি কম শক্ত ? ঠিক সময়ে বাবা তোমাকে ডিউস বল কিনে দেবেন। এখন ওঠো, যাও বন্ধুদের সঙ্গে ময়দানে খেলে এসো। তিনটে বেজে গেছে। এখনি সন্ধে হয়ে আসবে।'

শীতের দিন। ডিসেম্বরের প্রায় শেষ। ছুদিন বাদেই বড় দিন। এ সময় গোগোলকে বাড়ি থেকে এক ফার্লং দূরে ময়দানে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যেতে দেওয়া হয়। বিশেষ করে ছুটির দিনে। এখন তো অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর ছুটিই পড়ে গেছে। গোগোল মুখ ফেরাল। লাল মুখ, লাল ভেজা চোখ। বলল, 'বন্ধুরা সব ময়দানে চলে গেছে। জর্জ পারভেজ আমাকে ডেকেছিল, আমি যাইনি।'

মা বললেন, 'কেন যাওনি ? জর্জ পারভেজ কি ডিউস বল নিয়ে খেলতে গেছে ?'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

মা বললেন, 'তবে ? বড়দের যা দেখবে তাই তোমাকে করতে হবে, না ? এসব জেদ ভাল নয় গোগোল। অন্যায় আবদার করবে, আবার রাগও করবে ? এমনিতেই তো তুমি এমন সব কাণ্ড বাধিয়ে বসো, ভয়ে আমাদের

প্রাণ উড়ে যায়। হ্যাঁ রে গোগোল, তুই তো আমাদের একটা মাত্র ছেলে, তাই না? তোকে নিয়ে সব সময় কত চিন্তা করব বল দেখি?'

গোগোল মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মায়ের চোখ দুটো ছলছল করছে। দেখে গোগোলেরও মনটা টনটন করে উঠল। মাকে জড়িয়ে ধরে, তাঁর বুকে মুখ গুঁজল। মা ঠোঁট টিপে হাসলেন, আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। একা-একা তোমাকে আর ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে আজ ময়দানে যেতে হবে না। নীচে গিয়ে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করো। বঙ্কিমদা গিয়ে তোমাকে সময় হলে ডেকে নিয়ে আসবে।'

গোগোল বলল, 'মা, আজ আর নীচে খেলতে যাব না। জর্জের বোন জুলিকে একটা এক্সমাসের সান্টাক্লজ এঁকে দেব বলেছি। এখন সেটা আঁকব।'

মা বললেন, 'তা হলে তাই আঁকো। আমি যাই, তোমার বাবার বন্ধুরা গল্প করছেন। এঁদের খাবার তৈরী করে দেব। আমি দেখতে এসেছিলুম, তুমি খেলতে গেছ কি না।'

মা খাট থেকে উঠে দরজার দিকে গেলেন। গোগোলের মুখটা আবার লাল হয়ে উঠল। বলল, 'মা, বাবাকে যেন বোলো না।'

মা হেসে বললেন, 'বাবাকে তো তুমি বরাবরই নকল করো। সেটা কি নতুন নাকি? তবে হ্যাঁ, আজকের কথাটা বলব না। আজ তুমি বাবার ওপর রেগে ভেংচে দিচ্ছিলে।'

গোগোল জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, মা, আমি রাগ করিনি। আমি—আমার ইয়ে হয়েছিল।'

মা বললেন, 'বুঝেছি। দুঃখ, অভিমান হয়েছিল। ঠিক আছে, যাও, তুমি ছবি আঁকোগে। আমি চললুম।'

মা বেরিয়ে গেলেন। গোগোল মায়ের ঘরের ভেতর দিয়েই নিজের ঘরে গেল। ঘরের দেয়ালে লম্বা বোর্ডের উপর ক্রুসলি, আর বাঘের ছবিতে ভর্তি। আর আছে ওর নিজের আঁকা ছবি। গাছপালা, পাহাড়, নদী, পাখি, কি নেই? এমন কি হরিণ জল খাচ্ছে, তাও আছে। তবে হরিণটার শিংজোড়া ছাড়া বাকিটা গাধা না ঘোড়া না পাহাড়ী ছাগল, বোঝবার উপায় নেই। বাবা মাঝে মাঝে গোগোলের ঘরে ঢুকে নাকে হাত দিয়ে বলেন, 'উঃ বাঘের গায়ের চামসা গন্ধ বেরোচ্ছে।'

বাবা ওটা ঠাট্টা করে বলেন। পাঁচটা বাঘের রঙিন ছবি আছে। গোগোলের বাঘের ছবি খুব পছন্দ। বাঘের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর

মনে হয় ওরা কি নির্ভীক। কি দারুণ শিকারি। নিতান্ত দায়ে না পড়লে ওরা মানুষ মারে না। জিম করবেটের লেখা পড়ে ও তা জেনেছে। আর ব্রুসলি? ব্রুসলির 'এন্টার দ্য ড্রাগন' ওকে দেখতে দেওয়া হয়নি। ওটা নাকি বড়দের ছবি। কিন্তু ছবিটার গল্প ও বাবার কাছে শুনেছে। ব্রুসলির ক্যারাটের কথা শুনেই ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ঠিক যেন বাঘের মতোই দুর্দান্ত। তার চেয়েও বেশি। ব্রুসলি এমনভাবে চেন ঘোরায় রিভলবারের গুলিও নাকি ঠেকে যায়!

গোগোল ওর লম্বা দেরাজ টেনে ছবি আঁকবার বড় কাগজ বের করল। বের করলো রঙের বাক্স, তুলি। বড় পেন্সিল আর ইরেজার। কিন্তু ছোট পেন্সিলটা কোথায় গেল? মনে পড়ে গেল। সান্টাক্লজের মাথায় লাল টুপি আর লাল জামার হাতার বর্ডারে জুলি কি রঙ চায়? সোনালী না সাদা? সাদা চাইলে সাদা রঙ দিয়ে করা যাবে। সোনালি চাইলে সোনালি জরি কিনতে হবে।

গোগোলের কথাটা মনে আসতেই ও মায়ের ঘরের আর একটা দরজা দিয়ে বাবার ঘরে গেল. বাবার ঘর ঠিক শোবার ঘর নয়। পড়াশোনার ঘর। টেবিল চেয়ার, দুটো বইয়ের আলমারি। আর আছে একটা ডিভান। চেয়ারের পাশে একটা কাশ্মিরী ছোট টুল। তার ওপরে টেলিফোন। বাইরের ঘর থেকে বাবা আর তাঁর বন্ধুদের হাসি কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। গোগোল জুলিকে টেলিফোন করার জন্য, নিচু হয়ে রিসিভারটা তুলে নিল। হাত বাড়িয়ে ডায়াল করতে যাওয়ার আগে ক্রশ কানেক্শনের কথা শুনতে পেল।

গোগোল বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা নামাতে গিয়ে থমকে গেল। শুনতে পেল একটা মোটা খসখসে পুরুষের গলা, 'চুপ কর তো. টেলিফোনে একটা শব্দ শুনতে পেলে?'

জবাবে প্রায় তেমনি খসখসে কিন্তু একটু যেন খ্যানখ্যানে নাকি স্বর শোনা গেল, 'কই না তো? আপনি শুনতে পেয়েছেন?'

খসখসে মোটা স্বর শোনা গেল, 'মনে হল যেন খুট করে একটা শব্দ হল। কেউ আড়ি পাতছে কি না বুঝতে পারছি না।'

কথাটা শুনেই গোগোল রিসিভার নামিয়ে রাখতে গেল। কিন্তু ওর হাত আর কান যেন চুম্বকের মতো রিসিভারটা ধরে রাখল। মা বাবা কেউই ক্রসকানেকশন হলে, পরের কথা শোনা পছন্দ করেন না। আড়ি পেতে পরের কথা শোনা উচিত নয়। তাড়া থাকলে তুমি বলতে পারো 'দয়া করে

একটু তাড়াতাড়ি আপনারা কথা শেষ করবেন ? ক্রস হয়ে গেছে। আমার একটু জরুরী দরকার ছিল।' কিন্তু আড়ি পেতে পরের কথা শোনা অন্যায়। গোগোল সে কথা ভেবে রিসিভারটা নামিয়ে রাখবে ভাবল। তবু পারল না। সেই মোটা খসখসে গলা আবার শোনা গেল। 'কয়েক সেকেণ্ড ধরে রাখো তো। কথা বোলো না। নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাও কিনা দেখ। যদি সন্দেহ হয়, তবে রিসিভার নামিয়ে রাখো। আমি আবার ডায়াল করছি।'

গোগোল রিসিভারের মাউথপিসে আস্তে হাত চাপা দিল। ওর কেমন সন্দেহ হচ্ছে, লোক দুটো কোনো একটা ষড়যন্ত্র করছে। ও কিছুতেই কৌতূহল দমন করতে পারল না। প্রায় পনেরো সেকেণ্ড পরে, সেই খ্যানখ্যানে স্বর শোনা গেল, 'না স্যার, কোনো আওয়াজ তো পাচ্ছিনে। একেবারে ডেড মনে হচ্ছে।'

ওপার থেকে মোটা খসখসে চাপা স্বর শোনা গেল, 'আমিও শুনতে পাচ্ছিনে। হঠাৎ মনে হল, খুব আস্তে খুট করে একটা শব্দ যেন শোনা গেল। বোধহয় ভুল শুনেছি। সাবধানের মার নেই। বুঝেছ তো? এ কথা তোমার আর আমার মধ্যেই থাকবে। আর কোনো কাক-পক্ষীও জানবে না। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, কাজটা তোমাকে পঁচিশে ডিসেম্বর রাত্রেই সারতে হবে।'

খ্যানখ্যানে স্বর শোনা গেল, 'এ কথাটা তিনবার বললেন স্যার। পঁচিশে ডিসেম্বর মানে এক্সমাসের দিন। রাত্রি ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে কাজ সারতে হবে। কিন্তু কি কাজ, কোথায়, এখনও কিছুই বলেন নি।'

মোটা খসখসে স্বর বিরক্ত হয়ে বলল, 'এসব কাজে এত তাড়াহুড়ো করতে নেই। একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হয়। তুমি তো জানো, হিসেবের বাইরে ত্রিশ লাখ টাকার ক্যাশ যেটা আমরা আমাদের পার্টির কাছ থেকে পেয়েছি, সেই পার্টি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ওর হাতে এমন প্রমাণ আছে, আমরা ধরা পড়বই। তবে এ খবরও জানি, ও কয়েক দিন চুপচাপ থাকবে। পুলিশের কাছে বা ওর অডিটারকে খবরটা এখুনি দেবে না। পুরনো বছরের এই শেষ কটা দিন নিজেও বেশ ফুর্তি করবে, আমাদের ঘাঁটাতে যাবে না। নতুন বছরের দোসরা জানুয়ারি আচমকা আমাদের মাথায় কোপ বসাবে। অবশ্য লোকটার মুশকিলও আছে। নিজের অডিটারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই এত টাকা আমাদের ব্ল্যাক দিয়ে ফেলেছে। এ হিসেবটা ও দেখাতে গেলেই বিপদে পড়বে। আর ওর

অডিটর এখন দিল্লীতে গেছে। ফিরবে পয়লা জানুয়ারি। পুলিশের কাছে যাবার আগে ও অডিটরের সঙ্গে কথা বলবে। বুঝেছ? আমি চাই তার আগেই—।'

কথা শেষ হবার আগেই খ্যানখ্যানে স্বর শোনা গেল, 'লোকটাকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।'

কথাটা শুনেই গোগোলের হাত কেঁপে গেল। পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার মানে কী ও জানে। কিন্তু মাউথপীসে হাত চেপে ও রিসিভারটা শক্ত করে ধরে রইল। মোটা খসখসে চাপা গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, কথাটা মাথায় ঢুকেছে দেখছি।'

খ্যানখ্যানে স্বর শোনা গেল, 'এটা মাথায় ঢুকতে দেরি হবে কেন? কিন্তু আমি তো সে লোকের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার কিছুই জানিনে। চেহারা কেমন, বয়স কত—।'

মোটা খসখসে গলা বাধা দিয়ে বলল, 'আরে বাবা, আমি এত বোকা নই যে, সে সব তোমাকে বলব না। একটু ধৈর্য ধরে সব শোনো। তুমি কেবল ঘটনাটা বুঝেছ। নাম বললেই চিনতে পারবে। লোকটার নাম গগন হাজরা ওরফে বুলু হাজরা।'

খ্যানখ্যানে স্বর বলে উঠল, 'তাই বলুন! বুলু হাজরা। ঘাড়ে-গর্দানে মোটা চেহারা, দারুণ শীতেও পাজামা পরে আর পাতলা পাঞ্জাবীর বুকের বোতাম খোলা থাকে। গলায় সোনার হার।'

মোটা খসখসে স্বর শোনা গেল, 'ও তো একটা আস্ত শয়তান। ভাল মনে কারোর সঙ্গে কাজ করে না। অনেকের অনেক ক্ষতি করেছে। ওর বাড়ি হচ্ছে দুইয়ের এ, পার্ক টেরসে, পুরো দোতলা বাড়িটাই ওর। টেলিফোন নাম্বার হচ্ছে ডবল ফোর, ট্রিপল জিরো—।'

মোটা খসখসে স্বর শোনা গেল, 'এই তো, সবই জানো দেখছি। অবশ্য নাম্বারটা ওর নামে গাইডেই আছে। কিন্তু সে টেলিফোনটা ও খুলে রাখে। মানে ডিসকানেক্ট করে রাখে। আরও দুটো নাম্বার আছে। তবে টেলিফোন নাম্বারের দরকার নেই। বড়দিনের রাত্রে ওর বাড়িতে খুব বড় পার্টি হয়। সারা রাত্রি চলে। আমিও সেইদিন ওখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। যাবও ঠিক। তোমাকে সেই রাত্রেই ওকে—'

খ্যানখ্যানে স্বর শোনা গেল, 'বুঝেছি স্যার, আর বলতে হবে না। কিন্তু আমি যাব কী করে? আমার তো নিমন্ত্রণ নেই?'

মোটা খসখসে স্বর হেসে উঠে বলল, 'তুমি বুলু হাজরাকে এত চেনো,

আর এটুকুও জানো না, এক্সমাসের দিন রাত্রে ওর বাড়িতে এত ভিড় হয়। কে এল, কে গেল, কারোব লক্ষ্যই থাকে না। নীচের বিরাট হল ঘরে পার্টি হয়। এখন কথা হচ্ছে, সেই ভিড়েব মধ্যে তুমি ওকে—।'

খ্যানখানে স্বর শোনা গেল, 'ওব জন্যে ভাববেন না স্যার। ভিড়ের মধ্যে ভাল কাজ সাবা যায়। বাতিটাতি কিছুই নেবাতে হবে না। আমি ঠিক কাজ সেবে চলে আসব। আপনি খালি দেখবেন, আমাকে কেউ বিশেষ কবে লক্ষ্য করছে কি না। আমি যখন কাজ সারব, তখন কেউ টের পাবে না। কিন্তু স্যাব, একটা কথা। আপনি কলকাতার নামজাদা বাবু মল্লিক। আপনাব বউ ছেলেমেয়ে সব আছে। বুলু হাজরা বেচারিরও তিনটে ছেলে মেয়ে আছে। সব আট দশ ছ' বছবেব মধ্যে বয়স। লোকটাকে একেবারে সরিয়ে না দিয়ে অন্যভাবে—।'

মোটা খসখসে স্বর রেগে গেল, 'তুমি একটা পাকা খুনি, কালীকান্ত বাগাল তোমার নাম। লোকে তোমাকে সাইমন বলে জানে। তোমাব হঠাৎ এত দয়া কিসের?'

খ্যানখ্যানে স্বরে হাসি শোনা গেল। বলল, 'না, আমাব দয়ামায়া নেই স্যার। একবার আপনাকে ভাবতে বলছি।'

মোটা খসখসে স্বব রেগে বলল, 'সব ভাবাভাবি আমার হয়ে গেছে তুমি কাজটা করবে কিনা বলো।'

খ্যানখ্যানে স্বর বলল, 'নিশ্চয় করব স্যার। আপনার কাজ তো আগেও করেছি।'

মোটা খসখসে স্বর শোনা গেল, 'ঠিক আছে। আব কোনো কথা নয়। পঁচিশ তারিখ রাত্রে কাজ সেবে, পবেব দিন বিকেলে তুমি আমার গলফ গ্রীনের ফ্ল্যাটে দেখা কববে। ওখানে আমার যাতায়াত কম। বাড়িও নয়, অফিসও নয়। তুমি সেখানে আসবে। ঠিক আছে?'

খ্যানখ্যানে স্বর শোনা গেল, 'ঠিক আছে।'

মোটা খসখসে স্বর এবার মোলায়েম শোনাল, 'উইশ ইউ গুড লাক।'

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। গোগোল তখনও রিসিভারটা ধরে আছে। ওর কানে গেল ডায়ালটোনের গড়গড় শব্দ। ও চমকে উঠে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। জুলিকে টেলিফোন করার কথা আর মনে নেই। ছুটে গেল নিজের ঘরে। ড্রয়ার থেকে খাতা আর কলম বের কবে আগে লিখল, 'ডুয়ের এ পার্ক টেরাস। বুলু হাজরা—গগন। দোতলা বড় বাড়ি। বগলাকান্ত বাগাল—সাইমন। বাবু মল্লিক।'

কলমের গোড়াটা কামড়ে ধরে আরও কিছু মনে করার চেষ্টা করল। তারপরেই লিখল, 'ফোন নাম্বার ফোর ফোর, জিরো জিরো জিরো—' তারপর ? তারপর তো আর বলেনি ? অবশ্য বলেও কোন লাভ ছিল না। বুলু হাজরা ঐ নাম্বারের টেলিফোনটা ডেড করে রাখে। তবে টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে নাম্বারটা পাওয়া যাবে।

গোগোলের মাথায় কথাটা আসতেই ও আবার বাবার পড়ার ঘরে দৌড়ে গেল। টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা খুলে হাজরা বের করল। পেয়েও গেল, 'হাজরা গগনচন্দ্র। তুয়ের এ পার্ক টেরাস। কলিকাতা-১৭। এই কলিকাতা ১৭ টাই ও জানতে চেয়েছিল। ডাইরেক্টরি রেখে আবার ছুটে গিয়ে সেটা লিখে ফেলল। তারপর সেই লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইল। আর ভাবতে লাগল, একটা লোককে বড়দিনের রাত্রে মেরে ফেলা হবে। তার বউ আর তিনটি ছোট ছেলে মেয়ে আছে। একথা মনে হতেই ওর মনটা ছটফট করে উঠল। বাবাকে মেরে ফেললে ছেলে মেয়েগুলোর কি হবে ? জুলির জন্য সাণ্টাক্লজের ছবি আঁকা গোগোলের মাথায় উঠে গেল।

গোগোলের ডেস্কের ওপর ছবি আঁকার কাগজ। রঙের বাক্স আর তুলি। পেন্সিল আর ইরেজার। নেই রঙ গোলবার প্লেট আর জলের গেলাস। কিন্তু সেদিকে ওর একটুও খেয়াল নেই। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। উঠে বাতি জ্বালাবার কথাও মনে নেই। যে কাগজে নামগুলো টুকেছিল সেটাই ওর সামনে ছবি আঁকার কাগজের ওপর রয়েছে। অন্ধকারে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু যা-যা টুকেছিল, সব ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। আর সে কথাগুলোই মনে মনে আওড়াচ্ছে, 'তুয়ের এ পার্ক টেরাস। বুলু হাজরা, গগন। দোতলা বড় বাড়ি। বগলাকান্ত বাগাল, সাইমন বাবু মল্লিক। ফোন নাম্বার ফোর ফোর জিরো জিরো জিরো—' তারপরে আবার হাজরা গগনচন্দ্র। তুয়েব এ পার্ক টেরাস। কলকাতা-১৭।'

অন্ধকারে একলা ঘরে ভূতের মতো বসে গোগোল এক আজব কল্পনায় মেতেছে। বাবু মল্লিক আর সাইমনের চেহারাটা কেমন হতে পারে ? বুলু হাজরার চেহারার কথা ও টেলিফোনেই শুনেছে। ঘাড়ে গর্দানে মোটা চেহারা। খুব শীতেও পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকে। পাঞ্জাবির বোতাম লাগায় না। গলায় সোনার হার আছে। কিন্তু লোকটার গায়ের রঙ কালো না ফর্সা ? মাথায় চুল আছে, না টাক পড়েছে ? লম্বা না বেঁটে ? সাইমন খ্যানখ্যানে গলায় বলেছে, লোকটা আস্ত শয়তান, নয় ?

গোগোলের হঠাৎ মনে হল, বাবু মল্লিকের আসল নাম কি বাবু? মনে হচ্ছে না। যেমন বুলু হাজরা আসলে গগনচন্দ্র হাজরা। বগলাকান্ত বাগাল যেমন সাইমন। সাইমন কেন? ওটা তো সাহেবি নাম। ঐ নামেই নাকি তাকে সবাই জানে। বগলাকান্ত বাগাল কেমন করে সাইমন হয়, গোগোলের মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু ও রকম গলাব স্বর সে শুনেছে। বাবাব দূর সম্পর্কে এক দাদা তার নাম চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁব মেয়ে মৃদুলা, ডাক-নাম চুটকি। চুটকিদির বিয়ে হয়েছে গ্রে স্ট্রিটের কাছে এক বিরাট বড়লোকের বাড়িতে। ষেই বাড়িতে মন্দিবে অন্নপূর্ণাব মূর্তি আছে। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে চুটকিদিব শ্বশুব বাড়িতে গেছে। অন্নপূর্ণা পুজোর দিন। চুটকিদির এক দেওরেব নাম বিকাশ চট্টোপাধ্যায়। বোগা, লম্বা, চোখদুটো কটা। মুখে সব সময় হাসি। বিকাশদাব গলার স্বর ঠিক সাইমনেব মতো খ্যানখ্যানে। ভাল কথায যাকে বলে সানুনাসিক। গোগোল আজ পর্যন্ত যতজন আমেরিকানকে দেখেছে, তাঁদেব বেশির ভাগ লোকের গলাও ঐ বকম খ্যানখ্যানে শোনায়। সাইমনেব চেহাবা কি বিকাশদাব মতো? বিকাশদা তো একেবাবে নিপাট ভাল মানুষ। অন্নপূর্ণাব মন্দিরে কোনো উপলক্ষে পাঁঠাবলি হলে বিকাশদা সেখানে থাকেন না। তিনি বক্তপাত দেখতে পাবেন না। মাংসও খান না। আব সাইমন নিজেব হাতে মানুষকে পৃথিবী থেকে সবিয়ে দেয়। না, এভাবে মানুষেব চেহাবা কল্পনা কবা যায় না। গলাব স্বর শুনে কি মানুষের চেহাবাব কথা ভাবা যায়? .

বাবু মল্লিকেব মোটা খসখসে স্বব। শুনলেই মনে হয়, মোটাসোটা গাবদা চেহারাব লোক। অনেকটা বুলু হাজবার মতো। অথচ গোগোলেব বিল্ডিংয়ে পাঁচতলায় প্রফেসার তালুকদাবের গলা অবিকল যেন বাবু মল্লিকের মতো। কিন্তু মিঃ তালুকদাব ফর্সা, রোগা, খাটো। বড় বড় চোখ, খাড়া নাক। এত ফর্সা, গাল লাল দেখায়। চোখে চশমা। মাথাব চুল সাদা কালো মেশানো। একটা কলেজের তিনি ফিজিক্সের প্রফেসব। গোগোল তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাঁর গলা শুনলে ভয় লাগে। ঐ ছোটখাটো শরীরেব মানুষ, অথচ গলার স্বর যেন হাঁড়ির ভেতব থেকে মোটা হয়ে ভেসে আসে। আর খসখসে শোনায়। গোগোলকে বাবা মা একবার উৎপল দত্তর শেক্সপিয়রের নাটক 'ম্যাকবেথ' দেখাতে নিয়ে গেছলেন। গোগোল প্রায় কিছুই বুঝতে পারে নি। ম্যাকবেথ সেজেছিলেন উৎপল দত্ত। তাঁর গলাটা ঐ রকম মোটা আর খসখসে শুনিয়েছিল। অভিনয়

হয়েছিল ইংরেজিতে।

উৎপল দত্ত কি ইচ্ছে করেই ঐ রকম স্বরে কথা বলেছিলেন? যেন ম্যাকবেথের গলার স্বর ঐ রকম ছাড়া, অন্যরকম হতেই পারে না। গোগোলের তা মনে হয়েছিল। শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ গোগোল পড়েনি। শেক্সপিয়রের নাটকের ইংরেজি ও ভাল বুঝতে পারেনি। তবে কিছু কিছু কথা বুঝতে পেরেছিল। ম্যাকবেথ তাঁর রাজাকে হত্যা করেছিলেন। যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে, ডাইনিরা তার মাথায় এটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। উৎপল দত্তর খসখসে মোটা গলা খুব মানিয়েছিল।

প্রফেসর তালুকদার আর উৎপল দত্তর চেহারায় একটুও মিল নেই। তাহলে বাবু মল্লিকের চেহারা কেমন হতে পারে? হয়ত এ দুজনের কারোর মতোই নয়। কিন্তু গোগোল চেহারার কথা ভাবছে কেন? ও তো বাবু মল্লিক আব সাইমনকে খুঁজতে বেরোতে যাবে না?

আচ্ছা, লোকেরা এরকম হয় কেন? তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা চাই। মানুষকে খুন করা চাই। ভাবলে কী রকম খারাপ লাগে। আর মনের মধ্যে একটা জেদ চাপে, এটা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যারা এসব করে, তাদেব কি দয়া-মায়া নেই? তাদেরও তো গোগোলের মতো ছেলে আছে। মেয়েও আছে। ছেলেমেয়েদের কথা কি ওসব লোকেরা একটুও ভাবে না? ছেলেমেয়েরা জানতে পারলে নিজেদের বাবাকে কী ভাববে? ইশ, কী খারাপ কথা।

গোগোল শুনতে পেল, বাবা মাকে বলছেন, 'তা হলে চলো, আমরা ঘুরে আসি। এঁরা যখন এত চেপে ধরেছে, নাটকটা দেখেই আসা যাক। এটা বড়দের নাটক। গোগোলের যাওয়া চলবে না। তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমি এই পাজামা-পাঞ্জাবির উপর একটা গরম শাল চাপিয়ে নেব।'

কথাগুলো কানে আসতে গোগোল টুকে রাখা কাগজটা নিজের হাফ প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। লাফ দিয়ে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। মা ঢুকলেন ঘরে। গোগোল তখন ওর ডেস্কের সামনে। মা এগিয়ে এলেন সেখানে। অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী! কাগজে একটা দাগও যে পড়েনি। জুলিকে সান্টাক্লজ এঁকে দিবিনে? এতক্ষণে বসে বসে কী করছিলি?'

গোগোল মায়ের কথায় থতমত খেয়ে গেল। বোকার মত হাসল। মিথ্যে কথা বলতে মুখ সরল না। মা হেসে উঠে বললেন, 'সান্টাক্লজের ছবি তো তোর কাছে আছে। সেটা দেখেই আঁক না কেন?'

সাণ্টাক্লজের ছবি কোথায় আছে গোগোল জানে। না দেখেই ও ছবিটা আঁকতে পারবে। মায়ের বোধহয় সে কথাটা মনে নেই। বেঁচে গেল, মাকে মিথ্যে কথা বলতে হল না। ডেস্কের দেরাজ খুলে সাণ্টাক্লজের ছবি খুঁজতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু মা যদি ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেন, তা হলে এত সহজে রেহাই দিতেন না। কারণ ওর চোখে-মুখে তখন একটা চাপা উত্তেজনা। সাণ্টাক্লজের ছবি আর জুলি, কিছুই ওর মাথায় নেই। আগামী পরশু দিনই বড়দিন। মা বললেন, 'শোন গোগোল, আমি আর তোর বাবা, বাবার বন্ধুদের সঙ্গে একটা নাটক দেখতে যাচ্ছি। বড়দের নাটক, তোর দেখার মতো নয়। আমাদের ফিরতে-ফিরতে সাড়ে ন'টা বেজে যাবে। খিদে পেলে বঙ্কিমদাকে খেতে দিতে বলবি, বুঝলি?'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তবে ছবিটা আজ আমি না-ও আঁকতে পারি।'

মা তখন তাঁর ঘরে চলে গেছেন। সেখান থেকেই বললেন, 'সে তুই কী করবি, তুই জানিস। মোটের ওপর আর তোমার বাড়ি থেকে বেরনো চলবে না। কোনো ফ্ল্যাটেও গল্প করতে যাবে না।'

গোগোল বলল, 'না কেন যাব?'

পাশের ঘর থেকে মায়ের গলা ভেসে এল, 'যেন তুমি তা যাও না? কোনো ফ্ল্যাটে কিছু ঘটলেই তুমি ছুটে চলে যাও, এরকম অনেকবার হয়েছে। কিন্তু তুমি জানো, আমি ওসব একদম পছন্দ করিনে?'

মা কথাটা মিথ্যে বলেননি। কোনো ফ্ল্যাটে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনলেই ও ছুটে বেরিয়ে যায়। বাবা মা কেউ সেটা পছন্দ করেন না। বলেন, 'সব বিষয়ে তোমার এত কৌতূহল কিসের? পরের ঘরে কী জন্য হৈ-হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে, তোমার জানবার দরকার নেই। ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতো থাকবে।'

কথাগুলো সবই সত্যি। অথচ গোগোলের সব বিষয়েই কৌতূহল বড় বেশি। আর সেই জন্যেই ও এক-এক সময় মারাত্মক বিপদে পড়ে যায়। এই যেমন টেলিফোনের ক্রশ কানেকশনের কথা। কথাগুলো ও ভুলতে পারছে না। যত ওর কৌতূহল, ততই ভাবনা ধরিয়ে দিচ্ছে, কী করে ঘটনাটা ঘটে যাবার আগে সব জানিয়ে দেওয়া যায়। ওর মনের কথা মা-বাবা জানতে পারলে নাটক দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, ওকে এ বিষয়ে মাথা গলাতে দেবেন না।

মা শাড়ি-জামা বদলে গায়ের উপর লাল শাল জড়িয়ে এ-ঘরে এলেন। বললেন, 'আমরা বেরোচ্ছি। লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে থাকবে। বঙ্কিমদার কাছে যেন কোনো নালিশ শুনতে না হয়।'

গোগোল মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। ঘাড় কাত করে বলল, 'আচ্ছা।'

এ সময়ে বাবাও গোগোলের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'গোগোল, আমরা ঘুরে আসছি।'

গোগোল বলল, 'আচ্ছা'।

বাবা-মা দুজনেই ঘরের বাইরে চলে গেলেন। তারপরে সকলের একসঙ্গে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল। গোগোল চুপ করে বসে রইল। বসে থাকলে কী হবে। ওর মাথায় তখন একমাত্র ভাবনা, তিনটে লোকের যে-কোনো একজনের সঙ্গে টেলিফোনে কী করে যোগাযোগ করা যায়। বিশেষ করে বুলু হাজরার সঙ্গে। এ লোকটাকে সাবধান করে দিতে পারলে সব ল্যাটা চুকে যায়। কে কাকে টাকা-পয়সা ঠকাতে চাইছে, ধরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে, তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মেরে ফেলবে কেন?

গোগোল খানিকক্ষণ ভেবে, ডেস্ক ছেড়ে উঠল। বাইরের ঘরে এসে বঙ্কিমদাকে খুঁজল। দেখতে পেল না। খাবার টেবিলের সামনেও সে নেই। গোগোল রান্নাঘরে উঁকি দিল। দেখল, বঙ্কিমদা একটা খাতা খুলে কলম দিয়ে কিছু লিখছে। নয় তো দেশের বাড়িতে বাবা-মাকে চিঠি লিখছে।

গোগোল সেখান থেকে এসে, বাবার পড়ার ঘরে গেল। দেওয়ালে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। হাজরা গগনচন্দ্রের নামটা খুঁজে বের করল টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে। পকেট থেকে কাগজ বের করে পুরো টেলিফোন নাম্বার মিলিয়ে নিল। কিন্তু ডায়াল করল ওয়ান নাইন নাইন। বেশ খানিকক্ষণ বাজার পরে একজন মহিলার গলা শোনা গেল। গোগোল গগন হাজরার নাম্বারটা বলে বলল, 'দেখুন এ নাম্বারটা অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি। কিছুতেই পাচ্ছিনে। একটু দেখবেন?'

মহিলা গোগোলকে কত বড় ভাবলেন কে জানে। বললেন, 'দেখুন আমার মনে হচ্ছে, টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখা হয়েছে, নয় তো খুলে রেখেছে। টেলিফোন ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি।'

গোগোল বলল, 'তা হলে বোধহয় তাই হবে। থ্যাঙ্কু আন্টি।'

গোগোল রিসিভারটা নামিয়ে দিয়ে বাবার চেয়ারে বসল। বসে আকাশ-

পাতাল ভাবতে লাগল। আর ভাবতে ভাবতে ওর মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা খেলে গেল। বাবু মল্লিকের আসল নামটা শোনা নেই বটে। বগলাকান্ত বাগালের নামটা তো পুরোপুরিই শোনা আছে। যাকে সবাই সাইমন বলে জানে। সে কোথা থেকে বাবু মল্লিকের সঙ্গে কথা বলছিল? তার নিজের বাড়ি থেকে কি?

কথাটা মনে হতেই গোগোল টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা খুলল। 'বাগাল' পদবি খুঁজতে লাগল। বি এ জির মধ্যে একটাই মাত্র বাগাল পাওয়া গেল। রয়েছে 'বাগাল বৈদ্যনাথ'। এক্সচেঞ্জ থ্রি ফাইভ। গোগোল বাগাল পদবী কোনোদিন শোনেনি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, না অন্য কোনো জাত হবে? বৈদ্যনাথ বাগালের নাম্বারে কি একবার ডায়াল করে দেখবে? কী জিজ্ঞেস করবে? একটা কিছু বলতে হবে তো? টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপরে ঠিক করল যেই ধরুক, একমাত্র সাইমন না হলে, পরিষ্কার জিজ্ঞেস করবে, 'সাইমন আংকল আছেন?'

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ও রিসিভার তুলে বৈদ্যনাথ বাগালের নাম্বার ডায়াল করল। ওপারে ক্রিং ক্রিং বেজে উঠল। কয়েকবার বাজবার পরে, রিসিভার উঠল। একজন বুড়ো মানুষের মতো গলা শোনা গেল, 'হ্যালো?'

গোগোল জিজ্ঞাসা করল, 'সাইমন আংকল আছেন?'

ওপার থেকে জবাব এল, 'না তো। সাইমন তো একটু আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তুমি কে বলছ?'

গোগোলের বুকে তখন যেন একশোটা ঢাক বাজছে। সত্যি তা হলে সাইমনের খোঁজ পেয়েছে ও! কিন্তু ওপার থেকে যার গলা শোনা গেল, মনে হল বুড়ো নিরীহ মানুষ। গোগোল বলল, 'আমি কাছেই থাকি। আমাকে আপনি চিনবেন না।'

ওপার থেকে বুড়ো মানুষটির যেন হাসি হাসি গলা শোনা গেল, 'চিনব না মানে? আমার তো মনে হচ্ছে, তুই পিণ্টু কথা বলছিস। সাইমন-কাকুকে তুই আবার কবে থেকে আংকল বলছিস?'

গোগোল জবাব দিতে না পেরে, বোকার মত হাসল। বলল, 'সাইমন নামটার সঙ্গে আংকল বলতেই ভাল লাগে।'

বুড়ো ভদ্রলোকের হাসি-হাসি গলা শোনা গেল, বুড়ো ভদ্রলোক বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, হেসে হেসেই বললেন, 'তাই বুঝি? খুব

পেকেছিস দেখছি। দাঁড়া, কালই তোর বাবাকে বলছি। লেখাপড়ার নাম নেই, পাকামি শিখেছিস মেলাই। তা এখন সাইমন কাকুকে কী দরকার হল?'

গোগোল কোন উপায় না দেখে বলল, 'একটু দরকার ছিল।'

বুড়ো যেন রহস্য আর মজা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা দরকারটা কী আমাকে বলা যায় না?'

গোগোল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমি সাইমন কাকুকে একটা টেলিফোন নাম্বারের জন্য ডাকছিলুম। বাবু মল্লিকদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা একটু দরকার ছিল।'

বুড়ো ভদ্রলোক আবার একটু থেমে যেন অবাক হয়ে বললেন, 'বাবু মল্লিক? সে আবার কে?'

গোগোলেব একটু সন্দেহ হল, বুড়োমানুষটি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করছেন না। নিজেই আবার ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কথা বলছিস না কেন? বাবু মল্লিক বলে আমি কারোকে জানিনে। তবে একজন মল্লিককে জানি। তারই নাম বাবু মল্লিক কিনা, আমি জানিনে। তার নাম চরণদাস মল্লিক। ঐ নামে টেলিফোন থাকতে পারে।'

গোগোল বলল, 'ঠিক আছে দাদু।'

বুড়ো ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন, 'দাদু! আমার সঙ্গে বেল্লিকপনা হচ্ছে পিণ্টু? জ্যাঠাকে দাদু? দাঁড়া, কাল সকালে তোদের বাড়ি যাই। তারপরে মজা দেখাব। তুই কোথা থেকে টেলিফোন করছিস?'

গোগোল সহজেই বলে দিল, 'বাড়ি থেকে।'

বুড়োমানুষটি তৎক্ষণাৎ নিরীহ গলায় অবাক হয়ে বললেন, 'তোদের বাড়ি থেকে? ও! তোদের বাড়ির নাম্বারটা যেন কত? ভুলে গেছি।'

গোগোল কিছু না ভেবেই বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা বলে ফেলল। ফেলেই ওর জিভে কামড় লেগে গেল। এত সহজে মুখ ফস্‌কে কেমন করে বেবিয়ে গেল? ও তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, দাদু, ওটা আমাদের বাড়ির নাম্বার নয়।'

বুড়ো ভদ্রলোক নিজেই টেলিফোনের লাইন কেটে দিলেন। গোগোল দেখল, ও এই শীতে ঘেমে উঠেছে। রিসিভারটা ওর হাতের ঘামে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা নামিয়ে রেখে, আঙুল কামড়ে ধরল। বুড়োটা এত সহজে গোগোলকে বোকা বানিয়ে দিল? অবশ্য এটাও ঠিক, সাইমনের টেলিফোন নাম্বারটা ও পেয়ে গেছে। সেটাও মিথ্যে নয় তো?

বুড়োটাকে এখন রীতিমত ধড়িবাজ মনে হচ্ছে।

ভাবতে ভাবতেই ও সোজা হয়ে বসল। বাবার টেবিলের দেরাজ খুলে কলম বের করল। সেই কাগজের টুকরোয় তাড়াতাড়ি টুকে নিল, 'চরণদাস মল্লিক'। লিখে বুড়োর কথাগুলো মনে করতে চেষ্টা করল।

গোগোল এই পর্যন্ত মনে মনে আউড়েই টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা ওলটাল। চলে গেল, বি থেকে এম পাতায়। মল্লিক থেকে এ বি ছেড়ে সি-তে। পেয়েও গেল 'মল্লিক চরণদাস।' এক্সচেঞ্জ ডবল ফাইভ। ঠিকানা—২নং বেণীমাধব মিত্র লেন, কলকাতা-৬।

গোগোল চটপট চরণদাস মল্লিকের নাম, টেলিফোন নাম্বার আব ঠিকানাটা টুকে ফেলল। টেলিফোন ডাইরেক্টরি রেখে, গায়ের থেকে উলের সোয়েটার খুলে নিল। এখন ওর রীতিমত গরম হচ্ছে। ও কি এখন চরণদাস মল্লিককে টেলিফোন করবে? করে যদি বাবু মল্লিককে পায়, কী বলবে? সত্যি কথাটা বললে তো সব ভেস্তে যাবে। হযত বুলু হাজরাকে মাবার প্ল্যানটাই বদলে ফেলবে। হয়তো আজ রাত্রেই সব শেষ করে দেবে। তখন গোগোল আব কিছুই কবতে পাববে না এ সময় একজন বড় মানুষেব দবকাব। যেমন অশোক ঠাকুর। কিন্তু ওকে গোগোল পাবে কোথায়? উনি তো থাকেন কলকাতার বাইবে। বাড়িতে টেলিফোন আছে, কাব নামে আছে ও তা জানে না। তা ছাড়া, কলকাতার বাইরে টেলিফোন করতে হলে, আগে কী নাম্বারে ডায়াল কবতে হবে, ওর জানা নেই। সে লাইন অটোমেটিক, না, অন্য কোনো একস্‌চেঞ্জ ধরে জানতে হবে, কিছুই জানে না।

গোগোল তবু আবাব টেলিফোন ডাইরেক্টরি তুলে নিল। এখন অশোক ঠাকুর ছাড়া আব কারোর কথাই ওর মনে আসছে না। ও টেগোর, ঠাকুর খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও ঠাকুর বা টেগোর অশোক পেল না। অনেক খুঁটিয়ে দেখেও পেল না। গোগোল চুপচাপ বসে খানিকক্ষণ ভাবল। হাতে এখনও সময় আছে। কাল সারা দিন, সারা রাত্রি। পরশু সারা দিন। কিন্তু এমন খালি বাড়ি কি পাবে? বাবা মা নেই। ইচ্ছে মতো টেলিফোন কবতে পারছে। তাঁরা থাকলে, এভাবে টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘাঁটতে দেখলেই, একগাদা প্রশ্ন করবেন। গোগোল তখন ফ্যাসাদে পড়ে যাবে।

গোগোলের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হল না। ও রিসিভার তুলে নিল। বাবু মল্লিককে পাওয়া যায় কি না, একবার দেখলে ক্ষতি কী?

যেই বাবু মল্লিকের গলা শুনবে, রিসিভার নামিয়ে রাখবে। তবু জানা তো যাবে! ও রিসিভার তুলে, ডাবল ফাইভে, চরণদাস মল্লিকের নাম্বারে ডায়াল করল। ওপারে ক্রিং ক্রিং বাজছে। গোগোলের বুকে ধক্-ধক্ করছে। অনেকক্ষণ বাজার পরে, একজন টেলিফোন ধরল। খুব শান্ত মিষ্টি এক ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল, 'হ্যালো, কাকে চান?'

গোগোল ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, 'বাবু মল্লিক আছেন?' ওপার থেকে অবাক প্রশ্ন এল, 'বাবু মল্লিক? কত নাম্বার চান আপনি?'

গোগোল নাম্বারটা আবার বলল। ওপার থেকে ভদ্রলোকের অবাক শান্ত স্বর শোনা গেল, হ্যাঁ নাম্বারটা তো ঠিকই বলছেন। কিন্তু এ বাড়িতে বাবু মল্লিক বলে তো কেউ নেই?'

গোগোল ভুলেই গেছে, ও একজন অপরাধীর খোঁজ করছে। জিজ্ঞেস করল, 'এটা চরণদাস মল্লিকের বাড়ি নয়?'

ওপার থেকে অবাক শান্ত জবাব এল, 'হ্যাঁ, আমিই চরণদাস মল্লিক বলছি। কিন্তু এ বাড়িতে বাবু মল্লিক বলে তো কেউ নেই। আপনি কে বলছেন?'

গোগোল থমকে গেল। এমন একজন ভদ্রলোককে ঠকাতেও লজ্জা করছে। মিথ্যে কথাও বলতে পারছে না। ও আমতা আমতা করে বলল, 'আমি? আমি মানে—।'

ওপার থেকে ভদ্রলোক যেন একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, তুমি কোনো ছেলেমানুষ কথা বলছ। তা বাবু মল্লিক কি তোমার বন্ধু?'

গোগোল এবার বলেই ফেলল, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে তোমার ভুল হয়েছে বাবা। বাবু নামে কোনো ছেলে এ বাড়িতে নেই। তুমি ভালো করে নাম্বারটা আর একবার মিলিয়ে দেখো, কেমন?'

গোগোল বলল, 'আচ্ছা।' বলেই রিসিভারটা নামিয়ে দিয়ে, মাথাটা দুহাতে চেপে ধরল। ছিঃ, কী লজ্জা। ভদ্রলোককে মিথ্যে কথা বলতে হল। কিন্তু বৈদ্যনাথ বাগাল কি তাহলে মিথ্যে কথা বললো? অসম্ভব নয় মোটেই। গোগোলকে পিন্টু ভেবে গড়গড় করে অনেক কথা বলেছে। দাদু বলায় ধমকও দিল। অথচ ভেবে দেখতে গেলে বৈদ্যনাথ বাগাল তো পিন্টুর দাদুই হবে। সে তো সাইমনকাকুর বাবা! আসলে বুড়ো প্রথমে ধরতে না পারলেও, পরে ঠিক বুঝেছে, একটা অন্য ছেলেকে সে পিন্টু বলে

ভুল করেছে। তারপর গোগোলকে বেমালুম ঘোল খাইয়ে টেলিফোন নাম্বারটা জেনে নিয়েছে।

গোগোল আবার চুপচাপ বসে সাত-পাঁচ ভাবতে শুরু করল। ভাবতে ভাবতে আবার ওর মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা খেলে গেল। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে গগন হাজরার নাম আর ঠিকানাটা মিলে গেলেই তাকে পাওয়া যেতে পারে। ভাবতে ভাবতেই ও আবার টেলিফোন ডাইরেক্টরি তুলে নিল। এবার এইচ্, আর এইচ্ থেকে হাজরা। হাজরা গগন খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেল। শুধু নাম নয়। ঠিকানাটাও মিলে গেল।

গোগোল টেলিফোন ডাইরেক্টরি রেখেই রিসিভার তুলে নিল। তুলে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখল। ভাবল, যদি গগন হাজরা ওরফে বুলু হাজরাকে পাওয়া যায়, ও কী বলবে? নিজেই জবাব দিল, কী আর বলবে? বাবু মল্লিক আর সাইমনের খুনের ষড়যন্ত্রটা জানিয়ে দেবে। এছাড়া তো ও আর কিছুই চায় না। গোগোল মন ঠিক করে রিসিভার তুলল। ডাবল ফোর একস্‌চেঞ্জে, নাম্বারটা ডায়াল করল। এনগেজড্ শব্দ পাওয়া গেল। রেখে দিয়ে, অস্থির ভাবে আবার খানিকক্ষণ বাদেই রিসিভার তুলে ডায়াল করল। এবার কট্ করে একটা শব্দ হল মাত্র। তারপরেই সব চুপচাপ। কেন? গোগোল আবার ডায়ালটোন পাবার জন্য রিসিভারের বোতাম টিপল। ডায়ালটোন পেয়ে, আবার ডায়াল করল। বাজছে! ওপারে এবার ক্রিং-ক্রিং বাজছে। প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড পর. ওপার থেকে একজন মহিলাব গলা শোনা গেল, 'হ্যালো?'

গোগোল টেলিফোন নাম্বারটা আগে জিজ্ঞেস করল। মহিলা বললেন, হ্যাঁ, এই নাম্বার।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'গগন হাজরা আছেন?'

মহিলা একটু যেন অবাক হয়ে বললেন, 'না তো। উনি তো আজকের সকালের ফ্লাইটে⋯' হঠাৎ থেমে গেল। যা বলতে যাচ্ছিলেন, তা না বলে. জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে বলছেন?'

গোগোলের কথা শুনে অনেকেই মেয়েদের গলা ভাবে। ও চট করে কোনো জবাব দিতে পারল না। ওপার থেকে মহিলা যেন একটু সন্দেহ করে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল? আপনি কে বলছেন, নামটা বলতে পারছেন না?'

গোগোল বলল, 'আমি একটু গগনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলুম।'

মহিলা বললেন, 'তবু নিজের নামটা বলতে পারছেন না? তাহলে আমার স্বামীর খবর আপনাকে আমি দেব কেন? দেব না।'

গোগোল এবার বলেই ফেলল, 'আপনি আমাকে বড় ভাববেন না। আমি একটি ছেলে বলছি।'

ওপার থেকে গগন হাজরার স্ত্রীর স্বর শোনা গেল, 'আমারও সেরকম একটু সন্দেহ হচ্ছিল। তা তুমি কে? ওঁকে চাইছ কেন?'

গোগোল জানে, সব মহিলারাই মায়ের মতো। আসল কথাটা বললে, উনি ভয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। ও বলল, 'আমি গগনবাবুকেই একটা কথা বলতে চাই।'

মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম?'

গোগোল জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল। মহিলা আবার অধৈর্য আর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার নামটাও বলতে পারছ না? কীরকম ছেলে তুমি?'

গোগোল তবুও চুপ। তখন মহিলা বললেন, 'জানিনে তুমি কী বলতে চাও। পরশু দিন বিকেলে ওঁকে পাবে। উনি এখন কলকাতায় নেই।' বলেই তিনি রিসিভার নামিয়ে দিলেন।

গোগোলও আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। একজন মহিলার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা ঠিক হয় নি। মা শুনলে রেগে যেতেন। কিন্তু গোগোল কী করেই বা নামটা বলবে? তাহলে যে সব কথাই বলতে হয়। তবে একটা কথা গোগোলের কানে ঠেকে আছে। মহিলা প্রথমেই বলেছিলেন, 'উনি তো আজ সকালের ফ্লাইটে…।' বলেই থেমে গিয়েছিলেন। তার মানে গগন হাজরা প্লেনে করে কোথাও গেছেন। কোথায় যেতে পারেন। বাবু মল্লিক সাইমনকে টেলিফোনে বলেছিল, বুলু হাজরার অডিটর দিল্লী গেছে। অডিটর দিল্লী থেকে ফিরে না এলে, তাকে না জানিয়ে বুলু হাজরা কিছু করবে না, লোকটা কি তাহলে দিল্লীতেই উড়ে গেছে? তাহলে গোগোলের এখন আর কিছু করার নেই।

বঙ্কিমদা ঘরে ঢুকল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বাবার পড়ার ঘরে বসে কী করছ? পড়াশোনা নেই?'

গোগোল টেলিফোন ডাইরেক্টরি রেখে, নামধাম-টোকা কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আমি আমার এক বন্ধুকে ফোন করছিলুম। তুমি রান্নাঘরে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছিলে?'

বঙ্কিমদা বাড়ির কাজের লোক। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়।

মা-বাবা ওকে খুব ভালবাসেন। বঙ্কিমদা মানুষ ভাল। গোগোলকেও সে ভালবাসে। কিন্তু অন্যায় করলে বকতে ছাড়ে না। সে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কে বললো তোমাকে, আমি বাড়িতে চিঠি লিখছিলাম?'

গোগোলও হেসে বললো, 'আমি রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছি।'

বঙ্কিমদা বললো, 'ঠিক বলেছ। আমি বাবাকে চিঠি লিখছিলাম।' গোগোল নিজের পড়ার ঘরে গেল।

পরের দিন সকালে জলখাবার খেয়ে গোগোল জুলিব জন্য সাণ্টাক্লজ আঁকতে বসল। ছুটির দিন বলেই মা-বাবা আপত্তি করেন নি। কিন্তু আঁকায় গোগোলের তেমন মন নেই। গতকাল রাত্রে ওর হঠাৎ মনে হয়েছে, সাইমনের বাবা বৈদ্যনাথ বাগাল কী মিথ্যে কথা বলেছে! বাবু মল্লিকের বাবার নাম চরণদাস মল্লিক বলে ওকে ঠকিয়েছে। চরণদাস মল্লিক নিজেই বললেন, তাঁর বাড়িতে বাবু নামে কেউ নেই। চরণদাস মল্লিকের কথা শুনে মনে হল, তিনি মিথ্যে কথা বলার লোক নন। বরং বৈদ্যনাথ বাগালকে একটু অন্যরকমের মানুষ মনে হয়েছে। কথাবার্তার ধরন অন্যরকম। গোগোলকে সে মোটেই পিন্টু ভেবে কথা বলেনি। গোগোল ঐখানেই একটা মস্ত ভুল করেছে।

সাণ্টাক্লজের মুখটা ক্রমেই রবীন্দ্রনাথের মতো হয়ে যাচ্ছে, সেটা ওর খেয়াল নেই। সাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বুড়ো মানুষের মত মুখ আঁকতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের মুখটা যেন আপনিই ফুটে ওঠে। তার ওপরে সেই বুড়ো মানুষটির মাথার চুল যদি হয় ঝাঁকড়া আর লম্বা। জুলিকেও টেলিফোন করে জিজ্ঞেস কবা হয় নি, সাণ্টাক্লজের মাথায় টুপির আর জামার হাতার বর্ডারে, লাল অথবা সোনালী ডোরা লাগাতে হবে কি-না।

গোগোল বাবার গলা শুনে ছবি থেকে মুখ তুলল। শুনতে পেল, বাবা-মাকে বলছেন, 'আমি বেশি দেরি করব না। খাবাব অনেক আগেই আসব। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

মায়ের জবাবটা শোনবার জন্য ও কান খাড়া করল। মায়ের গলা শোনা গেল, 'আমি আবার যাব? রান্নাবান্না রয়েছে।'

বাবা বললেন, 'সে তো বঙ্কিমই পারবে। তুমি একটু বলে দিয়ে যাও।'

মায়ের কথা শোনা গেল না। একটু পরেই তিনি গোগোলের ঘরে ঢুকলেন। গোগোলের সঙ্গে মায়ের চোখাচোখি হয়ে গেল। মা এগিয়ে এসে গোগোলের ছবির দিকে দেখলেন। বললেন, 'এখনও অনেক বাকি দেখছি। আমি তোমার বাবার সঙ্গে একটু তিতুদাদের বাড়ি ঘুরে আসছি।'

গোগোল মনে প্রাণে তাই চাইছিল। বললো, 'যাও। আমি এ-বেলাতেই শেষ করে ফেলব। কেবল জুলিকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে, টুপিতে আর জামায় লাল না সোনালি বর্ডার দেব।'

মা বললেন, 'লাল টুপিতে আবার লাল বর্ডার কী করে দিবি ?'

গোগোল বোকার মত হেসে বললো, 'না না, লাল না, সাদা না সোনালি।'

মা হেসে বললেন, 'তাই বল্। তবে তোর সাণ্টাক্লজের বাপু বড্ড গম্ভীর মুখ। রবি ঠাকুরেব মতো হাসছে না কেন?' বলে মা তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

গোগোল সেটা আগেই ভেবেছে। এখন তাহলে ওকে নতুন করে আঁকতে হবে। এবার বাধ্য হয়েই ওকে দেরাজ থেকে সাণ্টাক্লজের ছাপানো ছবি বের করে দেখতে হল। রবি ঠাকুরই চোখ কুঁচকে মজার হাসি হাসছেন। তাহলে ওকেও তাই আঁকতে হবে। এই ভুরু কোঁচকানো গম্ভীর মুখ চলবে না। ছাপানো ছবিটা সামনে রেখে, ও নতুন কাগজ বের করল। জুলিকে টেলিফোন করতে হবে না। ও নিজেই খোঁজ নিতে আসবে।

মা বেরিয়ে যাবাব আগে আবার গোগোলের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'আমরা ঘুরে আসি। কাল তিতুদারা আমাদের বাড়িতে খাবে। সে কথা বলতে যাচ্ছি। তুমি যেন এখন আর বেরিও না।'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি কোথাও যাব না।'

বাবা-মা বেরিয়ে যাবার পরেই, গোগোল উঠে দাঁড়াল। ছবিটা ও ঠিক এঁকে ফেলবে। কিন্তু বুলু হাজরাকে বাঁচানো যায় কেমন করে, সেটাই ওর মাথায় ঘুরছে। সেজন্য ও ঠিক করেছে, সকালেই একবার সাইমনকে টেলিফোন করবে। ওকে জানিয়ে দিতে হবে, বাবু মল্লিকের সঙ্গে ওদের বুলু হাজরাকে মারার ব্যাপারটা জানা হয়ে গেছে।

গোগোল বাবার ঘরে যাবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। নিশ্চয়ই জুলি? নয়তো বাবার কোনো বন্ধু। ও তাড়াতাড়ি বাবার ঘরে যেতেই, বঙ্কিমদাও টেলিফোন ধরার জন্য ছুটে এল। গোগোল বলল, 'আমি ধরছি।'

বঙ্কিমদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গোগোল টেলিফোনের রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যালো?'

বেশ কয়েক সেকেণ্ড কোন সাড়াশব্দ নেই। গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, 'হ্যালো?'

এবার বৈদ্যনাথ বুড়োর গলা শোনা গেল, 'কে, পিণ্টু নাকি রে?'

গোগোল চমকে উঠল। বৈজ্ঞনাথ বুড়ো নিজের থেকে টেলিফোন করছে? ও বলল, 'হুঁ।'

বুড়ো বলল, 'এই নে তোর সাইমন আঙ্কলের সঙ্গে কথা বল্।'

সাইমন? সেই খুনিটা! টেলিফোন লাইনের মধ্যে দু-একটা শব্দ হল। তারপরেই সেই খ্যান্খ্যানে নাকি স্বরে ভেসে এল, 'হ্যালো পিন্টু? কি শুনেছ?'

গোগোল বলল, 'আপনারা যা বলাবলি করছিলেন, তাই শুনেছি।'

সাইমনের হাসি-হাসি খ্যান্খ্যানে স্বর শোনা গেল, 'কী শুনেছিস, তা বলবি তো? কখন শুনলি?'

গোগোল বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলায়। বুলু হাজরার কথা, আপনারা বলাবলি করছিলেন।'

টেলিফোন আবার দশ-বারো সেকেণ্ড চুপচাপ। তারপরে সাইমনের সেই গলা ভেসে এল, 'সেকথা কি কাউকে বলেছিস নাকি?'

গোগোল বলল, 'এখনও বলিনি।'

সাইমন একটু যেন খোসামোদ করে বললো, 'তাহলে আর কাউকে বলিসনে।'

গোগোল বললো, 'না বললে যে আপনি পৃথিবী থেকে একজনকে সরিয়ে দেবেন। এ কথার মানে আমি জানি।'

সাইমনের খ্যানখ্যানে গলাটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। অনেকটা যেন দাঁতে-দাঁত পেষা গম্ভীর স্বরে বললো, 'খোকা, তোমার খুব সাহস আছে দেখছি।'

কথাটা বলেই সে রিসিভার নামিয়ে রাখলো। গোগোল অবাক হয়ে রিসিভারটার দিকে তাকাল। আবার কানে ধরলো। ডায়ালটোন শোনা যাচ্ছে।

এই সময়েই কলিং বেল বেজে উঠলো। নিশ্চয়ই জুলি? অথবা জর্জ পারভেজ, সুজিতদের কেউ হবে। বঙ্কিমদা দরজা খুলে, কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। গোগোল রিসিভার নামিয়ে রেখে বাইরে গেল। বঙ্কিমদা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বাইরে একজন অচেনা ভদ্রলোকের মুখ। চওড়া মুখ। চোখগুলো ড্যাবা-ড্যাবা, সিঁথি কাটা চুল। গোঁফ-দাড়ি কামানো। গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল দু-পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে বঙ্কিমদা?'

বঙ্কিমদা বললো, 'চিনিনে। বাবুর খোঁজ করছেন।'

গোগোল দেখল, ভদ্রলোক গোগোলের দিকেই তাকিয়ে আছেন। হেসে বললেন, 'তোমরা আমাকে চিনবে না। সমীরেশবাবু আমার বিশেষ বন্ধু। তোমার নামটা যেন কী? ভুলে গেলাম।' গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন।

গোগোল কিছু বলবার আগেই বঙ্কিমদা বললো, 'ওর নাম গোগোল। আপনার কী নাম বলুন, বাবু এলে বলে দেব।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ভূতনাথ ধর। তাহলে চলি। তোমার বাবুকে বোলো, দুদিন বাদে সন্ধের পরে আসব। চলি গোগোল।'

ভদ্রলোক লিফটের দিকে সরে গেলেন। গোগোল বঙ্কিমদার ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোককে দেখবার চেষ্টা করলো। ভদ্রলোকও লিফটের বোতাম টিপে এদিকেই দেখেছিলেন। বঙ্কিমদা দরজাটা বন্ধ করে দিল। বললো, 'লোকটাকে আমার একটুও ভাল লাগলো না।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

বঙ্কিমদা বললো, 'কেন আবার? বাবুর নাম করে জিজ্ঞেস করলো, আছেন কি না। তারপরেই জিজ্ঞেস করলো, বাবুর কটি ছেলেমেয়ে? কত বড়? জবাব দেবার আগেই তুমি এসে পড়লে। বাবুর বন্ধু হলে কি জানত না, এ বাড়িতে কটি ছেলে মেয়ে? যত সব বাজে লোক।'

গোগোল শুনেই বাড়ির গেটের দিকে জানালায় ছুটে গেল। দেখল, সেই লোকটি গাড়ি পার্কিংয়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গোগোলদের জানালার দিকেই দেখছে। গোগোলের মনটা ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল। লোকটা বাবু মল্লিক আর সাইমনের কাছ থেকে আসেনি তো? সাইমন গোগোলদের টেলিফোন নাম্বারটা জেনে গেছে। টেলিফোন নাম্বার থেকে কি বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করা যায়?

গোগোল নিজের মনেই জবাব দিল, 'কেন যাবে না? ডাবল ফোর এক্সচেঞ্জ দেখে দেখে, বাবার নাম আর ঠিকানা পাওয়া খুবই সহজ।' নিজের মনে জবাবটা দিয়েই, গোগোল বুঝল, বাবু মল্লিক আর সাইমন ওর আস্তানা চিনে গেছে। ওকেও বোধ হয় দেখে গেল। এবার ওরা কী করবে? গোগোলই বা কি করবে? বুলু হাজরাও তো কলকাতায় নেই। আগামীকাল বিকেলের আগে তাকে পাওয়াও যাবে না।

গোগোল ভাবতে ভাবতে ওর নিজের ঘরে গেল। এমন সময় আবার কলিংবেল বেজে উঠল। গোগোল চেয়ারে বসতে গিয়ে থেমে গেল। দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। তারপরেই জুলির গলা ভেসে এল। জুলি এল গোগোলের ঘরে। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সান্টাক্লজ

এঁকেছ ?'

গোগোল বললো, 'এঁকেছি, ভাল হয়নি। আর একটা আঁকতে হবে। কিন্তু তুমি সাণ্টাক্লজের টুপিতে আর জামার হাতায় কী বর্ডার চাও ?'

জুলি আঁকা ছবিটা দেখে মুখ গম্ভীর করে বললো, 'সোনালি।'

গোগোল বললো, 'আজ বিকেলেই আঁকা হয়ে যাবে।'

জুলি বললো, 'তা নইলে আমি সাজাতেই পারব না। জর্জ নিজে তুলো দিয়ে একটা সাণ্টাক্লজ বানিয়েছে। বাবা দেখে বললেন, ঠিক একটা শ্বেত ভল্লুক হয়েছে।'

গোগোল আর জুলি এক সঙ্গে হেসে উঠল। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'জর্জ কী বললো ?'

জুলি হাসতে হাসতে বললো, 'কী আবার ? রেগে গেছে খুব। বাবাকে বললো, বেশ, আমার শ্বেত ভল্লুকই ভাল।'

ওরা দুজনে আবার হাসতে লাগল। কিন্তু গোগোলের মনে চিন্তা, লোকটা কি সত্যিই বাবু মল্লিক আর সাইমনের লোক ?

বিকেল তখন সাড়ে তিনটে হবে। গোগোল জুলির সাণ্টাক্লজ শেষ করে এনেছে। মা দুবার দেখে গেছেন। খুব পছন্দ হয়েছে। এবার বাকি শুধু টুপিব আর জামাব হাতার বর্ডার বসানো। গোগোল কাঁচি দিয়ে সোনালি ফিতে কাটছিল।

এমন সময়, ওর কানে এল, নীচে অনেকে হাসছে। হৈ-হল্লা করছে, আর হাততালি দিচ্ছে। গোগোল ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য বাইরের ঘরের জানালায় গেল। দেখল, মা সেখানে আগেই গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে মা ?'

মা বললেন, 'এসো, দেখবে এসো। একটা সত্যি সত্যি সাণ্টাক্লজ এসেছে।'

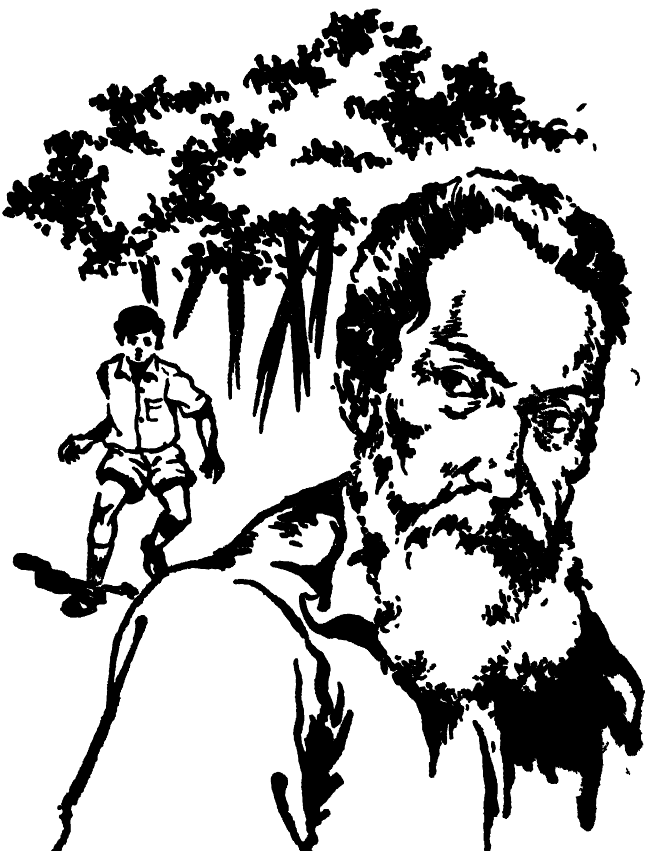
গোগোল জানালায় উঁকি দিয়ে, খুশিতে অবাক। সত্যি একেবারে জ্যান্ত সাণ্টাক্লজ। পাকাচুল দাড়িতে তার মুখ ভরা। গায়ে লাল রঙের আলখাল্লা। মাথায় লাল টুপির ডগায় পাখির সাদা পালক। পায়ে সাদা কেডস্। তার এক হাতে একটা ক্রস, অন্য হাতে যীশুর একটা ছোট পুতুল। পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। কোমরের কাছে একটা থলে ঝুলছে। সে দু-হাত তুলে নাচছে। সাদা ভূরু জোড়া কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে। হেসে হেসে মুখের ভঙ্গি করছে। গোটা ফ্ল্যাটবাড়ির আর আশ-পাশের বাড়ির যত রাজ্যের ছেলেমেয়েরা এসে জুটেছে। তারাও সাণ্টাক্লজের সঙ্গে নাচছে। বড়রাও

দূরে দাঁড়িয়ে ভিড় করে দেখছেন। ছেলেমেয়েরা তাঁদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সান্টাক্লজের কাছে যাচ্ছে। সে কোমর বাঁকিয়ে থলেটা দেখাচ্ছে। সবাই সেই থলেয় পয়সা দিচ্ছে। কেবল সান্টাক্লজ কী গান করছে, ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

গোগোল বললো, 'মা, নীচে যাচ্ছি।'

মা বললেন, 'যাও। দেখো বঙ্কিমদার কাছে খুচরো পয়সা আছে। আট আনা নিয়ে যাও। বেচারি নিশ্চয় একজন গরিব বহুরূপী। আগে কখনও দেখিনি।'

গোগোল বঙ্কিমদার কাছ থেকে পয়সা নিয়েই, বাইরে গিয়েই লিফট পেয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে, বোতাম টিপে নীচে নামল। জর্জ, পারভেজ, গোগা, সুজিত, জুলি সবাই ছিল। গোগোল ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শুনল,



সাণ্টাক্লজ গাইছে, 'জানিবে নিশ্চয় তিনি ঈশ্বরের সন্তান, জগৎ মধ্যে তাঁহার কাজ পাপীর তারণ।'

সাণ্টাক্লজ ফ্ল্যাট বাড়ির পার্কিংয়ের পাশ থেকে তখন গেটের দিকে চলেছে। গোগোল পয়সা দেবার জন্য, সেদিকে এগিয়ে গেল। চলল আরও ছেলে-মেয়েরা। গেটের দারোয়ানরাও হাততালি দিয়ে নাচছে। গোগোলও নাচতে নাচতেই গেল। সাণ্টাক্লজ তখন বাইরের রাস্তায়। গোগোল তার থলেতে পয়সা দেবার জন্য এগিয়ে গেল। সাণ্টাক্লজ নাচতে নাচতে পাক খেয়ে সরে গেল একটা গাড়ির দিকে। বেশ কয়েকটা গাড়ি রাস্তার দু-পাশে পার্ক করা ছিল। একটা গাড়িব এঞ্জিন স্টার্ট করল। গোগোল বললো, 'সাণ্টাক্লজ, আমার পয়সাটা নিয়ে যান।'

সাণ্টাক্লজ যেন গোগোলকে দেখতেই পেল না। ওর কথাও শুনতে পেল না। সকলের দিকে হাত তুলে বিদায় চাইল, 'বাই বাই বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস, বাই বাই পেরেন্টস। লেট মি গো টু আদাব মেরি গেট টুগেদার।'

গোগোল এবার একেবারে সাণ্টাক্লজের গায়ের ওপব গিয়ে পড়ল। সাণ্টাক্লজ তখন সেই এঞ্জিন স্টার্ট করা গাড়িটার দরজার সামনে। সাণ্টাক্লজ গোগোলের দিকে তার থলে এগিয়ে দিল। আর গোগোলকে ঠেলে দিল গাড়ির দরজার কাছে। গাড়ির দরজা খুলে গেল। চকিতেই একটা মোটা শক্ত হাত গোগোলকে গাড়ির ভেতর টেনে নিল। সাণ্টাক্লজও তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। আর গাড়িটা গর্জন কবে জোরে ছুটতে আরম্ভ করল। তারপরেই সেই মোটা খসখসে গলা শোনা গেল, 'সাইমন, কেউ গাড়ির পথ আটকাতে এলে, সোজা গুলি করবে। সাণ্টাক্লজ, তোমাব থলের ভেতরের বোমাগুলো রেডি রাখো।'

ভয়ে গোগোলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বাবু মল্লিকের গলাব স্বর চিনতে ওর ভুল হল না। গাড়ির সামনে ড্রাইভারসহ তিন জন। বাবু মল্লিক মাঝখানে বসেছে। বাঁ ধারের লোকটি যে সাইমন কোন সন্দেহ নেই। সে বললো, 'কিছু ভাববেন না স্যার।'

গোগোল দেখল, সাণ্টাক্লজ তার আলখাল্লা দিয়ে ওকে একরকম চাপা দিয়ে শুইয়ে রেখেছে। বাইরে থেকে ওকে দেখা যাচ্ছে না। পাশে আর একজন গোগোলের ঘাড়ে হাত চেপে আছে। সাণ্টাক্লজ কেবল বললো, 'দরকার হয় গাড়িসুদ্ধ বোমায় উড়িয়ে দেব। তবে ঠিক জিনিসটাকে যে পাওয়া গেছে, সেটাই বড় কথা। ভাবছিলাম পাখিটা এখনও ফাঁদে আসছে না কেন?'

গাড়ি তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটেছে। গোগোল কিছুই বুঝতে পারছে না, কোন রাস্তায় ছুটছে। তবে, গাড়ি বিশেষ আঁকাবাঁকা পথে চলছে না। তাহলে বোঝা যেত। বাবু মল্লিকের মোটা খসখসে গলা শোনা গেল, 'একটু পাক মারো। আর একটু অন্ধকার হোক। তারপর ডেরায় নিয়ে গিয়ে তুলবে। গাড়ি একেবারে ভিতরে ঢুকিয়ে নেবে। সাণ্টাক্রুজ, সব ঠিক আছে?'

সাণ্টাক্রুজ বললো, 'সব ঠিক আছে। আমাদের কেউ ফলো করছে না। নিশ্চিন্ত থাকো। আমি ঠিক নজর রেখেছি।'

গোগোল তখন ভাবছে, ঝোঁকের মাথায় নিজের সর্বনাশ ও নিজেই করেছে। সাইমনের বাবাকে নিজেদের টেলিফোন নাম্বারটা বলে ফেলেছে। কিন্তু কোথায় এরা ওকে নিয়ে চলেছে?

গাড়ির গতি কমল। মনে হল একটা হাম্পের ওপর দিয়ে, ঝাঁকানি দিয়ে পার হল। গোগোল দেখল, গাড়ির ভিতর আলো পড়ছে। বাবু মল্লিকের গলা শোনা গেল, 'সাণ্টাক্রুজ।'

সাণ্টাক্রুজ জিজ্ঞেস কবল, 'বাইরে সব ঠিক আছে?'

বাবু মল্লিক বলল, 'আছে।'

গোগোলের মনে হল, এক লহমায় ওকে কিসের মধ্যে যেন জড়িয়ে ফেলা হল। মুখে শক্ত হাতের চাপা পড়ল। গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হল। গোগোল মুখ বন্ধ অবস্থায় একটা পুঁটলির মধ্যে। ওর পা দুটোও কেউ চেপে ধরে আছে। হাত পা ছোঁড়ার উপায় নেই। মুখ দিয়ে শব্দ করারও জো নেই। দরজা খোলার শব্দ হল। এক মিনিটের মধ্যে বন্ধ হবার শব্দও শোনা গেল। গোগোল কোন রকম গদির মধ্যে পুঁটলির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্ট্যাণ্ডের ওপব শেডে ঢাকা নরম আলো। চোখ খুলে দেখল, ও একটা ঘরের মধ্যে। ঝক-ঝকে পরিচ্ছন্ন ঘর। কেবিনেই খাটের ওপর ফোমের গদির ওপর বিছানা। একটি স্টিলের আলমারি। দুটো চেয়ারে দুজন বসে আছে। একজন দাঁড়িয়ে। কেবল সাণ্টাক্রুজ একটা বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমি ধরাচুড়া ছেড়ে আসি।' বলে ভিতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

যে দুজন বসেছিল, তাদের একজনকে গোগোলকে চিনতে পারল। সকালবেলা এ লোকটিই বাবাকে খুঁজতে গেছিল। আসলে গোগোলের খোঁজেই গেছিল। আর সেটা যে টেলিফোনের নাম্বার দেখেই ঠিকানা খুঁজে গেছিল, এখন আর কোন সন্দেহ নেই। দরজা জানলা সব বন্ধ। তিন

জনেই গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিল। বসে থাকা একজন মোটা খসখসে গলায় বললো, 'সাইমন, তোমার বাবাকে সত্যি ধন্যবাদ। তাকে আমি যা দেব বলেছি, নিশ্চয়ই দেব। তুমি ও চিরঞ্জীব দারুণ কাজ করেছ। ঠিক খোঁজই নিয়েছিলে। এখন কী করা যায় একে নিয়ে বলো তো?'

যে দাঁড়িয়ে ছিল, খ্যানখ্যানে নাকি স্বরে বললো, 'কী আবার? যা শত্রু পরে পরে। এ হচ্ছে জাত সলুইয়ের বাচ্চা। বাঁচিয়ে রাখলেই ছোবল দেবে। ভাবতে পারছেন স্যার, ক্রশ কানেকশনে কথা শুনে, কীভাবে আমার বাড়ির টেলিফোন নাম্বার বের করে ফোন করেছে? বাবার মনে যদি খটকা না লাগত তা হলে আপনার বাড়ির টেলিফোন ঠিক বের করত। মাঝখান থেকে চরণদাস মল্লিক টেলিফোন পেয়ে অবাক হয়েছেন। সে খবরটাও পেয়েছি। এর পরে আর প্রমাণ করার দরকার নেই, সলুইটা কী সবনাশ করতে যাচ্ছিল।'

সলুই মানে যে গোখরো সাপের ডিম ফোটা বাচ্চা, গোগোল তা জানে। ঘরের দেওয়ালে একটা মাত্র বিলিতি প্রিন্টিংয়ের নদী পাহাড়ের ছবি ছিল। গোগোল সেদিকে তাকিয়ে সাইমনের কথাগুলো শুনল। সাইমনের কথার পরে, কেউ মিনিট-খানেক কোনো কথা বললো না। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সান্টাক্লজের বদলে নতুন লোক। সাদা ট্রাউজারের ওপর লাল জামা সান্টাক্লজের পোশাক এখন আর নেই। কেবল মুখে এখনও অল্প রঙ লেগে আছে।

বাবু মল্লিক বললো, 'সাইমনের মুখে রাত্রে কথাটা না জানতে পারলে, কিছু ভাবতেই পারতাম না। এখন বুঝেছ সাইমন, বলেছিলাম, টেলিফোনে কেমন একটা শব্দ হল। আমি ভুল শুনি নি। আর এইটুকু ছেলে আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনেছে। শুনে আবার সাইমনের বাবার নাম বের করেছে টেলিফোন গাইড থেকে। আর সবটাই করেছে আন্দাজে। মিলেও গেছে। আর কী কী ও জেনেছে, তাই বা কে জানে?'

আবার সবাই একটু চুপচাপ। সাইমন ট্রাউজারের ওপর পাঞ্জাবীর নীচে কোমর থেকে রিভলবার বের করল। বললো, 'স্যার, এটাতে সাইলেনসার লাগানো আছে। ও আর কী কী জেনেছে, তা দিয়ে আমাদের দরকার কী?'

সান্টাক্লজ খাটের ওপর বসে বললো 'আমারও তাই মত। বেশি ঝুট-ঝামেলায় যাবার দরকার কী? এ বিচ্ছু ছেলে যা জানবার জেনেছে। এখন যা করবার করে ফেলো, গুম করে দিই।'

গোগোল এখন আর কারোর দিকে তাকাচ্ছে না। ভাবছে, ওতো দূরের

কথা, সান্টাক্লজের ফাঁদটা যে ওর জন্যেই পাতা হয়েছিল, কেউ একটুও বুঝতে পারে নি। অথচ একটা বাজে লোক এসে যে বাবার খোঁজ করেছিল, বঙ্কিমদা সেকথা বাবা-মাকেও বলেছিল। চিরঞ্জীব লোকটা এবার মুখ খুলল। বললো, 'শোনো গোগোল, তুমি খুব সাংঘাতিক হাতে পড়েছ। বাবা-মায়েব একমাত্র ছেলে। আমার নাম চিরঞ্জীব হলেও আসলে আমি ভূতনাথ ধর। মানে ভূত ধরাই আমার কাজ। তুমি হচ্ছ টেলিফোনের ভূত, ধরে ফেলেছি ঠিক। এবার সত্যি করে বলো তো, তুমি কী করতে চেয়েছিলে ?'

গোগোল মুখ ফিরিয়ে সবাইকে একবার দেখল। সব মুখগুলো শক্ত। চোখের দৃষ্টি কটমট করছে। ওর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। বললো 'কিছু না। এমনি সব জানতে চেয়েছিলুম।'

চিরঞ্জীবই জিজ্ঞেস করল, 'তোমাব মত এতটুকু ছেলে, ক্রস কানেকশানে কথা শুনে, এমন কী জানতে চেয়েছিলে ?'

গোগোল চুপ করে রইল। সান্টাক্লজ হঠাৎ তার একটা বড় হাত তুলে বললো, 'চুপ করে আছ কেন ? এক থাপ্পড়ে সব কথা বের করে নেব। ডেঁপো পাজি ছেলে, আবার বলছে এমনিতে সব জানতে চেয়েছিলুম। কী জানতে চেয়েছিলে ? কী শুনেছিলে টেলিফোনে ?

গোগোল লোকটার প্রকাণ্ড হাতের থাবার দিকে দেখল। মিথ্যা নয়, থাপ্পড় কষালে গোগোলেব সব দাঁতগুলো পড়ে যাবে। ও বললো, 'কী শুনব ? যা কথা হয়েছিল তাই শুনেছি। বুলু হাজরা বলে একজনকে মেরে ফেলার কথা হয়েছিল।'

সবাই চুপ। একটু পরে চিরঞ্জীব বললো, 'বেশ, সেকথা জেনে তুমি আবার আমাদের খোঁজ করছিলে কেন ? ধরিয়ে দেবার জন্য ?'

গোগোল আবার চুপ কবে রইল। ওর গলাটা শুকিয়ে গেছে। আচমকা ঘটে যাওয়া ঘটনাটা এখনও সামলে উঠতে পারছে না। কেবল এটাই বুঝতে পারছে, ও ভয়ঙ্কর একটা ফাঁদে পড়েছে। যারা সহজেই লোককে মেরে ফেলতে পারে। সাইমন এসে বসল খাটের একধারে। বললো, 'ছাখ ছেলে। ওসব কথাবার্তা পছন্দ করিনে। বাঘের ঘরে ঘোগের হানা সহ্য করতে পারিনে। তোর পুঁটি মাছের মত প্রাণ, আমি এক সেকেণ্ডে শেষ করে দিতে পারি।'

চিরঞ্জীব বললো, 'আহা, সেটা তো আছেই। তবে ও যদি সব সত্যি কথা বলে, আমি নিজে গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলব। ও যদি মুখ না

খোলে, চাই কি অনেক টাকাও দিতে পারি।

বাবু মল্লিক বললো, 'হ্যাঁ, আমারও সেই কথা। একটা বাচ্চা ছেলে নেহাত কথাটা শুনে ফেলেছে। এখন জানা দরকার, ও বাড়িতে বাবা মাকে সব বলেছে কি না?

গোগোল মাথা নেড়ে বললো, 'বলিনি।'

চিরঞ্জীব বললো, 'কিন্তু তুমি বুলু হাজরার বাড়িতে টেলিফোন করেছিলে। করোনি?'

গোগোল অবাক চোখে চিরঞ্জীবের দিকে তাকাল। কিন্তু কথা বললো না। সাইমন বললো, 'চিরঞ্জীববাবু, কেন আর কথা বাড়াচ্ছেন? ওসব খোঁজ তো আপনি নিয়েই নিয়েছেন। এ ছুঁচোটা বুলু হাজরাকে সব ফাঁস করে দিচ্ছিল। বুলুর বউ আপনাকে বলেনি, একটা ছেলে টেলিফোন করে তার স্বামীকে কিছু বলতে চেয়েছিল? নেহাত আমাদের কপাল জোরে বুলুব্যাটা দিল্লীতে রয়েছে। নইলে কাল আমাদের সর্বনাশ হয়ে যেত।'

সাণ্টাক্রুজ বললো, 'সর্বনাশ আর কী হত? বুলু সাবধান হয়ে যেত। একটা বাচ্চা ছেলের কথায় তো আর পুলিশ কান দিত না, বুলু যে পুলিশকে সত্যি কথা বলছে, সেটাও প্রমাণ হত না। এখন এ আপদকে কী করবে তাই ভাবো।'

চারজনেই আবার চুপচাপ। গোগোল শেষ পর্যন্ত না বলে পারল না, 'আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দেবেন?'

চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়াল। বললো, 'আমি নিয়ে আসছি।' সে একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই ঠাণ্ডা এক গেলাস জল এনে দিল।

গোগোল ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল। চিরঞ্জীব জিজ্ঞেস করল, 'আর খাবে?'

গোগোল মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

বাবু মল্লিক বললো, 'তা হলে আমি যা বলছি, তাই হোক। আগামীকাল রাতটা যাক। বুলু হাজরার ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে এর ব্যবস্থা করা হবে। ব্যানার্জি ওর পাহারায় থাকবে।'

সাণ্টাক্রুজ বললো, 'সে আমি ঠিক রাখব। ব্যবস্থা অনেক রেখেছি। একটু ট্যাঁ-ফোঁ করলেই কুচ।' সে দা চালাবার ভঙ্গি করল হাত ঝাড়া দিয়ে।

সাইমন খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এর ব্যবস্থা করার কিছু নেই

স্যার। থাকলে আপনাকে আমি বলতাম। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপর আমার একটু টান আছে। সেইজন্য বুলু হাজরার ছেলে মেয়ের কথা তুলেছিলাম। কিন্তু এ যা করেছে, তাতে নিজের মরণ নিজেই ডেকে এনেছে। একে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো উপায় নেই। এখন আমি চললাম। কাল রাত্রে, কাজ শেষ করে, এখানে সকলের সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

বাবু মল্লিক আর চিরঞ্জীবও উঠে দাঁড়াল। বাবু মল্লিক বলল, 'হ্যাঁ, আমরাও যাই। কাল রাত্রে আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি। আজ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোব। তা হলে ব্যানার্জি, সব ঠিক আছে তো?'

সান্টাক্রুজ ওরফে ব্যানার্জি বলল, 'সব ঠিক আছে। আপনারা নিশ্চিন্তে চলে যান।' তিনজনেই বেরিয়ে গেল। ব্যানার্জিও গেল। যাবার আগে দরজাটা বাইরে থেকে লক্ করে দিল।

পরের দিন গোগোলের যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল-সন্ধ্যা বোঝবার উপায় নেই। আসলে, সারা রাত্রি ও প্রায় ঘুমোতেই পারেনি। কতগুলো সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখে বারে বারে জেগে উঠেছে। ঘরে আলো সব সময় জ্বলছে। গতকাল রাত্রে ওকে ব্যানার্জি লোকটা পরোটা, মুরগির মাংস আর মিষ্টি খেতে দিয়েছিল। লোকটা নিজে কী খেয়েছে, গোগোল জানে না। কাবণ সে পাশের ঘরে ছিল। গোগোলেব জন্য এক বোতল জল রেখে দিয়েছিল।

খিদের জ্বালায় গোগোলের না খেয়ে কোন উপায় ছিল না। তারপরে ও বাথরুমে গেছল। বাথরুমের জানালাটা বাইরের থেকে সিল্ করা। কাঠের পাল্লা। ঘরের জানালাগুলোও তাই। তবে পর্দা সরিয়ে দেখা গেছে, ঘরের জানালার কাঠের পাল্লার ওপরে, ঘষা কাঁচ বসানো আছে। বাইরের কিছুই দেখা যায় না। কেবল দিন-রাত্রি বোঝা যায়। গোগোল আর একটা জিনিস বুঝেছে। ও আছে একতলার ঘরে। গতকাল ওকে সিঁড়ি দিয়ে বা লিফ্‌টে তোলা হয়নি।

ব্যানার্জি লোকটা একটু অদ্ভুত। নিজের মনেই কথা বলে। গুনগুন করে গান গায়। আর টলে টলে চলে। গোগোল গতকাল রাত্রে তাই দেখেছে। কেমন একটু পাগলাটে ভাব। ভুলোও আছে খানিকটা। একবার দরজা খোলা রেখেই, রাত্রে পাশের ঘরে বসে কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলছিল। গোগোলের বিষয়ে বা বুলু হাজরার ব্যাপারে কোনো কথা নয়। কোনো বন্ধুর সঙ্গে তুই-তুই করে কথা বলছিল। খুব

দুঃখ করে বলছিল, সে বিশেষ ব্যস্ত আছে, তাই মাঠে যেতে পারবে না। তারপরে হঠাৎ উঠে এসে দরজাটা টেনে লক্ করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'খেয়ালই ছিল না। পাখি পালালেই হয়েছিল আর কি। মল্লিক আমাকেও হাওয়া করে দিত।'

গোগোল লক্ষ্য করে দেখেছে, পাশের ঘরে একটা খাবার টেবিল। টেবিল ঘিরে কয়েকটা গদি আঁটা চেয়ার। পাশেই রয়েছে রেফ্রিজারেটর। লাল রঙের টেলিফোনটা খাবার টেবিলের ওপর। টেবিলের খানিকটা দূরে কাঠের পার্টিশনে নানারকম কারুকাজ করা।

গোগোল খাটের একপাশে গিয়ে, একটা জানালার পর্দা তুলল। ঘষা কাঁচের ওপর রোদ পড়েছে। সকাল ক'টা বেজেছে কে জানে। আজ বড়দিন। কথাটা মনে হতেই গোগোলের ঠোঁট ফুলে উঠল। চোখ উঠল ছলছলিয়ে। বুকের মধ্যে কেমন টনটন করছে। মা বাবা কী করছেন, কে জানে? আজ তিতুদা'দের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিতুদা ওর পিসতুতো দাদা। ডাক্তারি পাশ করেছেন। বিয়ে করেছেন কয়েক মাস আগে। মা কিছুদিন ধরেই বাবাকে বলছিলেন, তিতুদা আর বৌদিকে নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু গোগোল যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, বাবা পাগলের মতো পুলিশের কাছে দৌড়াদৌড়ি করছেন। সঙ্গে তিতুদা, ফ্ল্যাটবাড়ির আরও অনেকে। মা কাঁদছেন। বঙ্কিমদাও কাঁদছে। আর গোগোল কোথায় একটা ঘরের মধ্যে আটকে পড়ে আছে, ও নিজেও জানে না।

আজ বড়দিন মানে, আজই বুলু হাজরার শেষ দিন। গোগোল কিছুই করতে পারবে না। ক্রস কানেকশনে টেলিফোনের কথা শুনে ও একে-তাকে খুঁজতে গিয়ে কেবল নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে। বড়রা যে বলেন, বেশি কৌতূহল ভাল নয়, এখন তা বোঝা যাচ্ছে। বুলু হাজরাকে শেষ করে, সাইমন বাবু মল্লিকের সঙ্গে এখানে আসবে। তারপর?

গোগোল ভাবতে পারছে না। ও জানালার কাছ থেকে সরে এল। দাঁত মাজার ব্রাশ নেই। বাথরুমে পেস্ট আছে। ও খাট থেকে নেমে বাথরুমে গেল। বেশ বড় বাথরুম। গোলাপি রঙের বাথটাব। সেই রঙেরই বেসিন। বড় আয়না। সাবান, শাম্পু, পেস্ট, বড়দের দাড়ি কামাবার জিনিসপত্র সব আছে। গোগোল চোখে-মুখে জল দিল। ডান হাতের তর্জনীতে পেস্ট নিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিল। ছোট বাথরুম করে বেরিয়ে এল। কিন্তু ব্যানার্জির কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

গোগোল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কান পাতল দরজায়।

ব্যানার্জির গুনগুনানি শোনা যাচ্ছে। ঠুং-ঠাং শব্দও ভেসে আসছে। কী করছে লোকটা, কে জানে। তবে সাণ্টাক্লজ সেজে, আসরটা বেশ মাতিয়েছিল। ওটা যে গোগোলকে ধরার একটা ফাঁদ, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আর এখন কেমন গুনগুন করছে। কী ধরণের লোক, গোগোল বুঝতে পারছে না। যেন একটা মজার খেলা খেলছে।

গোগোল দরজা থেকে সরে আসতেই, খট করে দরজা খুলে গেল। ব্যানার্জির গায়ে একটা গেঞ্জি আর পাজামা। হাতে প্লেটের ওপর রয়েছে মাখন মাখানো টোস্ট, ওমলেট। ফর্সা মুখটা আর চোখদুটো লাল দেখাচ্ছে। বলল, 'গুডমর্নিং খুদে গোয়েন্দা মিঃ গোগোল। মুখ-টুখ ধোয়া হয়েছে? না ধোয়া হয়ে থাকলে ধুয়ে নাও। তারপরে খাবার খাও। মিষ্টি এনে দিচ্ছি। কিন্তু এখানে চা-কফি ছাড়া, আর কিছু পাবে না। চলবে?'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

ব্যানার্জি প্লেটটা খাটের বিছানাব ওপবেই রেখে, দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পবেই আবার ঢুকল। হাতের প্লেটে একটা সন্দেশ। সেটা রেখে, জলের বোতলটা দেখিয়ে বলল, 'খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। আজ এমন একটা ফূর্তির দিন, তুমি ছোকরা মাটি করে দিলে। নিজেও ডুবলে, আমাদেরও ডোবালে। এখন যা কপালে আছে, তার জন্যে অপেক্ষা করো। তবে হ্যাঁ দুপুরে তোমাকে আমি মুরগির ঝোল খাওয়াব। বিকেলে কেক খাওয়াব। রাত্রেও খাওয়াব। কিন্তু তারপরেই তো সাইমন তোমাকে—।'

ব্যানার্জি কথা শেষ না করে, আঙুলে তাগ্ কষে ট্রিগার টেপার ভঙ্গি করল। তারপরে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। গোগোল একবার কল্পনা করার চেষ্টা করল, সাইমন রিভলবার তুলে ওকে গুলি করছে। আর সিনেমার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। গুলি লেগে লোকে কেমন করে মরে যায়। কিন্তু আপাতত মাখন-টোস্ট আর ওম্‌লেটের গন্ধে ওর খিদে পেয়ে গেল। ও খেতে আরম্ভ কবল।

খাওয়ার শেষে আর কিছুই করার নেই। বাইরে যাবার দরজার দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। অথচ চুপ করে বসে থাকা মুশকিল, হঠাৎ ওর মাথায় একটা চিন্তা এল। ও ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে গেল। স্টেনলেস স্টিলের দাড়ি কামাবার সেফ্‌টি রেজারটা তুলে নিল। ফিরে এসে, খাটের ওপর উঠে, জানালার পর্দা সরাল। কাঠের পাল্লার ওপর দিকে,

কাচের ধার ঘেঁষে, রেজার দিয়ে ঘষা দিতেই বিশ্রী শব্দ হল। গোগোল ভয়ে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল। কাচটা এক ফুট বাই এক ফুট হতে পারে। ওখান থেকে পালানো যাবে না। কিন্তু কাচটা ভাঙতে পারলে, বাইরের চেহারা দেখা যেত। কিন্তু সেফ্‌টি রেজার দিয়ে এ কাচ কাটা যাবে না। ঠুকে ভাঙতে গেলে শব্দ হবে। শেষ পর্যন্ত গোগোল কাঠের সঙ্গে লাগানো কাচের পুটিং ঘষে ঘষে তুলতে লাগল। তাও বেশ শক্ত। শব্দ হচ্ছে। তবে কম। ও মাঝে মাঝে দরজার দিকে দেখছে, আর পুটিং তুলছে। পুটিংয়ের ভেতর থেকে পেরেক বেরিয়ে পড়ছে।

গোগোল বুঝতে পারছে কোন লাভ নেই। পেরেকগুলো বাঁকিয়ে তুলে, কাচ খোলার সাধ্য ওর নেই। সেফ্‌টি রেজারটা নষ্ট হচ্ছে। ও নেমে এসে দরজায় কান পাতল। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ব্যানার্জি কি বেরিয়ে গেছে? হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ও দরজায় ধাক্কা দিল। ব্যানার্জি এলেই বলবে, ও চা খেতে চায়। আসলে খাবে না। দিলে, পরে ফেলে দেবে। কয়েকবার দরজা ধাক্কা দিয়েও, ব্যানার্জির সাড়া পাওয়া গেল না। এ দরজার লকের কোন ছিদ্র নেই। বাইরে থেকে টেনে দিলে, আপনা থেকেই লক্‌ হয়ে যায়। ব্যানার্জি কি তাহলে বেরিয়েছে? আবার কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পেল না। গোগোল লাফ দিয়ে খাটে উঠে, জানালার পর্দা সরাল। সেফ্‌টি রেজার দিয়ে কাচের ধারে জোরে ঘা মারল। কাচে চিড় খেল। ও আরও জোরে মারল। ঝনঝন করে এক টুকরো কাচ ভেঙে পড়ল। গোগোলের দৃষ্টি বাইরে গেল। খানিকটা জায়গা সিমেন্ট-বাঁধানো। তারপরে একটা বাগান। বাগানের পরেই পাঁচিল। নিচু পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে চওড়া পিচের রাস্তা। রাস্তার ধারে বড়-বড় গাছপালা। শীতের রোদভরা রাস্তা দিয়ে হু-হু করে বাস, প্রাইভেট গাড়ি, লরি আর সাইকেল রিক্‌শা যাতায়াত করছে। সাইকেল রিক্‌শা? এটা কোন্ জায়গা? গোগোল কলকাতায় একমাত্র টালিগঞ্জ এলাকাতে সাইকেল রিক্‌শা চলতে দেখেছে। এটা কি টালিগঞ্জ? তখনই মনে পড়ে গেল, গতকাল রাত্রে বাবু মল্লিকের কথা। বুলু হাজরাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে, সাইমনকে সে তার গলফ্‌ গ্রিনের ফ্ল্যাটে চলে আসতে বলেছিল। গলফ্‌ গ্রিন তো টালিগঞ্জের কাছেই।

গোগোল দরজার দিকে একবার দেখে, আবার কাচের ওপর ঘা মারল। আবার খানিকটা কাঁচ ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল। এদিকটায় যে লোকজন নেই, তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বাড়িটা ক'তলা, তা বোঝবার উপায় নেই।

ফাঁকটা বেশ বড় হলেও, গোগোল মুখ বাড়াতে সাহস পেল না। ধারাল ভাঙা কাঁচে মুখ কেটে যেতে পারে। ও প্রাণভরে বাইরেটা দেখতে লাগল। আর মনটা ছটফটিয়ে উঠল। এ ঘর থেকে চিৎকার করলেও, রাস্তার লোক ওর গলা শুনতে পাবে না।।

গোগোল কতক্ষণ দেখছিল, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ব্যানার্জির বেশ চড়া স্বরের গান শোনা গেল, 'বড়লোকের বিটি লো লম্বা-লম্বা চুল।'… গোগোল চট করে পর্দা টেনে দিয়ে খাটের নিচে নেমে এল। বাথরুমে ঢুকে সেফ্‌টি বেজাবটা রেখে দিল। ঘরে এসে খাটে বসতেই, ব্যানার্জি দরজা খুলে ঢুকল তার পাজামা আর গেঞ্জির ওপরে এখন একটা গরম শাল জড়ানো। তার মুখ লাল। বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে। বলল, 'হুঁ, বসে আছ? যেমন কপাল কবেছ? এখানে এমন বই নেই যে তোমাকে পড়তে দিতে পারি। আর কতক্ষণ? রাত্রি দশটা অবধি কাটিয়ে দাও। তারপরেই সব শেষ।'

গোগোল ব্যানার্জির লাল হাসি-খুশি মুখেব দিকে তাকিয়েছিল। জিজ্ঞেস কবল, 'এটা কোন্ জায়গা?'

ব্যানার্জি ভুরু কুঁচকে, একটু ভাবল। বলল, 'কোন জায়গা? এটা হল দমদম ক্যান্টনমেণ্ট এরিয়া। বোসো। আর একঘন্টা বাদেই দুপুরের খাবাব পাবে। যদি চান করে নিতে চাও, নিতে পারো। গরম জল চাইলে, গিজারের সুইচ টিপে দিও। তোয়ালে আর সাবান তো আছেই।'

ব্যানার্জি কথাগুলো বলে, একটু যেন টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। কেন কে জানে। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা মিথ্যে বলে গেল। দমদম ক্যান্টনমেণ্ট এটা নয়। শাল গায়ে দেখে মনে হল, সে বাইরে বেবিয়েছিল। গোগোল স্নানটা সেরেই নিল। বাড়ির কথাই বারে বারে মনে পড়ছে। কেউ ভাবতেও পারছে না, ও কোথায় কেমন আছে। টেলিফোনের ঘটনার কথা কাউকেই বলেনি। ফলে ওর অন্তর্ধানের ব্যাপার কেউ কিছু আন্দাজও করতে পারছে না।

ব্যানার্জি দুপুরে সত্যি-সত্যি গরম মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়াল। তার সঙ্গে মিষ্টি। কিন্তু সময় যত যাচ্ছে, গোগোলের উদ্বেগ তত বাড়ছে। মুখে খাবার রুচছে না। অর্ধেক খাবারও খেতে পারল না। গোটা দুপুরটাও ব্যানার্জির টেলিফোনে কথাবার্তা, চিৎকার করে গান আর গুনগুনানি শুনল। লোকটা খ্যাপা নাকি? আবার মাঝে মধ্যে নিজের মনেই কথা বলছিল। এসব শুনতে শুনতে গোগোল কয়েকবার জানালার ভাঙা

কাঁচ দিয়ে বাইরের দিকে দেখেছে।

ব্যানার্জি বিকেলে সত্যি-সত্যি প্লেটে একটা আস্ত কেক নিয়ে এল। তার গায়ে লেখা আছে, 'হ্যাপি খ্রীষ্টমাস।' বলল, 'নাও, বড়দিনের কেক খাও মাঃ গোগোল।'

কেকটা দেখে, গোগোলেব এবার সত্যি কান্না পেয়ে গেল। ব্যানার্জি হেসে উঠে বলল, 'কেঁদে কী হবে? যেমন কাজ করেছ, তাব ফল তো পেতেই হবে। মনে করো, এখন বাড়িতেই আছ। খেয়ে নাও। তবে তোমাকে একটা কথা দিচ্ছি। সব শেষ হবার আগে, তোমাকে তোমাব বাবা-মা'র সঙ্গে টেলিফোনে একবার কথা বলতে দেব।'

ব্যানার্জির গায়ে তেমনই পাজামা আর গেঞ্জি। লোকটাব শীত নেই। কেবলই লাল হচ্ছে, আব টলে টলে চলছে। গোগোল কেক ছুঁয়েও দেখল না। ভেতরে যত ছটফটানি বাড়ছে, কান্নাও পাচ্ছে তত। মাঝে মাঝে উঠে পর্দা সরিয়ে ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরে দেখছে। দূরেব রাস্তাটায় গাড়ির ভিড় কমে যাচ্ছে। কিন্তু বড়-বড় নিয়নেব আলোয় দিনেব মত সব ফটফট করছে।

গোগোল নখ কামড়াতে আরম্ভ কবেছে। বাত্রি নেমে এসেছে। ক'টা বেজেছে, বোঝবার উপায় নেই। ও দরজায় কান পাতল। ব্যানার্জি টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলছে। এ ঘব থেকেও শোনা যাচ্ছে, 'তোমবা স্টার্ট করছ? উইশ ইউ হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস্। আমি ঠিক আছি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, কড়া নজরে বেখেছি। এটা নিয়ে ভেবো না। ওটা সামলে এসো।'

কথার শেষেই ধুপ্ করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ পড়ে গেল। সেই সঙ্গে বোধ হয় একটা চেয়ারও। একটু পবে দবজার দিকে ব্যানার্জিব পায়ের ভারী শব্দ এগিয়ে এল। গোগোল তাড়াতাড়ি বাথরুম আর ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। একটা শেষ চেষ্টা ও করবে। ধরা পড়ে পিটুনি খেয়ে মরে গেলেও, মরিয়া হয়েও পালাবার পথ খুঁজবে।

দরজায় খট্ করে শব্দ হল। ব্যানার্জি হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। গোগোল দাঁড়িয়ে ছিল দরজার পাশেই। ব্যানার্জি চিৎকার করে উঠল, 'এই বদমাস ছেলে, বাতি নিভিয়েছিস কেন?'

গোগোল সেই ফাঁকে দরজার বাইরে গিয়েই জোরে দরজাটা টেনে দিল। ভেতর থেকে দরজার ওপর দুম্ দুম্ করে ঘুসি পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে ব্যানার্জির পাগলের মতো চিৎকার, 'খোল্ খোল্ বলছি।'

গোগোল তখন খাবার টেবিল পেরিয়ে কাঠের পার্টিশনের বাইরে চলে গেছে। আলো জ্বলছে। পার্টিশনের বাইরে বসবার ঘর। বাঁদিকে একটা বন্ধ দরজা। গোগোল হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। পেছনে তখন ঘরের দরজায় যেন বোমা পড়ছে। গোগোল বাইরে এসে দেখল, মস্ত বড়-গাড়ি-বারান্দা। আলো নেই। সামনে বাগান আছে বোধ হয়, ও বারান্দা থেকে নেমে ছুটল। পাঁচিল ঘেরা বাগানের গেটটা খুঁজে পেতে দেরি হল না। তালা লাগানো ছিল না। গেট খুলে, ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল। বাঁয়ে দূরে বোধ হয় সেই বড় রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের রাস্তাটা একটু অন্ধকার মতো। গোগোল সেদিকেই ছুটল।

দু-পাশে বাড়ি-মাঠ, সবরকমই আছে। সাইকেল রিক্‌শা চলাচল করছে। দু একটা চায়ের দোকান। এ অঞ্চলে বড়দিনের আলোর সাজ, হৈ-হল্লা কিছুই নেই। গোগোল প্রাণপণে ছুটে, আর একটা বড় চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল। নিয়নের আলোয় রাস্তা দিনের মতো পরিষ্কার। ও ছুটে রাস্তার উলটো দিকে গেল। যত গাড়ি যাচ্ছে, সবগুলোকেই হাত দেখাচ্ছে। কেউ থামছে না, এতটুকু ছেলেকেও লোকে ভয় পায়? গাড়িতে তুলতে চায় না? রাস্তায় কিছু লোক চলাচলও করছে। কিন্তু ও সাহস করে কিছু বলতে পারছে না। কোন্‌দিকে ছুটছে নিজেও জানে না। কেবল প্রত্যেকটি গাড়িকে ও হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করছে।

শেষ পর্যন্ত হেড লাইট জ্বেলে, একটা গাড়ি ওর সামনে থেমে গেল। দেখল, গাড়িটা খালি ট্যাক্সি। ড্রাইভার একজন সর্দারজি। গোগোল নিজেদের বাড়ির রাস্তার নাম করে বলল, 'যাবেন?'

সর্দারজি বাংলায় বললেন, 'হ্যাঁ যাবে না কেনো। মগর খোকা, তুমার পাস রুপেয়া আছে তো?' গোগোল বলল, 'না। আপনাকে বাড়িতে গিয়ে টাকা দেব। আমার বাবা-মা আপনাকে বেশি টাকাই দেবেন।'

সর্দারজি গোঁফে হাত বুলিয়ে গোগোলকে একবার আপাদমস্তক দেখল। তারপর পিছনের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। বসে যাও।'

গোগোল ট্যাক্সির ভেতরে উঠে বসল। সর্দারজি মিটার ডাউন করে ট্যাক্সি চালাল। জিজ্ঞেস করল, 'খোকা, ঘরসে পলাইছিলে?'

গোগোল বলল, 'না, হারিয়ে গেছলুম। আমার বাবা-মা আপনাকে সব বলবেন।' সর্দারজি পাগড়িশুদ্ধ মাথা ঝাঁকাল। গোগোলের মাথায় আবার নতুন চিন্তা এল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে ঘড়ি আছে? এখন ক'টা বেজেছে?'

সর্দারজি বাঁ হাত তুলে, ঘড়ি দেখে বলল, 'ন বেজে দশ মিনিট।'

গোগোল বলল, 'সর্দারজি তা হলে পার্ক টেরাসে চলুন—আমার বাবা-মা বোধহয় এখন সেখানে গেছেন।

সর্দারজি গাড়ি প্রায় থামিয়ে দিল। বলল, 'এ খোকা, তুমার দিমাক ঠিক আছে তো। পার্ক টেরাস কোথায় আছে, হামি জানে না।'

গোগোলও সেটা জানে না। কিন্তু এখন আর কথা ফেরাবার উপায় নেই। ও বলল, 'পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর কাছে।'

সর্দারজি আবার গাড়ির গতি বাড়াল।

পার্ক টেরাস খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হল। সর্দারজি তো রেগেই গেল। ট্রাম ডিপোর কাছ থেকে, মার্কেটের কাছে ঘুরে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে, শেষ পর্যন্ত পার্ক টেরাসের খোঁজ পাওয়া গেল। ট্যাক্সি দাঁড়াল তুইয়ের এ পার্ক টেরাসে। সর্দারজি রেগে বলল, 'নিজের মেহমানের ঘর তুমি চিনছো না? যাও, জল্‌দি ঘরসে টাকা লিয়ে এসো।'

গোগোল ট্যাক্সি থেকে নেমেই, বাগানওয়ালা দোতলা বড় বাড়িটাব ভেতরে ঢুকে গেল। বাইরে রাস্তাব ধারে কাতার দিয়ে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রঙ-বেরঙের আলো দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়েছে। নীচের হলঘবে নানা রঙের বেলুন ঝুলছে। স্টিরিওতে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজছে। ভিতরে বহু মহিলা, পুরুষের ভিড়, হলের সামনে বড় বারান্দা।

গোগোলকে কেউ লক্ষ্যই করছে না। ও তা চায়ও না। হলে ঢোকবাব সাহস ওর নেই। সেখানে বাবু মল্লিক আর খুনে সাইমনটা আছে। ওকে দেখতে পেলেই, নির্ঘাত গুলি করে মারবে। ও বাইরে থেকে হলের ভিতর উঁকি দিল। ভিতবে আলো জোরালো নয়। কারোকেই স্পষ্ট করে দেখা যায় না। গোগোল হাজরাদের কারোকে চেনে না। ও ভাবছে, নীচের হলে কি বুলু হাজরার ছেলেমেয়েরা এসেছে? এটা তো বড়দের আসর। ছোটরা নিশ্চয়ই দোতলায় আছে।

গোগোলের চোখে পড়ল, বারান্দা বাঁদিকে ঘুরে গেছে। সেদিক থেকে উর্দিপরা বেয়ারারা ট্রে হাতে গেলাস আর খাবার নিয়ে আসছে। ও সেদিকে গেল। দেখল, বারান্দার ডানদিকে একটা বড় ঘরে রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে। বাঁদিকের বারান্দার একেবারে শেষে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দু-এক জন সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে। গোগোল কোনোদিকে না তাকিয়ে, সোজা সেই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

দোতলায়ও চওড়া ঢাকা বারান্দা। ডানদিকের ঘরগুলো মাঝারি।

আলো জ্বলছে। লোক নেই। ও একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ভেতরে মুখোমুখি আর একটা খোলা দরজা। সেই দরজা দিয়ে ভেতরে দেখল, নীচের থেকে ছোট হলেও, ঘরটা প্রায় হলের মতোই। সেখানে দশ-বারোজন গোগোলের বয়সী ছেলে-মেয়ে খেলা করছে। হলের এক কোণে সাণ্টাক্লজ সাজানো। গোগোলকে দেখে সবাই ওর দিকে তাকাল, গোগোল ওদের দিকে এগিয়ে গেল। সকলের মুখের দিকে তাকাল। এখন লজ্জা আর সংকোচের সময় নেই। ও জিজ্ঞেস করল, 'এখানে গগন হাজরাব ছেলে-মেয়ে কেউ আছে?'

সবাই অবাক চোখে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করল। একটি বছর আটেকের ছেলে বলল, 'আমার বাবার নাম গগন হাজরা।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'তোমাব মা কোথায়?'

ছেলেটি বলল, 'মা নীচে আছেন।'

গোগোল বলল, 'তুমি শিগ্‌গির নীচে যাও। মাকে বলো, যে ছেলেটা কাল সন্ধ্যেবেলা ওঁকে টেলিফোন কবেছিল, ;ও এসেছে। খুব তাড়াতাড়ি যাও। আর দেখো, কেউ যেন শুনতে না পায়।'

ছেলেটা বন্ধুদের দিকে তাকাল। গোগোল প্রায় বড়দের মতো ধমক দিল, 'ওদিকে দেখছ কী? শিগ্‌গির মাকে ডেকে নিয়ে এসো। নইলে এ বাড়িতে এখুনি একটা খারাপ ব্যাপার ঘটে যাবে। দৌড়ে যাও।'

ছেলেটা এবার কথা শুনল। দৌড়ে ঘরের বাইবে চলে গেল। আশে-পাশে সোফা আছে। গোগোল বসল না। ওকে সবাই হাঁ করে দেখছে। ও সাণ্টাক্লজের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রায় দু-মিনিট পরে, সেই ছেলেটির সঙ্গে একজন মহিলা এলেন। সেজেছেন খুব সুন্দর। গোগোলের সামনে এসে, ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি? কী চাও?'

গোগোল বলল, 'আমি আপনাব সঙ্গে গতকাল টেলিফোনে কথা বলেছিলুম।'

'তুমিই সেই?' মহিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

গোগোলের চোখে-মুখে উত্তেজনা ফেটে পড়ছে। বলল, 'গগনবাবু কি নীচে আছেন?'

মহিলা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ কেন বলো তো?'

গোগোল বলল, 'ওঁকে এখুনি একজন খুন করবে। আপনি ওঁকে

তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলুন।'

মহিলার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল, 'কী বলছ তুমি?'

গোগোল বলল, 'ঠিকই বলছি। বাবু মল্লিক আব সাইমন নামে দুজন লোক ওঁকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে এসেছে। ত্রিশ লক্ষ টাকা নিয়ে কী যেন হয়েছে এঁদের মধ্যে। গগনবাবু সেই জন্যই দিল্লিতে তাঁর অডিটাবের কাছে গেছলেন।'

মহিলা গোগোলেব কথা শেষ হবাব আগেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। বাকি ছেলেমেয়েবা গোগোলকে ঘিবে, অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। গোগোলের চোখে ভাসছে ট্যাক্সিব সর্দাবজি ড্রাইভাবেব মুখ। তিনি নিশ্চয়ই গোগোলকে মিথ্যেবাদী ভেবে গালাগালি কবছেন।

হঠাৎ নীচে থেকে একটা হৈ হট্টগোল ভেসে এল। গোগোল ঘব থেকে বেরিয়ে সিঁড়িব দিকে ছুটল। মহিলা-পুরুষদেব ভয় পাওয়া চিৎকাব চেঁচামেচির মধ্যে, গেলাস বোতল ভেঙে পড়াব ঝনঝন শব্দ হল। গোগোল নীচে এসে দেখল, অনেকেই বাইরে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। বেয়ারারা চিৎকার করছে, 'খুন! খুন!'

গোগোল একটা দরজা দিয়ে নীচের হলে ঢুকল। দেখল, এক জায়গায় অনেকে ভিড় করেছেন। গোগোল সেখানে এগিয়ে গেল। আর অবাক চোখে দেখল, সেই মহিলার কাঁধেব কাছ থেকে রক্ত ঝবে পড়ছে। তিনি নীল রঙের স্যুট-পরা এক ভদ্রলোকের কাঁধ জড়িয়ে আছেন। গোগোল সামনে যেতেই, মহিলা ওকে দেখিয়ে, কোনো বকমে বললেন, 'এই সেই ছেলেটি।'

সকলের দৃষ্টি গোগোলের দিকে ফিরল। অনেকেই ঘিরে এলেন ওকে। একজন নীল স্যুট পরা ভদ্রলোককে বললেন, 'মিঃ হাজরা, আপনি আপনাব স্ত্রী আর ছেলেটিকে নিয়ে ওপরে চলে যান। ডাক্তার এখুনি আসবে। পুলিশও এল বলে।'

নীল স্যুট-পরা গগন হাজরা গোগোলেব দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন। গোগোল ভাবছে, মহিলার কী হল? ওঁর কাঁধের কাপড় রক্তে ভাসছে কেন?' ও জিজ্ঞেস করল, 'ওঁর কী হয়েছে?'

এক ভদ্রলোক বললেন, 'মিঃ হাজরাকে একজন গুলি করে মারতে যাচ্ছিল। উনি ওঁর স্ত্রী। উনিই স্বামীকে বাঁচাবার জন্য আগে থেকেই মিঃ হাজরাকে ডেকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তখনই লোকটা গুলি করে। গুলিটা লেগেছে মিসেস হাজরার কাঁধে।'

মিসেস হাজরা মিঃ হাজরার ওপর শরীরের ভার রেখে, একটা হাত গোগোলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ডাকলেন, 'এসো, আমার কাছে এসো বাবা।'

গোগোল কাছে গেল। তিনি গোগোলের গলা জড়িয়ে ধরলেন। সেই অবস্থায় মিসেস হাজরাকে ধরে, মিঃ হাজরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। দোতলার হল ঘরে সোফায় বসিয়ে দিলেন মিসেস হাজরাকে। সঙ্গে আরও কয়েকজন। গোগোল মিঃ হাজরাকে বলল, 'দেখুন একজন সর্দারজি ড্রাইভার আমাকে এখানে তাঁর ট্যাক্সিতে নিয়ে এসেছেন। ওঁকে ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দিন।'

অন্য একজন ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে বললেন, 'বুলু আমি যাচ্ছি। তুমি এখানে থাকো।'

স্থানীয় থানার ও সি এলেন, একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে নিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার মিঃ হাজরা ? মিসেস হাজরাকে কেউ গুলি করেছে ?'

বুলু হাজরা বললেন, 'হ্যাঁ। আসলে আমাকে মারতেই নাকি এসেছিল। আপনি এই ছেলেটির মুখে সব শুনুন।' তিনি গোগোলকে দেখিয়ে দিলেন।

ও সি গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল প্রথমেই ওর বাবার নাম আর ঠিকানাটা জানিয়ে বলল, 'এখুনি আমার বাবা-মাকে টেলিফোন করে একটা খবর দিন, আমি এখানে আছি।'

ও সি মস্ত একটা হাঁ করে গোগোলকে দেখে বললেন, 'তুমি গোগোল ? গতকাল সাড়ে-তিনটে নাগাদ তোমাকেই সাণ্টাক্লজের ছদ্মবেশে একটা লোক কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছল ?'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

ও সি'র যেন গোগোলদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা মুখস্থই ছিল। তিনি সাব-ইন্সপেক্টরকে বললেন, 'আপনি এখুনি টেলিফোন করে, মিঃ আর মিসেস চ্যাটার্জিকে এখানে আসতে বলুন। বলুন, গোগোল অক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছে। কোনো ভয় নেই। তারপরে সব শুনছি।'

এক ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে 'বললেন, 'কিন্তু আততায়ীকে খুঁজতে যাবেন না ?'

গোগোল বলল, 'তাকে আমি চিনি। আমি সব কথাই বলব। তার আগে ওঁকে বাঁচান।' ও মিসেস হাজরাকে দেখাল।

এ সময়েই দুজন ডাক্তার এলেন হন্তদন্ত হয়। মিসেস হাজরাকে তখন

একটা বড় সোফায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর ছেলেমেয়েরা কাঁদছে। একজন ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে ক্ষতস্থান দেখে বললেন, 'গুলি বিঁধে নেই। খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। চিকিৎসা বাড়িতেই চলতে পারে। কিছু অ্যাপারেটাস দরকাব। ডাঃ গাঙ্গুলীব সঙ্গে হাত মিলিয়ে অপারেশন আর রক্ত বন্ধ কবে ফেলব। তবে মিসেস হাজরাকে অন্য ঘবে নিয়ে যেতে হবে। খুব মাবাত্মক কিছু হয়নি। বেঁচে যাবেন।'

কয়েকজন মহিলা, পুরুষ মিসেস হাজরাকে ধবে একটা ঘবে নিয়ে গেল।

গোগোলকে ঘিরে হলঘবে একটা প্রায় সভা বসে গেছে। গোগোলেব মুখ থেকে সব ঘটনা শুনে, সকলেই স্তব্ধ, হতবাক। একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত নেই। সবাই যেন একটা অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর ঘটনা শুনলেন।

ও সি উঠে দাঁড়িয়ে গোগোলেব দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমার তুলনা নেই গোগোল। নিজে বেঁচেছ অদ্ভুতভাবে। মিঃ হাজরাকেও বাঁচিয়ে দিয়েছ। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে, অপবাধীদেব ধবে অপরাধ প্রমাণ করা। আব তাদের আইনমাফিক শাস্তি দেওয়া।' তিনি গোগোলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

গোগোল দেখল, মা, বাবা তিতুদার সঙ্গে কাছেই একটা সোফায় বসে আছেন। গোগোল মায়েব কাছে এগিয়ে গেল। মায়ের চোখে তখনও জল। গোগোল বলল, 'মা, রাগ কোবো না। আমি টেলিফোনের কথা তোমাদেব বলিনি।'

মা বললেন, 'বেশ কবেছ। তুমি তো আমাকে ববাববই এবকম জ্বালাও।'

মা গোগোলকে কোলেব কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু সবাই তখন গোগোলকে আদর কবতে চাইছে। ও যেন সকলের হাতে হাতে ঘুবতে লাগল। বুলু হাজরা গোগোলের বাবা, মা, তিতুদাকে ছাড়লেন না। বললেন, 'আপনারা এখন যেতে পারবেন না। আমার স্ত্রী ছাড়বেন না। আর এ-কথাও আমার স্বীকার করা উচিত, আমি এমন কোনো ভাল কাজ করিনি, যাতে গোগোলের মতো ছেলের এমন বিপদে পড়তে হয়। তবু ওর কল্যানেই আমি আজ বেঁচে গেলাম।'

একটি বছর-চারেকের মেয়ে, গোগোলকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছেই ছান্টাক্লসটা তোমাকে ভুঁলির ভেতলে ধুকিয়ে নিয়েছিল?'

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। গোগোল হেসে বলল, 'হ্যাঁ। ভুঁড়িটা আসলে ওর মস্ত আলখাল্লা।'

গোগোল ঘরের একপাশে সাণ্টাক্লজের তুলোর মূর্তির কাছে এগিয়ে গেল। সাণ্টাক্লজবুড়ো সাদা ভুরুর নীচে, কালো চোখে হাসছে। ওর মনে পড়ল ব্যানার্জির কথা। লোকটা সত্যি ভাল সাজতে পারে। ও মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না। বেচারি দরজাটা এখনও খুলতে পেরেছে কি না, কে জানে। এত ভাল সাজতে পারে, নাচতে পারে, গাইতে পারে। তবু এরা এমন হয় কেন? তারপরেই মনে পড়ল, জুলির জন্য আঁকা ওর সাণ্টাক্লজের ছবির কথা। জুলি কি সেটা নিয়ে গেছে? ও মাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখে মা সেখানে নেই। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, মা কোথায়?'

বাবা বললেন, 'তোমার মা মিসেস হাজরার কাছে অন্য ঘরে গেছেন।'

গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, জুলি কী আমার আঁকা সাণ্টাক্লজ নিয়ে গেছে?'

বাবা মাথা নেড়ে বললেন, 'বেচারা তোমার জন্য কেঁদে মরছে। তার আর হ্যাপি ক্রিষ্টমাস করা হল না।'

গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে আজ ফিরতে যত রাতই হোক, গোগোল ফিরে গিয়ে সাণ্টাক্লজের ছবিটা জুলিকে দেবে।



গোগোল এবার নিয়ে দ্বিতীয়বাব দীঘায় এল। এ সময়ে আসার কথা নয়। আসার কোন কথাও ছিল না। আগে থেকে কোনো তোড়জোড়ও ছিল না। যেমন কোথাও বেড়াতে যেতে হলে, অনেক আগে থেকেই দিন তাবিখ ঠিক হয়ে যায়। বাবা আগেই টিকিট কেটে রাখেন, রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা কবা থাকে। দীঘাব সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসার জন্য ট্রেনেব রিজার্ভেশনের কোনো দরকারই হয় না। ট্রেনে চেপে দীঘায় না এলেও, গোগোল বাবা-মার কথাবার্তা থেকেই জেনেছে, ট্রেনে করে এলে, খড়্গপুর পর্যন্ত আসা চলে। অথবা কাঁথি পর্যন্ত। তারপরে বাসে চাপতে হবে। দীঘা পর্যন্ত কোনো রেল লাইন নেই।

গোগোল প্রথমবাব যখন দীঘায় এসেছিল, তখন কলকাতা থেকে মোটর গাড়িতেই এসেছিল। তখন ওব বয়স ছিল অনেক কম। তারপর তো পুরীর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছে। সেই সমুদ্রের চেহারাই আলাদা। যেমন তার ঢেউ, তেমনি গর্জন আর সেবারেই সেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। একটা খালি পোড়ো বাড়ির উঠোনে জমে থাকা বালির বুকে, দেখতে পেয়েছিল এক চিলতে সোনালি পাড়। সোনালি পাড়ের হদিস পাবার জন্য, বালি খুঁড়তে খুঁড়তে সে কী ভয়ংকর কাণ্ড! বালির নীচে ছিল এক ভদ্রমহিলার মৃতদেহ। তখনই কোথা থেকে এসে পড়েছিলেন এক

ভদ্রলোক। আর গোগোলের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল পিস্তলের গুলি। ভাগ্যিস্ ভদ্রলোক গোগোলকে বালির ওপরে টেনে শুইয়ে দিয়েছিলেন!

যাক সে অনেক ব্যাপার। গোগোলের প্রথম দেখা দীঘার কথা তেমন মনে নেই। আবছা যেটুকু মনে আছে, তার মধ্যে, সোজা রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে নামতে গেলে, প্রথমেই ছিল বেশ উঁচু একটা বাতিস্তম্ভ। এটাও মনে আছে, সেই বাতিস্তম্ভের আলো, সমুদ্রের ধারের বালুচরে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যেত। বাবা-মায়ের সঙ্গে সমুদ্রে চান করার কথাও একটু-আধটু মনে আছে। আর বিশেষ করে মনে আছে, সমুদ্রের ধারে বালুচরের ওপর দিয়ে মোটরগাড়ি চেপে বেড়ানো। দীঘার সমুদ্রের ধারের এটাই নাকি বিশেষত্ব, বালুচর বেশ শক্ত। গাড়ির চাকা বসে যায় না। এমনকি, ছোটখাটো প্লেনও নাকি নামে। কিন্তু গোগোল তা দেখতে পায় নি।

এবারে এসে দেখল, সেই বাতিস্তম্ভটা ভেঙে গিয়েছে। কেবল তার ভিতটাই ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। সমুদ্রের ধারে আজকাল মোটরগাড়ি চলাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ, বাবার কাছে শুনল, সমুদ্র নাকি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। শক্ত বালুচর নরম হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চলার পক্ষে বিপজ্জনক। শুনে গোগোলের মনটা খাবাপ হয়ে গেল। সেই ওর চার-পাঁচ বছর বয়সে, সমুদ্রের ধারে গাড়ি চেপে বেড়ানোর ছবিটা চোখের সামনে একটু-একটু ভাসছিল। বেড়ানোর মজাটাও একেবারে ভুলে যায় নি। সেই একটুখানি মনে থাকাটাকে এবার বেশ ভাল করে উপভোগ করবে, ভেবে এসেছিল। এবারও কলকাতা থেকে টানা গাড়িতেই এসেছে। সুতবাং গাড়ির ভাবনা ছিল না। দিপুমামার গাড়িটাও বেশ ভাল, নতুন আর ঝক্‌ঝকে। দিপুমামা নিজেই গাড়ি চালান, আর চালাতেও পারেন খুব ভাল। গাড়ির স্পীড তুলতে ওঁর যেন জুড়ি নেই। ফাঁকা হাইওয়ে পেলে তো কথাই নেই। স্পীডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে আশি থেকে একশো, একশো থেকে একশো কুড়ি-তিরিশ-চল্লিশ পর্যন্ত তুলে দেন। গোগোল দারুণ উত্তেজনা বোধ করে, মনে-মনে বলে, আরো, আরো। কিন্তু এত স্পীড মা আর মামিমার সহ্য হয় না। বাবারও নিশ্চয় ভাল লাগে। কারণ [illegible] দিপুমামাকে স্পীডের জন্য কখনো বাধা দেন না। কেবল মিটিমিটি হাসতে থাকেন। এদিকে মা আর মামিমা রীতিমত বিরক্ত হতে থাকেন, বারে-বারে স্পীড কমাতে বলেন। দিপুমামাকে বাধ্য হয়েই তখন স্পীড কমাতে হয়।

দিপুমামা সম্পর্কে মায়ের খুড়তুতো ভাই। নাম দীপক মুখোপাধ্যায়।

ভবানীপুরে বাড়ি। বাবার থেকে বয়স কিছু কম, মায়ের থেকে কয়েক বছরের বড়। তবু মা তাঁকে 'তুই' করে বলেন। দিপুমামার রঙ ফরসা, চেহারা বেশ লম্বা। চোখমুখও বেশ সুন্দব। চলাফেরায় খুব চটপটে, মুখে হাসি লেগেই আছে। আব কথাবার্তা বলেন যেন ছেলেমানুষেব মতো। অবশ্য সত্যিই ছেলেমানুষের মতো নয়। গোগোলের সেইরকম মনে হয়। দিপুমামাকে ওর খুব ভালো লাগে। দিপুমামাও ওকে খুব ভালোবাসেন। গোগোলের বেশি ভাব দিপুমামাব ছেলে বুবুনেব সঙ্গে। তবে বুবুন গোগোলের থেকে বছর তিনেকের ছোট। আর গোগোলের বিশেষ ভক্ত।

দিপুমামার এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরি আছে। খুব ব্যস্ত মানুষ। তবু সপ্তাহেও একদিন গোগোলদের বাড়িতে আসেন। গোগোলেবাও মাঝে-মধ্যে দিপুমামাদের বাড়ি যায়। বাবার সঙ্গে দিপুমামার ভাব বেশি। দুজনে গল্প করতে বসলে, আর শেষ হতে চায় না। তা নিয়ে মা আর মাসিমা দুজনে ঠাট্টা কবে নানা কথা বলেন। তবু গোগোলের বিষয়ে দিপুমামার খুবই কৌতূহল। বিশেষ কবে, গোগোলের এক-একটা কাণ্ড যখন খবরের কাগজ পর্যন্ত গড়ায়, দিপুমামা বাড়িতে ছুটে এসে গোগোলকে কীভাবে কতটা আদর কববেন, ভেবে পান না। তাঁব চোখেমুখে আর কথায় বিস্ময় ফেটে পড়ে। আবার ভয়ও পান, বলেন, 'গোগোল, সব দেখে-শুনে আমাব ভয় লাগে। ভাবি, কোন্ দিন তুই একটা ভয়ংকর বিপদে পড়ে যাবি।'

এ তো বাবা-মায়েবও কথা। কিন্তু গোগোল কোনদিনই, কোনো ঘটনার মধ্যে ইচ্ছে কবে জড়িয়ে পড়ে না। চোখেব সামনে হঠাৎ কবেই এমন ঘটনা ঘটে যায়, কিছু বুঝে ওঠবার আগেই দেখা যায়, ও যেন কেমন কবে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। আব সেই সব ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়া মানেই বিপদ! বিপদে কি কেউ ইচ্ছে করে পড়তে চায়? গোগোলও চায় না। কিন্তু, বিশেষ করে মা সে-কথাটা বিশ্বাসই করতে চান না। অবশ্য গোগোলের সব বিষয়েই কৌতূহল একটু বেশি। কোথাও কিছু সন্দেহজনক চোখে পড়লেই, ওর দৃষ্টি সেখানে আটকে যায়। এমন-কি, কোনো লোকের চলাফেরা চোখ-মুখ দেখে সন্দেহ হলেও, সেই লোকটাকে ও ভুলতে পারে না। সেদিকে নজর তো আটকে যায়ই, মনের মধ্যে অনেকরকম চিন্তার জট পাকিয়ে ওঠে। কৌতূহল আর আকর্ষণ যাই হোক, সেই ঘটনা আর লোকেরা ওকে যেন টানতে থাকে। তার ফলে ওর কোনো বিপদ ঘটতে পারে, তখন সে-কথা মনে থাকে না। আর বিপদ যে ঘটে, সেটা তো বেশ কয়েকবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তবু গোগোল সন্দেহজনক কিছু দেখলে

বা মনে হলে, তা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারে না।

যাই হোক, এবার দীঘায় আসা হল দিপুমামার জন্যই। দিপুমামার খুবই দুঃখ, তাঁর ফ্যাক্টরির জন্য বেশি দিনের ছুটি নিয়ে তিনি কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন না। দুঃখটা বুবুন আর মামিমারও। দিপুমামা না গেলে, কারোরই যাওয়া হয় না। এখন এই এপ্রিল মাসে স্কুলে লম্বা কোনো ছুটি নেই। মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটি পড়বে। কিন্তু গুডফ্রাইডের সঙ্গে শনি রবি মিলিয়ে তিন দিনের ছুটি। কয়েকদিন আগেই দিপুমামা এসে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে, তারপর খুব জোর দিয়ে দীঘায় বেড়াতে যাবার কথা বলেছিলেন। প্রোগ্রাম তাঁর ছকা ছিল। গোগোল আর বুবুনের বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটির পরেই, গাড়ি নিয়ে বিকেলে বেরিয়ে পড়া। দীঘা পৌঁছুতে চার ঘণ্টা। মা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। বৃহস্পতিবারে তিনি বেরোতে চাননি। তাছাড়া হোটেল বা ট্যুরিস্ট লজে ঘর বুক করা ছিল না। হঠাৎ গিয়ে পৌঁছে, থাকবার ঘর পাওয়া যাবে কি না, যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। রাত্রে কোথাও পৌঁছনো মায়ের পছন্দ ছিল না। তাছাড়া, দিপুমামার হাই স্পীডে গাড়ি চালনা নিয়েও মায়ের মনে অস্বস্তি ছিল।

দিপুমামার প্রস্তাব শুনে গোগোলের মনটা খুশিতে নেচে উঠেছিল। উইকলি টেস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। সামার ভেকেশানের পরে স্কুল খুলে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা। স্কুলের পড়া নিয়ে এখনই মনে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু মায়ের আপত্তি শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খুব হতাশ হয়েই দিপুমামা আর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল।

দিপুমামা হেসে হাত নেড়ে মাকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলেন। তিনিও মাকে 'তুই' বলেন। বলেছিলেন, 'তুই বৃহস্পতিবারের বারবেলার কথা ভাবছিস্। আমি সেসব দেখে রেখেছি। আমরা যখন বেরোব, তখন বারবেলা কেটে যাবে। এখনো চারদিন হাতে আছে। আমি আজই দীঘায় টেলিফোন করছি। থাকবার জায়গা মিলে যাবেই। যাব তো দীঘায়, তার জন্য এত ভাবতে হবে? আর গাড়ি চালানো? আপ্ টু মৌরিগ্রাম তো তিরিশ কিলোমিটারের বেশি জোরে যাওয়াই যাবে না। তারপরে বড় জোর ষাট-সত্তর কিলোমিটার স্পীডে যাব। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। দু-তিন দিনের কাপড় গুছিয়ে রাখিস্, তাহলেই হবে। আমার তো কোথাও বেরোনোই হয় না। তোর বউদি আর বুবুনকেও বলেছি। ওরা খুব আশা করে আছে।'

মা দিপুমামাকে কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাবা

বলেছিলেন, 'বুবুন আর ওর মা যখন আশা করে আছে, তখন ঘুরেই আসা যাক।'

মা আর আপত্তি করতে পারেন নি। দিপুমামা সব কথা বলে যাবার পরে, মা মামিমাকে টেলিফোন করেছিলেন। দুজনের মধ্যে কথা হয়েছিল। গোগোলও বুবুনের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিয়েছিল। তবে দীঘায় আসবার দিন দিপুমামা একটা কথাই রাখতে পারেন নি। বম্বে রোডের ওপর গাড়িতে স্পীডোমিটারের কাঁটা অনেকবার একশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মা আর মামিমা বিরক্ত হচ্ছিলেন। আসলে ভয় পাচ্ছিলেন। দিপুমামা তখনই স্পীড কমিয়ে দিচ্ছিলেন। বাবা কেবল একটু হেসে বলেছিলেন, 'দিপু, রাস্তার বোর্ডের ওপর যে লেখা থাকে 'বেটার লেট দ্যান নেভার', সেটা মনে রাখাই ভাল।'

কথাটার অর্থ অনেকটা 'নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো'র মতো। স্পীডে মজা লাগে ঠিক কিন্তু দৈবের কথা কেউ বলতে পারে না। মূলে হা-ভাত হবার থেকে, সাবধান হওয়াই ভাল।

দীঘায় পৌঁছুতে রাত্রি ন'টা বেজে গেল। দিপুমামা, একটা নতুন হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। হোটেলটা একেবারে সমুদ্রের ধারে। রাত্রে কেবল সমুদ্রের গর্জনই শোনা গেল। সকলেরই খিদে আর ঘুম পেয়েছিল। রাত্রে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, খাবার খেয়ে একেবারে বিছানায়। দুটো ঘর নেওয়া হয়েছিল। গোগোল রাত্রে শুয়ে শুয়ে, অনেকক্ষণ সমুদ্রের গর্জন শুনেছিল। ঘুম আসছিল না। আর প্রায় ছ-সাত বছর আগের দীঘার কথা ভাববার চেষ্টা করছিল। তারপরেই কখন এক সময়ে চোখে ঘুম নেমে এসেছিল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সাজো-সাজো রব। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে, প্রথমেই সমুদ্রের ধারে ধারে বেড়াতে যাওয়া। দীপুমামাও জানতেন না, বাজারের সামনে বাঁধানো ঢালু রাস্তা দিয়ে, গাড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাওয়া বারণ। বাবাই সে-কথা বললেন, সমুদ্রের ধারের চর আর আগের মতো নিরাপদ নেই। সমুদ্র ক্রমেই এগিয়ে আসছে। শক্ত বালুচর নরম হয়ে গিয়েছে। গাড়ি চলার পক্ষে বিপজ্জনক। শুনেই গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ও বুবুনকে বলে রেখেছিল, সমুদ্রের ধার দিয়ে গাড়ি চেপে বেড়ানো হবে। তারপরে সকলের সঙ্গে সামনের রাস্তায় হেঁটে এসে দেখল, বাতিস্তম্ভটা নেই। কেবল তার ভিতটাই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বাবা বললেন, 'এ সবেরই কারণ, সমুদ্র এগিয়ে আসছে। তলে-

তলে মাটি নরম হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই ঢালুতে নেমে যাবার শান বাঁধানো ধাপেও ফাটল ধরেছে। সরকারও চিন্তিত, কী করে দীঘার সী-বীচ্‌কে রক্ষা করা যায়।'

গোগোল অবশ্য সমুদ্রের ধার দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। তবে বাতিস্তম্ভ আব শানবাঁধানো ঢালু চত্বরের ভাঙাচোরা অবস্থা দেখে বুঝতে পারল, বাবা ঠিকই বলছেন। দিপুমামা বললেন, 'এরকম ভাঙতে থাকলে, এত হোটেল, বাজাব, ট্যাবিস্টলজ, সৈকতাবাস, সবই একদিন সমুদ্রের তলায় চলে যাবে।' মা আর মামিমা এ সব কথায় কান না দিয়ে সমুদ্রের ধারের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাবা গোগোলের হাত ধরে রেখেছিলেন। গোগোল ধরে রেখেছিল বুবুনের হাত। বাবা পা বাড়িয়ে, বাঁ দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওদিকটাতেই ভাঙছে বেশি, সেইজন্য ওদিকে পাথর ফেলে ভাঙন ঠেকাবার চেষ্টা হচ্ছে। কে জানে, পাথর ফেলে সমুদ্রকে আটকানো যাবে কি না। তা ছাড়া ইটেব পাঁচিল তুলে, বাঁধও খাড়া করা হয়েছে। ওদিকটায় ঝাউবন আগে বেশ গন ছিল। এখন দেখছি, ঝাউগাছ আর প্রায় নেই।'

গোগোল বাবার কথা শুনতে শুনতে মা আর মামিমাকে খুঁজছিল। সমুদ্রের ধারে সকালবেলাই এত ভিড় হয়েছে, মা আব মামিমাকে দেখতেই পাচ্ছে না। এর মধ্যেই, অনেকে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে পড়েছে। দু-চাবজনেব ছোট-ছোট মাথা বেশ দূরে ঢেউয়ের বুকে জেগে উঠেছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। গোগোল-বুবুনের বয়সী অনেক ছেলেমেয়ে ছুটে-আসা ঢেউয়েব সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ খেলছে, আর আনন্দে হেসে হাততালি দিচ্ছে। বীচের উপরেও অনেকে দৌড়ের রেস্‌ লাগিয়ে দিয়েছে। কয়েকটা কুকুরও দৌড়োদৌড়ি করছে, মাঝে-মাঝে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকছে। আসলে খেলছে। কেউ কেউ আবার বলও খেলছে। সমুদ্রের ধারে যেন উৎসব লেগে গিয়েছে। কিন্তু মা আর মামিমা কোথায় গেলেন? বাবা আর দিপুমামা সমুদ্রের ভাঙন আর দীঘার ভবিষ্যৎ নিয়েই আলোচনা করতে-করতে উত্তর দিকে আস্তে-আস্তে হেঁটে চলেছেন। গোগোল বুবুনের দিকে দেখল। বুবুন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর বড় বড় চোখে তাকানো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ও ভয় পাচ্ছে। আবার অনেকের স্নান আব দৌড়ঝাঁপ দেখে ওর মজাও লাগছে।

গোগোলের চোখ পড়ল, উত্তর দিকে বেশ খানিকটা দূরে, এক জায়গায় অনেকে ভিড় করেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে মামিমার লাল শাড়ি পরা চেহারাটা ওর চোখে পড়ল। পড়া মাত্রই সেদিকে ছুটে যাবার জন্য ও

বাবার হাত ছাড়াবাব চেষ্টা করল। বাবা আরও শক্ত করে গোগোলের হাত চেপে ধরে, অবাক হয়ে বললেন, 'কী হল তোমার? কোথায় যাবে?'

গোগোল হাত তুলে ভিড়ের জটলাব দিকে দেখিয়ে বলল, 'মা আব মামিমা ওখানে আছেন। কী যেন দেখছেন ওখানে।'

বাবা ভিড়েব দিকে চোখ তুলে দেখে বললেন, 'ও, ওখানে মাছেব জাল তোলা হয়েছে। তোমাব মা-মামিমা তাই দেখছেন।'

গোগোল বলল, 'আমি আব বুবুন ওখানে যাব।'

বাবা বললেন, 'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

গোগোল অস্থিব হয়ে বলল, 'তোমবা তো আস্তে-আস্তে যাচ্ছ। আমি আব বুবুন দৌড়ে যাব।'

বাবা হেসে দিপুমামাব দিকে তাকালেন। তাবপবে গোগোলেব হাত ছেড়ে দিযে বললেন, 'বেশ, যাও। কিন্তু মাযেদেব কাছেই যাবে। জলেব ধাবে বা অন্য কোনদিকে যাবে না।'

'না আব কোথাও যাব না।' বলেই গোগোল বুবুনেব হাত ধবে ছুটল।

বুবুন গোগোলেব সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিতে পাবছে না। বলল, 'গোগোলদা, আমি তোমাব সঙ্গে ছুটতে পাবছিনে। আস্তে চলো।'

অনেক লোকেব ভিড় আব জটলাব অনেক কাছেই ওবা এসে গিযেছে। গোগোল অবাক হয়ে বলল, 'এটুকু ছুটতে পাবছিসনে?'

বুবুন সত্যি-সত্যি হাঁপাচ্ছে। ঘেমেও গিয়েছে। বলল, 'তোমাব মতো আমাব জোব নেই। কযেক দিন আগে আমার জ্বব হয়েছিল।'

গোগোল ছোটাব জোব কমিয়ে দিল। বলতে গেলে, জোবে হাঁটতে লাগল। বুবুনেব দিকে তাকিয়ে ওব মনে কষ্ট হল। ও সত্যি ভাবী বোগা আর কাহিল-মতো দেখতে। জানে, ও প্রাযই অসুখে ভোগে। গোগোল তখন মামিমাব পাশে মাকে দেখতে পেয়েছে। মা-মামিমা দুজনেই ভিড়েব মধ্যে ঝুঁকে দেখছেন। গোগোল আর বুবুন তাঁদের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। বুবুন মামিমাব হাত ধবে টানল। মামিমা মুখ ফিবিয়ে, অবাক হয়ে হাসলেন। মাও গোগোলদেব দেখতে পেলেন।

গোগোল মায়েব পাশ দিয়ে ভিড় ঠেলে ভিতরে উঁকি দিল। দেখল, খালি গা, ছোট কাপড় পবা কয়েকজন লোক তখনও জাল খুলে ভিতব থেকে মাছ বের করছে। কয়েক জন মাছগুলো একদিকে সরিয়ে রাখছে। আর মাছের মতো দেখতে, কতগুলোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। যেগুলো মাছের মতো দেখতে নয়, অনেকটা বিদ্ঘুটে সাদাটে দলা পাকানো, সেগুলো

যে জেলি ফিশ্, গোগোল তা জানে। আর কোনো মাছই গোগোলের চেনা মনে হল না। ছুঁড়ে ফেলা মাছের মধ্যে, সাদা পেট, কালচে পিঠ, একরকমের পেটফোলা গোল-মতো মাছ দেখা গেল। আর বাকিগুলো এক ফুট দেড় ফুটের মতো লম্বা. অনেকটা মাছের মতোই। মা সেগুলো দেখিয়ে বললেন, 'ওগুলো হল হাঙরের বাচ্ছা।'

হাঙরের বাচ্ছা! গোগোল কখনো জ্যান্ত হাঙর দেখেনি। ছবিতে আর সিনেমায় দেখেছে। বইয়ে পড়েছে হাঙরের কথা। কিন্তু সেগুলো দেখতে অনেক বড়, করাতের মতো দাঁত। আর ভয়ংকর হিংস্র। সমুদ্রের অন্যান্য প্রাণীরাও ওদের ভয় পায়। অথচ মাছধরা লোকেরা যেভাবে হাতে তুলে বাচ্ছাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলছে, আর দেখতে এত ছোট এবং নিরীহ, মনেই হয় না, এগুলোই সেই ভয়ংকর হিংস্র হাঙর। গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'মা, হাঙরের বাচ্চাগুলো কি আবার সমুদ্রে নেমে যাবে?'

মা হেসে বললেন, 'দূর বোকা ওগুলো এখনই মরতে বসেছে। একটু পরেই মরে যাবে। ডাঙায় আর রোদে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকে না। বড় হাঙর তো নয়।'

'এখানে বড় হাঙর আছে? তা হলে লোকেরা স্নান করছে কী করে? হাঙব কাটবে না?' গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মা বললেন, 'বড় হাঙর অনেক দূরে, গভীর জলে আছে ওরা এত কাছে আসে না। এলে তো এই জালেই ধরা পড়ত। লোকেরাও জলে নামত না।'

মায়ের কথা শুনে গোগোল আশ্বস্ত হল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, ঢেউয়ের বুকে অনেকের স্নান আর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখল। ইতিমধ্যে বাবা আর দিপুমামা কখন এসে গিয়েছেন, কারোর খেয়াল ছিল না। বাবা বললেন, বড় হাঙর হলে, মাছ ধরার এ-জাল কেটে বেরিয়ে যেত। এগুলো আসলে মেছো হাঙরের বাচ্চা। কিংবা বলতে পারো, কামট।'

মামিমা সরে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কামট কী?'

'একরকম হাঙর জাতীয় প্রাণীই বলা যায়।' বাবা বললেন, 'সুন্দরবন অঞ্চলে নদীনালায় কামট আছে। হাঙরের থেকে কোন অংশে কম নয়। সেজন্য ওদিকের লোকেরা জলে সহজে নামে না। এক কামড়েই একটা ঠ্যাং কুচ্ করে কেটে নিয়ে চলে যায়। তাদের দাঁতও ভীষণ ধারালো, চোয়াল দারুণ শক্ত। এগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে সেই কামটেরই বাচ্চা।'

গোগোল কোনদিন বাবার মুখে কামটের কথা শোনেনি। অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো কামটের কথা কখনও বলোনি?'

বাবা হেসে বললেন, 'আমি বইয়ে পড়েছি। কামটের কথা কখনও ওঠেনি বলেই বলা হয়নি।'

মা যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখনই বা বলার কী দরকার? এ সব শুনে মনে হচ্ছে, জলে নামাই যাবে না।'

মামিমা বললেন, 'হ্যাঁ, আমার তো ভয়ই করছে।'

বাবা হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'এত অল্প জল আর ঢেউয়ে বড় হাঙর, কামট কোনোটাই আসবে না। ঢেউয়ের আঘাতে আছাড় খেয়ে ডাঙায় এসে পড়বে। তাদের কি প্রাণের ভয় নেই? সবাই জানে দীঘার সমুদ্রে আজ পর্যন্ত হাঙরের উৎপাতের কথা শোনা যায়নি। এমনি কথার-কথা বললাম। গোগোলকে নিয়ে তুমি আমি এ-সমুদ্রে স্নান করেছি। এখানে ভয়ের কিছুই নেই।'

দিপুমামা মা আর মামিমাকে বললেন, 'তোমাদের কি মাথা খারাপ নাকি? দেখতে পাচ্ছ, ছোট-ছোট বাচ্চারা জলে ঢেউয়ের বুকে লাফাচ্ছে, আর তোমরা হাঙরের কথা শুনেই ভয় পেয়ে যাচ্ছ? চল, এখানে আঁশটে গন্ধ লাগছে।'

গোগোল সকলের সঙ্গে সরে এল। আর ঠিক তখনই একটা বল ওর পা ঘেঁষে সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। ও নিজেকে সামলাতে পারল না। বলের পিছনে দৌড় দিল। একটা ঢেউ ছুটে আসছে, বল প্রায় ঢেউয়ের হাতায়। গোগোল যখন ছুটে গিয়ে বলটাকে পা দিয়ে আটকাল, ঢেউ তখন ওর জুতো সুদ্ধ পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছে। ঢেউয়ের জল নেমে যাবার সঙ্গে, বলটাকে টেনে নিতে গেল। গোগোল দু পায়ে বল চেপে ধরে, আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। তারপরে জোর একটা শট করল। দূর থেকে একদল ছেলে হাততালি দিয়ে উঠল।

বুবুনও বল দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনি। হাঙরের ভয় কোথায় চলে গিয়েছে। ও ছুটে এসে বলল, 'গোগোলদা, বলটা তুমি আমাকে দিলে না কেন?'

গোগোল বলল, 'বলটা তো আমাদের নয়। যাদের বল, তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

কিন্তু মায়ের দিকে চোখ পড়তেই গোগোল থমকে গেল। মায়ের মুখ শক্ত দেখাচ্ছে। যে-ছেলেগুলো বল খেলছে, তারা গোগোলের থেকে বয়সে বড়। কিন্তু মা সেজন্য রাগ করেননি। কাছে যেতেই, পায়ের দিকে

দেখিয়ে বললেন, 'কী করেছ, দেখেছ? জুতো মোজা সব বালি কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। অন্য ছেলেদের বলের সঙ্গে তুমি ওভাবে ছুটে গেলে কেন?'

গোগোল বলল, 'বলটা পাছে সমুদ্রে ভেসে যায়, সেইজন্য আটকাতে গেছিলাম।'

মা বললেন, 'মোটেই নয়। বল দেখেই তুমি এমন দিশেহারা হয়ে পড়লে, আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না।'

দিপুমামা বললেন, 'যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আগে জানলে কলকাতা থেকে একটা বল নিয়ে আসা যেত। গোগোল আর বুবুন খেলতে পারত।'

বুবুন বলল, 'এখানে কি বল কিনতে পাওয়া যাবে না বাবা?'

দিপুমামা বললেন, 'দেখা যাবে।'

বাবা বললেন, 'গোগোল, তুমি বুবুনকে নিয়ে সমুদ্রের ধার থেকে দূরে সরে গিয়ে ছুটোছুটি করো।'

গোগোল মায়ের মুখের দিকে একবার দেখে, বুবুনের হাত ধরে শুকনো চরের দিকে এগিয়ে গেল। চোখে পড়ল, বড়-বড় পাথরের বোলডার ফেলে উঁচু বাঁধ তৈরি কবা হয়েছে। ওদের হোটেলটাও দেখা যাচ্ছে। আরও খানিকটা ভিতর দিকে, হোটেলের সামনে ইটের গাঁথনি তোলা বাঁধ। সেই বাঁধটাই চলে গিয়েছে উত্তর দিকে। এর আগে গোগোল যখন এসেছিল, তখন বাঁধ ছিল না।

বুবুন বলল, 'গোগোলদা, এসো আমবা হাইডিং ফাইণ্ডিং খেলি।'

গোগোল বলল, 'এখানে লুকোচুরি খেলা হবে কেমন করে? লুকোবার জায়গাই তো নেই।'

বুবুনের মেজাজ খাবাপ হয়ে গেল। বলল, 'তাহলে আমরা কী করব?'

গোগোলের অবশ্য সমুদ্রের জলে গিয়ে খুব ঝাঁপাতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু তার উপায় ছিল না। সমুদ্রের ধারে যাওয়াই বারণ। বেড়িয়ে ফেরবার পরে, সকলের সঙ্গে সমুদ্রে নামা হবে। ও বুবুনকে বলল, 'তুই ছোট্, আমি তোকে ধরব।'

বুবুন বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে পারবই না। তার চেয়ে তুমি ছোটো, আমি তোমাকে ধরব।'

গোগোল একবার উত্তর দিকে দেখল। সমুদ্রের ধাব ঘেঁষে, অনেকেই হাঁটতে-হাঁটতে ওদিকে চলেছে। মা বাবা দিপুমামা আর মামিমাও আস্তে-আস্তে হেঁটে ওদিকে চলেছেন। গোগোলের চোখ পড়ল ইট-বাঁধানো

বাঁধের দিকে। হোটেলের ধার দিয়ে, বাঁধটা সমুদ্রের চরের দিকে বেঁকে এগিয়ে এসেছে। ওদিকটা বেশ উঁচু, আর লোক প্রায় নেই। দু-একজনকে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে গেলে নিশ্চয়ই বাবা-মা কিছু বলবেন না। ও বলল, 'চল বুবুন, আমরা ওই বাঁধটার ওপরে যাই। ওখানে গাছপালা আছে আর হোটেলটাও কাছে। ওখানে গিয়ে আমরা খেলব।'

বুবুন বলল, 'হ্যাঁ, তাই চল।'

বুবুন গোগোলের হাত ধরেই রেখেছিল। ও নিজেই ছুটতে লাগল। গোগোলও ছুটতে লাগল। বালির চরের ওপর দিয়ে, হোটেলটা ছাড়িয়ে গেল। বাঁধের কাছে গিয়ে, বালির ঢালু ঠেলে, বাঁধের ওপর উঠল। উঠে দেখল, জায়গাটা মোটেই খেলবার মতো না। বাঁধের ধারে জমি উঁচু-নিচু। পিছন দিকে ঝাউবনও আছে। তেমন ঘন নয়। ঝাউবনের ফাঁকে-ফাঁকে, দু-একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। গোগোল বলল, 'বুবুন, এ-জায়গাটা মোটেই খেলবার মতো নয়। মাটি আর বালি এবড়ো-খেবড়ো. দৌড়ুতে গেলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব।'

বুবুন জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কী করবে?'

গোগোল বলল, 'আমরা এখানে বসে সমুদ্র দেখব।'

বুবুন মাথা নেড়ে বলল, 'আমার বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে এসো আমরা ক্যারাটে খেলি।'

গোগোলের হাসি পেল। ও ভাবল, বুবুনের ক্যারাটে খেলাটা কেমন। বাড়িতে অনেকদিন দেখিয়েছে। বাড়ির টেলিভিশনে নানারকম ছবি দেখে বুবুন সেগুলো নকল করেছে। আসলে সেগুলো ক্যারাটে নয়। অদ্ভুত ধরনের সব মারামারির কায়দা কসরত। যা দেখলে হাসিই পায়। সেগুলো না বক্সিং, না কুস্তি, ক্যারাটে তো নয়ই। গোগোল ব্রুস লী-র ছবি দেখেই মুগ্ধ। ওর ঘরে ব্রুস লী-র রঙিন বড় ছবিও আছে। ব্রুস লী-র অনেক রকম ছবির কাটিং ওর কাছে আছে। কিন্তু ব্রুস লী-র ক্যারাটে নিয়ে একটা ছবি এসেছিল। ছোটদের সেটা দেখা নিষেধ ছিল। তবে, কলকাতার ময়দানে ক্যারাটে শেখার একটা সাময়িক ক্যাম্পে গিয়েছিল। নিয়ে গিয়েছিলেন ওর মাস্টারমশাই, যিনি ওকে বাড়িতে পড়ান। ব্রুস লী-র ছবিটাও তিনিই গোগোলকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। মায়ের ওসব একেবারেই পছন্দ নয়। মাস্টারমশাই দিয়েছিলেন বলেই গোগোল ওটা ঘরে রাখতে পেরেছিল। তিনিই গোগোলকে ক্যারাটের কয়েকটা অদ্ভুত খেলা দেখিয়েছিলেন। আর দেখিয়েছিল ওর পিসতুতো দাদা তিতু।

অবশ্য কয়েক বছর আগে, গোগোলও বুবুনের মতই, যেমন খুশি মারামারি করাকেই ক্যারাটে মনে করত। আসলে ক্যারাটে শেখাটা বেশ কঠিন। তার জন্য শরীরকে তৈরি করতে হয়, আর একটু বড় হওয়াও দরকার। কিন্তু বুবুনের মন খারাপ করে দেবার ইচ্ছে হল না। বলল, 'বেশ, তাই খেলা যাক।'

বুবুন তৎক্ষণাৎ চোখমুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে গোগোলের দিকে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। ইদানীং গোগোল বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অর্থাৎ লম্বা হয়েছে। সেই তুলনায় বুবুন এখনও ছোটখাটো। ও কখনো গোগোলের দিকে পা ছুঁড়ল। কখনো হাত দিয়ে বুকে আঘাত করল। আর সব-থেকে মজার ব্যাপার হল, ওর মুখ থেকে নানান শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। হিস হুস ঢুং ঢাং। আসলে সিনেমায় ওই ওই শব্দগুলো করা হয়। আসল লড়াইয়ে ও-রকম কোনো শব্দ হবার কথা নয়। গোগোলের খুব হাসি লাগল। আর বুবুনের মার বাঁচিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। বুবুন কিছুতেই গোগোলের নাগাল পাচ্ছে না। নাগাল না পেয়ে, বুবুনের মেজাজ খারাপ হতে লাগল। জেদ চেপে যাওয়ায় ক্ষেপেও উঠল। তারপর হাঁপিয়ে পড়ল। বলল, 'তুমি কেবলই পালিয়ে যাচ্ছ গোগোলদা।'

গোগোল বলল, 'পালাচ্ছি কোথায়? আমি তো তোর মার বাঁচাচ্ছি।'

বুবুন বলল, 'তুমি তো খালি এপাশ-ওপাশ করে সরে যাচ্ছ। আমি তোমাকে ছুঁতেই পারছি না। তুমি আমাকে অ্যাটাক করো।'

গোগোল জানে, সেটা করা মোটেই ঠিক হবে না। বুবুনের লেগে যেতে পারে। আর লাগলে যদি ও কান্নাকাটি জুড়ে দেয়, বাবা-মা জানতে পারেন, বকুনি খেয়ে মরতে হবে। ও বলল, 'বেশ, আমি তোকে অ্যাটাক করছি, তুই আটকাবার চেষ্টা কর। কিন্তু মুখ থেকে ওই শব্দগুলো করবিনে।'

'বেশ, এসো।' বুবুন বকসিংয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে, মাথা নিচু করে এগিয়ে এল।

গোগোল চোখের পলকে বুবুনের পিছনে গিয়ে, ওর পায়ে আস্তে করে একটা লেংগি মারল। বুবুন মাটিতে পড়ে গেল। বুবুন হাত ঝেড়ে উঠেই গোগোলের দিকে ফিরে মুখ দিয়ে সাঁ করে একটা শব্দ করল। চোখ পাকিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলো মেলে, গোগোলের বুকে ছুঁড়ে দিল। গোগোল বসে পড়ল। বুবুন গোগোলের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পড়েই গোগোলের পিঠে দুমদুম ঘুষি মারতে আরম্ভ করল। গোগোলের

মাথাটা তখন বুবুনের দু পায়ের মাঝখানে। ও বুবুনের পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার বুবুন মাটিতে পড়ল উপুড় হয়ে। তবু বুবুন মাটি থেকে উঠে লাফ দিয়ে গোগোলের ঘাড়ে উঠতে গেল। গোগোল ওর বাঁ পা এত উঁচুতে তুলল, নিজের মাথাটাই ছাড়িয়ে গেল। বুবুন বেরিয়ে গেল সেই পায়ের তলা দিয়ে। তারপরেই গোগোল বাঁ হাতটা সোজা করে, বুবুনের ঘাড়ের দিকে তাগ্ করল।

'ব্যস্ ব্যস্, আর নয়!' কাছেই একজন বড় মানুষের গলা শোনা গেল।

গোগোল থমকে গেল। বুবুনও কেমন যেন ভয় পেয়ে, গোগোলের পাশে এসে দাঁড়াল। দু জনেই তাকিয়ে দেখল, সামনে দুজন দাঁড়িয়ে। বাবা বা দিপুমামার থেকেও বয়স কিছু কম হবে। একজন বেশ লম্বা, কিন্তু শক্ত চেহারা। গায়ে ঘন সবুজ রঙের শার্ট আর ট্রাউজার। আর একজন একটু খাটো। নীল ট্রাউজার আর কালো-সাদা ডোরাকাটা শার্ট গায়ে। তার আবার ঠোঁটের ওপর চীনা গোঁফ। দুজনেরই মাথায় ঘাসে বোনা টুপি, আর চোখে কালো সানগ্লাস। এরা যে কখন কোন্ দিক থেকে এসে দাঁড়িয়েছে, গোগোল খেয়ালই করেনি। অথচ চারদিক তো খোলাই। এরা নিশ্চয় মাটি ফুঁড়ে ওঠে নি?

যার ঠোঁটের ওপর চীনা গোঁফ, সে চোখের সানগ্লাস খুলে গোগোলের দিকে তাকাল। হেসে বলল, 'চমৎকার! পা-টা তুলেছিল একেবারে ব্রুস লী-র মতোই। হাতটাও চালিয়েছিলে দারুণ। কিন্তু ওর ঘাড়ে লাগলে খুবই খারাপ হত।'

গোগোলের ভুরু কুঁচকে উঠল। আশ্চর্য, লোকটির গলার স্বর ওর চেনা-চেনা লাগছে। মুখটাও প্রায় চেনা, অথচ যেন চিনতে পারছে না। বিশেষ করে হাসিটা। ও বলল, 'আমি মোটেই ওকে মারতাম না।

'সেটা আমি বুঝেছি।' লোকটি বলল, 'লড়াইটা নিশ্চয়ই আপসে হচ্ছে?'

গোগোল বুবুনকে দেখিয়ে বলল, 'ও আমার ভাই।'

লোকটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। সঙ্গীটি হাসল। লোকটি বুবুনকে একবার দেখে গোগোলের দিকে তাকাল। বলল, 'মনে হয় ও তোমার নিজের ভাই নয়। তাই না?'

গোগোল অবাক হয়ে বলল, 'ও আমার মামাতো ভাই।'

লোকটি হেসে মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'বুঝেছি। তুমি দেখছি ক্যারাটে ব্যাপারটা একটু জানো। আগের থেকে একটু লম্বাও হয়েছ। ঠিক আছে,

খেলা করো, চলি।'

লোকটি চোখে সানগ্লাস পরে নিল। সঙ্গীকে ইশারা করে, যাবার আগে, হাত তুলে বিদায় জানাল। তারপর দু জনে বাঁধের ওপর দিয়ে নেমে সমুদ্রের ধারে চলে গেল। গোগোল তখনও অবাক হয়ে ভাবছে, লোক দুটি কে? কেন চেনা-চেনা মনে হল? বিশেষ করে, একটা কথা গোগোলের কানে লেগে আছে। 'আগের থেকে একটু লম্বাও হয়েছ।' তার মানে, গোগোলকে লোকটি আগে কোথাও দেখেছে? তা নইলে ওকথা বলবে কেন? ও মুখ তুলে বালুচরের দিকে তাকাল। দেখল, জল অনেক এগিয়ে এসেছে। স্নানের জন্য লোকের ভিড় আরও বেড়েছে। ঘাসের টুপি মাথায় লোক দুটি ভিড়ের মধ্যে চলে গেছে। তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল কেমন করে? তাদের মাথায় তো অনেকটা চওড়া গোল ঘাসের টুপি ছিল। কিন্তু গোগোল ভিড়ের মধ্যে টুপি মাথায় একটা লোককেও দেখতে পেল না। বুবুন জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কে গোগোলদা? তুমি চেন?'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না। কিন্তু ওরা কোন্ দিকে গেল, দেখতে পাচ্ছি না তো?'

বুবুন বলল, 'ওরা তো পাথরের বাঁধের পাশ দিয়ে চলে গেল।

গোগোল পাথরের বাঁধের দিকে তাকায়নি। ও তখন খালি একটা কথাই ভাবছিল, লোক দুটিকে ওর কেমন চেনা-চেনা লাগছিল। যে কথা বলছিল, তার একটা কথায় সেটাই প্রমাণ হয়। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। এসব ভাবতে গিয়েই, লোক দুটি নেমে কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটা খেয়াল করেনি।

বুবুন আবার বলল, 'লোকটা তোমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে কথা বলছিল, যেন তোমাকে চেনে।'

গোগোল কোন জবাব দিল না। ওর মনে ভারি অস্বস্তি হচ্ছে। এ সময়েই ওর চোখ পড়ল বাবা মা মামিমা আর দিপুমামার দিকে। সমুদ্রের জল এত এগিয়ে এসেছে, তাঁরা পাথরের বাঁধের সামনে এসে পড়েছেন। আর চারদিকে তাকাচ্ছেন। তাকানোর ভঙ্গি দেখেই গোগোল বুঝতে পারল, ওঁরা গোগোলদেরই খুঁজছেন। গোগোল চিৎকার করে বলল, 'বাবা, আমরা এখানে আছি।'

কিন্তু সমুদ্রের গর্জন আর লোকজনের চিৎকারে কেউ কিছু শুনতে পেলেন না। গোগোল বুবুনের হাত ধরে বাঁধের নীচে নেমে এল। সমুদ্রের

জল তখন প্রায় ওদেরই ছোবে-ছোঁবে করছে। গোগোল বুবুনকে নিয়ে ছুটে সকলের সামনে এসে পড়ল। বুবুন মামিমাকে জড়িয়ে ধরল। আর মা অবাক চোখে তাকিয়ে গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোথায় ছিলে?'

গোগোল বাঁধের ওপর হাত দেখিয়ে বলল, 'ওই ওপরে।'

বাবা বললেন, 'যাক, তোমরা যে ওপরে ছিলে, সেটাই ভাল। জোয়ার এসে গেছে, জল এখুনি বাঁধের কাছে এসে পড়বে। চলো, আমরা বাঁধের ওপর দিয়েই হোটেলে ফিরে যাই।'

দিপুমামা গোগোলের হাত ধরে বললেন, 'এদিকে জোয়ার এসে গেছে, আর আমরা ভাবছি, তোমরা কোথায় গেলে। চলো, এবার আমরাও সমুদ্রে নামার জন্য তৈরি হয়ে আসি।'

গোগোলের চোখের সামনে তখনও সেই লোক দুটির চেহারা ভাসছে।

॥ দুই ॥

সমুদ্রে স্নানের আনন্দে আর উত্তেজনায় গোগোল সেই লোক দুটির কথা ভুলেই গেল। জোয়ারের জল উঁচু হয়ে ফুলে ফেঁপে তখন হোটেলের সামনে বাঁধের নীচেই এসে পড়েছে। ডান দিকে পাথরের বোলডারের ওপর ঢেউ এসে ধাক্কা খেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে পড়ছে। মামিমা সাঁতার জানেন না, তাই খানিকটা জলে নেমে বসে পড়েছেন। দিপুমামা বুবুনকে নিয়ে একটু দূরে গিয়েছেন। কিন্তু বুবুন ভয় পেয়ে দিপুমামাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে ঢেউ ছুটে আসতে দেখলেই ভয়ে চিৎকার করে উঠছে। দিপুমামা হাসছেন আর বলছেন, 'বোকামি কোরো না বুবুন। ছাখো গোগোলদা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কতদূর চলে গেছে।'

গোগোল বাবার সঙ্গে অনেকটা দূরেই চলে গিয়েছে। ওদের আশেপাশেও অনেক মহিলা পুরুষ। গোগোল বুবুনদের মতো ছেলেমেয়েদের তো কথাই নেই। স্নানের আনন্দে সবাই হাসছে, চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মা সাঁতার জানেন, তিনিও বাবার কাছাকাছিই ছিলেন।

বাবা গোগোলকে সমুদ্রে স্নান করার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়ালে ঢেউয়ের ধাক্কাটা জোরে লাগে। নাকে-মুখে জলও ঢুকে যায়। সব সময় পাশ ফিরে দাঁড়াতে হবে। অবশ্য গোগোলের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। কারণ ও নীচে মাটি পাচ্ছিল না। ঢেউ এলে বাবা আগেই সাবধান করে দিচ্ছিলেন, 'গোগোল, এবার ডুব দিতে হবে।'

ডুব দিলেই ঢেউটা মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। আবার বাবা গোগোলকে ধরে ঢেউয়ের বুকে লাফিয়ে উঠছিলেন। ঢেউটা চলে যাচ্ছিল নীচে দিয়ে। গোগোল বাবার সঙ্গে বেশ দোল খেয়ে ভেসে থাকছিল। সাঁতারটা ওর এখনও ভাল করে শেখা হয়নি। মাত্র ছ'মাস আগে সাঁতার শেখার জন্য ওকে একটা ক্লাবে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সাঁতার শেখাটা গোগোলের তেমন মনঃপুত নয়। কারণ তিতুদাদের রাজপুরের বাড়ির পুকুরে, কলা গাছের ভেলায় করে ও পুকুরেয় মাঝ বরাবর পর্যন্ত গিয়েছিল। অবশ্য তিতুদা সঙ্গে ছিল। আর কলাগাছের ভেলাটা একেবারে বুকে না চেপে কেবল হাত দিয়ে ধরে কেমন করে ভেসে থাকতে হয়, তিতুদা সেটা ঠিকমতো শিখিয়ে দিয়েছিল। কেবল পা দাপিয়ে সাঁতরে যাওয়া। সমুদ্রে অবশ্য কলাগাছের ভেলা ধরে ভেসে থাকা অসম্ভব। এক ঢেউয়েই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সেজন্য অনেকে মোটরের চাকার টিউব নিয়ে ভাসছে। অনেকটা নিরাপদ হলেও, ঢেউ তাদেরও বেশ নাকানি চুবানি খাইয়ে দিচ্ছে। সেই তুলনায় গোগোল বাবাব গায়ের ওপর ভার না দিয়েও, বেশ ভাল ভাবেই ঢেউয়ের নীচে ডুব দিয়ে, আর মাথা জাগিয়ে ভেসে থেকে স্নানের মজা পাচ্ছে।

কিন্তু মায়ের সবই ঘড়ি-ধরা। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে যেতেই মা বাবাকে উঠতে বললেন। গোগোলকে বললেন, 'আর নয়, এবার ওঠো গোগোল। একদিন হঠাৎ বেশিক্ষণ জলে থাকলে সর্দি লেগে যাবে। তাছাড়া তোমার বাবা হাঁপিয়ে পড়েছেন।'

মা কথাটা ভুল বলেন নি। বাবার হাঁপিয়ে পড়াটাও স্বাভাবিক। গোগোলের জন্য বাবার নিজের স্নানের মজাটা নষ্টই হয়ে গেল। তবু প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে গোগোলকে বাবা অল্প জলে পৌঁছে দিয়ে নিজে আবার চলে গেলেন বেশি জলে। এদিকে বুবুন দিপুমামাকে ছেড়ে বালির ওপরে মামিমাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। দিপুমামাও তখন অনেক দূরে।

সমুদ্রে স্নানের শেষে হোটেলের ঘরে ফিরে বাথরুমে আবার মিষ্টি জলে স্নান করতে হল। গায়ে মাথার চুলে প্রচুর বালিও ঢুকেছিল। তারপরে মনে হল, রাক্ষসের মতো খিদে পাচ্ছে। সকলের জামা-কাপড় বদলাতে যেটুকু সময়। তারপরেই হোটেলের ডাইনিংরুমে হাজির। অনেক টেবিলই দখল হয়ে গিয়েছে। গোগোলদের ছ'জনের জন্যে দুটো টেবিল জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হল। কী কী খাবার দেওয়া হবে, তা বলে দিলেন মা আর মামিমা। দিপুমামা তো একলাই তিনজনের স্যালাড খেয়ে ফেললেন।

খেয়েদেয়ে আবার ঘরে ফেরা। এবার বিশ্রাম এবং ঘুম। গোগোলের যত গোলমাল এখানেই। দুপুরে ঘুম ওর কাছে বাঘ। অবশ্য ও কয়েকটা বই নিয়ে এসেছিল। মায়ের কথা না মেনে উপায় ছিল না। বিছানায় ওকে যেতেই হল। বইগুলো ছাড়ল না। বুবুনু ওদের ঘরে খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা মা দিপুমামা আর মামিমা ঘরের বাইরে বারান্দায় চেয়ারে বসে খানিকক্ষণ গল্প করলেন। তারপরে তাঁরাও শুতে চলে এলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে গোগোল আর শুয়ে থাকতে পারল না। বই রেখে উঠে বসল। মা শুয়েছেন ওর এক পাশে। বাবা আর এক পাশে। দুজনেই চোখ বুজে ঘুমোচ্ছেন। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে বন্‌বন্‌। গোগোল খাট থেকে নামতে গেল। অমনি মা বলে উঠলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

গোগোল এই ভয়টাই পাচ্ছিল। বলল, 'আমার আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

বাবাও যে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছিলেন না, বোঝা গেল। বললেন, ঘরের বাইরে বারান্দায় গিয়ে বোসো। অন্য কোথাও যেও না।'

গোগোল আগেই দেখে নিয়েছে, বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। বলল, 'ওখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। আমি সামনের লনে যাব?'

মা বললেন, 'না, লনে এখন রোদ। রোদ লাগলে শরীর খারাপ হবে।'

বাবা বললেন, 'তার চেয়ে তুমি বরং দোতলার লাউঞ্জে যাও। ওখানে ব'সে সমুদ্র দেখতে পাবে।' গোগোল খুশি হয়ে পা বাড়াতে যাবে, মা বলে উঠলেন, 'ওখান থেকে আর কোথাও যেও না।'

'আচ্ছা' বলে গোগোল দরজা খুলে বেরিয়ে, আবার দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল।

বাইরের করিডরে কাছেপিঠের সোফায় অনেকে বসে গল্প করছিলেন। রিসেপশনের কাছে মালপত্রসহ কয়েকজনের জটলা চলছে। গোগোল লাউঞ্জের সিঁড়ির দিকে গেল। দোতলা বলতে যতটা উঁচু বোঝায়, সেরকম নয়। কয়েক ধাপ উঠেই লাউঞ্জ। সেখানেও কয়েকজন এদিকে-ওদিকে বসে রয়েছেন। গল্প করছেন। গোগোল সামনের দিকে গিয়ে একটা খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। মনে হল জোয়ারের জল যেন আরও বেড়েছে। সমুদ্র এগিয়ে এসেছে আরও কাছে। বাইরে একটা

লোকও দেখা যাচ্ছে না। আকাশটা নীল নয়, অথচ মেঘও নেই। ঠিক যেন ভেটকি মাছের মতো রঙ। আকাশ আর সমুদ্র যেখানে মিশেছে, গোগোল বেশ খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল। ওর চোখের সামনে পৃথিবী নামে গ্রহটা ভেসে উঠল। বিশাল পাহাড় পর্বত সমুদ্র নদনদী মরুভূমি জঙ্গল আর গ্রাম শহর সব নিয়ে, একটা গোলাকার বস্তু শূন্যে ঘুরছে।

ভাবতে-ভাবতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, ঘাসের টুপি মাথায় সেই দুজন সমুদ্রের ধার দিয়ে উত্তরের বাঁধের দিকে চলেছে। দুজনেই কথা বলতে বলতে চলেছে। গোগোলের মনটা আবার খচখচ করে উঠল। ওবা কারা? চেনা-চেনা লাগছিল, অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না, কোথায় দেখেছে। সেই কথাটাও মনে পড়ল, 'আগের থেকে একটু লম্বাও হয়েছ।' তার মানেই লোকটি আগে কোথাও গোগোলকে দেখেছে।

লোক দুটিকে যতক্ষণ বাঁধের ওপব উঠে আড়ালে চলে যেতে দেখা গেল, গোগোল দেখল। তারপরে জানালার কাছ থেকে সরে এল। সমুদ্র দেখতে আর ভাল লাগছে না। কেমন একঘেয়ে লাগছে। অথচ মুখ ফিরিয়ে চলে এলেই আবার দেখতে ইচ্ছা করে। সমুদ্র বেশ মজার চরিত্র।

গোগোল লাউঞ্জ থেকে নেমে এল করিডরে। বাঁ দিকে ওদের ঘরের বন্ধ দরজাব দিকে একবার দেখল। বাবা-মা হয়তো ঘুমোচ্ছেন, নয়তো গল্প করছেন। ও করিডর দিয়ে এগিয়ে হোটেলের বাইরে রাস্তায় চলে এল। রাস্তাব ধারে অনেকগুলো গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। দিপুমামার গাড়িটা চিনতে পারল। বাঁ দিকে গেলে বাজারের দিক। ডান দিকে একটা সরু রাস্তা চলে গিয়েছে। দু-একজন লোক সেদিকেও যাচ্ছে।

গোগোল আস্তে-আস্তে সেদিকে গেল। ভেবেছিল, ওদিকে নিশ্চয়ই রাস্তা নেই। কিন্তু দেখা গেল, রাস্তাও রয়েছে, বাড়িও রয়েছে। দু-একটা দোকানও চোখে পড়ল। খানিকটা এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় ছায়ায় ওরই বয়সী ছেলেমেয়ে ক্যারামবোর্ড খেলছে। তারপরে রাস্তাটা বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। সেদিকে অনেকগুলো ঝাউগাছও রয়েছে। গোগোলের মনে হল, ওপরে ঝাউগাছের কাছে গেলে সেখান থেকেও হয়তো সমুদ্র দেখা যাবে। গোগোল এগিয়ে গেল। বালি থাকলেও মাটি বেশ শক্ত। ঝাউগাছ ছাড়াও বাঁ দিকে আরও নানারকম গাছ দেখা গেল। চারদিকটাই ছায়া-ঘেরা, আর নির্জন। বাতাস বইছে, গাছে তার শব্দ। কেবল গাছেরই না, পাখিও ডাকছে। প্রজাপতি

উড়ছে। গোগোল বেশ খানিক ওপরে উঠল। দেখল, আশেপাশে বেশ বড় আর সুন্দর ছবির মতো কিছু বাড়ি রয়েছে। পাশাপাশি নয়, এলোমেলো ছড়ানো, আর একটা বাড়ি থেকে আর-একটা বেশ দূরে। কিন্তু এত নিরিবিলি কেন? লোকজন দেখাই যাচ্ছে না।

গোগোল ঝাউবনের ছায়ায় ডান দিকে ঘুরে আরও উঁচুতে উঠতে গেল। থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, বাঁ দিকে একটা দোতলা বাড়ি থেকে একজন খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছে। আসতে আসতে দু-তিন বার পিছন ফিরে এমনভাবে দেখল, যেন সে পালিয়ে যাচ্ছে। লোকটার চোখে-মুখে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব। চেহারাটা বেশ লম্বা। চওড়া তেমন নয়। সাদা শর্টসের ওপর সাদা তোয়ালের কলার দেওয়া জামা। তার ওপর কাঁধে একটা রঙবেরঙের তোয়ালে। সেই তোয়ালে দিয়ে সে দু হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এল। মাথায় একটা হলুদ রঙের নেভি ক্যাপ। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। বাঁ কাঁধে একটা সাইড ব্যাগ।

লোকটা বাড়ির দিকে পিছন ফিরে দু-তিনবার দেখল। গেটের সামনে এসে চারদিকে সাবধানে চোখ বোলাল। গোগোল দুটো ঝাউগাছের আড়ালে। লোকটা ওকে দেখতে পেল না। তার দেখার ভঙ্গিটা কেমন সন্দেহজনক। যখন সে নিশ্চিন্ত হল, তাকে কেউ দেখছে না, সে ডান দিকে ফিরল। সাইড ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে বের করল সান গ্লাস। চোখে এঁটে নিয়েই, ডান দিকে নীচে প্রায় দৌড়ে নেমে গেল।

গোগোলের কেমন সন্দেহ হল, যেন লোকটা বাড়ি থেকে চুরি করে বেরিয়েছে। ভাবভঙ্গি সেইরকমই। ও গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাড়িটার গেটের কাছে গেল। দেখল, লোকটা নীচে নেমে যাচ্ছে। যেদিকে নামছে, সেদিকে একটা কাঁচা রাস্তাও দেখা গেল। রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা জীপগাড়ি। লোকটা দৌড়ে নেমে জীপের সামনের বাঁ দিকে উঠে পড়ল। জীপটা লেফট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ। বাঁ দিকেই স্টিয়ারিং। পকেট থেকে চাবি বের করে, এঞ্জিন স্টার্ট করল। আবার ওপর দিকে তাকাল। গোগোল চট করে পিছিয়ে গেল। গাড়িটার এঞ্জিনের শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। গোগোল অবাক হল। গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ও আস্তে-আস্তে সরে এসে আবার উঁকি দিল। দেখল, লোকটা জীপ থেকে নেমে, আবার উঠে আসছে। কেন? গোগোল কিছুই বুঝতে পারল না। তাছাড়া ও-রকম একজন লোককে চোর ভাবাও যায় না। লোকটা হয়তো এ-বাড়িতেই থাকে। ভিতরে আরও লোকজন নিশ্চয়

আছে। কোনো কারণে আবার ফিরে আসছে। গোগোল তো কোনো অপরাধ করেনি। ওর পালাবারও দরকার নেই।

তবু গোগোল বাড়িটার কাছ থেকে সরে গিয়ে, ডান দিকে ঝাউবনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। যেন লোকটি না ভাবে, গোগোল তাকে লুকিয়ে দেখছিল। ওভাবে দেখাটাও বোধহয় অন্যায় হয়েছে। হয়তো লোকটার ভাবভঙ্গি ও ভুলই দেখেছে। ওর নজরে পড়ল পাশাপাশি বেশ বড় দুটো প্রজাপতি উড়ছে। কালোর ওপরে খুব সুন্দর নকশা। ইস্, সঙ্গে যদি একটা ফ্লাই-ট্র্যাপ থাকত, তাহলে এখুনি ধরে ফেলত। তবু ও প্রজাপতি দুটোব দিকে হাত বাড়াল। আর প্রজাপতি দুটো ওর পাশ দিয়েই আর একদিকে উড়ে গেল। কিন্তু বেশি দূরে নয়। ও আবার সেদিকে হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল। আব তখনই ওকে থমকে দাঁড়াতে হল। দেখল সেই লোকটি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গোগোলের গা-টা কেমন



শিউরে উঠল। ও লোকটির দিকে চোখ তুলে তাকাল।

লোকটি চোখের সানগ্লাস খুলে, গোগোলের মুখের দিকে তাকাল। তীক্ষ্ণ আর কঠিন দৃষ্টি। মোটা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী করছ?'

গোগোল বলল, 'এমনি বেড়াচ্ছি।'

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কলকাতা থেকে এসেছ?'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় উঠেছ? কার সঙ্গে এসেছ?' লোকটি খুঁটিয়ে জানতে চাইল, যেন গোগোলকে সে একটা চোর ঠাউরেছে।

গোগোলের মোটেই ভাল লাগল না। ও হোটেলের নাম করে বলল, 'বাবা-মা-র সঙ্গে এসেছি।'

'তা হোটেল থেকে এদিকে কী করতে এসেছ?' লোকটি কৈফিয়ত চাওয়ার মতো জিজ্ঞেস করল।

গোগোল বলল, 'বললাম তো আপনাকে, ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

লোকটি খানিকক্ষণ গোগোলের চোখে চোখ রেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমি যখন নীচের রাস্তায় জীপে উঠছিলাম, তুমি তখন আমাকে লুকিয়ে দেখছিলে?'

গোগোলের কাছে জিজ্ঞাসার সুরটা মোটেই ভাল লাগল না। চাউনি আর গলার স্বর বেশ কঠিন। কিন্তু ও সহজভাবেই বলল, 'লুকিয়ে দেখিনি। আমি ওদিকে যাচ্ছিলাম, আপনি জীপে উঠলেন।'

'কিন্তু আমি যখন ওপর দিকে তাকালাম, তুমি আড়ালে সরে গেলে কেন?' লোকটির গলার স্বর এবার যেন আরও শক্ত শোনাল। দুই চোখে তীক্ষ্ণ সন্দেহ।

গোগোল ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বলল, 'ওভাবে দেখছি, তাতে আপনি কী ভাববেন, তাই সরে গেছলাম।'

লোকটি গোগোলের চোখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আবার বলল, 'আমি কেন কিছু ভাবতে যাব?'

গোগোল মনে মনে খুব ভয় পেলেও সাহস করে বলল, 'ওভাবে কারোকে দেখাটা অভদ্রতা তো। তাই সরে গেছলাম।'

লোকটা গোগোলের কথা বিশ্বাস করবে কি না, সে-কথা যেন ভাবল। তারপরে বলল, 'ঠিক বলেছ, ওভাবে কারোকে দেখতে নেই। তোমার নাম কী? কলকাতায় কোন্ স্কুলে, কোন্ ক্লাসে পড়?'

গোগোল ওর ভাল নাম আর স্কুলের নাম, ক্লাসের কথা বলল।

লোকটির চোখের চাউনিও একটু বদলাল। বোধহয় গোগোলের ওপর যে-রকম সন্দেহ করেছিল, সে ভাবটা অনেক কেটে গেল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমি কোথা থেকে এসে জীপের কাছে নেমে যাচ্ছিলাম, তা তুমি দেখেছ?'

গোগোল বুঝতে পারল, লোকটি জানতে চাইছে, তাকে সে বাড়িটার ভিতর থেকে বেরোতে দেখেছে কি না। ও মিথ্যে কথা বলতে পারল না। বলল, 'হ্যাঁ, আপনি ওই বাড়িটা থেকে বেরোলেন, আমি দেখেছি।'

লোকটি আবার গোগোলের চোখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ হেসে বলল, 'ঠিক দেখেছ। ওটাই আমার বাড়ি। বাড়ির মধ্যে আমার ষণ্ডা-মার্কা ভাই আছে। সে একটা ভয়ংকর পাগল। যাকে কাছে পায়, তাকেই মেরে-ধরে খামচে-কামড়ে রক্তারক্তি করে দেয়। যে-কোনো সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর এসে যদি তোমাকে দেখতে পায়, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। বলা যায় কি, তোমাকে হয়তো গাছের গুঁড়িতে আছড়েই মেরে ফেলবে। সেই জন্যই আমি তোমাকে সাবধান করার জন্য ফিরে এলুম। তাছাড়া এই ভরতপুরে তোমার এ-জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ভালো নয়। তুমি নিশ্চয়ই বাবা মাকে বলে এদিকে বেড়াতে আসোনি?'

গোগোল একটু অবাক হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন। আমি বাবা-মাকে বলে আসিনি।'

লোকটি এবার আরও বেশি করে হাসল। বলল, 'দেখ, আমি ঠিক ধরেছি। যাও, আর দেরি কোরো না। এখানে থেকো না। আমার সেই ভয়ংকর খ্যাপা পাগল ভাইটি যে-কোনো সময়েই বেরিয়ে আসতে পারে।'

গোগোল ভয়ে-ভয়ে বাড়িটার দিকে একবার দেখে বলল, 'আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।'

গোগোল মুখ ফিরিয়ে যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই পা বাড়াল। খানিকটা গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। লোকটি সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছে। এতে গোগোলের মনে কেমন একটা সন্দেহ হল। ঢালুতে নেমে যাবার আগে আর একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। লোকটি তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোগোল নামতে লাগল। কিন্তু মনের সন্দেহটা গেল না। এবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানটা আর দেখা যাচ্ছে না। লোকটি কি এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে? গোগোলের মনে ভীষণ কৌতূহল হল। কিন্তু দেখতে যাবার সাহস হল না। তবে

লোকটির কথাবার্তা বলার ভঙ্গি ওর মোটেই ভাল লাগেনি। এমন কটকটে চোখে তাকিয়ে শক্ত গলায় কথাগুলো জিজ্ঞেস করছিল, যেন গোগোল কিছু অন্যায় করেছে। সে-রকম অন্যায় কি ও সত্যিই কিছু করেছে?

গোগোল আরও ভাবল, লোকটার নজর কী কড়া। নীচে জীপে বসে একবার তাকিয়েই গোগোলকে ঠিক দেখতে পেয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট করেও, বন্ধ করে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছিল। সত্যি কি ও-বাড়িতে লোকটির ওই রকম সাংঘাতিক ঠ্যাঙাড়ে পাগলা ভাই আছে? সেই জন্যে সাবধান করতে এসে গোগোলকে এত কথা ও-রকম ভাবে জিজ্ঞেস করছিল কেন? গোগোলের মনে কেমন একটা খটকা লাগল। এখন ওর মনে হল বাড়িটা থেকে বেরোবার সময় লোকটার ভাবভঙ্গি সত্যিই কেমন একটু অদ্ভুত লেগেছিল। ওর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হল। গোগোলের মনটাই এ-রকম। একবার একটা কোনো ব্যাপারে মনে খটকা লাগলে, শেষ পর্যন্ত না দেখে থাকতে পারে না। ও ডান দিকে ঘন গাছের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে নীচের সেই রাস্তাটা দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু রাস্তাটা দেখা গেল না। আবার ওপর দিকে দেখল। কারোকেই দেখা যাচ্ছে না।

এ-সময়েই জীপের এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা যেন এদিকে এগিয়ে এসে, আবার ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল। লোকটা তাহলে চলে গেল। গোগোল আবার আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে দাঁড়াল। বাড়িটার দিকে দেখল। সত্যি কি ষণ্ডা-মার্কা খ্যাপা পাগল আছে নাকি? পাগলরা তো অনেক সময় চিৎকার চেঁচামেচি করে। সে-রকম কোনো শব্দই ভেসে আসছে না। দূরে সমুদ্রের গর্জন, আর ঝাউ গাছে বাতাসের শব্দ।

গোগোল বাড়িটার গেটের কাছে গিয়ে আবার নিচের দিকে ঝুঁকে দেখল। জীপটা নেই। তার মানে লোকটি চলে গিয়েছে। সে বলল, নিজের বাড়ি। বাড়ির মধ্যে ও-রকম পাগল ভাইকে ফেলে রেখে গেল কেন? আরও কেউ আছে? গোগোল বাড়িটার ভিতর দিকে দেখল। গেট দিয়ে ঢুকে সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। এক সময়ে বোধহয় বাগান ছিল। এখনও তার কিছু চিহ্ন রয়েছে। বাঁ দিকে থামওয়ালা চওড়া বারান্দা। ঘরের দরজা-জানালা সবই বন্ধ। কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

গোগোল পায়ে-পায়ে গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল। বাগানের দিকে খানিকটা যেতেই, ও সমুদ্র দেখতে পেল। বাড়িটা বেশ উঁচুতে। এখান

থেকে যে সমুদ্র দেখা যাবে ও ভাবতেই পারেনি। বাঁ দিকে বাড়িটার দিকে তাকাল। থামওয়ালা বারান্দা বাঁ দিকে ঘুরে গিয়েছে। বাড়িটাও গোলমতো। গোগোল বাঁ দিকে গেল। দেখল বারান্দাটা এদিকেও বেশ বড়। একটা বেতের চেয়ার আর বেতেরই টেবিল রয়েছে। সেখান থেকে বসে সমুদ্র দেখা যায়। বারান্দার শেষে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

কিন্তু কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন? ঠ্যাঙাড়ে পাগলের ভয়টা গোগোলের মনে আছে। সে কি দোতলায় আছে? না কি লোকটা ওকে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে? দু-এক মিনিট ভেবে গোগোল বারান্দায় উঠল। বারান্দায় বেশ ধুলো পড়েছে। অথচ বাড়িটা বেশ ঝকঝকে। সমুদ্রের দিকে দুটো দেবদারু গাছ রয়েছে। এত নিঝুম, খালি বাড়ি মনে হচ্ছে। পরের বাড়িতে এ-রকম ঢোকা উচিত নয়।

গোগোল সাত পাঁচ ভেবে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। একটা-একটা করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। উঠতে-উঠতে সিঁড়িতে পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। সেই লোকটার কেড্‌স জুতোর ছাপ যেন। ও দোতলায় উঠল। নীচের মতোই বারান্দা, কিন্তু থাম নেই। কাঠের রেলিং। দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েই দেখল, বারান্দার ধুলো আর বালিতে সেই কেড্‌সের ছাপ। যাওয়া এবং আসার। গোগোল সেদিকে যাবে কি না ভাবছে। হঠাৎ ওর কানে খুব আস্তে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে এল। মনে হল, শব্দটা ওপর থেকে এল। দেখল তিন তলায় ওঠার সিঁড়িতেও সেই কেড্‌সের ছাপ রয়েছে। কিন্তু ওপরে অন্ধকার। গোগোল ভাবল, সত্যি কি ও কোনো শব্দ শুনেছে? সেই পাগলটাই কাছেপিঠে থেকে শব্দ করছে না তো?

গোগোলকে ওপরটা টানতে লাগল। ও তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠল। সিঁড়ির ঘোরার মুখে দেখল, ছাদে যাবার দরজা এদিক থেকে ছিটকিনি লাগানো। গোগোল দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার আবার সেই গোঙানি-শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেল। শব্দটা যেন ছাদ থেকেই এল। গোগোল ছিটকিনি খুলল আস্তে-আস্তে। দরজাটা খুলেই ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, ট্রাউজার আর গেঞ্জি গায়ে একটা লোক মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার বুকের কাছ থেকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাছেই একটা লোহার রডের ওপরে যেন লম্বা দূরবীন লাগানো। সেটা উত্তর দিকে মুখ করে রয়েছে। লোকটার ওঠবার ক্ষমতা নেই। নড়তেও পারছে না।

গোগোল আস্তে-আস্তে তার সামনে গেল। দেখল লোকটির পায়ের

স্ত্যাণ্ডেল দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার হাত ছড়ানো। মুখটা অন্যদিকে কাত করা, বুকের কাছে নুয়ে এসেছে। ও কাছে যেতেই দেখল, লোকটার পাঁজরের কাছেও রক্ত। গোটা গেঞ্জি আর ট্রাউজারেও রক্ত লেগেছে। সে আবার একবার গোঙানো শব্দ করল। গোগোল নিচু হয়ে লোকটির মুখ দেখবার চেষ্টা করল। চোখ এখনও একটু খোলা। বোধহয় গোগোলেব পায়ের শব্দেই লোকটি গুঙিয়ে বলল, 'কে···অনিল ? আমি মারা যাচ্ছি। ও আমাকে গুলি করেছে। সেই চামড়ার ম্যাপটা চশমার খাপে, নিচের স্টোর রুমের কাঠকয়লার গাদার মধ্যে···।' আর কিছু তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

আসলে কথাগুলো গোঙানোর স্বরে জড়িয়ে বলতে লোকটির অনেক সময় লাগল। গোগোল নিচু হয়ে কথাগুলো শুনল। লোকটি কি মারা গেল ? গোগোল বুঝতে পারছে না। কিন্তু তার ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে থেমে গেল। মাথাটা একবার যেন ওঠাতে চেষ্টা করল। পাবল না। গলা দিয়ে বিষম-লাগার মতো একটা শব্দ হয়েই সব থেমে গেল। অনিল কে ? এই লোকটিই বা কে ? আর যে-লোকটি এই বাড়ি থেকে বেরিযে জীপে করে চলে গেল, সে-ই বা কে ? একে কে গুলি কবেছে ? গোগোল চুপ করে একটু ভাবল। তারপবে মাথা নিচু কবে ডাকল, 'শুনছেন—এই যে, শুনুন।'

লোকটা নড়ল-চড়ল না। কোনো কথাও বলল না। গোগোলের এখন কী করা উচিত ? চামড়ার ম্যাপটা চশমার খাপে, নিচেব স্টোব রুমে কাঠকয়লার গাদার মধ্যে···।' এ-কথাবই বা মানে কী ? চামড়ার আবাব ম্যাপ হয় নাকি ? গোগোলের কৌতূহল হল। ও সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল। দোতলায় একটু দাঁড়িয়ে, একতলায় নেমে গেল। সেই ষণ্ডা-মার্কা পাগল কি সত্যি আছে ? থাকলে কি তাকে এতক্ষণে দেখা যেত না ? লোকটা বোধহয় গোগোলকে ভয় দেখাবাব জন্য মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু নীচের স্টোর রুমটা কোথায় ?

গোগোল সিঁড়ি থেকে নেমে, প্রথম ডান দিকের বন্ধ দবজাটা ঠেলল। দরজা খুলল না। ভিতর থেকে বন্ধ। ওর মনে হল, রান্নাঘর ভাঁড়ার, এসব হয়তো পিছন দিকে আছে। ও বারান্দা দিয়ে নেমে বাড়িটার পিছন দিকে গেল। পিছনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে কাজুবাদামের কয়েকটা গাছ। একটা বাথরুমের দরজা খোলা।

গোগোল ঢুকবে কি না একবার ভাবল। সত্যি সেই মারকুটে খ্যাপা

পাগলটা ভিতরে কোথাও নেই তো ? ভেবে গোগোল বাথরুমের দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। বাথরুমের আর একটা দরজাও খোলা রয়েছে। ঘরের ভিতরে যাবার। কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার। গোগোল এগিয়ে গিয়ে ভিতর দিকে উঁকি দিয়ে দেখল। সামনেই একটা ঘর। আবছা অন্ধকারে দেখা গেল, সে ঘরে একটা খাট রয়েছে। খাটের বিছানা বালিশ সব এলোমেলো ওলটপালট করা। বালিশের ওয়ার ঘরের মেঝেয় লুটোচ্ছে। একটা বালিশ ছেঁড়া। তার তুলো বেরিয়ে পড়েছে। একটা কাঠের আলমারির পাল্লা খোলা। ভিতরের কিছু বইপত্রও মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেই পাগলটার কাণ্ড নাকি ?

গোগোল ডান দিকে ফিরে দেখল, অন্য ঘরে যাবার একটা দরজা খোলা রয়েছে। ও আস্তে-আস্তে সেই দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। ঘরটা বেশ বড়। কিন্তু অন্ধকার। বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একটা বড় টেবিল আর কয়েকটা এলোমেলো চেয়ার ছাড়া। ও ভিতরে ঢুকল। অন্ধকারটা একটু সয়ে যেতে ওর চোখে পড়ল, ঘরটার অন্য দিকে কার্পেট পাতা। কয়েকটা সোফা আর সেন্টার টেবিল রয়েছে গোগোল বুঝতে পারল এটা বসবার ঘর, আর খাবার-ঘরও বটে। একটু এগিয়ে ভালো করে দেখল। দেখে অবাক হয়ে গেল। সোফাগুলোর গদি কেউ যেন ছুরি দিয়ে কেটেছে। ফোমের ন্যাড়া গদিগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আশ্চর্য, ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পাশের ঘরগুলোর দরজাও খোলা। গোগোল এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল। দুটো ঘরই শোবার ঘর। আর প্রত্যেকটা ঘরের খাটের বিছানা থেকে, খোলা আলমারির জিনিসপত্র সব এলোমেলো ছড়ানো। বালিশ বিছানা ছিঁড়ে একেবারে ছত্রাকার। যেন একটা দানব সব তছনছ করে দিয়েছে। সেই খ্যাপা পাগলের কাণ্ড নাকি ? মানুষ না পেয়ে এগুলোর ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ?

গোগোলের আর দাঁড়াতে সাহস হল না। বেরিয়ে এসে, যে-ঘর দিয়ে ঢুকেছিল, সেদিকেই গেল। যেতে গিয়ে একটা ঘর চোখে পড়ল। বোধহয় তার একটা জানালা খোলা আছে। ভিতরে আলো দেখা যাচ্ছে। গোগোল উঁকি দিয়ে দেখল। ঘরটা রান্নাঘর। উঁচু সিমেন্ট-বাঁধানো উনোন রয়েছে। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার মোটা পাইপের মুখ খোলা। একটা টেবিলের ওপর কাপডিশ চামচ ছুরি আর কিছু তরিতরকারি রয়েছে। রান্না করবার সরঞ্জামও সব রয়েছে।

বোঝা গেল, নিশ্চয়ই কেউ এখানে রান্নাবান্না করেছে। শুধু গন্ধ না,

একটা মীটসেফের মধ্যে কিছু রান্না করা খাবারের পাত্রও রয়েছে। ছাদের সেই লোকটিই কি এসব করেছে? কে জানে। আর দেরি করা উচিত নয়। তবু পাশের আর-একটা ঘরের দরজা খোলা দেখে, গোগোল সেখানেও উঁকি দিল। ঘরটার মধ্যে এলোমেলো শিশি বোতল টিনের কৌটো। আর এক কোণে কাঠকয়লার গাদা। এর মধ্যেই কি তাহলে সেই চশমার খাপে ঢোকানো চামড়ার ম্যাপটা আছে?

গোগোলের মাথায় কথাটা আসতেই, ওর খুব কৌতূহল হল। এগিয়ে গিয়ে স্যাণ্ডেল-পরা পা দিয়ে কাঠকয়লা ছড়াতে লাগল। বেশ খানিকটা ছড়াবার পরেই, একটা চশমাব খাপ দেখা গেল। গোগোল সেটা হাতে তুলে নিল। খুলে দেখল, ভিতরে একটা কাগজ। কাগজের নীচে প্রায় কাগজেরই মতো নরম আর পাকানো একটা চামড়ার টুকরো। ও চামড়ার টুকবোর পাক খুলে ফেলল। দেখল সেটাব গায়ে কী-সব নক্‌শাকাটা। নানা অ্যারো মার্ক। অ্যারো মার্ক দিয়ে নর্থ আব সাউথ দেখানো বয়েছে। সব ব্যাপারটা দেখে ওঠবার আগেই ওব কানে এল, সামনের বাবান্দায় জুতোর মস্‌মস্‌ শব্দ। গোগোলের বুকেব মধ্যে ধরাস কবে উঠল। সেই লোকটা? নাকি ঠ্যাঙাড়ে পাগলটা? ও তাড়াতাড়ি চামড়ার টুকরো পাকিয়ে, আব কাগজের চিরকুট চশমার খাপে ভবে দিল। কাঠকয়লাব গাদায় সেটা ফেলতে গিয়েও, কী মনে হল। হাফপ্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। যে-ঘব দিয়ে ঢুকেছিল, সেই ঘবেই ছুটে গেল। বাথরুমে ঢুকে বাইরে বেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে গেল। জুতোর মস্‌মস্‌ শব্দটা শোনা যাচ্ছে, তবে অনেক কম। গোগোল কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গেটের বাইবে চলে গেল। আর বলতে গেলে, একছুটেই হোটেলের সামনে এসে পড়ল।

'এই যে শ্রীমান।' হোটেলে ঢোকবার মুখেই দিপুমামা বলে উঠলেন, 'কোথায় গেছলে তুমি? আমরা লাউঞ্জে বাগানে কোথাও তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না?'

গোগোল দিপুমামার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। একে ভয়, তার ওপর জোরে দৌড়ে এসে হাঁপাচ্ছে। হাত দিয়ে উত্তর দিকে দেখিয়ে বলল, 'আমি বেড়াতে-বেড়াতে ওদিকে চলে গেছলাম। ওখানে ঝাউবন আর সুন্দর-সুন্দর বাড়ি আছে। সমুদ্রও বেশ দেখা যায়।'

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই মা এসে পড়লেন। তাঁর চোখে-মুখে বেশ রাগ-রাগ ভাব। রাগতভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেছলে তুমি?'

দিপুমামা বললেন, 'আমি বলছি, ও গেছল ব্যারিস্টারস কলোনির দিকে। ওর কথা শুনেই বুঝেছি।'

'কিন্তু সেখানেও তো ওর যাবার কথা ছিল না।' মা তেমনি রাগ করেই বললেন, 'এজন্যই গোগোলের ওপর আমার রাগ হয়। ওর থাকার কথা ওপরের লাউঞ্জে, কেন ও হোটেল ছেড়ে বাইরে গেছে? আর আমরা সবাই খুঁজে মরছি।'

গোগোল ভাবল, মা বোধহয় ওর গালে একটা চাঁটিই বসিয়ে দেবেন। আশেপাশে দু-চারজন লোককে চলতে-ফিরতে দেখেই বোধহয় থেমে গেলেন। ইতিমধ্যে বাবাও এসে পড়লেন। সঙ্গে বুবুন। বাবা গোগোলকে দেখে বললেন, 'তুমি এত হাঁপিয়ে ঘেমেই বা এসেছ কেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমাকে যেন বাঘে তাড়া করেছিল?'

গোগোল কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। সব ঘটনা বললে এখনই একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। দিপুমামা হেসে বললেন, 'বোধহয় কুকুর-টুকুর তাড়া করেছিল। নাকি খুদে গোয়েন্দাটি কোনো রহস্যের খোঁজ পেয়েছে?'

গোগোল শেষ পর্যন্ত বলল, 'এক ভদ্রলোক একটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, ওর ভেতরে নাকি একটা ঠ্যাঙাড়ে পাগল আছে।'

দিপুমামা হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'ও, সেই পাগলের ভয়েই তোমার মুখ এ-রকম লাল হয়ে গেছে। পাগলটাকে দেখতে পেয়েছ নাকি?'

গোগোল মাথা নাড়িয়ে জানাল, 'না।'

'না দেখেই এ-রকম চোঁ-চোঁ দৌড়?' দিপুমামার হাসি যেন থামতেই চায় না।

দিপুমামার হাসিতে আবহাওয়াটা একটু হাল্‌কা হয়ে গেল। মায়ের রাগও যেন অনেকটা কমে গেল। কিন্তু আসল ঘটনাটা যে কী সাংঘাতিক গোগোল তা ভুলতে পারছে না। ভোলা সম্ভবও নয়। ছাদে যে-লোকটি গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে, সে-খবরটা যখন সবাই শুনবে, তখন হয়তো গোটা দীঘা জুড়েই একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু চশমার খাপটা যে গোগোল পকেটে করে নিয়ে এসেছে, তাতে ওর মনটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। পরের জিনিস এভাবে নিয়ে আসাটা উচিত হয়নি। অথচ ছাদে গুলি খাওয়া লোকটির কথা শুনে, আর চশমার খাপটা কাঠকয়লার গাদায় পেয়ে ওর মনে হয়েছিল, ওটা ওখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। মনে হচ্ছে, ওটার জন্যই

কেউ লোকটিকে ওভাবে গুলি করে মেরেছে। আর অনিল নামে কারোকে সেই কথাটা না জানিয়ে সে যেন মরতেও পারছিল না। সে গোগোলকেই নিশ্চয় সেই 'অনিল' ভেবেছিল। গোগোল ভাবতেই পারছে না যে অনিল কে, কেমন দেখতে, আর কোথায়ই বা আছে। কিন্তু সে-কথা এখন কারোকে বলতে সাহস হচ্ছে না। পরে বলতেই হবে।

মা বললেন গোগোলকে, 'যাও, বাথরুমে গিয়ে ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে নাও। এখানে আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'

গোগোল করিডর দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বাবা বললেন, 'গোগোলকে যেন বেশ একসাইটেড দেখাচ্ছে।'

মায়ের দৃষ্টি একরকম। বাবার দেখাটা আর এক রকম। বাবা বেশি কিছু বলেন না। কিন্তু যখন বলেন, তখন একটুও ভুল বলেন না। গোগোল তো সত্যি কেবল ছুটে হাঁপিয়ে পড়েনি। ভিতরে ওর ভীষণ উত্তেজনা। বুবুন ওর হাত ধরে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল, 'গোগোলদা সত্যি তোমাকে একটা পাগল তাড়া করেছিল?'

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না, তাড়া করেনি। আমি কোনো পাগলকে দেখতেই পাই নি? একজন একটা বাড়ি দেখিয়ে বলছিল, ভেতরে নাকি একটা সাংঘাতিক পাগল আছে। যাকে দেখে, তাকেই মেরে ধরে আঁচড়ে কামড়ে দেয়।'

বুবুনের চোখ দুটো এমনিতেই একটু গোলমতো। ভয়ে আরও গোল হয়ে উঠল। বলল, 'ভাগ্যিস পাগলটা তোমাকে দেখতে পায়নি! পেলে আর রক্ষে ছিল না। খুব বেঁচে গেছ।'

গোগোল বুবুনের কথা ঠিক শুনছিল না। জীপের লোকটা, ছাদে গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকা মানুষটি আর অনিল কে হতে পারে, এসবই ওর মাথায় ঘুরছিল। আর ভাবছিল, চশমার খাপটা কোথায় রাখবে। ব্যাপারটা গুরুতর, কোনো সন্দেহ নেই। এ-রকম একটা ব্যাপার জেনে, আর চোখের সামনে একজনকে মরতে দেখেও চুপচাপ থাকা গোগোলের পক্ষে অসম্ভব মনে হচ্ছে। তার ওপরে চশমার খাপটা ওরই পকেটে। যার মধ্যে পাতলা কাগজের মতো চামড়ার পাকানো একটা ম্যাপ, আর কাগজের চিরকুটে কিছু লেখা রয়েছে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। অথচ মুখ ফুটে কারোকে কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছে না।

গোগোলের হঠাৎই মনে হল, ওবাড়ি থেকে পালিয়ে আসবার আগে, যার জুতোর মসমস্ শব্দ শুনেছিল, সে-ই অনিল নয় তো? কারণ জীপের

সেই লোকটার পায়ে ছিল কেড্‌স জুতো। মসমস্‌ শব্দ হবার কথা নয়। কিন্তু এখন তো আর গোগোলের উপায় নেই, সেই বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করবে।

এ-সময়েই মা এসে ঢুকলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী গোগোল, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ? বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিতে বললাম না?'

দিপুমামাও এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, সবাই তৈরি হয়ে নাও, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ব। নইলে দেরী হয়ে যাবে। অনেকটা পথ যেতে হবে। বুবুন তুমিও ও-ঘরে যাও, মাকে বলো, তোমার জামা-প্যান্ট বদলে দিতে, আর মাও যেন জামাকাপড় বদলে নেন।

বুবুন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে বাবা?'

দিপুমামা বললেন, 'সে এক দারুণ জায়গায়। আমরা যাব কাঁথি শহরে কপালকুণ্ডলার মন্দির আর মূর্তি দেখতে। তুমি এখনো জানো না, গোগোল জানতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা বই লিখেছিলেন কপালকুণ্ডলা নামে। সে অনেককাল আগের কথা। আমরা তখন কেউই জন্মাইনি।'

বুবুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তখন কি তবে গোগোলদা জন্মেছিল?,

দিপুমামা হতবাক হয়ে বুবুনের দিকে তাকালেন। মা একেবারে ছেলে-মানুষের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলেন। দিপুমামা বললেন, 'এটা তুমি কী করে ভাবলে বুবুন, আমরাই যখন জন্মাইনি, তখন গোগোল জন্মাবে? ও তো আমাদের থেকে অনেক ছোট।'

বুবুন সরলভাবেই বলল, 'বা, তুমিই তো বললে, গোগোলদা জানতে পারে।'

মা তখনো হাসছিলেন। বললেন, 'দিপুদা, তুই কথাটা বলতেই ভুল করেছিস। বুবুন তোর কথা শুনে বুঝতেই পারেনি, গোগোল কপালকুণ্ডলা বইটার কথা জানতে পারে। বইটা যখন লেখা হয়, তখন আমরা কেউ জন্মাইনি।'

বুবুনের কথা শুনে গোগোলের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হাসবে কী, ওর মাথাটাই তো বিগড়ে গিয়েছে।

বুবুন ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে বলল, 'বুঝেছি' বুঝেছি। তুমি বলছ, গোগোলদা হয়তো বইটা পড়েছে, তাই না?'

বুবুনের বোকামিতে দিপুমামা বেশ বিরক্তই হলেন, বললেন, 'তুমি একটা সামান্য কথাও ঠিকমতো বুঝতে পার না। আমি সে-কথাই বলতে চেয়েছি, যে গোগোল হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ওর ইস্কুলে পড়েছে। কী

গোগোল, তোমাদের বাঙলা বইয়ে কি কপালকুণ্ডলার কথা আছে ?'

দিপুমামার প্রশ্নে গোগোল জবাব দিল, 'না, কপালকুণ্ডলা নেই, বিষবৃক্ষ থেকে একটা অংশ দেওয়া হয়েছে। তবে কপালকুণ্ডলা বইয়ের নাম শুনেছি, বইটার কিছুই জানিনে।'

দিপুমামা বললেন, 'কপালকুণ্ডলা এক দেবীর নাম, আসলে কালীরই আর-এক নাম। কাঁথিতে—মানে কণ্টাই যাকে বলে, সেই শহরের দক্ষিণ সীমানায় কপালকুণ্ডলার মন্দির আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথিতে মহকুমা-শাসক ছিলেন, তখন তিনি সেই মন্দির দর্শন করেছিলেন। বুঝতেই পারছ, কাঁথিতে শহর তখন নামে মাত্র, গ্রামই বলা চলে। সুন্দরবন ছিল আরো অনেক এগিয়ে। মন্দিরটা বোধহয় তখন জঙ্গলের মধ্যেই ছিল। আর, সেই কপালকুণ্ডলার মন্দির দেখেই, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের নায়িকার আর উপন্যাসের নামও রেখেছিলেন কপালকুণ্ডলা। আজ এখন আমরা সেই মন্দিরই দেখতে যাব।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য গোগোল কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা ভুলে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'এখনো কি মন্দিরটা জঙ্গলের মধ্যেই আছে ?'

'না, তা বোধহয় নেই।' দিপুমামা মাথা নাড়লেন, 'আমি কোনোদিন কপালকুণ্ডলার মন্দির দেখিনি। এখানে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে শুনলাম, মন্দিরটা কাঁথি শহরের এক প্রান্তে। ভেবে দেখলাম, আমাদের গাড়িতে যেতে এক থেকে সোয়া ঘণ্টা লাগতে পারে। আমাদের হাতে এখনো পুরো দুদিন সময় আছে। সমুদ্রের ধারে বেড়ানো আর চান করা আছেই। আজ আমরা কপালকুণ্ডলা দেখে আসি।'

গোগোল মনে মনে বেশ খুশিই হল। কিছুক্ষণ আগে যে-সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সে-সব আপাতত ভুলে থাকা যাবে। কেবল ভাবতে হবে, চশমার খাপটা কোথায় রাখা হবে। ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো মানেই হয় না। বাবা মা বা দিপুমামা মামিমার চোখে পড়ে যেতে পাবে। বলা যায় না, গোগোলের পকেট থেকে পড়েও যেতে পারে। জিনিসটা আর যাই হোক, নিশ্চয়ই সেটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যার জন্যে একজনকে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে। অনিল নামে কারোকে খুঁজে পাওয়া গোগোলের পক্ষে সম্ভব হবে না। সে-রকম সুযোগ পেলে, আগামীকাল কোন এক ফাঁকে চশমার খাপটা আবার সেই বাড়ির কাঠকয়লার গাদায় রেখে এলেই হবে।

মা তাড়া দিলেন, 'কী হল গোগোল, তুমি এখনো হাঁ করে দাঁড়িয়ে

রইলে? গাড়িতে যেতে-যেতে কপালকুণ্ডলার কথা অনেক শুনতে পাবে। তুমি বাথরুমে ঢুকে পড়ো। তারপরে আমি ঢুকব।'

গোগোল বলল, 'তা হলে আমাকে জামা-প্যান্ট দাও, আমি বাথরুমে বদলে নেব।'

দিপুমামাও বুবুনকে নিয়ে নিজেদের ঘরে যেতে যেতে বললেন, 'চল বুবুন, তুমিও তৈরি হয়ে নেবে।'

মা স্যুটকেশ খুলে গোগোলকে ধোয়া জামা-প্যান্ট বের করে দিলেন। গোগোল সেগুলো নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গেল। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপরেই খুব তাড়াতাড়ি প্যান্টের পকেট থেকে চশমার খাপটা বের করল। খাপের মুখ খুলে আগেই কাগজের চিরকুটটা খুলে দেখল। কালো কালিতে বাঙলায় বেশ পরিষ্কার করে লেখা আছে:

শ্রীশ্রীকালীমাতা সহায়।

শ্রীমান অনিলকান্তি চৌধুরি

চিরঞ্জীবেষু,

আমি দীঘায় ব্যারিস্টারস কলোনিতে নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়েব বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছি। সে-কথা তোমাকে কলিকাতা হইতে আসিবার আগেও বলিয়াছি। কী কারণে এখানে আসিয়াছি, তুমি তাহাও মোটামুটি অবগত আছ। আমাদের চারপুরুষ আগে কাঁথির সমুদ্র-তীরবর্তী অরণ্যমধ্যে ডানিয়েল নামে এক সাহেবের সঙ্গে কোনরকম ব্যবসা ছিল। চার পুরুষ আগে আমাদের সেই পিতৃপুরুষেব নাম ছিল মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি। ডানিয়েলের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ ব্যবসা ছিল, তাহা পরিষ্কার জানা যায় না। এমনও হইতে পারে, ডানিয়েল একজন বম্‌বেটে ছিল। মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি তাহারই সঙ্গী ছিলেন। সে যাহাই হউক, দুইজনে অগাধ সোনা মোহর বহুমূল্য অলঙ্কার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া, কাঁথি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রের ধারে জঙ্গলে কোথাও তাহা গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে। চামড়ার ম্যাপের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের যে দলিলটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতই লেখা ছিল, একটি লোহার পেটিকায় সেই সমুদয় সোনাদানা রত্ন অলঙ্কার বিশেষ স্থানে মাটির নীচে পাথর চাপা দেওয়া রহিয়াছে। চামড়ার ম্যাপটিতে সেই জায়গা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথ লিখিয়া গিয়াছিলেন, ডানিয়েলকে তাহার শত্রুরা সমুদ্রে নৌকাবক্ষে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু ম্যাপটি তাঁহার কাছে রহিয়াছে। অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথের কাছে। অতএব

মহেন্দ্রনাথের বংশধরেরা যেন সেই গুপ্তধন খুঁজিয়া বাহির করে। বহুলক্ষ টাকার সেই গুপ্তধন খুঁজিয়া পাইলে চৌধুরিবংশের আর কোন অভাব থাকিবে না।

এখন আমি চাকরি হইতে অবসর পাইয়াছি। এইবার সেই গুপ্তধন সন্ধানের চেষ্টায় চলিলাম। কিন্তু আমাদের জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাই বিক্রমকান্তি চৌধুরি এই খবরটি জানে। আমার সন্দেহ হয়, সে সেই ম্যাপটির সন্ধান করিতেছে। সে লোক মোটেই সুবিধার নহে। তাহাব চরিত্র অতি নিষ্ঠুর, ও ক্রুব প্রকৃতির। টাকার জন্য এমন কোন কর্ম নাই, সে কবিতে পারে না। হয়তো সে আমাকে অনুসরণ করিয়া দীঘায় আসিবে। আমাকে খুঁজিয়া পাইতে চেষ্টা কবিবে, এবং ম্যাপটি চুরি কবিবার ধান্দায় থাকিবে। যদি দীঘায় নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে আমাকে দেখিতে না পাও, জানিবে কোন বিপদ হইয়াছে। তোমার জন্য এই চিঠি লিখিয়া, চশমাব খাপের মধ্যে সেই ম্যাপসহ রাখিয়া গেলাম। আমি যদি মরিয়াও যাই, তুমি সেই গুপ্তধনের সন্ধান করিবে। কারণ তুমিই সেই গুপ্তধনের বর্তমান অধিকারী। এইখানেই শেষ কবিতেছি। তোমাব অপেক্ষায়, ইতি,

আশীর্বাদান্তে

কাকাবাবু

(স্বাঃ শ্রীঅমৃতকান্তি চৌধুরি)

ছোট-ছোট অক্ষবে লেখা চিরকুটটি ছোট নয়। অনেক কথা লেখা রয়েছে। তাহলে যিনি গুলি খেয়ে ছাদে মরে পড়ে রয়েছেন, তিনিই কি অমৃতকান্তি চৌধুরি? বিক্রমকান্তি কি সেই শর্ট পরা, টাওয়েল গেঞ্জি গায়ে জীপের লোকটি?

গোগোল আব দেবি করতে পারল না। কোনোরকমে চোখে মুখে হাতে পায়ে জল দিয়ে ধুয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল। ধোয়া জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে, পকেটে চশমার খাপটা ঢুকিয়ে দিল। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল, মা বাথরুমে ঢোকবার জন্য অপেক্ষা করছেন। গোগোল চুল আঁচড়াবাব জন্য ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই গোগোল চশমার খাপটা পকেট থেকে বের করে, খাটের মোটা গদির নীচে ঢুকিয়ে দিল। হাত দিয়ে চেপে দেখল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ও আবার ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেল। এ-সময়ে বাবা ঢুকলেন। গোগোলকে দেখে বললেন, ‘তুমি তৈরি হয়ে গেছ? বেশ, তোমার মা বাথরুমে গেছেন?’

গোগোল বলল, 'হ্যাঁ! আমি তাহলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াই?'

বাবা বললেন, 'তা দাঁড়াও। কিন্তু হোটেলের সামনেই থেকো, অন্য কোথাও যেও না। পাঁচটা বাজতে চলেছে। আমরা এখুনিই বেরিয়ে পড়ব। নইলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।'

গোগোল দরজা খুলে করিডরে এল। রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেল। রিসেপশন পেরিয়ে হোটেল থেকে বেরোবার মুখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার সেই সকালবেলার লোক দুটো! দু জনেই একটা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করছিল। দু'জনেরই চোখ পড়ল গোগোলের ওপব। এখন তাদের মাথায় আর সেই ঘাসের টুপি নেই। কিন্তু চোখে সানগ্লাস আঁটা রয়েছে। আর দু'জনেই গোগোলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কে এরা? মুখ দুটো যেন খুবই চেনা-চেনা লাগছে?

গোগোল এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই, যার চেহারা একটু ছোটখাটো, সে এগিয়ে এল। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে বলল, 'কী গোগোল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

গোগোল অবাক হয়ে মাথা নাড়ল। লোকটি বলল, 'সেই রাজধানী এক্সপ্রেসের কথা মনে আছে?'

গোগোলের মাথায় বিদ্যুতের মতো ঝিলিক খেলে গেল। অশোক ঠাকুর! সেই নামকরা গোয়েন্দা? তিনি এখানে? কিন্তু তাঁর তো এ-রকম বিশ্রী গোঁফ ছিল না? আর উনি কি তাহলে সেই সঙ্গী অয়স্কান্ত রায়? ও বলল, 'আপনি অশোক ঠাকুর তো!'

অশোক ঠাকুর হেসে বললেন, 'আস্তে বলো। ঠিক চিনতে পেরেছ। গোঁফটার জন্য চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাই না?'

গোগোলের বুকে যেন দামামা বাজতে লাগল। ও আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না। চুপিচুপি গলায় বলল, 'জানেন, ব্যারিস্টারস্ কলোনির একটা বাড়ির ছাদে, এক ভদ্রলোককে কে গুলি করে মেরে রেখে গেছে। আমি একটু আগেই দেখে এসেছি।'

অশোক ঠাকুরের চোখ দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে এল। বলল, 'তুমি দেখেছ? সর্বনাশ হয়ে গেছে তাহলে। আমরা তো ব্যারিস্টারস্ কলোনিরই একটা বাড়ির খোঁজ করছি। সেখানে অমৃতকান্তি চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক—'

গোগোল বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁকেই কেউ গুলি করে

মেরেছে। আপনি শিগগির সেখানে যান। আমরা কাঁথিতে কপালকুণ্ডলা দেখতে যাচ্ছি।'

অশোক ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কখন ফিরে আসবে?'

গোগোল বলল, 'জানিনে। সবাই যখন আসবেন, তখন। আর—'

'তোমার দিপুমামা আর বাবা আসছেন।' অশোক ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের পরিচয় এখন ওঁদেব দিও না। ফিরে এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি খুবই একটা জরুরি খবর দিয়েছ।'

অশোক ঠাকুর তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বাবা আর দিপুমামা কাছে এসে পড়লেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ভদ্রলোক? তোমাকে কী জিজ্ঞেস করছিলেন?'

বাবাকে মিথ্যা কথা বলতে গোগোলের খুবই খারাপ লাগে। অথচ আসল ঘটনা বলতেও সাহস পাচ্ছে না। একটু ঢোঁক গিলে বলল, 'উনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমার নাম কী, কোথা থেকে এসেছি, এই সব।'

বাবা গোগোলের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'কিন্তু তোমাকে কেমন চঞ্চল দেখাচ্ছে। কিছু হয়েছে নাকি?'

গোগোলেব বুকেব মধ্যে টিপটিপ করে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

দিপুমামা নেমে গিয়ে, গাড়ি স্টার্ট কবে এগিয়ে নিয়ে এলেন। মা মামিমা বুবুনকে নিয়ে এসে পড়লেন। সবাই গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলল কাঁথিতে, কপালকুণ্ডলা-দর্শনে।

॥ তিন ॥

গোগোলরা যখন কাঁথি শহরে পৌঁছোল, তখনই সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। রাস্তায় আলো জ্বলছে। দিপুমামা এক-এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে, রাস্তাব লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন, 'কপালকুণ্ডলার মন্দিরটা কোন দিকে বলতে পারেন?'

এ-রকম কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করে, শহরের ভিড় ছাড়িয়ে এমন একটা রাস্তা ধরতে হল, কোথাও ইলেকট্রিকের আলো নেই। রাস্তাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আশেপাশে দু-একটা দোকানঘরে হ্যারিকেনের আলো বা লম্ফ জ্বলছে। কয়েকটা সাইকেল-রিকশা আর গোরুর গাড়ি দেখা যাচ্ছে হেডলাইটের আলোয়। দিপুমামা গাড়ি থামিয়ে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে, কপালকুণ্ডলা মন্দিরের সন্ধান পেলেন। গাড়ি নিয়ে ভিতরে যাবার উপায় নেই। তবে বাঁ দিকে খানিকটা খোলা বালি মাটি আর

গাছপালা-ঘেরা জায়গায় গাড়িটা তুলে দিলেন।

বাবা বললেন, 'আমরা একটা খুবই ভুল করেছি। একটা টর্চলাইট সঙ্গে করে আনা উচিত ছিল।'

মা বললেন, 'সে-কথা এখন আর ভেবে লাভ নেই। চলো, ওদিকে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মন্দিরটা ওখানেই।'

এ-সময়েই একজন লোক অন্ধকার থেকে যেন ফুঁড়ে বেরোল। বলল, 'হ্যাঁ, মায়েব মন্দিরটা ওখানেই। চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

দিপুমামা বুবুনের হাত ধরে ছিলেন। বুবুন ধরেছিল গোগোলের হাত। গোগোলের এক হাত বাবা ধরে আছেন। পাশে-পাশে মা আর মামিমা। দিপুমামা সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে? কোথায় থাকেন?'

লোকটিকে মনে হল বয়স হয়েছে। গলাটা ধরা-ধরা। বলল, 'আমি মা-কপালকুণ্ডলার নিত্যপূজারি। আমার সঙ্গে আসুন। মন্দিরের দরজা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আমি দরজা খুলে আপনাদের দেবীদর্শন করাব।'

বুবুন ফিসফিস করে বলল, 'গোগোলদা, আমার কেমন ভয় করছে।'

গোগোলের কোন ভয় করছিল না। কেবল অন্ধকারটাই যা গোলমাল করছে। পূজারিঠাকুর গলা তুলে কাকে কী বললেন। দু-তিনটে হ্যারিকেন আর লম্ফ নিয়ে কেউ কেউ এগিয়ে এল। পূজারিঠাকুর একটা রকের ওপর উঠে গিয়ে দরজার শিকল খুললেন। গোগোল আগেই অন্ধকারে মুখ তুলে দেখে নিয়েছে, মন্দিরের কোনো চূড়া ওর চোখে পড়ল না। আশেপাশে গাছপালায় অন্ধকার যেন দলা পাকিয়ে রয়েছে। জোনাকি জ্বলছে টিপটিপ। আর ঝিঁঝিঁ ডাকছে। পায়ের নীচে মাটি, যেন বালিই বেশি। রাত্রে জায়গাটা দেখলে সত্যি যেন কেমন গা ছমছম করে।

পূজারিঠাকুর দরজা খুলে ভিতরে হ্যারিকেন নিয়ে ডাকলেন, 'আসুন সবাই জুতো নীচে খুলে রেখে আসুন।'

বাইরেও হ্যারিকেন ছিল। গোগোলের প্রথমেই চোখে পড়ল, মন্দিরের দেওয়ালে সাদা পাথরের গায়ে কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬০ সালে এই মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন।'

পূজারিঠাকুর সবাইকে ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দিলেন। দেখা গেল, একটি কালীর মূর্তি। মূর্তিটি মাটির তৈরি, নতুনত্ব কিছু নেই। এক দিকে একটা আংটার সঙ্গে কয়েকটা পুরনো খাঁড়া ঝুলছে। পূজারিঠাকুর বললেন, 'ওই খাঁড়াগুলো বহুকালের পুরনো। এখানে নিয়ম হচ্ছে, কপালকুণ্ডলার

সামনে যখন খাঁড়া দিয়ে পশুবলি দেওয়া হয়, তখন খাঁড়ার রক্ত মোছা হয় না। ওই খাঁড়াগুলোতে অনেক আগের বলির রক্ত লেগে আছে। অনেকে বলে, এক কাপালিক নাকি মানুষও বলি দিতেন, তাই এই পুরনো খাঁড়াতে মানুষের রক্তও লেগে আছে।'

বাবা বললেন, 'ওসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এখানে চাকরি করতেন, তখন এ-জায়গার নাম ছিল মেগুয়া মহকুমা। পরে নাম হয়েছে কাঁথি। এ-জায়গারই কোথাও আছে দরিয়াপুব আর চাঁদপুর নামে জায়গা। বঙ্কিমচন্দ্র চাঁদপুরের বাংলোয় থাকতেন। সেখান থেকে তিনি এ-মন্দির দেখতে এসেছিলেন, একজন কাপালিকেব সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তখন অবশ্য এখানে ঘন জঙ্গল ছিল।'

পূজারিঠাকুর বললেন, আমার ছেলেবেলায় তো এখানে লোকালয়ই ছিল না। কাছেই জঙ্গল, সুন্দরবনের শুরু। সমুদ্র আরও দূরে ছিল। এখন এগিয়ে এসেছে। চারদিকে জঙ্গল, মন্দিরের সামনে এই নাটমন্দির, আর পেছনে পুকুর আর মহাশ্মশান। কাপালিক ওখানেই ছিলেন।'

গোগোলের গাটা সত্যি কেমন ছমছম করে উঠল। বুবুন তো দিপুমামার হাতই ছাড়ছে না। বাবা মা দিপুমামা মামিমা সবাই কপালকুণ্ডলার সামনে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। বাবা আর দিপুমামা কিছু টাকা পূজারিঠাকুবকে দিয়ে বললেন, 'মায়ের পুজো দেবেন।'

পূজারিঠাকুর বললেন, 'দাঁড়ান, আপনাদের একটু প্রসাদ আর মায়েব ফুল দিচ্ছি।'

গোগোল মন্দির থেকে বেরিয়ে এল। রকের নীচে নেমে নাটমন্দিরে ঢুকল। ছোটখাটো মন্দির। মাথার ওপরে ছাদ নেই। খড়ের চাল, তাও যেন ভাঙাচোরা। সেখানে একটা লম্ফ জ্বলছে। গোগোল ঘুরে-ঘুরে দেখতে-দেখতে নাটমন্দিরের বাইরে চলে এল। সামনেই কয়েকটা গাছপালা। মন্দিরটা আড়ালে পড়ে গিয়েছে। ওর চোখের সামনে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখের ছবিটা ভাসছিল। তখনই হঠাৎ কী হল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই, গোগোলকে শক্ত দুটো হাত কঠিন করে চেপে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। চিৎকার করবার সুযোগ পেল না। কেউ যেন ওর মুখের মধ্যে কিছু গুঁজে দিল। আর ওকে নিয়ে ছুট দিল।

গোগোল হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কেবল এটা বুঝল, যে-লোকটা ওকে নিয়ে যাচ্ছে, তার খালি গাটা অসুরের মতো বিরাট আর শক্ত। মনে হল, সে রাস্তায় ছুটে এল।

একজন গলা নামিয়ে বলল, 'নিয়ে এসেছ ? উঠে পড়ো গাড়িতে। সামনে দিয়ে ঢুকে পেছনে মাথা নিচু করে বসে পড়ো। দেখো, ছেলেটা যেন একদম টুঁ শব্দ করতে না পারে।'

যে-লোকটা গোগোলকে নিয়ে এসেছিল, সে যেন বাঘের মতো একটা সামান্য শিকারকে নিয়ে লাফ দিয়ে একটা জীপগাড়ির সামনে উঠল। উঠেই, জীপের পিছন দিকে গিয়ে গোগোলকে কোলেব ওপর রেখে, মুখ চেপে ধরে রাখল। জীপটাও তখনই গর্জন করে উঠল। গোগোল বাবার গলা শুনতে পেল, 'গোগোল, গোগোল, তুমি কোথায় গেলে ?'

কিন্তু গোগোলের জবাব দেবার কোনো উপায় নেই। জীপ তখন সোঁ-সোঁ করে ছুটতে আরম্ভ করেছে। গোগোলেব প্রাণ তখন ভয়ে উড়ে গিয়েছে। ও হাত-পা ছুঁড়ে, লোকটার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা অসম্ভব ব্যাপার। লোকটাব গায়ে যেমন বেজায় শক্তি, তেমনি বিশাল তার চেহারা। সে গোগোলকে দু পায়ের মাঝখানে চেপে ধরে আছে। আর মুখের মধ্যে রুমালের মতো কিছু গুঁজে দিয়ে সেখানেও হাত দিয়ে চেপে রেখেছে। গোগোলের নড়া-চড়া করা বা শব্দ করার কোনো উপায় নেই। ওর চোখ দিয়ে কেবল জল পড়ছে। বুঝতে পারছে কোনো ভয়ঙ্কর লোকেব পাল্লায় পড়েছে। বাবা-মাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবে কিনা কে জানে।

লোকজনের শব্দ আর আলো দেখে বুঝতে পারছে, ওরা শহরের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। অথচ ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। একটু পরেই জীপ নির্জন রাস্তা ধরল। মাঝে-মাঝে উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট জীপের ওপর পড়ছে। পড়লেই বা কী হবে ? গোগোলকে তো নীচে ফেলে রাখা হয়েছে। কেবল উল্টো দিকের গাড়ির হেডলাইটের আলোয়, ওকে চেপে ধরে রাখা লোকটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাচ্ছে। কালো কুচকুচে রঙ, সত্যি অসুরের মতো চেহারা। চোখ দুটো লাল ভাটার মতো।

যে জীপ চালাচ্ছিল, সে একবার জিজ্ঞেস করল, 'গোগা, সব ঠিক আছে ?'

গোগা নামে লোকটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ সাহেব, সব ঠিক আছে। আপনি কিছু ভাববেন না। এ তো বাঘের মুখে একটা হরিণের বাচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। বেশি তেড়িবেড়ি করলে, মাথাটা একদম ঠুকে দেব, বাছাধনের আর ট্যাঁ-ফো করতে হবে না।'

গোগোলের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। কান্না কিছুতেই থামাতে পারছিল

না। বাবা মা দিপুমামা মামিমা সবাই যে কী করছেন, কে জানে। কোথায় ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাও বুঝতে পারছে না। কিন্তু জীপের চালক লোকটার গলা শুনে মনে হল, এটা সেই লোকের গলা, যে ওকে জীপ থেকে উঠে এসে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আর ঠ্যাঙাড়ে পাগলের মিথ্যা ভয় দেখিয়েছিল। ওর সন্দেহ হল, লোকটা, নিশ্চয়ই গোগোলের সেই বাড়িতে ঢোকার কথা কোনো রকমে জানতে পেরেছে। তা নইলে, এভাবে ওকে ধরে নিয়ে যাবে কেন? গোগোলেরা যে কপালকুণ্ডলা দেখতে আসছে, তাও লোকটা ঠিক খবর রেখেছে। ওদিকে অশোক ঠাকুর আব তাঁর সঙ্গী অয়স্কান্ত রায় দীঘায় ঘুরছেন। গোগোলের কাছ থেকে তারা একটা খবব পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কি এসব ব্যাপারেব কোনো যোগাযোগ আছে?

গোগোল কিছুই বুঝতে পারছে না। জীপ ছুটেছে হুহু করে। জীপটার পিছন দিকটা ঢাকা। সেদিক থেকেও ওকে কেউ দেখতে পাবে না। জীপ কতক্ষণ ছুটছে, গোগোলের কোনো হিসাব নেই। ওর মুখ বন্ধ থাকায় নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। এক সময়ে আবার ও লোকজনের সাড়াশব্দ পেল। আর আলোও দেখতে পেল। জীপের চালক বলল, 'গোগা, এবার খুব সাবধান।'

গোগা বলল, 'আপনি চলেন না সাহেব, কিছু ভাবতে হবে না।'

গোগোলের হঠাৎ মনে হল, ও যেন সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল। ও মাথা তোলবার চেষ্টা কবল। গোগা নামে লোকটা তৎক্ষণাৎ ওর মাথাটা নুইয়ে দিয়ে বলল, 'খবরদাব, মাথা তুলেছ কি এক ঘুষিতে পাকা বেলেব মতন ফাটিয়ে দেব।'

গোগোল মাথা তুলতে পারল না। কিন্তু জীপের শব্দ ছাপিয়েও ও সমুদ্রের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। জীপের মধ্যে আলোও দেখা গেল। আবার কি দীঘায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। সেই বাড়িটাতেই কি? সেই বাড়িটাতে তো গাড়ি ঢোকবার উপায় নেই। আর সেই বাড়িতেই যদি নিয়ে যাওয়া হয়, তবে একরকম ভাল। অশোক ঠাকুর সে-বাড়িতে এতক্ষণ নিশ্চয়ই চলে গিয়েছেন। আর ছাদে মরে পড়ে থাকা অমৃতকান্তি চৌধুরির কথা ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

গোগোল বুঝতে পারল, জীপের মধ্যে আলো আর তেমন আসছে না। লোকজনের সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। জীপটা কখন যে, কোন দিকে ঘুরছে, বুঝতে

পারেনি। আবার একদিকে ঘুরল। মনে হল ডান দিকে। খানিকক্ষণ চলল। আবার অন্ধকার, আর নিস্তব্ধ। সমুদ্রের শব্দ হারিয়ে গিয়েছে। জীপটা এদিকে-ওদিকে কয়েকটা বাঁক নিয়ে এক জায়গায় থামল। জীপের সামনের চালক বলল, 'গোগা, এখানে আর তেমন ভয় নেই। ওর মুখটা খুলে দে, এখন এখানে চিৎকার করলেও কেউ আসবে না। ওকে নামিয়ে নিয়ে আয়।'

গোগা নামে লোকটা গোগোলের মুখ থেকে রুমাল খুলে হাত সরিয়ে নিল। গোগোল প্রাণ ভরে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। ওকে সে একটা সামান্য পুতুলের মতো এক হাতে বগলদাবা করে জীপের সামনে দিয়েই নেমে এল। টর্চলাইটের আলো পড়ল গোগোলের মুখের ওপর। ও আলো সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজল। টর্চটা ঘুরে গেল। গোগা তখন গোগোলকে মাটিতে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এমন শক্ত হাতে ধরে আছে, গোগোল ছুটে গেলেও, ওর হাতটা থেকে যাবে গোগার হাতেই। দেখা গেল আশেপাশে গাছপালা। বাঁ দিকে একটা উঁচু মতো ঢিবি। সামনে একটা একতলা বাড়ি। আশেপাশে আর কোনো বাড়ি আছে কি না, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। আকাশে ফটফট করছে তারা আর একফালি চাঁদ। আসলে ও-রকম মনের অবস্থায় গোগোল অন্ধকার দেখছিল। এখন একটু চাঁদের আলোও চোখে পড়ল। কপালকুণ্ডলায় এ চাঁদের আলো দেখা যায়নি।

টর্চের আলো বাড়িটার দরজার কড়ায় লাগানো তালার কাছে এগিয়ে গেল। লম্বা ছায়ার মতো একটা লোক তাড়াতাড়ি তালা খুলে, দরজার পাল্লা খুলল। ভিতরে অন্ধকার। গোগোল স্পষ্টই দেখল লম্বা লোকটার গায়ে যেন সেই টাওয়েল গেঞ্জি আর নীচে শর্টস। তাহলে সেই লোকটাই। গোগোল যাকে সন্দেহ করছিল, গলা শুনে?

গোগা গোগোলকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। গোগোল ভেবেছিল, এবার ইলেকট্রিকের আলো জ্বলবে। কিন্তু তা জ্বলল না। বরং লোকটা বলল, 'গোগা, আমি মোমবাতি জ্বালছি। ওকে ডান দিকের ভেতরের ঘরে নিয়ে এসো।'

গোগোলের মনে হল, বাড়িটার ভিতরে একটা উঠোন রয়েছে। পাঁচিলের এপাশে-ওপাশে গাছপালার ঝুপসি ঝাড়। অল্প চাঁদের আলোয় তার চেয়ে বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। গোগা ওকে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। এক পাশে খস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। দেখা গেল একটা টেবিল। টেবিলের ওপরেই একটা মোমবাতি খাড়া করা রয়েছে। লোকটা

মোমবাতি জ্বালল। গোগা ঘরের দরজা বন্ধ করে, গোগোলকে ছেড়ে দিল। নিজে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে।

গোগোল জানে, এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করা অসম্ভব। চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। তাহলে ওরা কখনোই ওর মুখ খুলে দিত না। এবার গোগোল সেই লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সেও গোগোলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হে গোগোল আমাকে চিনতে পারছ?'

লোকটাকে দেখলেই কেমন খারাপ আর ভয় লাগে। ও-বেলাও লেগেছিল। এখন ওর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছে, কেঁদেকেটে কোনো লাভ হবে না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনি আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন কেন? আমি তো কিছু করিনি।'

'কী করেছ আর না করেছ, তা এখনই বুঝিয়ে দেব। লোকটা বলল, 'তোমাকে যখন তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি গোগোল নামটা বলনি। অন্য একটা নাম বলেছিলে।'

গোগোল বলল, 'আমি তো আপনাকে আমার ভাল নাম বলেছি। ডাকনাম কি কেউ বলে?'

লোকটা বলল, 'তা জানি। তবে তুমি ইচ্ছে কবেই তোমার গোগোল নামটা বলনি। তাহলে আমি তোমাকে সহজে ছাড়তাম না। অনেকক্ষণ পরে আমার হঠাৎ মনে এসে গেল, তোমার ছবি আমি খবরের কাগজে দেখেছি। তখনই চিনে ফেললাম, তুমি গোগোল। কিন্তু তখন আর তোমাকে ধরার উপায় ছিল না। এখন সত্যি করে বলো তো, তুমি সেই বাড়িটাব মধ্যে ঢুকেছিলে কি না?'

গোগোলের এ-লোকটাকে মিথ্যা বলতে একটুও বাধল না। বলল, 'না তো। আপনি তো বললেন, ও-বাড়ির মধ্যে একটা মারকুটে পাগল আছে।'

লোকটা বলল, 'তাহলেও তোমাকে বিশ্বাস নেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সেই বাড়িতে ঢুকেছিলে।'

গোগোল বলল, 'অচেনা পরের বাড়িতে ঢুকতে যাব কেন?'

'সেটা ঠিক কথা। কিন্তু তুমি গোগোল বলেই, আমি সন্দেহ করছি, তুমি সে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলে।'

লোকটা আবার বলল, 'কেন এ-সন্দেহ করছি, তাও বলছি। কপালকুণ্ডলা

'দেখতে যাবার আগে অশোক ঠাকুরকে তুমি কী বলেছিলে ?'

গোগোলের বুকের মধ্যে চমকে উঠল। এ-লোকটা অশোক ঠাকুরকে চিনল কেমন করে ? আর গোগোলকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই বা দেখল কোথা থেকে ?

লোকটা জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে, চাপা গর্জন করে বলল, 'ভাবছ, কী মিথ্যে কথা বলবে ?'

গোগোল বলল, 'মিথ্যে কথা কেন বলব ? কে অশোক ঠাকুর, আমি চিনিনে। নামও শুনিনি। কপালকুণ্ডলা দেখতে যাবার আগে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন আমার নাম কী, কোথা থেকে এসেছি।'

লোকটার মুখটা যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি অশোক ঠাকুরকে চেনো না ? রাজধানী এক্সপ্রেসের ঘটনাটা যখন ঘটেছিল, তখন থেকেই তো তুমি অশোক ঠাকুরকে চেনো। ভাবছ, আমি খবরের কাগজ পড়িনে ?'

গোগোল বুদ্ধি করে বলল, 'খবরের কাগজে কী লিখেছিল আমি জানিনে। অশোক ঠাকুরকে আমি চিনিনে।'

'হুঁ, তুমি দেখছি খুবই সাহসী ছেলে।' লোকটি কঠিন হেসে বলল, 'আমি স্পষ্ট দেখেছি, তুমি অশোক ঠাকুরকে কিছু বললে। আর সে তখনই তার চ্যালাকে নিয়ে ব্যারিস্টারস কলোনির দিকে চলে গেল। তার থেকেই আমি বুঝে নিয়েছি, তুমি নিশ্চয় ও-বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলে। নয়তো অশোক ঠাকুরকে এমন কথা বলেছ, সে তখনই সেদিকে ছুটে গেছে। এবার বুঝতে পেরেছ, তোমাকে কেন এভাবে ধরে এনেছি ?'

গোগোল তবু মাথা নাড়ল। লোকটা ঠোঁট দুটো বাঁকিয়ে বাঘের মতো তাকিয়ে বলল, 'বুঝিয়ে দেব। ওই গোগা তোমাকে দু হাতে পিঁপড়ের মতো টিপে মেরে ফেলতে পারে। আর তা নইলে আমিই তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

বলে, লোকটা সেই সাইড ব্যাগের ভিতর থেকে একটা রিভলবার বের করে গোগোলের দিকে তাক কষে দেখাল। আবার বলল, 'কারোকে মারব ভাবলে আমার হাত একটুও কাঁপে না। বেশি ওস্তাদি না করে এখনো বলে ফ্যালো তুমি সেই বাড়িতে ঢুকেছিলে কি না ? ঢুকে থাকলে কী দেখেছ আর অশোক ঠাকুরকে কী বলেছ ?'

গোগোলের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়। ও বলল, 'আমি ও-বাড়িতে

ঢুকিনি, অশোক ঠাকুর বলে কারোকে কিছু বলিওনি।'

'চোপরাও।' লোকটা ঘর কাঁপিয়ে ধমকে উঠল।

গোগোল সত্যি কেঁপে উঠল। মনে হল, তখনই সে গুলি করে গোগোলের খুলি উড়িয়ে দেবে। কিন্তু ভয় পেলেও, ও চুপ করে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে রইল। লোকটা এবার গোগোলকে অপমান করে বলল, 'তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, ইস্কুলে পড়, আর এই তোমার শিক্ষা? একটা সত্যি কথা বলতে পারছ না? বাবা-মা কি তোমাকে এইরকম শিক্ষা দিয়েছেন?'

গোগোল প্রথমে মনে-মনে কেমন দুর্বল হয়ে গেল। কথাগুলো ওর মনে ভারী খোঁচা দিল। মিথ্যা কথা বলা ওর অভ্যাস নেই। বাবা-মা ওকে কখনোই মিথ্যা বলতে শেখাননি। তারপরেই ওর মনে হল, এই লোকটাই বা কী রকম? যে তার সাইডব্যাগে রিভলবার নিয়ে ঘোরে, মিথ্যা করে ঠ্যাঙাড়ে পাগলের ভয় দেখায়, আর ডাকাতের মতো গোগোলকে চুরি করে নিয়ে আসে? ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই ফাঁকা বাড়ির ধুলোবালি ভরা বারান্দায় এ-লোকটার কেড্‌সের দাগ। এ-লোকটাই কি ছাদের সেই ভদ্রলোককে গুলি করে মারেনি?

এই সব ভেবে গোগোলের মন শক্ত হয়ে উঠল। লোকটা কখনোই ভাল নয়, ও বলল, 'আমার বাবা-মা কখনো মিথ্যে বলতে শেখাননি।'

'তাহলে তুমি নিজেই বানিয়ে-বানিয়ে মিথ্যে বলছ?' লোকটা ধমকেই জিজ্ঞেস করল।

গোগোল বুঝেই নিয়েছে, এ-লোককে সত্যি কথা বলা যায় না। বলল, 'না, আমি মিথ্যে বলিনি।'

লোকটা তার চোখমুখ উৎকট রকম শক্ত করে বলল, 'গোগা, একে সহজে কথা বলানো যাবে না। ওকে সেই ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। দেখি ক'দিন ও চুপ করে থাকতে পারে। তারপরে যা করবার তাই করা যাবে।'

গোগা বলল, 'এখনই হুকুম দিন না, ঘাড় মটকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসি।'

লোকটা বলল, 'সে সময় অনেক পাওয়া যাবে। এখন ওকে সেই ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দাও। তারপরে চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি। ওদিকের খোঁজখবর একটু নিতে হবে।'

লোকটা টেবিলের ওপরে রাখা টর্চলাইট হাতে তুলে নিল। গোগা এসে

গোগোলের হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। দেখা গেল, চাঁদের আলো যেন আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। গোগা ডান দিকের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে, একটা ঘরের দরজা খুলল। অন্ধকার ঘর। গোগোল কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ঘরটা ছোট। সেই ঘরের মধ্যে আর-একটা ঘর। আরও ছোট, আরও অন্ধকার। গোগা সেই ঘরের মধ্যে গোগোলকে ঠেলে দিল। গোগোলের জলতেষ্টা পেয়েছিল। বলল, 'আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।'

গোগা কোনো জবাব না দিয়ে বাইরে থেকে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার ভারী পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। গোগোলের গলা শুকিয়ে কাঠ। খিদেও পাচ্ছে। এখন ওর মনে পড়ল, কপালকুণ্ডলা দেখতে যাবার সময় দিপুমামা বলেছিলেন, 'কপালকুণ্ডলা দেখে ফেরবার সময় আমরা কাঁথিতে মিষ্টি কিনে খাব।' সেই খাওয়াটা আর হয় নি। দিপুমামারাও কি আর খেতে পেরেছেন? মায়ের মুখটা মনে হতেই গোগোলের চোখে জল এসে পড়ল। বাবা তো সকলের সামনে কাঁদবেন না। মা এতক্ষণে কেঁদে আকুল হচ্ছেন। সেখানে কী ঘটছে, কিছুই জানবার উপায় নেই।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হল। আর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপরে আর-একটা দরজা খোলা হল। গোগোলের মুখে টর্চের আলো পড়ল। কালো মোটা হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি এগিয়ে এল ওর কাছে। গোগার গলা শোনা গেল, 'এই নাও জল। আর শোনো, একটা কথা বলে দিচ্ছি। সাহেব খুব রাগী মানুষ। যদি কিছু জানো, এখনো সাফ বলে দাও, নইলে ব্যাপার খুব খারাপ হবে।'

গোগোল অ্যালুমিনিয়ামের ঘটিটা নিয়ে, উঁচু করে ধরে গলায় জল ঢালল। এভাবে জল খাবার অভ্যাস নেই। গলা বেয়ে, বুকের জামা অবধি ভিজে গেল। অনেকটা জল খেয়ে ঘটিটা ফিরিয়ে দিতে গেল। গোগা বলল, 'ওটা তোমার কাছেই রাখো। আমার কথাটা ভেবে দেখেছ? সাহেব তো তোমাকে কিছু করতে চান না। খালি জানতে চান, তুমি সেই বাড়িটায় ঢুকেছিলে কি না, আর ওই কোন ঠাকুর না কে, তাকে কী বলেছ। এটুকু বলে দিলেই তো মিটে যায়। তাহলেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

টর্চের আলোটা দেওয়ালের গায়ে পড়ায়, গোগোল গোগাকে ভাল করে দেখতে পেল। তার প্রকাণ্ড শক্ত শরীর, মাথাটা ন্যাড়া। কান দুটো যে লেপটে গিয়েছে, দেখাই যায় না। চোখ দুটো ভাঁটার মতো লাল। গোগোল বলল, 'বললাম তো, আমি ওসব কিছুই করিনি, কিছু জানিও না। তা

টনি মোটেই ভাল লোক নন, আমি বুঝেছি।'

গোগা তার ভাঁটার মতো চোখে অবাক হয়ে গোগোলকে দেখল। বলল, 'তুমি এমন ফুটফুটে সুন্দর দেখতে ছেলে, কিন্তু তোমার সাহস দেখছি খুবই বেশি। তাহলে থাক, কপালে যা আছে, তাই ঘটবে।'

গোগা বেরিয়ে যাবার আগেই গোগোল ঘরটা দেখে নিল। বোঝা গেল এটা একটা ভাঁড়ার ঘর। পাশেরটা রান্নাঘর। ভাঁড়ার ঘরের একদিকে একটা দরজা রয়েছে। সেটা বন্ধ। গোগা ভাঁড়ারঘরের দরজাটা বন্ধ কবার আগে বলল, 'খুব সাবধান, এ-ঘরে কাঁকড়া বিছে-টিছে থাকতে পাবে। তেই হয়তো তোমার প্রাণটা যাবে।'

বলেই দরজা টেনে বন্ধ কবে দিল। তার ভারী পায়ের শব্দ পাশের ঘরে লে গেল। তারপরে আর-একটা দরজা বন্ধ করার শব্দও হল। গোগোলের া তখন শিউরে-শিউবে উঠছে, কাঁকড়া বিছেব কথা শুনে। যেখানে দাঁড়িয়ে ল, সেখানেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে নড়তে পারছে না। কেবল চু হয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ঘটিটা বাখল। কান পেতে বাইবেব শব্দ শোনার চষ্টা কবল। আর তখনই ওব চোখে পড়ল, ঘবেব মধ্যে কোথা থেকে কফালি আলো এসে পড়েছে। ও অবাক্ হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল,-ছোট কটা ভেন্টিলেটার দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো এসে পড়েছে। এর মধ্যে টা ওর চোখেই পড়েনি।

বাইরে আবার দরজা বন্ধ করাব শব্দ ভেসে এল। দু মিনিট পবেই পের এঞ্জিন গর্জে উঠল, আর চলে যাবার শব্দও শোনা গেল। তার মানে গাগাকে নিয়ে একটা লোক বেবিয়ে গেল। গোগোলের সেই চশমার খাপেব ঠিটার কথা মনে পড়ল। এই লোকটা কি তবে বিমলকান্তি চৌধুরি? মৃতকান্তি চৌধুরি যার কথা অনিলকে লিখে গিয়েছেন?

হঠাৎ গোগোলের পায়ে, স্যাণ্ডেলের ওপবে যেন কিসের সুড়সুড়ি লাগল। এক লাফে সরে গেল। কাঁকড়া বিছে নাকি? কিন্তু জলের ঘটিটা ল উলটে। দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। ও আর-এক লাফে সেই আলোর ালিতে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ নামিয়ে দেখল। নিজের স্যাণ্ডেল পরা পা টা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও সেখানে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নেকক্ষণ চোখ তুলল না। তারপর আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা সয়ে এল। তে অবশ্য ঘরের মেঝের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাইরে শব্দ বলতে, ছে-গাছে বাতাসের ঝাপটা, আর ঝিঁঝির ডাক। তবে সমুদ্র যে খুব বেশি র নয়, সেটা আসবার সময়েই বোঝা গিয়েছে। ওকে কি আবার দীঘাতেই

ফিরিয়ে আনা হয়েছে ?

গোগোল মেঝের দিকে দেখল। ওর ভিতরে অস্থিরতা বাড়ছে ভেন্টিলেটারটা ছোট, মাঝখানে একটা লোহার রড। ওটার নাগাল পাও কঠিন। মাথাও গলানো যাবে না। একমাত্র চিৎকার করা যায়। কি চারদিক এমন নিঝুম আশেপাশে কেউ নেই। শুনতেও পাবে না। কাঁকড়া বিছের ভয়টা কাটিয়ে, সরে গিয়ে দরজাটায় হাত দিল। টানবা চেষ্টা করল। একটুও নড়ল না। বাইরে থেকে বেশ ভাল করেই বন্ধ ক গিয়েছে। এটা তো একটা দরজা। তারপরে আবার আর-একটা দরজা আছে। গোগোলের ক্ষমতা নেই, দুটো দরজা ভেঙে ও বেরোতে পারে।

এদিকে ঘরে চাঁদের আলোর ফালিটা ছোট হয়ে আসছে। ঘরের আ এক দিকে একটা দরজা আছে। গোগোল বিছের ভয়ে লাফ দিয়ে সে দরজাটার কাছে গেল। আর সেটা ধরে টান দিতেই, দরজাটা খুলে গেল ওর বুকে আর চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল। দরজাটা খোলা, ভাবতে পারেনি। গন্ধে টের পেল, দরজাব ভিতরে বাথরুম। নিশ্চয়ই গোগা সেই লোকটার খেয়াল ছিল না। আর বাথরুমের ভেন্টিলেটারটা বড় মাঝখানে রড আছে। তবে নাগালের মধ্যে, অনেকটা নীচে। ফাঁক দি চাঁদের আলো এসে পড়েছে আর একটু বেশি। মোটামুটি বাথরুমটা আব দেখা যাচ্ছে। বাথরুমে ঢোকবার অন্য একটা দরজাও রয়েছে। গোগো সেই দরজাটা ধরে টান দিল। খুলল না। ওপাশ থেকে বন্ধ।

গোগোল ভেন্টিলেটারের কাছে গেল। দু হাত বাড়িয়ে, মাঝখানে রডটা ধরল। দেওয়ালে পা চেপে মাথা তুলল। বাইরেটা চোখে পড়ল এলোমেলো গাছপালা, আর খোলা জায়গা। বাড়িঘর চোখে পড়ছে না হঠাৎ দেখল, সামনেই কুকুরের মতো দুটো জানোয়ার ওর দিকেই হে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। কী ও দুটো নিশ্চয়ই শেয়াল।

গোগোল বেশিক্ষণ ওভাবে থাকতে পারল না। দেওয়াল থেকে নামিয়ে দাঁড়াল। শেয়াল দুটোকে দেখে, ওর গা কেমন শিউরে উঠ লাগল। শেয়াল অবশ্য বাঘ বা নেকড়ে না। তাহলেও, একলা পে দুটো শেয়াল গোগোলকে হয়তো আক্রমণও করতে পারে। কিন্তু সে ভেবে কোনো লাভ নেই। গোগোল বেরোবেই বা কেমন করে। ও আব বাথরুমের বাইরে যাবার দরজাটা ধরে টান দিল। না, খোলবার কো উপায় নেই। ওর নজর আবার ভেন্টিলেটারের দিকে গেল। দেখে ম

হল মাথাটা হয়তো বের করা যেতে পারে। শরীরটা বের করবে কেমন করে? ব্রুসলী হলে হয়তো এই ভেন্টিলেটার দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারত। ক্যারাটেকরা শরীরকে নাকি রোগাও করে ফেলতে পারে।

গোগোল আবার ভেন্টিলেটারের কাছে গেল। হঠাৎ ওর চোখ পড়ল কমোডের ওপর। এটা আগে চোখেই পড়েনি। ও এবার কমোডের ওপর পা দিয়ে উঠে, ভেন্টিলেটারের মাঝখানের রড চেপে ধরল। বাইরে তাকাল। শেয়াল দুটোকে আর দেখা যাচ্ছে না। ও ভেন্টিলেটারের কাঁচটা সোজা করে, মাথাটা গলাবার চেষ্টা করল। সোজা ঢোকাতে গিয়ে মাথা আটকে গেল। অথচ ভেবেছিল, মাথাটা গলে যাবে! একটু ভেবে, মাথাটা কাত করে ঢোকাল। ঢোকাতেই মাথাটা বেরিয়ে পড়ল। এমন-কী গলারও অনেকখানি। দু হাত আর কাঁধটা গলিয়ে দিতে পারলেই, নীচে পড়ে যাওয়া যায়।

মুক্তির আশায় গোগোলের বুকের মধ্যে যেন বাজনা বেজে উঠল। নীচে পড়ে গেলে হয়তো একটু লাগবে। এমন বেশি কিছু উঁচু নয়। একবার বেরোতে পারলে, তারপর দেখা যাবে। গোগোল একটা হাত সবে বাড়াতে যাবে এমন সময়, জীপের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। ওর বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। জীপের শব্দ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। গোগোল হাত টেনে এনে, কোনোরকমে মাথাটা কাত করে ভিতরে নিয়ে এল। কমোড থেকে নেমে পাশের ঘরে ঢুকে, আস্তে-আস্তে দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল। জীপ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। এঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই বাড়ির ভিতরে দরজা খোলার শব্দ।

॥ চার ॥

দশ মিনিট কেটে গেল। কারো কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গোগোল প্রথমে হাঁপাচ্ছিল। ভয়ও পাচ্ছিল। আস্তে-আস্তে সামলে নিল। ঘরের এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় পনেরো মিনিট পরে, সামনের ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপরে এ-ঘরের। গোগার বাঁ হাতে হ্যারিকেন, ডান হাতে একটা থালা। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ কী, ঘটি গড়িয়ে জল পড়ে গেছে যে।'

গোগোল বলল, 'আমার পায়ে কিসের সুড়সুড়ি লাগতেই লাফিয়ে উঠেছিলাম। পা লেগে ঘটি উলটে গেছে।'

গোগা হলদে দাঁত আর লাল মাড়ি বের করে হেসে বলল, 'তাহলে

বোধহয় কাঁকড়াবিছে এসেছিল।'

গোগোল হ্যারিকেনের আলোয় ঘরের মেঝের চারদিকে দেখল। ধুলো আছে, কিন্তু আর-কিছুই চোখে পড়ল না। ঘরটার মধ্যে কোনো নর্দমার মুখও নেই। কাঁকড়াবিছে ঢুকবে কোথা দিয়ে? গোগা নিশ্চয়ই মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছে।

গোগা থালাটা মেঝেয় রেখে বলল, 'এই শেষ খাওয়া খেয়ে নাও। রক্ষে তুমি পাবে না, এমনকী যম এসেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি জল নিয়ে আসছি।'

গোগোল দেখল, থালায় কয়েকটা রুটি। রুটির পাশে বোধহয় কয়েক টুকরো মাংস আর ঝোল। ঝোলে রুটি ভিজে গিয়েছে। গোগা ঘটিটা নিয়ে, দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরে এল এক মিনিটের মধ্যেই। জলভরা ঘটি রেখে বলল, 'শোবার জন্য একটা মাদুর দিয়ে যাচ্ছি। তবে মশার কামড়ে সারারাত ঘুমোতে পারবে না। তাই বলছিলাম, মিছিমিছি দেরি না করে, যা বলবার বলে দাও।'

গোগোল তার কথাব কোনো জবাব দিল না। খিদে ওর পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু থালাটা কী-রকম নোংরা দেখাচ্ছে? ঝোলে ভেজা রুটি খেতেও ইচ্ছা করছে না। তবু খিদে এমন জিনিস, মাংসের গন্ধ নাকে যেতেই মনে হল জিভে জলও আসছে। ওদিকে বাবা মা দিপুমামারা যে কী করছেন, কে জানে? মা তো মুখে খাবার তুলতেই পারবেন না।। কথাটা মনে হতেই গোগোলের চোখ দুটো আবার ছলছল করে উঠল। খাবার খেতে ইচ্ছা করল না।।

গোগা আবার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল, একটু পরেই। এক পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। বলল, 'কী হল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমি বাতি নিয়ে চলে যাব।'

গোগোল বলল, 'আমার খেতে ইচ্ছে নেই।'

গোগা হেঁ হেঁ শব্দে হাঁ-মুখ করে হাসল। বলল, 'শোনো খোকা, যত বুদ্ধিমানই হও খাবার খেয়ে নাও। এখন তুমি সমুদ্দুরের কুমিরের পিঠে বসে আছ। যতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারো, তাই করো। খাও খাও, খেয়ে নাও।'

গোগোল গোগার মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখের সামনে ভাসছে পাশের বাথরুমের ভেন্টিলেটার। এখনও একটা আশা আছে। কিছু না বলে, ঘটির জলে হাত ধুয়ে থালার সামনে বসে গেল। কোনোরকমে দুটো

রুটি খেল। মাংসটা বেশ ঝাল। অনেকটা জল খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল। গোগা এক হাতে থালা আর অন্য হাতে হ্যারিকেনটা নিয়ে চলে যাবার আগে বলল, 'এবার ভগবানের নাম করতে থাকো।'

বাইরে গিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। তারপরে আর একটা দরজাও বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। গোগোল অন্ধকারে বসেই রইল, আর ভাবল, লোকটা আর গোগা কি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে? না এখন খাবে? ওরা নিশ্চয়ই রাত্রে ঘুমোবে? নাকি গোগা সারারাত জেগে গোগোলকে পাহারা দেবে? দিলেও সে রান্নাঘরের বাইরেই থাকবে। দুটো ঘরের দরজাই তো বন্ধ করে দিয়েছে। গোগোল যে খুলে বেরোতে পারবে না, তা জানে।

হঠাৎ পাশের বাথরুমের ভিতরের দরজা খোলার শব্দ হল। গোগোলের বুকটা ধড়াস করে উঠল। হয়তো সেই লোকটা ঢুকেছে। যদি এদিকের দরজাটা চোখে পড়ে, তাহলেই সর্বনাশ। খোলা দেখতে পেয়ে এখনই ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবে। পালাবার যেটুকু আশা ছিল, তাও শেষ হয়ে যাবে। গোগোল নিশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রইল। একটু পরেই ভিতরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, ওদিক থেকে ছিটকিনি আটকাবার শব্দও স্পষ্ট শোনা গেল।

গোগোল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ নড়ল না। মিনিট-খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে দরজাটার দিকে দেখল। অস্পষ্ট হলেও দরজাটা ও দেখতে পাচ্ছে। ঘরের মধ্যে এখন আর সেই চাঁদের আলোর ফালিটুকু নেই। সামান্য শব্দও যাতে না হয়, সেই ভেবে ও পায়ের স্যাণ্ডেল দুটো খুলে ফেলল। পা টিপে দরজার কাছে গিয়ে আবার একটু দাঁড়াল। তারপরে খুব আস্তে দরজায় ঠেলা দিল। দরজাটা একটু খুলে গেল। আশায় ও ভয়ে ওর বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ করে উঠল। আর-একটু ঠেলতেই, ও বাথরুমের ওপাশের ঘরে গলার আওয়াজ শুনতে পেল। একটু কান পেতে শুনেই সেই লোকটার গলা চিনতে পারল। সে কিন্তু অন্ধকারে বসেই রইল, ভীষণ কৌতূহল হল, লোকটা কী বলছে তা শোনবার জন্য। কিন্তু এবার ওকে আরও সাবধান হতে হবে। আগে যখন ঢুকেছিল, কোনো শব্দ হয়েছিল কিনা খেয়াল করেনি। এখন এদিক-ওদিক পা পড়ে যদি কোনোরকম শব্দ হয়, তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ও ভাল করে নীচের দিকে দেখল। পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গেল। দরজার গায়ে হাত দিল না। পাশ ফিরে একটা কান দরজায় আলতো করে ছোঁয়াল। আর

সেই লোকটার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল, '...বোকার মতো কথা বোলো না গোগা, আমার পক্ষে এখানে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়। তুমি তো দেখতেই পেলে, গোটা দীঘার চারদিকে পুলিশ জাল পেতেছে। কোনো লোক বা একটা গাড়িও তারা ছাড়ছে না। বিশেষ করে, প্রত্যেকটা গাড়ি থামিয়ে তারা সার্চ করছে, আর গাড়ির লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আমরা যেখানে খেতে গেলাম, সেখানে সবাই তাই বলাবলি করছিল, তাই না?'

গোগার গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ সাহেব, সবাই তাই বলছিল। সেই বাড়ির ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে, সে-কথাও সবাই বলাবলি করছিল। আপনার সেই আত্মীয়ের মড়াটা পুলিশ ছাদ থেকে নামিয়ে এনে কোথায় নাকি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

আপনার আত্মীয়! তাহলে গোগোল ঠিক অনুমান করেছিল, এ-লোকটাই হয়তো বিক্রমকান্তি। তার গলা শোনা গেল, 'ওইখানেই আমার একটা মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে। উচিত ছিল, ছাদ থেকে মড়াটা নামিয়ে নিয়ে এসে কোথাও লুকিয়ে রাখা। কিন্তু তারও কি উপায় ছিল? হয়তো মড়াসুদ্ধ গোগোল ছেলেটার চোখে পড়ে যেতাম। না পড়েও গোলমাল হয়ে গেল। গোগোল ছেলেটা ভীষণ বিচ্ছু। ও নিশ্চয় সেই বাড়িতে ঢুকেছিল, বোধহয় ছাদেও উঠেছিল। তা নইলে অশোক ঠাকুর ওখানে গেল কেমন করে?'

গোগা জিজ্ঞেস করল, 'এই অশোক ঠাকুরটি কে সাহেব?'

বিক্রমকান্তির গলা শোনা গেল, 'সে হচ্ছে এ-রাজ্যের খুনে-ডাকাতদের যম। যেখানেই লুকিয়ে থাক, ঠিক খুঁজে বের করে। ওকে নিশ্চয়ই অনিল দীঘায় পাঠিয়েছে। আর এমনই গ্রহের ফের, তার সঙ্গেই গোগোল ছেলেটার দেখা হয়ে গেছে। আমার আর এক মুহূর্তও দীঘায় থাকা চলবে না। রাত্রের মধ্যে যেমন করে হোক পালাতেই হবে। আর গোগোল ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েই পালাতে হবে। ওকে এখানে রেখে যাওয়া চলবে না।'

গোগোলের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। মুখ দিয়ে প্রায় শব্দ বেরিয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে নিজের একটা আঙুল কামড়ে ধরল।

গোগা বলল, 'ছেলেটাকে নিয়ে যাবার কী দরকার সাহেব? আপনি যখন বলছেন, ছেলেটাই একমাত্র আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারে, তাহলে ওকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিলেই হল।'

গোগোলের শিরদাঁড়ায় যেন একটা সাপ কিলবিল করে উঠল। সরিয়ে দেওয়ার অর্থ যে কী, ও ভালই জানে। বিক্রমকান্তির ঝাঁজালো গলা শোনা গেল, তুমি তো সোজা হিসেব দেখিয়ে দিচ্ছ। সরিয়ে দিলেই হল? আগে আমাকে বুঝতে হবে, গোগোল সেই বাড়িতে অমৃতকান্তির মড়াটা দেখেছে কি না। অশোক ঠাকুরকে কী বলেছে। তবে ওকে ছাড়া চলবে না। ওকে নিয়েই আমাকে পালাতে হবে। তারপরে সেরকম বুঝলে, তুমি যা বলছ, তাই করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে, কোন্ দিক দিয়ে পালাব। এদিক দিয়ে তো কলকাতার দিকে যাবার কোনো রাস্তা নেই। সমুদ্রের ধার দিয়ে যে উড়িষ্যার দিকে চলে যাব, তারও উপায় নেই। সব-থেকে খারাপ ব্যাপাব যেটা, তা হল, গাড়িতে বেশি পেট্রলও নেই।'

গোগা বলল, 'আমি একটা কথা বলছি সাহেব। আপনি গাড়িটা এখানেই রেখে দিন। আব ছেলেটাকে নিয়ে কাল ভোর রাত্রে, সমুদ্রের ধার দিয়ে, চন্দনেশ্বরে চলে যান। চন্দনেশ্বর মন্দিরটা উড়িষ্যার মধ্যে, বেশি দূরেও নয়। তারপরে উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে কলকাতায় ফিরে যান।

বিক্রমকান্তির গলা শোনা গেল, 'একরকম মন্দ বলনি। তবে গোগোলকে নিয়ে লোকজনের সামনে যেতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না। অবশ্য আমার কাছে এমন ওষুধ আছে, যা খাওয়ালে ও খালি ঘুমেব ঘোরে থাকবে। কারোকে কিছু বলতেও পারবে না, ছুটে পালাতেও পাবরে না।'

গোগাব উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'তাহলে তাই করুন সাহেব। গাড়িটাকে এ-বাড়িব পেছনে রেখে দিন, ওটা আমি পাহারা দেব। তাবপর ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে, এক সময় এসে গাড়িটাকে নিয়ে যাবেন।'

বিক্রমকান্তির কোনো কথা শোনা গেল না। সে যে খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছে, গোগোল তা বুঝতে পারছে। কিন্তু যাই হোক, ওর রেহাই নেই। গোগার গলা আবার শোনা গেল, 'তাহলে সাহেব, সেই লুকনো সোনাদানার কী হবে? যার জন্য এত কাণ্ড, সেই নক্‌শাটা কোথায়?'

বিক্রমকান্তিব গলা শোনা গেল, 'সেটাই তো পেলাম না। গোটা বাড়ির বালিশ বিছানা গদি সোফা সব কেটে ছিঁড়ে দেখেছি। কোথাও পাইনি। অমৃতকান্তি সেটা কোথায় রেখেছে, কিছুতেই বলতে চাইল না বলেই তো ওকে—' কথা থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আবার তার ব্যস্ত স্বর শোনা গেল, 'একটা গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন? এদিকেই আসছে নাকি? শিগগির পাশের ঘরে গিয়ে, জানালা দিয়ে ছাখো তো?'

গোগার ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। গোগোলের বুকে দামামা বেজে

উঠল। চোখ দুটো বড় করে, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। অশোক ঠাকুর গাড়ি নিয়ে আসছেন কি? তিনি নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে নেই। কিন্তু ও কোনো গাড়ির শব্দই পাচ্ছে না।

কয়েক মিনিট পরেই গোগার গলা শোনা গেল, 'না সাহেব, এদিকে কোনো গাড়ি আসছে না। বড় রাস্তার দিকে, নতুন বাড়িগুলোর দিকে একটা গাড়ি ঢুকে গেল।'

বিক্রমকান্তির গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে, কাল ভোর রাত্রে গোগোলকে নিয়ে উড়িষ্যার দিকেই চলে যাব। এখন একটু ঘুমিয়ে নিই। তুমি রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে শুয়ে থাকো। তার আগে আর একবার দেখে নাও, গোগোল শুয়েছে কিনা।'

'আচ্ছা সাহেব।' গোগার ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল।

গোগোল দাঁতে দাঁত চেপে, পা টিপে, বাথরুমের ভিতরের দরজা দিয়ে ঢুকে এল। মনে হল, ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কোনোরকম শব্দ না করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আর সেখান থেকেই একরকম গড়িয়ে মাদুরের ওপর চলে এল। পাশ ফিরে মড়ার মতো পড়ে রইল। রান্নাঘরের দরজা তখন খোলা হয়ে গিয়েছে। গোগোল শুয়ে পড়তেই, এ-ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ওর বন্ধ চোখে হ্যারিকেনের আলো পড়ল। গোগা এগিয়ে এল। গোগোল বুঝতে পারল, হ্যারিকেনটা ওর মুখের কাছে এসে পড়েছে। তারপরে গোগার গলা শোনা গেল, 'হুঁ, বিচ্ছুটা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

কথাটা আপন মনে বলে, সে বেরিয়ে গেল। পরপর দুটো দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল।

॥ পাঁচ ॥

গোগোল প্রায় আধ ঘণ্টা ঘাপটি মেরে পড়ে রইল। একটু ঘুম যে না আসছিল, তা নয়। দুপুরে একটুও ঘুমোয়নি। তারপরে সেই ঘটনা। ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে ছিল। কপালকুণ্ডলা থেকে ওকে যেভাবে নিয়ে এসেছে, তাতেই ওর যেন শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে সব ওকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। ও উঠে বসল। কান পেতে শুনল, কোথায় কী শব্দ হচ্ছে। একটা গাঁক-গাঁক শব্দ ভেসে আসছে রান্নাঘরের বাইরে থেকে। নিশ্চয়ই গোগা সেখানে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

গোগোল উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল বাথরুমের দরজার কাছে। দরজা

খুলে বাথরুমে ঢুকল। আবার একটু দাঁড়াল। কান পাতল, কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবু, বাথরুমের অন্য দরজার কাছে গিয়ে দরজার গায়ে আলতো করে কান ছোঁয়াল। কোনো শব্দ নেই। বিক্রমকান্তিও ঘুমোচ্ছে। ও এবার ভেন্টিলেটারের দিকে দেখল। বাইরে চাঁদের আলো বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। ও কমোডের কাছে এগিয়ে গেল।

গোগোলের বুকের মধ্যে ভীষণ ধক্‌ধক্‌ করছে। ও নিজেই বুকের সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছে। বলতে গেলে, ওকে টিকটিকির মতো নিঃশব্দে, ভেন্টিলেটারে মাথা গলিয়ে বেরোতে হবে। কোনোরকম শব্দ হলে, পালানো তো হবেই না। গোগা ঘাড় মটকে শেষ করেই দেবে।

কিন্তু এখন সেসব ভেবে লাভ নেই। ও কমোডের ওপর উঠে দাঁড়াল। ভেন্টিলেটারের মাঝখানের রড ধরে, বাইরে উঁকি দিল। চাঁদ চলে গিয়েছে গাছপালার আড়ালে। সামনে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া বাইরে কোনো শব্দ নেই। আর গোগার নাক-ডাকাব গর্জন। গোগোল ভেন্টিলেটারের কাঁচের ফ্রেমটা সোজা করল। তারপবে মাথা কাত করে ঢুকিয়ে দিল। গলাসুদ্ধ মাথা বাইরে বেরিয়ে পড়ল। এবার দু' হাত বের করে, নিচের দিকে নামিয়ে দেওয়াল চেপে ধরল। এইবারই খুব মুশকিল। পিঠ আর কোমর কাঁচে ঠেকে যাবার ভয় আছে। আব ঠেকে গেলেই শব্দ হবে। ও মাথা নিচু করে, বুক ঘষটে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কাঁধ আর পিঠ বেরিয়ে যাবার পরেই, কোমরের কাছে রড ঠেকে গেল। অথচ ওর শরীরটা এখন এমনভাবে নিচু হয়ে ঝুলছে, এভাবে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। এখনও কোমর আর পা দুটো ভিতরে রয়েছে। অবস্থাটা খুবই বিপজ্জনক।

ঠিক এ-সময়েই গোগোলের চোখে পড়ল, কতকগুলো চোখ কাছেই জ্বলজ্বল করছে। সেই শেয়াল দুটো। ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শেয়াল দুটো কি ওকে আক্রমণ করতে আসবে? আসলে তো ওরা ভিতু জানোয়ার। তবু জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। হয়তো গোগোলকে কামড়াতে আসবে। এলে গোগোল হাত-পা ছুঁড়বে। আসলে শেয়াল দুটো যেন অবাক চোখে মজা দেখছে। দেখুক। ও কোমরটা বের করার জন্য নীচের দিকে নিজেকে একটু ঠেলে দিল। দিতেই, কোমর খানিকটা বেরিয়ে এল। আর শরীরের ভারটা নিচে এত বেশি হল, ও প্রায় হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ার আগেই, ভেন্টিলেটারের কাঁচে দু' পা লেগে জোরে শব্দ হল। গোগোল মাটিতে হাত দিয়ে মাথা বাঁচাল বটে, ভিতরে বিক্রমকান্তির চিৎকার শোনা

গেল, 'গোগা, এই গোগা, কিসের শব্দ হচ্ছে? শিগগির দেখ।'

গোগোলের হাঁটু ছড়ে গিয়েছে। হাতেও যেন কী ফুটেছে। কিন্তু ও দিশেহারা হয়ে পড়ল। কোন্ দিকে যাবে? বাঁ দিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। শেয়াল দুটো দৌড়ে সেদিকেই পালাল। ডান দিকে খোলা জায়গা। ও ডান দিকেই দৌড় দিল। বাড়ির ভিতরে তখন বিক্রমকান্তি আর গোগার গলা শোনা যাচ্ছে। বিক্রমকান্তির চিৎকারটাই গোগোল শুনতে পেল, 'সর্বনাশ, ছেলেটা বাথরুম দিয়ে পালিয়েছে! গোগা, ধর ওকে।'

গোগোল দেখল, সামনেই বিক্রমকান্তির জীপটা রয়েছে। বাইরে চাঁদের আলো না থাকলেও, বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। গোগোল সেই রাস্তা ধরে প্রাণপণ ছুটল। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলেছে বাঁ দিকে কয়েকটা বড় বাড়ি দেখা গেল। সেদিকে যাওয়াটা উচিত হবে? চিৎকার করে লোকজনকে ডাকলে, কেউ বেরোতে পারে। কিন্তু বাড়িগুলো কেমন ভুতুড়ে আর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোগোল ছুটতে-ছুটতেই এসব ভাবছিল। আর তখনই ওর পিছনে জীপের গর্জন শোনা গেল।

গোগোল না থেমে ছুটতে আরম্ভ করল। এখন ওর সামনে চারদিক খোলা। দুপাশে মাঠ, কয়েকটা গাছপালা। লুকোবার কোনো জায়গা নেই। ওর কানে যেন সমুদ্রের গর্জন ভেসে এল। এ-সময়েই ওর গায়ে হেডলাইটের আলো এসে পড়ল। জীপটা গর্জন করে ছুটে আসছে। গোগোল পিছন দিকে না তাকিয়ে, মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগল। বাঁ দিকে কতকগুলো ঘর, আর রাস্তার আলো দেখা গেল। সামনেই একটা বড় রাস্তা।

জীপটা প্রায় কাছে এসে পড়েছে। গোগোল রাস্তার ওপারে ঝাউবনে ঢুকে পড়ল। সেখানে জীপটা ঢুকতে পারবে না। ঝাউবনের মধ্যে ঢুকতেই গুলির শব্দ হল, আর ওর কানের পাশ দিয়ে কিছু-একটা বেরিয়ে গেল। গোগোল তবু ছুটল আর অবাক হয়ে দেখল, সামনে বালির চর, আর সমুদ্র। পিছনে বিক্রমকান্তির চিৎকার শোনা গেল, 'গোগা, ওকে সমুদ্রের দিকে তাড়া করে নিয়ে যা।'

তার মানে, গোগা গোগোলকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবে। জীপের শব্দ থেমে গিয়েছিল। কিন্তু আর-একটা গাড়ির শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। গোগা যেন চিৎকার করে কী বলল। গোগোল বুঝতে পারল না। ও তখন বালুচরে নেমে পড়েছে। চাঁদের আলোয় বালুচর চিকচিক করছে। গোগোল সমুদ্রের দিকে গেল না। ডান দিকে তাকিয়ে মনে হল ধু-ধু করছে।

বাঁ দিকে দূরে কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে। গোগোল সেদিকেই ছুটল। কিন্তু পিছনে ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই গোগা। গোগার হাতে পড়া মানেই জীবনের মতো সব শেষ।



গোগোলের আর দম থাকছে না। বালুচরও ভেজা। জোরে ছোটা যাচ্ছে না। তবু একেবারে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার আগে ও ছুটতে লাগল। হঠাৎ বেশ খানিকটা দূর থেকে গোগোলের গায়ের ওপর টর্চের আলো পড়ল। ও দেখল, সামনের দিক থেকে কেউ ছুটে আসছে। কে? বিক্রমকান্তি? তার মানে, পিছনে গোগা, সামনে বিক্রমকান্তি। গোগোলের সমস্ত শক্তি যেন ক্ষয় হয়ে গেল। ও টলতে-টলতে এগোল। আর তখনই ডাক শুনতে পেল, 'গোগোল, ভয় নেই।'

অশোক ঠাকুরের গলা! সামনের টর্চলাইটের আলো ছুটে এল ওর কাছে। আর ওকে জড়িয়ে ধরলেন অশোক ঠাকুর, 'গোগোল, আর ছুটতে হবে না। তুমি এখন আমার কাছে।'

গোগোল কেঁদে ফেলল। কোনোরকমে বলল, 'পেছনে গোগা আসছে।'

অশোক ঠাকুর গোগোলকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে হেসে বললেন, 'ওসব গোগা-টোগা কেউ নেই তোমার পেছনে। আমাকে সামনের থেকে আসতে দেখেই সে পালিয়েছে।'

গোগোলের চোখ তখন জলে ঝাপসা। তবু পিছন ফিরে একবার দেখল। সত্যি কেউ নেই। তারপরে ও প্রায় অজ্ঞানের মতো অশোক ঠাকুরের বুকে লুটিয়ে পড়ল। অশোক ঠাকুর ওকে একেবারে কাঁধের ওপর তুলে নিলেন। এ-সময়েই আর একটা টর্চের আলো এগিয়ে এল। আর সেই সঙ্গে চিৎকার, 'অশোক, গোগোলকে পেয়েছিস?'

'পেয়েছি।' অশোক ঠাকুর বললেন, 'জীপের শব্দ পেয়ে আমরা যদি গাড়ি নিয়ে ছুটে না আসতাম, তাহলে গোগোল এতক্ষণে সমুদ্রে ভেসে যেত। ছাখ ফটিক, আমি কিন্তু এটাই সন্দেহ করেছিলাম, কাঁথি থেকে বিক্রমকান্তি কলকাতার দিকে যায় নি। সে বুঝেছিল, থানায় থানায় খবর চলে গেছে, পথে ধরা পড়ে যাবে। আর সে এখানে নতুন টাউনশিপের কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। পুলিশ কি তাকে ধরতে পেরেছে?'

গোগোল ঠিক জ্ঞান হারায় নি। কথাগুলো সবই শুনতে পাচ্ছে। অশোক ঠাকুরের বন্ধু অয়স্কান্ত রায়—অর্থাৎ যাঁর ডাকনাম ফটিক, তাঁর সঙ্গেই কথা হচ্ছে। ফটিক বললেন, 'হ্যাঁ, ধরা পড়েছে, তবে সে জীপের আড়াল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করছিল। কিন্তু বেচারির রিভলভারে তিন-চারটের বেশি গুলি ছিল না। লোকজনের ভিড় দেখে ঘাবড়েও গেছল।'

অশোক ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'আর যে গোগোলকে তাড়া করছিল?'

ফটিক বললেন, 'কালো কুচকুচে খালি গা অসুরের মতো লোকটা যে

কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, বোঝা গেল না। সে এখনো ধবা পড়েনি।'

গোগোল অনেকটা সামলে নিয়েছে। জিজ্ঞেস কবল, 'বাবা-মা কোথায়?'

'সবাই আছেন। আমবা তোমাব বাবা-মা'ব কাছেই যাচ্ছি।' অশোক ঠাকুর বললেন, 'সত্যি গোগোল, তুমি যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছ, এটা একটা আশ্চর্যেব ব্যাপাব! কোথা থেকে কী ভাবে পালালে, পবে সব কথা শুনব। তবে, আমি একটা বোকাব মত কাজ করেছি, এটা মানতেই হবে। তুমি কপালকুণ্ডলায যাবাব আগে, আমাকে যখন ব্যাবিস্টাবস কলোনিব সেই বাড়িব ছাদে একজনেব মবে পড়ে থাকাব কথা বললে, তখনই আমাব বোঝা উচিত ছিল, সেটা কেউ লক্ষ্য কবছে।'

গোগোল বলল, 'আমাকে নামিয়ে দিন। আমি হেঁটে যেতে পাবব।'

অশোক ঠাকুব বললেন, 'তবু তোমাকে এখন হাঁটানো হবে না। তোমাব বুকেব মধ্যে যে-বকম ঢিপঢিপ কবছে, তোমাকে শুইযে দেওয়া দবকাব।'

কিন্তু গোগোলেব শোবাব ইচ্ছা মোটেই নেই। ও এখন কেবল বাবা-মা দিপুমামা, বুবুন, মামিমা, সবাইকে দেখতে চায। হঠাৎ অনেক লোকেব চিৎকাব শোনা গেল, 'ওই যে ওই যে, গোগোলকে নিয়ে ওঁবা আসছেন।'

গোগোল অশোক ঠাকুবেব কাঁধ থেকে মাথা তুলল। দেখল, বাজাবেব সামনে আলো জ্বলছে। অনেক লোকেব ভিড়। একজন পুলিশ অফিসাব এগিয়ে এলেন। বললেন, 'গোগোলেব কোনোবকম চোট লাগেনি তো?'

অশোক ঠাকুব বাস্তাব সামনেই সিঁড়ি দিয়ে একটা বাংলোব সামনে উঠতে-উঠতে বললেন, 'সেটা দেখতে হবে।'

গোগোল দেখল, বাংলোব সামনে ভিড়েব মধ্যে বাবা-মা দিপুমামা সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। বাংলোব বাবান্দাব নীচে বিক্রমকান্তিকে ঘিবে একদল সশস্ত্র পুলিশ। গোগোল এবাব অশোক ঠাকুবেব কোল থেকে পিছলে নেমে পড়ল। ছুটে গেল মায়েব কাছে। মা হাত বাড়াবাব আগেই গোগোল মায়েব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা ওকে দু হাতে জড়িয়ে, কেবল ফুঁপিযে কেঁদে উঠলেন। একটা কথাও বলতে পাবলেন না। একটা হাত গোগোলেব মাথায এসে পড়ল। নিশ্চয় বাবাব হাত। শুনতে পেল, বাবা বলছেন, 'আমি তো বিকেলেই বলেছিলাম, গোগোল যেন খুবই উত্তেজিত।'

পুলিশ অফিসাব জনসাধাবণকে উদ্দেশ কবে বললেন, 'এবাব আপনাবা ভিড় কমান। দেখতেই পাচ্ছেন, গোগোলকে ফিবে পাওয়া গেছে। আসামীও ধবা পড়েছে, আব সেটা গোগোলেব জন্যই।'

সবাই গোগোলকে দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি করছিল। কেউ-কেউ বলে

উঠল, 'গোগোলের তুলনা নেই। গোগোল জিন্দাবাদ!'

পুলিসের অফিসারের কথায়, গোগোলকে নিয়ে মা বাংলোর ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। বাবা দিপুমামা মামিমাও এলেন। বুবুন তো চোখ ছানাবড়া করে গোগোলকে দেখছে। গোগোলরা যে-হোটেলে উঠেছে, সেই হোটেলের ম্যানেজার এসে বললেন, 'গোগোল আমাদের হোটেলের অতিথি, আমরা গর্বিত। গোগোলের জন্য আমাদের হোটেলের ঘর চিরদিন খোলা থাকবে।'

একজন গোগোলের জন্য গরম দুধ নিয়ে এল। মা দুধের গেলাস গোগোলের মুখের সামনে ধরলেন। বললেন, 'নাও, খাও। তুমি চিরদিন আমাকে এমনি করে কাঁদাবে।'

গোগোল বলল, 'না মা, তোমাকে আমি কাঁদাতে চাই না।'

সকলের মুখেই হাসি, তবু যেন চোখগুলো ছলছল করছে। পুলিশ অফিসার, ইন্সপেক্টর, অশোক ঠাকুর, ফটিক, সবাই বসলেন। একজন বললেন, 'রাত্রি এখন সাড়ে দশটা মাত্র। গোগোলের মুখ থেকে সব ঘটনা শোনা যাক।'

॥ ছয় ॥

গোগোল দুধ খেয়ে, আর মা-বাবা সবাইকে পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল দুপুর থেকে ঘটে-যাওয়া, আর বাথরুমের ভেন্টিলেটার দিয়ে পালিয়ে আসার সব কথাই বলল। তারপরে ও জিজ্ঞেস করল, 'অনিলকান্তি চৌধুরি কে?'

অশোক ঠাকুর তাঁর বয়সী একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি অনিলকান্তি, অমৃতকান্তি চৌধুরির ভাইপো। অমৃতকান্তির ডেডবডি ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথিতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু, তুমি যে বললে, সেই বাড়ির কাঠকয়লার গাদায় চশমার খাপে গুপ্তধনের ম্যাপ আর চিঠি ছিল, সেটা পাওয়া যায়নি।'

গোগোল বলল, 'ও হো, আমি বলতেই ভুলে গেছি। চশমার খাপটা আমি নিয়ে এসেছি। আমাদের হোটেলের ঘরে খাটের গদির নীচে রেখেছি।'

সবাই হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। অনিলকান্তি বলল, 'ওহ্, ওটা আমরা কী খোঁজাই খুঁজেছি!'

হোটেলের ম্যানেজার আর একজন পুলিশ অফিসার তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেই চশমার খাপ নিয়ে ফিরে এলেন। বের করলেন সেই চিঠি আর ম্যাপ। অনিলকান্তি চিঠিটা পড়লেন, আর চোখের জল মুছলেন। চামড়ার ম্যাপটা টেবিলের ওপর রেখে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সবাই যখন ম্যাপ দেখে গুপ্তধনের জায়গাটা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করছেন, তখন অশোক ঠাকুর বললেন, 'এই ম্যাপে

একটা কপি অনিলবাবু আমাকে কাগজে এঁকে দিয়েছিলেন। আমি অমৃতবাবুকে খুঁজতে এসে, এই ম্যাপের জায়গাটা কোথায় হতে পারে, সেটা নানাভাবে অনুসন্ধান করেছি। জায়গাটা চিনতেও পেরেছি।'

সবাই উৎসুক বড়-বড় চোখে অশোক ঠাকুরের দিকে তাকালেন। তিনি গোগোলের বড়-বড় চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, সেই জায়গাটা এখন সমুদ্রের নীচে হারিয়ে গেছে। গত পঞ্চাশ বছরে সমুদ্র এত এগিয়ে এসেছে, সেই জঙ্গল আর বম্বেটেদের আড্ডা, তার সঙ্গে কাছাকাছি অনেক গ্রামই সমুদ্রের তলায় চলে গেছে।'

সকলের মুখেই যেন একটা হতাশা নেমে এল। কিন্তু অনিলকান্তি বললেন, 'সেই গুপ্তধন অভিশপ্ত, অমন ভালমানুষ কাকাকেও মরতে হল। সমুদ্রের তলায় গেছে, ভালই হয়েছে। থাকলে অনেককে মরতে হত।'

গোগোল অবাক চোখে অনিলকান্তির দিকে তাকিয়ে ছিল। তিনি এগিয়ে এসে গোগোলের গাল টিপে আদর করে বললেন, 'আমার একটাই সান্ত্বনা তোমার জন্যই আমার কাকার হত্যাকারী ধরা পড়েছে। কলকাতায় আমাদের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাব।'

গোগোল বলল, 'বাবা-মা'র সঙ্গে যাব।'

সবাই হেসে উঠলেন। মা বললেন, 'তুমি তো বাবা-মা'র সঙ্গে ছাড়া কোথাও যাও না, তাই কেবল বিপদ ডেকে আনো।'

'আর সাহসের সঙ্গে শুধু নিজেই বাঁচে না, অন্যকেও বাঁচায়।' অশোক ঠাকুর বললেন। গোগোল সলজ্জ হাসল। বুবুন ওর গায়ের কাছে দাঁড়াল।

দিপুমামা বললেন, 'এখন সাহসী ভাগ্নেটিকে নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি।'

গোগোলের সঙ্গে বাবার চোখাচোখি হল; তাঁর চোখে স্নেহ ঝরে পড়ছে। তিনি হাসলেন। বললেন, 'এবার যাওয়া যাক। গোগোলের ঘুম পেয়েছে।'

সবাই উঠে দাঁড়াতে পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনারা হোটেলে চলে যান। কাল দেখা হবে। তখন গোগোলের ফোটো তোলা হবে।'

গোগোল বলল, 'কিন্তু গোগাকে ধরবেন না?'

অশোক ঠাকুর বললেন, 'কাল সকালে তোমার সামনে গোগাকে আশা করি হাজির করতে পারব।'

মা গোগোলের হাত ধরে বাংলো থেকে নীচে নেমে এলেন। গোগোল দেখল, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ জ্যোৎস্নায় সাদা ফেনা ছড়িয়ে ছুটে আসছে। দিপুমামা গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে এলেন।



গোগোলের দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়াটা নানা দিক থেকেই মনে রাখবার মত। দার্জিলিং থেকেই যাওয়া হয়েছিল কালিম্পং। সেখানে এক তিব্বতী বৌদ্ধ মঠে তো একটা সাংঘাতিক খুনের ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল। তা আবার গোগোলের চোখের সামনেই। এক লামা আর এক লামাকে, পিছন থেকে ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিল।

কালিম্পং থেকে আবার দার্জিলিংয়ে ফিরে আসা। তারপরে নিমন্ত্র পেয়ে বেড়াবার ধুম পড়ে গেল। পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে বাবা বেশ হাঁপিয়ে পড়লেন। হোটেলে ঢুকেই বললেন, 'আমি আর কোথাও বেরোচ্ছিনে। এখন কয়েকদিন চুপচাপ বিশ্রাম করব।'

মায়েরও সেই অবস্থা। গোগোল বলল, 'তাহলে আমি কী করব?'

মা বললেন, 'তোমার জন্য তো ঘোড়া রয়েছেই। তুমি ঘোড়া চে বেড়াবে, আর গায়ে ঘোড়ার গন্ধ নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু মনে রে ম্যালের সমতল ছাড়া, আর কোথাও যাবে না। কালিম্পং যাবার আগে জলাপাহাড়ে ঘোড়া নিয়ে চলে গেছলে। ওরকম কিছু করতে যেও না।'

কিন্তু বাবা মা'র বিশ্রাম করা হল না। বাবার পরিচিত ভদ্রলোকে সংখ্যা এত, প্রায় রোজই কোন না কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ লেগেই রইল দার্জিলিংয়ে ছিলেন বাবার এক উকীল বন্ধু। নাম শচীন মৈত্র। তি কোর্ট থেকে ফেরার পথে বাবার সঙ্গে হোটেলে গল্প করতে আসতেন। তাঁ বাড়িতেও একদিন নিমন্ত্রণ হল।

গোগোল মিঃ মৈত্রের কথা থেকে আগেই জেনেছিল, ওঁর অদ্ভুত সবজিনিস সংগ্রহ করার বাতিক আছে। সে সব জিনিসের দাম এমনিতে বেশী নয়। অথচ দাম দিয়েও নাকি সেসব জিনিস পাওয়া যায় না। অতি দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য সব জিনিস, যা মানুষের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। গোগোল জানত ওটাকে কিওরিও সংগ্রহ করা বলে।

মিঃ মৈত্র ভারতবর্ষের যেখানে যখন গিয়েছেন, সেখান থেকেই কিছু না কিছু সংগ্রহ করে এনেছেন। তার মধ্যে রাজস্থানের আদিবাসী মেয়েরা গলায় যে পাথরের মালা ব্যবহার করে, তাও যেমন আছে, তেমনি সিকিমের রাজপ্রাসাদের রাজার দেহরক্ষীর বিশেষ তলোয়ারও আছে। সেই তলোয়ারটা তিনি রাজার কাছে চেয়ে এনেছিলেন। রাজা নাকি তাঁকে খুশি হয়েই সেটা দান করেছিলেন। তা ছাড়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটক এসব জায়গায় নাকি বিস্তর আর অদ্ভুত সব কিওরিও সংগ্রহ হয়।

মিঃ মৈত্রের বাড়িতে যেদিন গোগোলরা নিমন্ত্রণ খেতে গেল, সেইদিন গোগোল তাঁর অদ্ভুত সংগ্রহ সব দেখল। গোগোলের উৎসাহ দেখে, উনি নিজেই সব দেখালেন। চীন, জাপান, বার্মা, এশিয়াব নানা মুলুকের তামাব আর রূপোর টাকা পয়সা তো ছিলই। যাকে বলে মুদ্রা। এমন কি, প্রাগৈতিহাসিক যুগেব মাটির মুদ্রাও তাঁর কাছে ছিল। সোনা-রূপোব ছোটোখাটো জিনিসও কম ছিল না। ড্রাগনমুখো আংটি থেকে তিব্বতী নানা পাথরের জিনিস। বিচিত্র সব পশুর নখ, ল্যাজ, নানা দেশেব পোশাক, টুপি, মহিলাদের ব্যবহারের অদ্ভুত সব মাথার ক্লিপ, ব্রোচ্! কিছু আব বাকি নেই। এমন কি, অদ্ভুত দেখতে সব নানা দেশী দোয়াত, কলমও বাদ গেল না। তার মধ্যে একটা জিনিস গোগোলের খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছিল। মাত্র দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি বুদ্ধ মূর্তি। সেটা তামাব তৈবি। কিন্তু বুদ্ধের গলার কাছ থেকে টান দিলেই মাথাটা খুলে যায়। মাথাব ভিতর দিকে, একটা চকচকে পাথর। অনেকটা হীবের মতই দেখতে। আব সেই হীবের গায়ে লাগানো আছে চকচকে সরু একটা ছুঁচ।

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

গোগোল একলাই দেখছিল না। মিঃ মৈত্রের বন্ধু এবং গোগোলের বাবারও বিশেষ পরিচিত মিঃ গাঙ্গুলিও দেখছিলেন। গোগোলেব কথা শুনে মিঃ মৈত্র বললেন, 'আমাকে যে এটা দিয়েছিল, সে একজন তিব্বতী রিফুউজি। এটার জন্য সে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দাম নিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ছুঁচটা এভাবে পাথরে গাঁথা কেন? জবাবে সে বলেছিল, আসলে, বুদ্ধের শরীরের ভেতরের অংশে যে ফাঁপা জায়গাটা রয়েছে ওর মধ্যে একরকম আঠার মত বিষ থাকে। ছুঁচটা সেই বিষের আঠায় গোঁজা থাকে।

'ছুঁচটা মাত্র ইঞ্চিখানেক লম্বা বটে, কিন্তু ওটা দিয়ে কারোর গায়ে ফুটিয়ে দিলে সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে।'

বাবা বলে উঠলেন, 'কী সাংঘাতিক! না ভাই মৈত্র, এ সব মারাত্মক জিনিস তোমার কেনা উচিত হয়নি। এসব তো খুনীরা ব্যবহার করে।'

মিঃ মৈত্র হেসে বললেন, 'ভয় নেই, এর মধ্যে এখন আর বিষ নেই। আমি কারোকে খুন করার জন্য এটা কিনিনি। একটা রেয়ার কিওরিও হিসেবেই কিনেছি। বুদ্ধ হলেন অহিংসার প্রতীক। আর দেখ, তারই ছোট্ট একটা তামার মূর্তির মধ্যে কী ভীষণ মারণাস্ত্র লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ছোট্ট তামার মূর্তিটা খুবই সুন্দর! আমি সেজন্যই কিনেছি।'

এই সময়ে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। মিঃ মৈত্র তাঁর কাঁচের ঢাকনার বাক্সে সব জিনিসগুলো ঢুকিয়ে দিলেন। সবাই দরজার দিকে তাকালেন। মিঃ মৈত্র গেলেন দরজা খুলতে। গোগোল বাবার সঙ্গে বাইরের ঘরে গেল। মিঃ গাঙ্গুলি ওদের পিছনে পিছনে এলেন। বাইরের দরজা খুলতে দেখা গেল, মিসেস গাঙ্গুলি তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে এসেছেন।

মিঃ মৈত্র বললেন, 'আসুন আসুন। মিঃ গাঙ্গুলি বলছিলেন, আপনাদের আসতে একটু দেরী হবে।'

মিসেস গাঙ্গুলি বললেন, হ্যাঁ, আমরা স্নান সেরে এলাম। মিঃ গাঙ্গুলির তো শীত বেশী, উনি রোজ স্নান করেন না। আমরা আবার তা পারিনে।'

মিঃ গাঙ্গুলি স্যুট পরে, টাই বেঁধে এসেছিলেন। তিনি কেবল হাসলেন, কোন কথা বললেন না।

গোগোল দেখল, মিঃ গাঙ্গুলির মুখটা কেমন লাল দেখাচ্ছে। তিনি ঘামছেনও বটে। শীত করলে ঘামবেন কেন? গোগোলের খুব অবাক লাগল।

যাই হোক, দুপুরে খাওয়ার পরে, খানিকক্ষণ গল্পগুজব হল। তারপরে বিদায়ের পালা। গোগোল বাবা-মায়ের সঙ্গে হোটেলে ফিরে এল। মিঃ গাঙ্গুলির স্ত্রীও গোগোলদের সঙ্গে ফিরতে চেয়েছিলেন। কারণ ম্যালে একটু বেড়িয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিঃ গাঙ্গুলি ব্যস্তভাবে বললেন, তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এখন উপরে উঠলে, ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।

মিঃ গাঙ্গুলির বাড়ি মিঃ মৈত্রের বাড়ি থেকেও খানিকটা নীচে, প্রায় বাজারের কাছে। তাঁরা চলে গেলেন নীচের দিকে। গোগোল বাবা মা'র সঙ্গে উপরে উঠে এল।

গোগোল বিকালে বেশ কয়েক পাক ঘোড়ায় চেপে বেড়াল। মা আর বাবা ম্যালের একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলেন। গোগোল যখন ঘোড়া ছেড়ে

ফিরে এল, দেখল মিঃ মৈত্র বাবার পাশে বসে আছেন। সকলের মুখই খুব গম্ভীর। সকলেই গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মিঃ মৈত্র হেসে বললেন, 'কী গোগোল, খুব ঘোড়ায় চড়া হল?'

গোগোল কিছু বলবার আগেই মা বললেন, 'শোন গোগোল, তুমি কি মিঃ মৈত্রের বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে এসেছ?'

গোগোল অবাক হয়ে বলল, 'না তো। ওঁর বাড়ি থেকে কী আনব?'

বাবা বললেন, 'উনি যে সেই বুদ্ধের মূর্তিটা দেখাচ্ছিলেন, যার মধ্যে সেই ছুঁচটা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই উনি জিজ্ঞেস করতে এসেছেন তুমি ওটা নিয়ে এসেছ কি না।'

গোগোলের ভীষণ রাগ হয়ে গেল। বলল, 'ছি ছি, পরের জিনিস না বলে আমি কেন নিয়ে আসব?'

মা গোগোলকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি যা পরে আছ, এই পরেই মিঃ মৈত্রের বাড়ি গেছলে। তারপর আর হোটেলেও যাওয়া হয়নি। তোমার প্যান্টের আর জামার পকেটে কী আছে সব দেখিয়ে দাও।'

গোগোলের মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল। দেখল বাবা মায়ের মুখেও অপমানের ছাপ। মিঃ মৈত্র গোগোলের দিকে চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন। মা বলেছেন বলেই গোগোল ওর সোয়েটার খুলে, ভেতরের জামার আর প্যান্টের পকেট উলটে খুলে দেখিয়ে দিল।

বাবা বললেন, 'হয়েছে মিঃ মৈত্র? নাকি গোগোলের জুতো-মোজাও খুলে দেখাতে হবে?'

মিঃ মৈত্র গোগোলের পায়ের দিকে তাকালেন। গোগোল নিজেই পায়ের জুতো মোজা খুলে দেখিয়ে দিল। মিঃ মৈত্র হেসে বললেন, 'না না, ঠিক আছে। মানে—।'

'আপনার ওসব মানে টানে শুনতে চাইনে।' বাবা বেশ রেগে উঠে বললেন, 'আগে জানলে, আপনার বাড়িতে কখনোই আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যেতাম না। এটা রীতিমত অপমান। আপনি কী করে আমার ছেলেকে সন্দেহ করলেন, ও সেই বুদ্ধ মূর্তিটা না বলে নিয়ে আসবে?'

মিঃ মৈত্র বললেন, 'প্লিজ রাগ করবেন না। ভাবলাম ছেলেমানুষ, হয়তো খেলাচ্ছলে ওটা নিয়ে এসেছে। আমি অপমান করার জন্য বলিনি। গোগোল আমার ছেলের মত। আমি আমার ছেলেদেরও জিজ্ঞেস করেছি। জানেন, কত কষ্ট করে আমি এসব সংগ্রহ করেছি। ওগুলো আমি আমার প্রাণের থেকেও বেশী ভালবাসি। আপনাদের অপমান করতে চাইনি।'

গোগোল রাগে ও অপমানে ফুঁসছিল। কিন্তু ওর মনে অন্য একটা চিন্তাও উঁকি দিচ্ছিল। ও বলল, 'আপনি মিঃ গাঙ্গুলির কাছে খোঁজ

করেছিলেন ?'

মিঃ মৈত্র জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, তা কী করে হয় ? উনি একজন সবকারি বড় অফিসার। দার্জিলিংয়ে ওঁর খুব নাম। উনি কি ও কাজ করতে পাবেন !'

গোগোল বলল, 'আপনি আমার কথা যদি ভাবেন, মিঃ গাঙ্গুলির কথা ভাববেন না কেন ? কলিং বেলের শব্দ শুনে আমরা সবাই যখন বাইরের ঘরে গেছলাম, উনি সকলেব পরে সেখানে এসেছিলেন ।'

মিঃ মৈত্রব কপালেব রেখাগুলো সাপের মত এঁকে বেঁকে উঠল। গোগোলেব আবও মনে পড়ে গেল, মিঃ গাঙ্গুলি কেবল ঘামছিলেন না, তাঁকে কেমন চুপচাপ দেখাচ্ছিল। আর পিছনে পিছনে আসবার সময় উনি কোটের ইনসাইড পকেটে কয়েকবার হাত দিয়েছিলেন ।

বাবা বললেন, 'গোগোল, ভদ্রলোকের সম্পর্কে এরকম বলতে নেই ।'

গোগোলেব চোখে তখন জল এসে পড়েছে। বলল, 'বাবা, আমরা কি তবে ভদ্রলোক নই ? আমাব কিন্তু বিশ্বাস, মিঃ গাঙ্গুলিই ওটা নিয়েছে ।'

মিঃ মৈত্র জিজ্ঞেস কবলেন, 'কেন তোমাব এরকম বিশ্বাস হচ্ছে বলতো ?'

গোগোল বলল, 'সে সব আমি বলতে চাইনে। আমার মনে হয়, মিঃ গাঙ্গুলিব কোটের ইনসাইড পকেটে এখনো বোধহয় সেটা আছে। যদি উনি লুকিয়ে না ফেলে থাকেন !'

'কী সব বলছ তুমি গোগোল !' বাবা ধমক দিয়ে উঠলেন।

মিঃ মৈত্র বললেন, সমীরেশবাবু, গোগোল যখন এরকমভাবে বলছে, নিশ্চয়ই তাব কোন কাবণ আছে। অবশ্য তিনি একজন মস্ত অফিসার। তবু চলুন না, সবাই মিলে একবার তাঁর বাড়িতে যাই ?'

বাবা মায়ের দিকে তাকালেন। মা বললেন, 'গিয়ে দেখাই যাক না।'

মিঃ মৈত্র উঠে দাঁড়ালেন। বাবা মাও উঠলেন। গোগোল তাঁদের সঙ্গে, আহিত ম্যানসনের পাশ দিয়ে নীচের রাস্তায় হেঁটে চলল। বাজারের কাছাকাছি মিঃ গাঙ্গুলির বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগল প্রায় পনের মিনিট। সামনের কাঁচের দরজা জানালা বন্ধ ছিল। কলিং বেল টিপতেই, একজন নেপালী মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, মিঃ গাঙ্গুলি পাজামার ওপরে সোয়েটার আর শাল চাপিয়ে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন। সবাইকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন। গোগোল দেখল, তাঁর চোখে মুখে একটা ব্যস্ত ত্রস্ত ভাব। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার ? আসুন আসুন, বসুন। আমার স্ত্রী আর মেয়েরা সিনেমা দেখতে গেছে।'

মিঃ গাঙ্গুলি তারপর বললেন, 'বসুন, একটু চা করতে বলি।'

বলেই তিনি, গলা তুলে ডেকে বললেন, 'কাঞ্ছি, তুমি একটু চা বানাও।'

গোগোল বলল, 'আমি একটু বাথরুমে যাব।'

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, 'বেশ চল, আমি তোমাকে বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি।'

গোগোল মিঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে অন্য ঘরের ভিতরে ঢুকল। সেটা একটা শোবার ঘর। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। এক পাশে কাঠের পার্টিশন দেওয়া একটা ঘেরাওয়ের মধ্যে। ব্রাকেটে ঝোলানো ট্রাউজার শার্ট কোট শাড়ি জামাও রয়েছে। আর একটা ড্রেসিং টেবিল। মিঃ গাঙ্গুলি গোগোলকে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি। তুমি ঘুরে এস।'

মিঃ গাঙ্গুলি চলে গেলেন। গোগোল বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গেল। মিঃ গাঙ্গুলি চলে যেতেই, ও কাঠের পার্টিশনের মধ্যে ঢুকে গেল। মিঃ গাঙ্গুলি যে



কোটটা পরে গিয়েছিলেন, সেটা ওর চোখে পড়ল। প্রত্যেকটা পকেট হাতড়ে, সেই বুদ্ধ মূর্তি পেল না। গোগোলের লজ্জা আর ভয় দুই হল। কিন্তু ওর বিশ্বাস একেবারে অনড়। ও পাগলের মত মিঃ গাঙ্গুলির সব ট্রাউজার আর কোটের পকেট হাতড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটা নীল জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাতেই, একটা কাগজের প্যাকেট পাওয়া গেল। গোগোল প্যাকেটটা খুলতেই, বেরিয়ে পড়ল সেই বুদ্ধ মূর্তি। ওর বুকের মধ্যে তখন ধক্ ধক্ করছে, নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। তাড়াতাড়ি সেটা নীল জ্যাকেটের পকেটে ঠিক জায়গায় রেখে ফিরে গেল বসবার ঘরে।

মিঃ মৈত্র বাবা মা সবাই ওর দিকে তাকালেন। মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, 'কী গোগোল, কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

গোগোলের মুখ লাল। ও মিঃ মৈত্রের পাশে বসে বলল, 'না। আমাকে একটা কাগজ পেন্সিল দেবেন?'

মিঃ গাঙ্গুলি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিশ্চয়ই দেব। কী করবে?'

গোগোল বলল, 'আমি একটা চিঠি লিখব।'

মিঃ গাঙ্গুলি হেসে উঠে, কাছের টেবিল থেকে কাগজের প্যাড আর পেন্সিল এনে দিয়ে বললেন, 'সত্যি, আমাদের বড়োদের মাঝখানে ও আর কী করবে? নিশ্চয়ই কলকাতার কোন বন্ধুকে চিঠি লিখবে।'

গোগোল কিছু বলল না। মায়ের দিকে একবার দেখল। তারপর কাগজের প্যাড কোলের ওপর রাখল। মিঃ গাঙ্গুলি তখন এবারের মে মাসেও দার্জিলিংয়ে কেমন শীত, সে কথা বাবাকে বলছিলেন। মিঃ মৈত্রের চোখ গোগোলের কোলে রাখা কাগজের প্যাডের দিকে। গোগোল লিখল, 'বুদ্ধ মূর্তিটা শোবার ঘরের ব্রাকেটে, নীল জ্যাকেটের পকেটে রয়েছে।'

মিঃ মৈত্র হঠাৎ বিষম খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলেন। মিঃ গাঙ্গুলি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী হল, মিঃ মৈত্র?'

মিঃ মৈত্র বললেন, 'শরীরটা খুব ভাল লাগছে না। অসময়ে খেয়েই। জানেন তো দার্জিলিংয়ের জল আমার সহ্য হয় না। আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, 'যান। আপনি তো আমার বাড়ির সবই চেনেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে আর কিছু চেনাতে হবে না স্যার।' বলে মিঃ মৈত্র উঠে গেলেন।

নেপালী মেয়েটি ট্রেতে করে চায়ের কাপ আর ঢাকনা দেওয়া টিপট সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখল।

মিঃ গাঙ্গুলি সকলেব কাপে চা ঢেলে দিলেন।

মিঃ মৈত্র ফিবে এলেন, তাঁব দুই চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। গোগোলের পাশে এসে বসলেন। গোগোল কাগজেব প্যাড থেকে লেখা কাগজটা ছিঁড়ে নিল। মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, 'কী হল, চিঠি লেখা হয়ে গেল ?'

গোগোল বলল, 'হ্যাঁ।'

চা খাবাব পবে, দু'চাব কথাবার্তা বলে সকলেই উঠে পড়লেন। তখন সন্ধ্যা উতবে গিয়েছে। বাস্তায আলো জ্বলছে। মিঃ গাঙ্গুলি সবাইকে বিদায দিযে নমস্কাব জানালেন। খানিকটা পথ গিযেই, মিঃ মৈত্র গোগোলকে বুকে জড়িযে ধবলেন। তাঁব চোখে জল। ভাঙা গলায বললেন, 'বাবা গোগোল, আমি তোমাব বাবা মাযেব মনে কষ্ট দিযেছি, তোমাকেও কষ্ট দিয়েছি। আমি বযসে বড হযেও তোমাব কাছে ক্ষমা চাইছি। তোমাব সন্দেহই ঠিক।'

মিঃ মৈত্র বুদ্ধ মূর্তিটা খুলে বাবা মাকে দেখালেন। কিন্তু তখনও তাঁব চোখ থেকে জল পড়ছে। বাবাব হাত ধবে বাবে বাবে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। আব পাগলেব মতই গোগোলকে আদব কবতে লাগলেন।

বাবা বললেন, 'মিঃ মৈত্র, আপনাব মনেব অবস্থা বুঝেছি। এখন আব আমবা কিছু মনে কবছিনে। আপনাব সখেব জিনিসটা ফেবত পেযেছেন, সেটাই আসল কথা।'

মিঃ মৈত্র বললেন, 'আব সেটা গোগোলেব জন্যই। গোগোলেব অনাবে আজ বাত্রেও আমাব বাড়িতে আপনাদেব নিমন্ত্রণ। চলুন সবাই আমাব বাড়িতে।'

মা বললে, 'মিঃ গাঙ্গুলি কী ভাববেন ?

মিঃ মৈত্র বললেন, 'কী আবাব ভাববেন ? সবই বুঝতে পাববেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পাববেন না। এটাও বুঝবেন, গোগোলই কাণ্ডটা ঘটিযেছে।' বলে তিনি গোগোলকে একেবাবে কোলে তুলে নিলেন, বললেন, 'জান গোগোল, মিঃ গাঙ্গুলিব ওটা নিশ্চযই একটা বোগ এই বোগেব নাম ক্লিপটোম্যানিযা। উনি চোব নন, তবে এক বকমেব চুবিই বটে।'

বাবা বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। নইলে মিঃ গাঙ্গুলিব মত লোক ওটা নিয়ে আসবেন কেন ?'

'কিন্তু একেই বলে টিট ফব ট্যাট।' বলে মিঃ মৈত্র হেসে উঠলেন।

সমাপ্ত